বঙ্গীয়

লোক-সঙ্গীত রত্নাকর

বাংলার লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ

(An Encyclopaedia of Bengali Folk-Song)

প হইতে ব

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ., পি.-এইচ্. ডি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক,

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমির রত্নসদস্য,

পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের অবৈতনিক অধ্যক্ষ

পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ

৩২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড্

কলিকাতা-৩৪

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী

কল্যাণভাজনেষু

বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর ১ম খণ্ড অ—ছ

বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর ২য় খণ্ড জ—ন

বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর ৩য় খণ্ড প—ব

বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর ৪র্থ খণ্ড ভ—হ

নিবেদন

'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর' বা বাংলা লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ, তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে মাত্র 'প' হইতে 'ব' পর্যন্ত আদ্য অক্ষরবিশিষ্ট লোক-সঙ্গীতগুলি স্থান পাইল। ইহার কারণ 'প'-এর মধ্যে পাঁচালী এবং প্রেম-সঙ্গীত অত্যন্ত দীর্ঘ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং 'ব'-এর মধ্যে বিবাহের গান দীর্ঘতম স্থান অধিকার করিয়াছে; তদুপরি বাউল গান এবং বোলান গানের জন্যও বিস্তৃত স্থান দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই সকল কারণেই মাত্র তিনটি অক্ষর দ্বারাই এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। অবশ্য 'ব'-এর মধ্যে বর্গীয় 'ব' এবং অন্তঃস্থ 'ব' উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে আরও একটি বিষয়ের বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিবার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও স্থানাভাবে সেই প্রলোভন সংযত করিতে হইয়াছে, তাহা বারমাসী গান। আমার 'বাংলার লোক-সাহিত্যে'র তৃতীয় খণ্ডে বারমাসী গানের বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহার আর পুনরুক্তি করা হইল না। কেবলমাত্র যে সকল বারমাসী উক্ত গ্রন্থে স্থান পায় নাই এবং যাহা বিগত দুই তিন বৎসরের মধ্যে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে. তাহাই বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পাঁচালী গান আকারে দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাই মঙ্গল গানের ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইত। মঙ্গলকাব্যের লিখিত ধারার উদ্ভবের পরও তাহার মৌখিক ধারাটি পাঁচালী গানের রূপে সমাজের মধ্য দিয়া প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। সেইজন্য মঙ্গলকাব্য বিষয়ক আলোচনায়ও ইহাদের বিশেষ একটু গুরুত্ব আছে। অথচ বিস্তৃতির জন্য সকল বিষয়ক পাঁচালীর উদ্ধৃতি সম্ভব হয় নাই। নানা স্থান হইতে ইহাদিগকে সংগ্রহ করা হইলেও প্রধানত মুর্শিদাবাদ জিলার সংগ্রহই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

'প'-এর মধ্যে পাঁচালী গানের পরই পাতানাচের গানের উদ্ধৃতিও উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে পাতানাচের গানের একটি বিশেষ স্থান আছে। ইহাতে আদিবাসীর গীতিসুর এবং নৃত্যভঙ্গি সাধারণ বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। জাতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির সমন্বয়ের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বাংলা ভাষা কি ভাবে যে আদিবাসীর ভাষার উপর নিজের প্রভাব স্থাপন করিয়া ক্রমে তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশেষত এই সকল গান আজ 'সভ্যতা'র সংঘাতে দ্রুত বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। পাতানাচের গান নৃত্য সম্বলিত গান এবং ইহার নৃত্য মিশ্র নৃত্য অর্থাৎ নরনারীর মিলিত নৃত্য। এই শ্রেণীর নৃত্য আজ নানা কারণে বিলুপ্ত হইতেছে; সুতরাং এই সম্পর্কিত সঙ্গীতের প্রেরণাও সমাজ-মানস হইতে বিলুপ্ত হইতেছে। অতএব যতদূর সম্ভব ইহাদিগকে রক্ষা করাই প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া ইহাদেরও এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইহাতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

প্রেম-সঙ্গীত বলিয়া স্বতন্ত্র একটি বিষয় নির্দেশ করা কঠিন; কারণ, বিভিন্ন সঙ্গীতের মধ্যেই, যেমন ভাওয়াইয়া, ঘাটু, ঝুমুর ইত্যাদিতে প্রেমের বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। ভাটিয়ালি সুরেও প্রেম-সঙ্গীত গীত হয়, তাহাকে সাধারণ ভাবে ভাটিয়ালি গানই বলে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে সকল গান বিশেষ কোন পরিচিত সংজ্ঞায় অভিহিত হয় না, অথচ প্রেমের বিষয় তাহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাদিগকেই সাধারণভাবে প্রেম-সঙ্গীত শিরোনামার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রেমের গান যেমন দুইটি প্রধান বিষয়ে বিভক্ত, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এবং লৌকিক, উদ্ধৃতির মধ্যে এই বিভাগটিও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। তথাপি এ কথা সত্য, প্রেম-সঙ্গীত সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। এমন কি, বিবাহের বিভিন্ন আচার পালনের সময় যে সকল সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যেও প্রেম-সঙ্গীত প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগকে প্রেম-সঙ্গীত বলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ না করিয়া বিবাহ-সঙ্গীত বলিয়াই উল্লেখ করিতে হয়। তথাপি প্রেম-সঙ্গীত নামক একটি স্বতন্ত্র বিষয় নির্দেশ না করিলে বিষয়টির গুরুত্ব রক্ষা পায় না; সেইজন্য এখানে স্বতন্ত্রভাবে তাহা বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের শতাধিক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া বাউল গান উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে উদ্ধৃত বাউল গানগুলি বাউলের সূক্ষ্ম সাধন-তত্ত্ব সম্মত অর্থাৎ বাউলের নিজস্ব ধর্মাচার-মূলক গান নহে, বরং সাধারণ ভাবে ইহাদিগকে লৌকিক বাউল গান বলা যাইতে পারে। কারণ, লৌকিক বাউলই লোক-সঙ্গীত, শাস্ত্রীয় বাউল গানকে যথাযথ লোক-সঙ্গীত বলা যাইতে পারে না; যাহা আচারমূলক ধর্মীয় সঙ্গীত তাহা লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হয় না। লৌকিক বাউল কথাটিও একটু স্পষ্ট করিয়া বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

ধর্মসাধনার একটি বিশিষ্ট ধারার নাম বাউল; তাহার মধ্যে একদিন যেমন গুরুবাদ ছিল না, তেমনই আচারের জটিলতাও ছিল না। কিন্তু ক্রমে ইহা

চৈতন্যধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। বিশেষত পশ্চিম বাংলার বাউল গানে নির্বিচারে রাধাকৃষ্ণ এবং চৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়া ইহার মৌলিক পরিচয়টি আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে এবং সেই অনুযায়ী এক শ্রেণীর বাউল গান রচিত হইয়াছে। বাউল সাধনার মূল আদর্শ হইতে বিচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ লোক ইহাদিগকে বাউল গান বলিয়াই জানে; কারণ, বাউল সাধনার দুই একটি তত্ত্বকথা ইহাদের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। পূর্ববাংলার বাউল গান চৈতন্যধর্মের প্রভাব হইতে অনেকখানি মুক্ত; কিন্তু পশ্চিম বাংলার বাউল গানে চৈতন্যধর্মের প্রভাব অধিক অনুভব করা যায়। চৈতন্যধর্ম প্রভাবিত বাউল গানকেই প্রধানত লৌকিক বাউল বলিয়া উল্লেখ করা যায় এবং প্রধানত তাহাই এই গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বাউলগানের উদ্ধৃতির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দেহতত্ত্বের গান, গুরুবাদী গান, সাধারণ ভক্তি এবং বৈরাগ্যমূলক গানও মিশিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, লৌকিক বাউলগানে কখনও অবিমিশ্র বাউল সাধনার কথা পাওয়া যায় না, অন্যান্য ভাব এবং চিন্তাও ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। বিশেষত পল্লীর সাধারণ গায়ক এবং শ্রোতা যে কোন বৈরাগ্যমূলক গানকেই বাউলগান বলিয়া ভুল করিয়া থাকে।

এই খণ্ডে বিপুল সংখ্যক বিবাহের গান উদ্ধৃত হইয়াছে। অথচ বিবাহের গান আমাদের যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার এক চতুর্থাংশও ইহাতে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে বিবাহের গানই দ্রুত শুধু পরিবর্তনই নহে, লুপ্ত হইতেছে। অথচ বিবাহের গানের মধ্য দিয়া সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের যে প্রত্যক্ষ পরিচয় উদ্ধার করা যায়, তাহা ইতিহাস এবং সমাজ-তত্ত্বের দিক দিয়া বিশেষ মূল্যবান্। সুতরাং ইহারা লুপ্ত হইয়া গেলে জাতির একটি বিশিষ্ট সম্পদ লুপ্ত হইয়া যাইবে। বিবাহের সঙ্গীতগুলি অন্যান্য সঙ্গীতের তুলনায় অত্যন্ত রক্ষণশীল; কারণ, বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ। সমাজের বিশ্বাস, বিবাহের আচারে কোন বিঘ্ন হইলে সন্তান লাভে বিঘ্ন হয়। বিবাহের সঙ্গীতগুলি বিবাহের স্ত্রী-আচারের অন্তর্ভুক্ত। আজ সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ফলে বিবাহের আচার শুধু পরিবর্তিত নহে, সম্পূর্ণ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং ইহাদিগকে এখনও যদি সংগ্রহ করিয়া রাখা না যায়, তবে কয়েকদিনের মধ্যে তাহাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

বিবাহের গানের মধ্য দিয়াও যে বাংলার সমাজ-জীবনের সংহতি সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন অঞ্চলের বিবাহের গানগুলির তুলনামূলক আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সেইজন্য বাংলার পশ্চিম সীমান্ত, উত্তর সীমান্ত এবং পূর্ব সীমান্তের বিবাহের গানই আমি বর্তমান খণ্ডে অধিক উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহাদের মধ্য দিয়া বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ধুবড়ী গোয়ালপাড়ার বিবাহের গানগুলি শ্রীনীহার বড়ুয়া কর্তৃক সংগৃহীত। নানা কারণে গানগুলি বিশেষ মূল্যবান্।

বোলান গানও বর্তমান খণ্ডে অধিক সংখ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছি। এক একটি বোলান গানের পালা আকারে অত্যন্ত দীর্ঘ; সেইজন্য মাত্র কয়েকটি পালা উদ্ধৃত করিতেই গ্রন্থের বিস্তৃত কলেবর অধিকার করিয়াছে। এই শ্রেণীর অসংখ্য পালা মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত আছে। বোলান গান পল্লী বাংলার লোক-নাট্যের বিশিষ্ট একটি রূপ। ইহারা গীতি-নাট্য; ইংরেজীতে যাহাকে 'অপেরা' বলে, বাংলার পল্লীর বোলান গান প্রকৃত পক্ষে তাহাই। পাঁচালী কিংবা এই শ্রেণীর অন্যান্য বর্ণনামূলক গীতির সঙ্গে ইহাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য। কিন্তু বোলান গানের গীতিরূপ ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া পাঁচালীর আকার ধারণ করিতেছে, এই খণ্ডে উদ্ধৃত বোলার গানগুলির মধ্য দিয়া ইহাদের ক্রমপরিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করা যাইবে।

এই খণ্ডে প্রকাশিত অধিকাংশ গানই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের লোক-সাহিত্য শাখার ছাত্রছাত্রী দ্বারা প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে আমার তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীরা যে কষ্টসহিষ্ণুতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে, তাহার জন্য তাহারা আমার আশীর্বাদ ভাজন। আমার ছাত্র অধুনা অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র গ্রন্থখানির মুদ্রণকার্যে সহায়তা করিয়াছেন। তিনি আমার স্নেহভাজন।

মুর্শিদাবাদ জিলার সারগাছি গ্রামের রামকৃষ্ণমিশন বুনিয়াদি শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকগণও ইহার এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গান প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিবার কার্যে সহায়তা করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
দশহরা, ১৩৬৭ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

লোক-সঙ্গীত রত্নাকর

তৃতীয় খণ্ড

প—ব

প

পটুয়ার গান

বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হইতে যদি পশ্চিমবঙ্গের প্রধানত পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলি পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করা যায়, তবে সেই সব অঞ্চলে যে বিশেষ প্রকৃতির এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহাই পটুয়ার গান। একদিন মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অর্থাৎ প্রধানত তমলুক অঞ্চলেই ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রধানত তাম্রলিপ্ত বা প্রাচীন তমলুকের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং দ্বিতীয়ত উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র বলিয়া এই অঞ্চলেই ইহার প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ হইয়া থাকিবে। আজিও তমলুকের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পটুয়া নামক এক শ্রেণীর সম্প্রদায় পট আঁকিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে সঙ্গীতসহ তাহার প্রদর্শনী করিয়া থাকে। কিন্তু এই অঞ্চলে ইহা আজ প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, বরং বাংলার লোক-সঙ্গীতের রাঢ় অঞ্চল বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করা যায়, তাহার অন্যত্র, প্রধানত বীরভূম অঞ্চলে ইহার প্রভাব এখন পর্যন্ত কতকটা সক্রিয় আছে।

লোক-সঙ্গীতেব অন্যান্য বিষয়ের মত পটে আঁকিবার বিষয়-বস্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বশত ইহাতে বৈষ্ণব বা ভাগবত-প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তারপর রামায়ণ কাহিনীও বৈষ্ণবভাবে অনুপ্রাণিত বলিয়া তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। লৌকিক বিষয়ের মধ্যে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীও কতকটা স্থান অধিকার করিয়াছে।

কৃষ্ণ-বিষয়ক পটগুলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ কদাচ প্রকাশ পায় না; এমন কি, সাত্ত্বিক মাধুর্য রূপও যে প্রকাশ পায়, তাহাও নহে—বরং তাহাদের পরিবর্তে তাঁহার নিতান্ত লৌকিক রূপটিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত পটখানিই তাহার প্রমাণ।

১

কৃষ্ণলীলা

কানিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা,
বনফুল গাঁথিয়ে কৃষ্ণের গলে বনমালা।
হাত বাঁকা পায় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি,
চরণের নূপুর বাঁকা চুড়ার টানুনি।
চূড়া বাঁধে নানা ছাঁদে অলকা তুলালী
তাও দেখে ভোলে ব্রজের ষোল শ রমণী।
তার ধারে ধারে নাম লিখেছে রাধা বিনোদিনী
চার কড়ার বাঁশী নয় ঠাকুর পিতলের ছোঁয়ানি।
কোন কোন গোপী বলে, বাঁশ বাঁশিয়া নয় তরল বাঁশের ডগা
ডাকে নাম ধরে বাঁশী সদাই রাধা রাধা।
সেই বাঁশী দিবানিশি করে অপমান
সেই বাঁশীতে ভোলায় সকল ব্রজগোপীগণ।
পারে বসন রেখে তবে জলখেলা করে,
গোপীর বসন লয়ে কানাই সেদিন ডালে বন্ধন করে।
জলখেলা করতে গোপী পাড় পানে চায়,
শুকান বস্ত্রখানি দেখিতে না পায়।
ঝড় নাই ঝঙ্কার নাই বস্ত্র কেবা লয়,
নন্দের বেটা চিকন কালা গোপীর বসন ধ'রে লয়।
কে নিলে বস্ত্র সকল গোপীগণ কেঁকায়।
বলে, চল চল যাব আমরা কংস রাজার ঠাঁই,
কৃষ্ণের অভিতাপে আর জাতি কুল নাই।
কৃষ্ণ বলে, বারে বারে তোমরা দিওনা কংসের তুলনা,
আমি শিশুকালে বধেছি কংসের ভগিনী পুতনা।
বলে, পুরুষ বট শ্যাম নাগর সব তোমার সাজে
আমরা যদি পুরুষ হতাম মরে যেতাম লাজে।
পরের নারীর বসন লয়ে কেবা ডালে বাঁধে।

জলখেলা সাঙ্গ হল, সকল গোপী গৃহে চলে যায়।
তখন সাজ সাজ বলে বড়াই নগরে দিল সাড়া
বড়াই বুড়ীর যাত্রায় সাজিল গোপের পাড়া।
কে কে যাবি গোপী সকল তোমরা মথুরার হাটে চল
তখন রাধে বলে, ওগো, দধির ভার লবে কে ?
বলে, নন্দের বেটা চিকণ কালা ওকে দধির ভার লয়ে দাও
শুভ স্থবর্ণার বাঁকখানি বেল্ল পাটের শিকে
কৃষ্ণের কাঁধে ভার দিয়ে গো লয়ে চলিল রাধিকে।
আমাদের যেথায় না বিকাবে দধি সেথায় নিয়ে যাব,
মনের সহিত তোমায় নগরে ঘুরাব।
কৃষ্ণ বলছে, আমরা তো বইনা ভার জগতেরি সার।
রাধা প্রেমের জন্য তাইতে কাঁধে বইছি ভার।
তখন দধি দুগ্ধ ছানা মাখন লয়ে চলিল
দানখণ্ডে গিয়ে তখন উপস্থিত হইল।
শীঘ্রগতি পার কর, কানাই, তুমি বেলাপানে চেয়ে,
দহি দুগ্ধের সময় যাচ্ছে বয়ে।
দুগ্ধের লব পণ পণ নবনীর লব বুড়ি,
কড়া কমতি হলে আমি মারব চোঙ্গার বাড়ি।
বড়াই বলে, কাজ নাই কানাইয়া কৃষ্ণ তোমার ভাঙ্গি না,
ডরাইছে গোপের নারী কপালে মারে ঘা।
কৃষ্ণ বলে, ভাঙ্গা নয় টুটা নয় ভক্তি-ভাবের তরী
হস্তী ঘোড়া পার করেছি, ওগো, শ্রীরাধা কত ভারী।
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা,
শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কানের সোনা।
সোনা লাও শাড়ী লাও সকল দিতে পারি
তবু তো দুকুল যমুনার জলে হেঁটে যেতে নারি।
এই ঘাটের নৌকাখানি ওঘাটে লাগাল
মথুরায় গমনে সকল গোপী চলিল।

মথুরাতে গিয়ে গোপী করে বেচা কেনা,
দ্বারে বাজ্ছে নহবতখানা প্রেম কাঙ্গালী যেতে মানা।
ডাকিলে উত্তর মেলে না বুঝি বিষয় গেল
এইখানে সকল খেলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

২

রামলীলা

রামায়ণের কাহিনীরই জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে যে ঐশ্বর্যগুণের অস্তিত্ব ছিল, তাহা এদেশে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রভাব বশত সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়া উভয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য অবশিষ্ট রহিল না। তবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ যেমন রস-প্রধান, রামকাহিনী তেমন নহে; তাহার মধ্যে একদিকে কাহিনী এবং আর একদিকে পারিবারিক কর্তব্যবোধ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; সেইজন্য ইহার রচনা অনেকটা সংযত। এখানে সিন্ধুমুনি বধের বৃত্তান্তটি বর্ণিত হইয়াছে।

রজ রাজার পুত্র নামে দশরথ
সভা করে বসে আছেন যত প্রজাগণ।
প্রজাগণে বলে, রাজা, শুন মহাশয়,
রাবণকে জেনিতে পারলে রথ যাত্রা হয়।
রথ রথী সারথি ঘোড়া উড়িতে লাগিল,
জটাই পক্ষীরথ ধরে নামাইল।
তুমি আমার মিতে, জটা, তোমার আমি মিতি।
বিপদকালে উদ্ধার করলেন মনে রেখো মিতি।
দেখ, বনে থাকি বনের পাখী আমি বনের মৈত্রতা জানি।
আমার সঙ্গে আত্মতা পাতাইলেন তুমি।
নিজের গলার পুষ্পের মালা জটার গলে দিলেন।
জনেম জনেম মৈত্রতা রাজা জটার সঙ্গে হলেন।
এইখানেই থাক জটা বনের রথ আগলাই যে।
আমি আসি কানন-বনে মৃগ শিকার করি।

নিলে ঘোড়া জামা জোড়া পায়তে পামরি,
গলাতে তুলসীর মালা নন্দ পাগলি।
একাদশী করিয়াছে বনের অন্ধক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
পারণের জল আনতে যাও, গুণের সিন্ধু মুনি।
নিত্য নিত্য যাই পিতা সরোবরের ঘাটে।
আজ তো যাবো না পিতা কি আছে কপালে।
যাওরে, বাপ, গুণের সিন্ধু কররে গমন।
কালকে গিয়াছে একাদশী আজ ব্রাহ্মণ-ভোজন।
কাঁদিতে কাঁদিতে সিন্ধু গাড়ু নিল হাতে।
অমৃত্যতে জল পুরিতে গেলেন সরোবরের ঘাটে।
চৌদিকে ঘুরে বেড়ালেন শিকার নাহি মেলে।
জল পড়া শব্দ রাজা কর্ণেতে শুনিলেন।
বনের মৃগ বলে কর্ণেতে বাণ বিঁধিলেন।
কে মেলিরে দুরন্ত বাণ আমার অঙ্গ গেল।
বাপরে বলে সিন্ধু পড়লেন সরোবরের জলে।
ব্রহ্মহত্যা গুরুহত্যা বলে করিলাম সুরা পান।
এই বন মাঝারে·তিনি কে ডাকিবেন মা।
পাতার মচমচানী শব্দ শুনতে পাই আপন কর্ণে।
কে এলিরে গুণের সিন্ধু এস করি কোলে।
তোমার সিন্ধু বটে মুনি আমার নাম দশরথ।
না জানিয়া বধ করেছি তোমাদের নন্দন।
কি শোনালে, রাজা দশরথ, কি বেরিল মুখে।
বজ্রাঘাত ভেঙ্গে পড়িল অন্ধমুনির বুকে।
সাত নয় পাঁচ নয় আমার একা সিন্ধু মুনি।
ক্ষুধার সময় এনেছিলেন ক্ষীরসহ নবনী।
দেখ মাঠের মধ্যে এক বৃক্ষ সেই তো মাঠের মাথা।
একলা মায়ের পুত্র মলে মা দাঁড়াইয়াছেন কোথা—
হায়! হায়! বলে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কপালে মারেন ঘা।
কোথায় রে, বাপ, প্রাণের সিন্ধু মারলে ডাক।

পুত্র বর পাবি রাজা নিপুত্র হবি।
চার পুত্র পাবি রাজা, রাম, লক্ষণ, যাবে তোর বন।
ভরত শত্রুঘ্নকে থুয়ে ত্যজিবে জীবন।
একজন মেলিনে রাজা, মেলেন গো তিনজন।
তিনজনার সৎকার্য কর গো এখন।
চুয়া, চন্দন, মধু, ঘৃত, দিয়া দাহন সাজাইলেন।
মাতা, পিতা, পুত্রের সৎকার্য এক ঝিলে করিলেন এখন।
মুনি সকল দিয়ে ডাক দিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।
শত শত শাস্ত্রের বচন বলিতে লাগিলেন।
মায়ের গর্ভে জন্ম নিল মাতা হরিণী।
তাহার গর্ভে জন্ম নিল ইকস্বমণি।
সেই যজ্ঞচরু নিয়ে দশরথকে দিলেন।
আবার সেই যজ্ঞের চরু নিয়ে কৈকেয়ী,
সুমিত্রা, কৌশল্যাকে দিলেন।
সেই যজ্ঞের চরু খেয়ে রামের জন্ম হল,
এই কথা শুনে রাজা আনন্দিত হইলেন।
দশমাস দশদিন পরিপূর্ণ হইলেন।
ফুলে ফলে গুণে রাম লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন।
দাইরূপে যশমোতি দুইহাত পেতে নিলেন।
সুবর্ণের চাকুতে নাড়ী ছেদন করিলেন।
আউলি ঝাউলি দিচ্ছেন রাজা দশরথের কোলে,
লক্ষ লক্ষ চুমু খাই বদন ভরিয়ে।

হেলে দুলে মায়ের কোলে বাড়িতে লাগিল।
এক মাস, দুই মাস, তিন মাস হলেন,
এই কথা শুনে রাজা বড়ই আনন্দিত হইলেন।
মুনি সকল ডাক দিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।
শ্বেত কাক দিয়ে যজ্ঞে নষ্ট করিলেন।
মুনিরা সব প্রাণের ভয়ে পলাই দেশ দেশান্তরে।

বিশ্বামিত্র মুনি গেলেন রাম-লক্ষ্মণ আনিবার তরে।
আমার সঙ্গে রাম পাঠাইতে জীবন কাতর,
নিজমুখে বলবি যে দিন রাম যাবে বন।
পরের পুত্র মেরে যেমন রাজা পরের প্রাণ কাঁদালি।
এখন নিজর পুত্র বনে দিয়ে নিজ প্রাণ ত্যজিবি।
চার পুত্র আছে ঘরে তোর, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন।
রামলক্ষ্মণকে বনে দিয়ে ত্যজিবি জীবন।
ধান দূর্বা দিয়ে রাজা বাড়ির বাহির করে দিলেন।
কতক দূরে গিয়ে মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন।
যাও দেখি, মুনি মশায়, পথের ভয় পরিচয়।
ছয় দিনের পথে আছে তাড়কা রাক্ষস।
ছয় মাসের পথে আছে যজ্ঞে দরশন।
আমার সঙ্গে রাম পাঠাইতে তোর জীবন কাতর।
নিজ মুখে বললেন খুলে রামকে দিলাম বন।
চোখে মুখে অগ্নি উঠে ধিকে ধিকে।
মুনির শাপে রাজা তখন অযোধ্যা পুরীতে।
যাওরে, রামলক্ষ্মণ যাও, মিথিলার বন।
চার পুত্র আছে মোর—তোর রামলক্ষ্মণ যাবে বন।
ভরত শত্রুঘ্নকে মুয়ে ত্যজেবি জীবন।
উপরে হয়েছে রবির তাপ, নীচে খর বালি।
চলিতে না পারেন রাম প্রাণের বিকুলি।
রাম, ধরোগা তরু ডাল, লক্ষ্মণ, ধরোগা শিরে।
ইয়ায়, ইয়ার, বলে রাম যাও ধীরে ধীরে।
ছয় মাসের পথে যাবো না, মুনি, ছয় দিনে চলে যাব।
কেমন যে তাড়কা বধ দুই ভায়ে দেখিব।
তাড়কা বীর পড়ে কেমন পর্বতের সমান।
তাড়কাকে দেখে রঘুনাথ ধেনুকে জুড়লেন বাণ।
শত শত বাণ মারে, তত তাড়কা ধরে ধরে খাই।
রাম-লক্ষ্মণ, বনে তখন তাড়কা বধ হয়।

তাড়কাকে বধ করে মিথিলা করে গমন।
পার কর পার কর মাঝি বেলা বয়ে যাই,
মিথিলা নগর—ফলো করে—যাছি রাম কে নিয়ে।
গৌতম মুনির শাপে অহল্যা পাষাণ হয়ে ছিলেন।
রামলক্ষ্মণের চরণ পেয়ে অহল্যা উদ্ধার হয়ে গেলেন।
এইখানে থাকল আমার রামলক্ষ্মণ দর্শন ॥ —মুর্শিদাবাদ

লৌকিক

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়া থানার পটিদারগণ এখনো কেউ কেউ মনোহর ফাঁসুড়ের পট দেখাইয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা চাহিয়া ফিরে। এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেক প্রাচীন পল্লীকবি কাব্যও রচনা করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কুঞ্জবিহারী দাস প্রধান। এই কবির একটি প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। বৈষ্ণবচক অঞ্চল হইতে সংগৃহীত মনোহর ফাঁসুড়ের একটি পট মেদিনীপুরের এক সংগ্রহশালায় আছে। নিম্নের জনৈক পটিদারের নিকট হইতে সংগৃহীত গানটি মালীবুড়ো লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। নিজে ইহার কোন অদল বদল করেন নাই।

একদিন সত্যপীর মনেতে ভাবিয়া।
সিন্ধু রাজার দেশে আমি পুজা নিব গিয়া ॥
সিন্ধু রাজার দেশে গিয়া আশিষ করিব।
কিছুদিন পরে তার সন্তান ভেজিব ॥
এই কথা মনে ভাবে সাহেব সত্যপীর ॥
রাজার দুয়ারে গেল হইয়া ফকির ॥
ফকির বলিল, বাবা, মেরা দুয়ালে।
আমারে পুজিলে তোর সন্তান হইবে ॥
রাজা বলে, ফকির, পুজায় কি দ্রব্য লাগিবে।
ফকির বলেন, বাবা, কৈ তব আগে ॥
দেড় টাকার সিন্নি দোব একমন হইয়া।
গাই বাছুর দিবে রাজা ফকিরে ডাকিয়া ॥
গঙ্গার কাছে গিয়া প্রণতি করিয়া।

পুজোরানা দিবে, মাগো, পুজার লাগিয়া ॥
স্তুতি-ভক্তি শুনে রাজা হরষিত হল।
সাত মাণিক আস্তানা নিয়ে মদনেরে দিল ॥
সাত মাণিক আস্তানা নিয়ে সাধুর তনয়।
ফাঁসুড়্যার দেশে চলে করিতে বিজয় ॥
দূরে দস্তুর গ্রামখানি দেখিতে সুন্দর।
মনোহর ফাঁসুড়ে বুড়া দেশে করে ঘর ॥
পঞ্চাশ ভাগিনা বুড়ার ষাট সত্তর নাতি।
কাটিতে পরের গলা ভাবে দিবারাতি ॥
গ্রামের নিকট এক সরোবর আছে।
গিয়ে মদন পড়্যা বসিলেন কাছে ॥
জলের হিমান লেগে জুড়াইল প্রাণ।
ফাঁসুড়্যার সাত বৌ জল আনিতে যান ॥
কলসী ডুবায় বিধুমুখী চারিদিকে চায়।
পুরুষ মদন দেখে গাছের তলায় ॥
কেউ বলে, দিদিগো, এই কোন জন।
কেউ বলে, রাজপুত্র কিংবা মহাজন ॥
জলের কলসগুলি মাঝখানে রেখ্যা।
শ্বশুরা বুড়ার কাছে পৌছিল গিয়া ॥
আগে পিছে সাত বৌ কাছে দাঁড়াইল।
মদনের বৃত্তান্ত কথা সকলি কহিল ॥
হরিষ বিধানে বুড়া পাতিলেন খড়ি।
সকলি শুভ দেখে কিছু নেই দেড়ি ॥
ধ্যায়ানে জানিল বুড়া নামটি মদন।
সাতটি মাণিক আস্তানা নিয়া করেছে গমন ॥
সুবল সুন্দর হিদা কি কর বসিয়া।
মদনে আনহ গিয়া বোনাই বলিয়া ॥
বাপের আদেশ পেয়ে তারা সাত ভাই।
মদনে আনিতে গেল করে ধাওয়া ধাই ॥

হিতু বলে, বসে কেন গাছের তলায়।
নিকটে শ্বশুর বাড়ী যেতে না জুয়ায় ॥
শ্বশুরের কথা শুনে পুরুষ মদন।
বিদেশী বান্ধব বুঝি দিলেন নারায়ণ ॥
ভুলে চলিল সাধু ফ্যাঁস্যুড়্যার ঘরে।
আগে পিছে সাত ভাই নিয়ে গেল তারে ॥
বুড়া বলে, কেরে, পুত্র, হিতু এলি ঘরে।
তোরা এলি মোর জামাই কতদূরে ॥
হিতু বলে, বাবাগো, আঁখি মেলে চাও।
এই নাও তোমার জামাই-এর মাথা খাও ॥
কি বলিলি, বেট্যা, ওরে কি বলিলি মোরে।
দিবানিশি প্রাণ কাঁদে জামাইয়ের তরে ॥
তোরা সাত বেট্যা মর দায় নাইক তায়।
সাধের জামাইয়ের তরে ছাতি ফেট্যা যায় ॥
এস বাছা, মদনরে, এস বস তুমি।
তোমার কথা ভেবে ভেবে অন্ধ হলাম আমি ॥
যাহ, বাছা, স্নানভোজন আগে কর গিয়া।
তোমার শাশুড়ি কাঁদে তোমার লাগিয়া ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন খাইয়াইল সুখে।
শুইতে দিল তারে নিরল মন্দিরে।
হেন কালে বুড়া তখন ডাকে আহুতিরে ॥
কোথা গেলি, আহুতি, মা, এস মোর পাশে।
জন্ম আয়স্ত্রী হয়ে থাক আমার আশিসে।
দোর বসে ধন দিল গোবিন্দ গোঁসাই।
তুমি যদি মনে কর কত কাল খাই।
সাতটি মণিক আর সোনা যে আস্তানা।
অর্ধেক ভাঙ্গিয়া, মাগো, দিব যে গহনা ॥
কবুল করিল রামা বাপের সাক্ষাতে।
বুড়া বলে বেটি মোর ঐ কথা বটে ॥

বস্ত্র অলঙ্কার পরে ফ্যাঁস্থড়্যা কুমারী।
কাটিতে সাধুর মাথা দিল হাতে ছুরি॥
ছুরি নিয়ে আহুতি শুইবারে গেল।
মদনের রূপে দেখে ঘর করেছে আলো॥
রূপ দেখে বিধুমুখী করে হায় হায়।
কেমনে লাগাব ছুরি ইহার গলায়॥
বিধাতা নিষ্ঠুর বড় দোষ দিবে কারে।
কেন যে জন্মাল বিধি ফ্যাঁস্থড়্যার ঘরে॥
এই কথা ভেবে তখন কাঁদিতে লাগিল।
ঘর হতে মদন পড়্যা শুনিবারে পেল॥
না কাঁদ না কাঁদ, রামা, না কাঁদ গো তুমি,
সকালে সোনার চুড়ি গড়ে দেব আমি॥
চুড়ি গড়ি দিবে কিহে, সদাগরজি।
বাঁচিবার রাস্তা দেখ চুড়ি দিবে কি॥
মনেত করেছ, সাধু, শ্বশুরের ডেরয়া।
আমার বাপের নাম যে মনুহর ফ্যাঁস্থড়্যা॥
নামটি আমার আহুতি ফাঁসুড়্যা-কুমারী।
কাটিতে তোমার গলা বাম হাতে ছুরি॥
ছুরি দেখে মদনের জ্ঞান লাভ হোল।
পুনরায় আহুতিরে জিজ্ঞাসা করিল॥
কি হবে কি হবে, রামা, কি হবে উপায়।
বাঁচাও গো, বিধুমুখী, বাঁচাওগো আমায়॥
এইবারে তুমি যদি বাঁচাইতে পার।
চিরকাল দাস হয়ে থাকিব তোমার॥
কাজের নিমিত্ত মনিষ্যি অনেক কথা কয়।
হৈলে আপন কাজ ফিরিয়া না চায়॥
পার হতে যায় লোক পারাবার তরে।
সে পারে থেকে লোক বলে কড়ি দেব পরে॥

সেই সব লোক হল বড়ই দাগবাজ।
ফিরিয়া না চায়, দেখ, হলে আপন আজ॥
এই রকমে দুইজনে সত্যবন্ধ হলো।
পক্ষীরাজ ঘোড়া এক মাগাইয়া নিল॥
উহাতে দুইজনে চাপিয়া বসিল।
পবনের বেগে ঘোড়া উড়িয়া চলিল॥
হেতায় বুড়ো তখন ভাবিল অন্তরে।
সারারাত্রি নিদ্রা নাই মাণিকের তরে॥
ঘুমিয়ে না ঘুমাও, মাগো, কত নিদ্রা যাও।
জাগিয়া ঘুমাও যদি আমার মাথা খাও॥
বলিতে বলিতে বুড়ো প্রবেশিল ঘরে।
পাগল হৈল বুড়া না দেখি বিটারে॥
কোথায় গিলি বিটু তুই বাঁধত কোমরে।
বেনা বেট্যা থাক পড়ে মার আহুতিরে॥
বাপের আদেশ পেয়ে তারা সাত ভাই।
আহুতি মারিতে গেল করি ধাওয়া ধাই॥
বলিতে বলিতে আহুতির কাছে দাঁড়াইল।
আহুতি বলে, সাধু, ঐ ভাইরা এলো॥
বাপ পাঠাল তোরে কোন কাজের তরে।
তুই কেন এলি তবে গড়াইয়া পরে॥
পর পর বল, দাদা, পর বল কারে।
পরের হাতে সেদিন কেন সঁপেছিলে মোরে॥
পর লাগি দেখ, দাদা, রাধা বৃন্দাবনে।
জনক-নন্দিনী সীতা রামের ভবনে॥
দুইজনে বাড়াবাড়ি হইল বিস্তর।
বুঝিলাম, দাদা, তোমরা যাবে যম ঘর॥
ধর্ম সাক্ষী রাখি ফ্যাস্নুড়্যা-কুমারী।
কোপে কোপে ভাইদের পাঠাল যমপুরী॥

রণজয় করে আহুতি হাসে খলখল।
মদন বলে আমার গায়ে এল বল॥
খড়ি পেতে দেখে বুড়া সব সমাচার॥
সব বেট্যা মরে গেল সব মল্ল তার॥
অনেক যতনে বুড়া ভুঁই ধরে উঠে।
সমরে সাজিলে বুড়া তারা পানা ছুটে॥
বলিতে বলিতে বুড়ার অঙ্গ কেঁপে গেল।
লাফায়ে লাফায়ে কত নদীনালা পারাল॥
মার মার বলে বুড়া সকলে ডাক ছাড়ে।
আকাশ হইতে যেন বজ্রাঘাত পড়ে॥
বলিতে বলিতে আহুতির কাছে দাঁড়াইল।
আহুতি বলে, সাধু, ঐ বুড়া এল॥
পাঠাইলাম তোমারে কোন কাজের তরে।
তুই যে এলি চলে পর গড়াইয়া॥
বাপ হয়ে কুকথা বল তুমি মোরে।
বুঝিলাম, বাবা, তুমি যাবে যমঘরে॥
ধর্ম সাক্ষী রেখে তখন ফাঁসুড়্যা-নন্দিনী।
এক কোপে বাপের হাত করে দুইখানি॥
হাত নাহিক বুড়া তবু নাচিয়া বেড়ায়।
কাটিয়া সাধুর মাথা মাণিক দাও আমায়॥
এত শুনি আহুতি ক্রোধে জ্বলে যায়।
কাটিয়া বুড়ার মাথা জমিনে ফেলায়॥
মরিল ফ্যাঁসুড়া বুড়া মরিল জমিনে।
মদন বলে আমি বাঁচিলাম প্রাণে॥
রণজয় করে আহুতি পশ্চাত করিল।
দুর্বাসার বনে গিয়া উপানীত হল॥

—মেদিনীপুর

পথচলার গান

গ্রাম্য লোক পথ চলিবার শ্রম লাঘব করিবার জন্য কোন কোন সময় গান গাহিয়া থাকে ; কিন্তু তাহার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন গান নাই, থাকিবার কথাও নহে। তবে দুইটি গান বিশেষ ভাবে এই বিষয়ক বলিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গান তাল-প্রধান ; সুতরাং কর্মসঙ্গীতের অন্তর্গত হওয়াই সঙ্গত। মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার পচাপানি গ্রামের হনুমুড়া নামক মুড়া জাতীয় অশীতিপর বৃদ্ধ গায়ক ইহাদিগকে পথচলার গান বা রাস্তা চলার গান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এখানেও সেইজন্য এই পরিচয়েই গানগুলি প্রকাশ করা গেল।

১

হায়রে, মন ললকে, হায়রে, মন ললকে,
কুলি কুলি কাহার টুইলা ঠমকে গো ॥
কুলি কুলি বাবুর টুইলা ঠমকে।
হায়রে মন ললকে।
হায়রে মন ললকে গো।
কুলি কুলি বাবুর ধুতি ফরকে ॥ —পচাপানি (ঝাড়গ্রাম)

২

গুগুনির শাক তুলতে গেলি নাম গাড়িয়া।
কুমীর বুড়ো বাইর্যাছে চাপা দাড়িয়া ॥
দেয়না ভাটু চাল দুটি দেখিয়ে
মোর সয়াকে দেবতা লাগালি ॥
হামতো মুই দেখলি
চাঁয় গুর্ গুর্ গুঁরুর ঘুরেলা ॥
চলগে সারি কাঁপা বাড়ি।
চলগে সারি বাগুন বাড়ি।
নাই যার ভাঁটু কাপাস বাড়ি ॥

পদাবলী

বৈষ্ণব গীতিকবিতা সাধারণ ভাবে পদাবলী নামে পরিচিত। জয়দেব তাঁহার 'গীত-গোবিন্দ' নামক গীতিকবিতার গ্রন্থে পদাবলী শব্দটি রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনাত্মক কবিতা রূপে সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছেন, তদবধি প্রধানত ইহা রাধাকৃষ্ণের লীলাসূচক গীতিকবিতা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন এক শ্রেণীর ভক্তিমূলক গীতকবিতা রচনার প্রবর্তন করেন, তাহা উমাসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীত নামে পরিচিত হইলেও শাক্ত পদাবলী নামেও পরিচিত। পদাবলী মাত্রই ভক্তিমূলক গীতি, মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বশতই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলগানের কাহিনী শাক্ত পদাবলীর রূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়া বাংলা সাহিত্যে তাহার ধারাও শুষ্ক হইয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ, উমামেনকা শ্যামাব্যতীত পদাবলীর আর কোন চরিত্র নাই। তবে অভিজাত বৈষ্ণব এবং শাক্ত পদাবলীর সীমানার বাহিরেও আর একশ্রেণীর পদাবলীর জন্ম হইয়াছিল, তাহা লৌকিক পদাবলী বলিয়া পরিচিত। তাহা বৈষ্ণব পদাবলী এবং শাক্ত পদাবলীর আদর্শে রচিত হইলেও ইহাদের রচনা সম্পর্কে কোন অলঙ্কার শাস্ত্রীয় অনুশাসন স্বীকার করা হয় নাই। লৌকিক উপাদানেই ইহাদের কাহিনী গঠিত এবং চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে। পশ্চিম বাংলার ঝুমুর গানে (ঝুমুর দেখ) এবং পুর্ব বাংলার বহু লৌকিক কীর্তন গানে (কীর্তন দেখ) তাহার রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা অগণিত একটি মাত্র লৌকিক পদাবলী নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

১

বৃথা কুঞ্জ মাঝা, বৃথা ফুল সাজা, বৃথা এ কবরী হায় গো। নিশি হৈল গত বৃশ্চিকে শত শত দংশিছে কমল হিয়ায় গো॥ কি কবি সজনি, এ মধু রজনী বিফলে গেল পোহাইয়ে গো। বসন ভূষণ রত্ন আভরণ খুলেছে মরি লজ্জায় গো। এ যোল শৃঙ্গার অঙ্গে লাগে ভার বিরহ সহা না যায় গো। নিদ্রাহীন আঁখি পথ পানে দেখি নিরখিতে শ্যামরায় গো। আমি অভাগিনী তাই বুঝি, সয়িনী, বঁধু না ফিরিয়া চায় গো॥ আশা ভালবাসা প্রেমের পিয়াসা মিটিবে না বুঝি হায় গো, তবু বিপিন তারে ডাকে বারে বারে পাবই যে এই আশায় গো॥

—বাঁশপাহাড়ী

পদ্মমণির পালাগান

চট্টগ্রাম অঞ্চলে হীরালাল ও পদ্মমণি কন্যার পালাগান নামে এক গীতিকা প্রচলিত আছে। তাহার কাহিনী এই :

হিমাল সহরের রাজা মতিলাল ; তাহার পুত্রের নাম হীরালাল, উজিরের পুত্র জয়মলের সঙ্গে তাহার গভীর প্রীতি। দুইজনে একদিন দেশ ভ্রমণে বাহির হইল। কর্ণাট রাজ্যে গিয়া তাহারা উপস্থিত হইল। সেই রাজ্যের রাজার নাম নাগেশ্বর, তাহার কন্যা পদ্মমণি অপূর্ব সুন্দরী। হীরালাল পদ্মমণিকে দেখিতে পাইল, দেখিয়া তাহার প্রতি গভীর আসক্ত হইল। রাজবাড়ীর মালিনীর গৃহে সে আশ্রয় লইল, সেখানে কৌশলে সে পদ্মমণির সঙ্গে মিলিত হয়। পদ্মমণি একদিন উজির পুত্রকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে বিষের নাড়ু খাইতে দেয়। ইহাতে হীরালাল ক্রুদ্ধ হইয়া পদ্মমণিকে আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। রাজ অনুচরেরা ইহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। কিন্তু উজির পুত্র পদ্মমণিকে রাজার সম্মুখে ভ্রষ্টা প্রতিপন্ন করে। ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা কন্যাকে বন-বাসে নির্বাসিত করেন। সেখানে রাজকন্যার মৃত্যু হয়। কিন্তু হীরালাল সে সংবাদ জানিতে পারে না, পদ্মমণির প্রতি তাঁহার প্রেম পূর্বের মতই অবি-চল ছিল, সে পাগলের মত একাকী তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমে সে পাগলা গারদে বন্দী হয়। এদিকে এক মুনি উজির পুত্রকে তিনটি ঐন্দ্রজালিক পালক দিয়া কোনটির কি ক্ষমতা, তাহা বুঝাইয়া দিল। প্রথম পালকের গুণে উজির পুত্র হীরালালের সন্ধান পায়, দ্বিতীয় পালকের গুণে রাজকন্যা পদ্মমণি পুনর্জীবিত হয়। সদাগরের পাগলা গারদে পদ্মমণির সঙ্গে হীরালালের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু সদাগর পদ্মমণির রূপ দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হয়। অবশেষে তৃতীয় পালকের গুণে উজির পুত্র ও হীরালাল তাহাকে হত্যা করিয়া পদ্মমণিকে উদ্ধার করে। হীরালালের সঙ্গে পদ্মমণির বিবাহ হয়। এই সুদীর্ঘ পালাগানের প্রথমাংশ এই প্রকার :

রাজ্যবাড়ীর নাম জান হিমাল শহর—
মতিলাল বাদ্‌শাহ আছিল সেই রাজ্যের পর।
বাদশাহ করে বাদশাই লইয়া তক্তের পরে—
বাঘে আর মইষে যেন একই ঘাটে চরে।
কি কইয়ম মতিলাল বাদশার পুরীর আবাল,
হাজার দেড়েক আছিল জান শহর কোতোয়াল। —চট্টগ্রাম

পদ্মাবতীর গান

। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গের কবি সৈয়দ আলাওল রচিত অনুবাদ কাব্য পদ্মাবতীর নানা বিচ্ছিন্ন অংশ লোকমুখে এখনও প্রচলিত আছে, তাহাই পদ্মাবতীর গান বলিয়া পরিচিত। যদিও সৈয়দ আলাওল লিখিত ভাবে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি ইহার বিভিন্ন অংশ মুখে মুখে প্রচারিত হইবার ফলে ইহা অনেকখানি লৌকিক স্তরে নামিয়া আসিয়াছে, তথাপি ইহাদিগকে পরিপূর্ণ লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই। মৌখিক সংগ্রহ তাঁহার রচিত বারমাসীর সামান্য একটু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, তবে লিখিত রূপ হইতেই ইহা মৌখিক প্রচলিত হইয়াছে—

১

বৈশাখে বিদরে মহী অরুণ প্রবলে,
ভ্রষ্ট ভেল বায়ু জল বিরহ অনলে।
মিত্র হৈয়া কমল না সহে দিনমণি,
পতি বিনে কেমতে সহিবে কমলিনী।
জৈষ্ঠে পুষ্পরেণু ছিটায় যত সখীগণ,
ভস্মবৎ হয় মোর অঙ্গ পরশন। —চট্টগ্রাম

পদ্মাবতীর গান বলিতে মনসার গানও বুঝাইতে পারে। তবে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে মনসা-মঙ্গল ব্যাপক প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও পদ্মাবতীর গান বুঝাইতে সেই অঞ্চলে সৈয়দ আলাওল রচিত পদ্মাবতীর গানই বুঝাইয়া থাকে। অনেক সময় লোক-সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়াই লিখিত সাহিত্য বা শিল্পসাহিত্য সৃষ্টি হয়, কোন কোন সময় শিল্পসাহিত্য অধঃপতিত হইয়া লোকসাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করে। পদ্মাবতীর গানের শেষোক্ত অবস্থা হইয়াছে।

পরীবানুর হাঁহলা

চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ঐতিহাসিক কাহিনীমূলক একটি ক্ষুদ্র গীতিকা 'পরিবানুর হাঁহলা' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গীতিকার আকারে রচিত হইলেও ইহার কাহিনী নিতান্ত শিথিলবদ্ধ, বিষয়-বস্তু অত্যন্ত করুণ। বাংলার সুবেদার সুজা

আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুদূর চট্টগ্রামের পথে আরাকানে যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সপরিবারে শেষ পর্যন্ত এক মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহারই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহাতে সুজা কি ভাবে তাহার দুই কন্যা এবং পত্নী পরীবানুকে সঙ্গে করিয়া প্রথমত চট্টগ্রাম এবং পরে চট্টগ্রামও নিরাপদ বিবেচনা না করিয়া আরও দক্ষিণে আরাকান রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কথা আছে ; তারপর আরাকান রাজ পরীবানুর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া কি ভাবে যে তাঁহাকে লাভ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে সুজা এবং পরীবানু জলে ডুবিয়া আত্মঘাতী হইয়াছিলেন, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে 'সুজা কন্যার বিলাপ' নামে যে সকল গীতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও ইহারই অংশ ছিল, পরে ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া স্বাধীন গীতিকায় পরিণত হইয়াছে। পরীবানুর হাঁহলার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যায়।

১

কি ভাবে গাহিব ওই দুখ্খের বিবরণ।
যে হালে হইল সেই পরীর মরণ॥
কেমনে দুখ্খের কথা বয়ান করিবে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে॥
ভোজের বাজি দুনিয়া রে কেবল বেড়া জাল।
কাড়াকাড়ি মারামারি আর যত জঞ্জাল॥
মিছা রাজ্য মিছা ধন মিছা টাকা কড়ি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে॥

পাঁচালী

দেবমাহাত্ম্যসূচক কাহিনীমূলক গান বাংলায় পাঁচালী বলিয়া পরিচিত শব্দটির উৎপত্তি হইয়া নানাবিধ মতবিরোধ দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন, পঞ্চ আলি বা সখীতে মিলিয়া যে গান গাওয়া হয়, তাহাই পাঁচালী; আবার কেহ বলেন, পা চালাইয়া চালাইয়া যে গান গাহিয়া থাকে, তাহাই

পাচালী, তারপর পাঁচের সঙ্গে অলীক সামঞ্জস্যের জন্য চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইয়া পাঁচালী হইয়াছে। কেহ কেহ আবার মনে করেন, পাঞ্চাল দেশের রাগ ইহাতে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম পঞ্চালী বা পাঁচালী। যাই হোক, ইহার বিষয়ে একটি কথা স্থির আছে, তাহা এই যে, ইহা দেবমাহাত্ম্যসূচক আখ্যায়িকাগীতি। সেই অর্থে ভারত পাঁচালী, শ্রীরাম পাঁচালী অর্থে যথাক্রমে মহাভারত এবং রামায়ণের বাংলা অনুবাদ-গীতিকে বুঝায়। মনসা-মঙ্গলকেও মনসার পাঁচালী বলে। মঙ্গলগানও কাহিনীমূলক গান, সুতরাং ইহাকেও পাঁচালী বলিত।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাঁচালী অঙ্গিকের দিক হইতে একটি নূতন রূপ লাভ করিয়াছিল, এ'কথা সত্য, তথাপি বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া তাহাতে কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। দাশরথি রায় উনবিংশ শতাব্দীতে যে নূতন ধরণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল। তবে ইহার পরিবেষণের রীতিতে তিনি নূতনত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনের মনোভাব তাহা হইতে দূর হইয়া গেলেও দেবতার কথা সেখানে পরিত্যক্ত হয় নাই। সুতরাং প্রাচীন কিংবা আধুনিক পাঁচালী উভয় রূপের মধ্যেই দেবদেবীর লীলা-প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগ হইতেই পাঁচালীর লিখিত রূপের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার একটি মৌখিক রূপও বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তাহারই ধারা মৌখিক ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণ নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, মৌখিক রচিত পাঁচালীর মধ্যে তাহারই রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। বিষয় অনুযায়ী ইহাদের কয়েকটি নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

রামায়ণ

১

ও ধন্য পুণ্য ধাম, অযোধ্যা তার নাম, রাজা দেখ হয় গো দশরথ।
সে যে রাজন, পালে প্রজাগণ, সকলের পূর্ণ মনোরথ॥
পাত্র মিত্র নিয়ে রাজা করেন মন্ত্রণা।
রামকে রাজা করবো আমার মনের বাসনা॥

কর আয়োজন যত সভাজন, কল্য প্রাতে রাম হবে রাজা।
রাম রাজ্যে হবে গো রাজা শুনে সুখী হলো প্রজা॥
কৈকেয়ীর দাসী শুনে গো সেই কথা কানে।
করি তাড়াতাড়ি চলে গুড়ি গুড়ি উপনীত রাণীর স্থানে॥
রাণীর কাছেতে কেঁদে তখন বলে, শুন গো দুঃখের কথা।
শুন গো দুঃখের কথা, কৌশল্যা হবে রাজমাতা॥
ও রাম রাজা হবে বলি গো তবে, তোমার আজি কপাল ভেঙ্গেছে।
শুন কাহিনী, রাম রঘুমণি এ রাজ্যের রাজা হতেছে॥
ভরত রাজা হলে তুমি হবে রাজমাতা।
রামকে বনবাসে পাঠাও, শুন মোর কথা॥
বলে গো রাণী, শুন গো তুমি শুনে ঐ কথা শুনে বক্ষ ফেটে যায়।
রাম রাজা হলে গো আমার অসম্মান হবে না ধরায়॥
মন্থরা বলে, কাঁদিতে জনম যাবে।
রাণী বলে, ভরত বল গো এখন কেমন করে রাজ্য পাবে॥
কুঁজি মন্ত্রণায় রাণী তখন, ভাসে নয়ন জলে।
রাজা পূর্ব সত্য করে, গিয়েছ কি তুমি ভুলে॥ —মুর্শিদাবাদ

২

ভাইরে, লক্ষ্মণ, কি হলো;

ও ভাই লক্ষ্মণ রে, সীতাধনে বলো কেবা হরে নিল;
পিতৃসত্য পালনে আমি এলাম বনে সঙ্গেতে জানকী অনুজ লক্ষ্মণ,
পঞ্চবটী বনে করি কুটির বন্ধন চন্দ্রমুখী আমার কোথা চলে গেল।
রাম বলে, শুনো, পঞ্চবটী বন, তোমরা কি দেখেছ আমার সীতাধন,
দেখ দেখি, ভাই, প্রাণের লক্ষণ, জল আনিবারে সীতা সরোবরে গেল॥
শুন পশুপক্ষী, শুন বৃক্ষলতা, কে হরিল আমার চন্দ্রমুখী সীতা,
দেখ দেখি লক্ষণ করি অন্বেষণ কমলমুখী বুঝি কমলে লুকাল।
সীতা সীতা বলি রাম পড়েন ভূমিতলে, করে লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে,
রঘুবীর স্থির নয় জানকী-শোকানলে, বলে সীতা বিনে আমার জীবন বিফল।
সীতা হারাইয়া যদি যাই দেশেতে, কিবা বলিবে অযোধ্যার লোকেতে।

ত্রিপুরা চরণ কয় বিনয় বচন, দয়া করো, রাম, রাজীব-লোচন।
আমি মূঢ়জন না জানি ভজন দয়া করো, রাম, ভকত-বৎসল ॥ —ঐ

জীবনের জীবন রে তুমি, ওরে আমার ভাই লক্ষ্মণ।
নয়নতারা দুঃখ-পাসরা, কে আছে তোমার মতন ॥
গিয়াছিলাম কাননেতে, তুমি ভাই গেলে সঙ্গেতে।
কত কষ্ট হল সইতে কেবলি আমার কারণ ॥
চোদ্দ বৎসর অনাহারে ছিলে কেবল আমার তরে।
ধন্য, লক্ষণ, ধন্য তোরে, দেখ নাই মায়ের বদন ॥
এখনও সব মনে পড়ে গিয়েছিলাম পাতালপুরে,
লঙ্কাধামে মায়া করে হরিলো রাজা রাবণ ॥
ভাগ্যে পবনপুত্র ছিল সেই তো বাঁচাইল
আপন পাপে আপনি বাঁচিল মোদের জীবন ॥
ভদ্রকালী মাথায় করে হনু আনলে মর্ত্যপুরে
মায়ের পুজা প্রচার করে তাই পুজে যত নরগণ ॥
শক্তিশেল ধরিলে বক্ষে, ছিলে রে, ভাই কত দুঃখে,
ভাগ্যফলে পেলে রক্ষে বাঁচালে পবন নন্দন ॥
নাগপাশে বেঁধেছিল, গরুড় এসে জীবন দিল।
না এলে কি হতো বল যেত দুই ভায়ের জীবন ॥
রামচন্দ্র কাঁদিছে কেনে, সীতা আছে অশোক বনে,
মায়া সীতে কাটে রণে জানাইল সব বিবরণ ॥
অকালেতে বোধন করলাম, দুর্গা মায়েরে পুজিলাম,
তাইতে রণে জয়ী হলাম মরিলে রাজা রাবণ ॥
এতদিন জানলাম আমি ভায়ের মতন, ভাই রে, তুমি,
লক্ষ্মণ গুণের শিরোমণি কহিছে খাঁদু চরণ ॥ —ঐ

৪

পুত্রশোকে রাবণ মনোদুঃখে চলে সমরে সমরে।
সাজিল সৈন্য সেনা কে করে চালনা, দামামা বাজিল সমরে সমরে ॥

সেজেছে রাবণ গো ওযে বসেছে রথ উপরে।
বাজিল বিজয় ডঙ্কা লঙ্কাখান টলমল করে॥
সেনাগণ বলে তারা, ওহে ওহে মহারাজন্।
আজি বিনাশিব শ্রীরামলক্ষণ গো লক্ষ্মণ গো॥
আমরা নর-বানরে সাগর পারে তাড়ায়ে দিব।
অসুখে অশোকে আমরা সীতায় রাখিব॥
ও বল করে ধনু ধর, সকলে সমরেতে চল।
সাজ সবে সবে লঙ্কাখানা করুক টলমল॥
পরদেশী তাপসী লাগায় দিক।
আর ঘুমায়ে রবি ধিক রে শত ধিক॥
ঐ আমাদের গো সোনার লঙ্কা, লঙ্কা আমাদের গো।
আমরা সবে বীরের ব্যাটা করি কি করে শঙ্কা॥
সাজ সবে নর-বানর, আমরা করি কি কোন ভয়।
উচ্চৈঃস্বরে বল সবে রাবণ রাবণ রাজার জয়॥
চলরে সেজে নাচরে কালী তোরা সব দিস না গালি,
ও হওরে সবে হুঁসিয়ারি হাঁসায় না শত্রু দলি॥ —ঐ

উপনীত হলো গিয়ে রামের কাছে, আছে সেনাগণ সব দাঁড়ায়ে।
পতাকা উড়িছে মালসাট মারিছে, বলে যত বাণ দেয় তাড়ায়ে॥
রাবণের সাড়া পেয়ে গো, তখন ধেয়ে এল বীর হনুমান।
হনুমানকে দেখে চোখে রাবণ রাজা জুড়িল বাণ॥
ঐ বংশ ধ্বংস না করি রবো না।
যতদিন জীবন রবে গো, এ দুঃখ আমার যাবে না॥
মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে রাবণের বুকে।
যত পারে অস্ত্র ছাড়ে পুত্রেরও শোকে॥
যেন অগ্নি জ্বলে রাবণ রাজার বাণ।
ভয়ে ভয়ে তখন ভঙ্গ দিল বীর হনুমান॥
কড়যোড়ে রাম গোচরে কয়,

ঐ অস্ত্রবীর, রঘুপতি, মোদের সাধ্য নাই।
চেয়ে চেয়ে দেখ, রাম, অস্ত্র পড়ে ঝমাঝম॥
রাবণ সৈন্য অগণন, মোদের সৈন্য যে অধিক কম॥
এই মিনতি পায় রাক্ষসে ও রাম কর পরাজয়।
রক্তে নদী বয়ে গেল গো, লঙ্কা ভেসে যায়॥
বিজয় ধনুক ধরে দাঁড়াল।
রাবণ বলে এতদিনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল॥ —ঐ

৬

আমার বুকে আছে যত, বেদনা ওগো ধরাতে জানে কে।
দুঃখের অনল নিভায় না জল দিলে, রাম ওগো জ্বলে মরচি বুকে॥
কাঁদালে ওহে রাম আমায়, কাঁদতে হবে তা'ও জান না।
তোমায় আমায় জানাজানি লোকে তাতো কেউ জানে না॥
কে সাজালে ভিখারী বল, রাম।
কাঁচ দিয়ে ভুলায়ে হে, করে লঙ্কা অধিকারী॥
সত্তাসত্তির বিচার করি ধর তুমি বাণ।
ওহে তোমার সাথে আমার সাথে তফাৎখান॥
আমি সাধ করি করেছি কি তোমার সীতা চুরি।
আমার তরে সাগর পারে এসেছ রাম জটা-বাকল পড়ি॥
আমায় যদি ঘুমায়ে থাকে গো।
ডাকলে সাড়া না দেয় তারা দেয় গঞ্জনা তাকে॥
ঐ মনের কথা, প্রাণে রেখেছি হে মনে মনে।
সে যা বলে বলুক লোকে আমি তা শুনব কেনে॥
আরাধনের ধন জোর করে আমরা নিব হে চরণ।
কেউ জানে না জগমাঝে জানবো শুধু মোরা দুজন॥
মনের ভাব মনেতে রেখে ধনুকেতে অস্ত্র ফেরে।
রাবণের জয়, রাম পরাজয় যুদ্ধে তখন গেল হেরে॥ —ঐ

৭

রামের পরাজয় দেখে লক্ষ্মণ গিয়ে সম্মুখে দাঁড়াল।
ময়দানবের শেল পড়ে কোন রণে লক্ষ্মণকে রাবণ সে এ বাণ মারিল।

বাণের মুখে গো কত ধিকে ধিকে আগুন জ্বলে।
সজোরে পড়লো গিয়ে. লক্ষ্মণের বক্ষস্থলে ॥
ঐ লক্ষ্মণ হলো তখন অচেতন, কাঁদে রাম।
সীতা তরে লঙ্কা পুরে গো প্রাণের ভাই হারালাম ॥
ঐ ব্রহ্ম অস্ত্র ধরিবে রাম রাবণের পরাজয়।
রাবণ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল কনক-লঙ্কায় ॥
কত ধূলায় পড়ে কাঁদে রাম রঘুমণি।
আমি আগে এলাম জন্ম নিলাম আগে কোথা যাবে তুমি ॥
কাঁদে তখন কমলআঁখি।
আমি বাড়ী গিয়ে সুমিত্রা মায়ের কোলে দিব কি ॥
মনের দুঃখ আমার গেল না, জানকী উদ্ধার হ'ল না।
ওহে মিতে, সুগ্রীব, আমি কি করি তাই বল না ॥
তোমরা সবে যাও চলে মরিব সাগরের জলে।
পোড়া বিধি বাদী হলো সুখ নাই মোর কপালে ॥
রাত পোহালে রাজা হই বিমাতা পাঠাল বনে।
রাবণ করলে সীতা চুরি গিয়ে পঞ্চবটী বনে ॥ —ঐ

৮

ভাঙা কপাল গিয়েছে ভেঙে, জুড়া লাগে কি জুড়লে?
সাড়া দে আজ আমায়, উঠরে প্রাণের ভাই, যুক্তি করি বিরলে ॥
সীতায় কার্য নাই আমার, আমি তোরে লয়ে চলে যাব।
অযোধ্যাতে আর যাবো না, ভিক্ষা মেগে মেগে খাব।
বিধিরে আর কত কাঁদাবি আমায় বল।
কাঁদায় আমার জনম হল, এত কি কপালে ছিল ॥
ভাঙ্গিব আজ তোর শোকেতে পাষাণে মাথা।
দেখি আমায় ছেড়ে কত দূরে তুই যাবি কোথা ॥
আমি বিষে জীবন দিয়ে জুড়াইব শোক।
গৌর বর্ণ কিসের কারণ এমন হলিরে কোন বিষে ॥
হলো আমার কলঙ্ক সমাজে।
আমার হাতে হাতে সঁপে দিল তোর মা আমাকে

তোর মা এসে যখন শুধাবে, আমি কি দিয়ে তারে বুঝাবো।
তোর মা এসে কাঁদবে যখন আমি দুঃখ-সায়রে ভাসবো ॥
এত বলি রাম মূর্ছা হয়ে পড়লো নবঘনশ্যাম ॥
বলিছে, রাম, কি করিতে কি করিলাম ॥
জাম্বুমনির নিকটে আসি, বলে কাঁদ কিসের তরে।
বৈদ্যচূড়ামণি আছে বাঁচাইবে লক্ষণেরে ॥ —ঐ

সুষেণ বলিছে, রাম, কেঁদ না তুমি আমি বাঁচাব লক্ষ্মণে।
মরিলে ঔষধ আছে এখুনি উঠবে বেঁচে যেতে হবে গন্ধমাদনে।
ঔষধ এনে বাঁচাও গো আমারও ভাই লক্ষ্মণে ॥
তুমি না পারিলে নরে পারিবে না কোন জনে ॥
আনতে হবে রাতে রাতে হনুমানে।
তবেই বেঁচে রইব আমি ধরাতে যদি পারি লক্ষ্মণ বাঁচতে ॥
তখন রামের পদধূলি নিয়ে চললো হনুমান।
ঔষুধ না চিনতে পেরে আনলো পর্বতখান ॥
বগলে রাখিল সেই দিনমণি।
আমার পর্বতখানি, রামের নিকটে দেয় আনি ॥
তখন সুষেণ বুড়ো ঔষুধ গুঁড়ো দেয়,
লক্ষ্মণ তখন চেতন হয়ে রামের পানে চায় ॥
ঐ তামালে জড়ায়ে ওগো রয়েছে কনকলতা।
রামের গলা ধরে লক্ষ্মণ কইছে মায়ের কথা ॥
পায় গো সুখ স্মরিয়ে, রাম, তোমার ও চাঁদ মুখ।
এতক্ষণে দাদার ওগো সুস্থ হ'ল বুক ॥
মনের দুঃখ দূরে গেল গো নাচে যত কপিগণে।
ওগো ওগো, রঘুপতি, নাই গো গতি তোমা বিনে ॥ —ঐ

১০

কলঙ্কিনী সীতা ধনি রঘুমণি বলেগো,
পবিত্র এই সূর্যকুলে সীতা কালি দিলে গো।

লক্ষ্মণে ডাকি বলে বাণী, বনে দাও সীতাধনি
লবনা ছোঁবনা সীতায় হেরিব না মুখখানি।
রামের কথা শুনে লক্ষ্মণের বাজে প্রাণে
কেমনে বনেতে দিব আমি সীতাধনে।
অভিমানে লক্ষ্মণেরি নয়নধারা বয় গো
মনোদুঃখে আধোমুখে দাঁড়াইয়া রহে গো।
জনমতুখিনী সীতা জনম গেল দুখে গো
আবার যাবে বনবাসে বাজে বুকে ঘড় বুকে গো।
এই ছিল কি তোমারি কপালে চিরদিন বনে ছিল
কি দোষেতে রঘুমণি গো আবার তোমায় বনবাসে দিল।
আছে গর্ভবতী, বনে দিল সীতা সতী
করুণা দেবী গো কহিছে রাম ধনুকধারী।
শ্রীরামেরি কথা কেবা লঙ্ঘিবারে পারে গো
সীতা দেবীর কাছে লক্ষ্মণ চলে ধীরে ধীরে গো।
উঠগো মা, রাজনন্দিনী, শুভদিন এসেছে গো
পতি তোমার পরম গতি দিতে যে বসেছে গো।
চল, মাগো, সাধু দরশনে আমারি সনে বনে
রথে চড়ি সাথে চলগো উপবনে গহন কাননে।
লক্ষ্মণের কথাতে হরষিতা হল সীতা
আবার সেই বনে গো দেখব যোগীঋষিগণে।
লক্ষ্ণণ বলে কৌতুহলে, চল সীতা সতী গো
বন-ভ্রমণে আজ্ঞা দিলেন তোমার রঘুপতি গো।
উদ্দেশেতে রঘুনাথে প্রণাম করে সতী গো
লক্ষ্মণেরি সনে বনে সীতা করে গতি গো।
অমঙ্গল দেখে মনে ঝরিছে দু নয়ন,
লক্ষ্মণে কহিছে সীতা গো, কেন আমার কাঁদে প্রাণ।
যেন বলে আমার মনে রঘুপতি দিলেন গো বন।
নানা বন উপবন লক্ষ্মণ সাথে করে ভ্রমণ॥

বনে বনে নানাস্থানে গমন করে সীতা গো
সাধু মুনি দরশনে আনন্দিত চিতে গো।
দিবা অবসানে গেল বাল্মীকির বন-বাসে
অস্তাচলে চলে রবি সন্ধ্যা কিছুক্ষণে আসে।
রথে হতে নেমে সীতে বসে পড়ে ভূমিতে
ঘুমায়ে পড়িল সীতে গো বড় কাতর হয়ে আলসেতে।
ঘুমায় ধরা পরে, লক্ষ্মণ মনে চিন্তা করে,
কোনখানে ঘর নাই, মনে মনে ভাবি তাই গো।
গর্ভবতী সীতা সতী দিলাম বনবাসে গো।
তোমারি কপালে লিখন এই কি ছিল শেষে গো।
আগে যখন ছিল বনে আমরা ছিলাম সাথে গো
একাকিনী এখন ধনি রইল বিজন পথে গো।
রক্ষা ক'রো যোগী ঋষিগণে, সীতা সতী রইল বনে
রক্ষা ক'রো তরুলতা গো পশুপাখী দেখ সীতা গো।
রক্ষা করুন হরি বনে রইল সীতা পড়ি
দেখোহে ভগবান রক্ষা ক'রো সীতার প্রাণ।
ঘরে চলে লক্ষ্মণ তখন রথ লয়ে যে ফিরে গো
যায় যায় আর চাহে ফিরে নয়ন দুটি ঝরে গো।
চেতন হয়ে চাহে সীতা লক্ষ্মণ নাহি সাথে গো,
জানলাম তবে এসেছিল আমায় বনে দিতে গো।
অপরাধী পতির চরণে তাই বুঝি দিলেন বনে
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে সীতা গো সন্ধ্যাকালে তপোবনে।
সীতার কান্না শুনি আসিল বাল্মীকি মুনি
সীতাকে চিনিল মুনি আনন্দিত মনে।
আদর করে লয়ে গেল মুনিবর কুটিরে গো
যুগল কুমার জন্ম হল কিছুদিনের পরে গো।
অল্পে অল্পে বোলানের গান সাঙ্গ করি
মহুগ্রামে মোদের বাড়ী কানাই দলের মহুরি।

ঢুকড়ি করে ম্যানেজারি, বোলানের দলে তারি।
দশজনের চরণের দাস গো ভবের মাঝে অতি যে ভিখারী।
ওস্তাদ যে খ্যাপারাম পেলনা সে ভাবের আরাম।
মালতী ফুলে গো মালা দেন মহুরির গলে,
বোলানের গান সঙ্গে করি বলুন হরি হরি গো
ষোল আনা বিদায় করুন চলে যাব বাড়ি গো। —ঐ

১১

সীতা। দুঃখের সাগরে কি করে বলগো পাব পার।
মাঝখানে ডুবল তরী গো জানিনে সাঁতার ॥
ছিলাম একদিন রাজনন্দিনী, তারপর হই রাজার রাণী,
এখন হলাম ভিখারিণী গো, ও দিন চলা ভার ॥
করে থালা পরিপূর্ণ, দরিদ্রে দিয়েছে অন্ন।
এখন দুটি অন্নের জন্যে গো, ও দ্বারে যাব কার ॥
স্বর্ণ-খাটের শয্যাতে, নিদ্রা যেতাম শুয়ে রাতে।
এখন শয়ন গাছ তলাতে গো বিছানা পাতা ॥
কোথায় পতির সে সম্ভাষণ, কোথায় আমার বসনভূষণ,
কোথায় আমার আত্মীয় স্বজন গো সুখের যে সংসার ॥
পতির পাশে দিবানিশি বসে হাসতাম মধুর হাসি।
এখন চোখের জলে ভাসি গো, হাসি নাই আর ॥
পঞ্চমাসের গর্ভবতী আজি আমি জানেন পতি।
হইলে বনে সন্তুতি গো, দোহাই দিব কার।
সীতা নামে দুঃখ দেখ, এ'নাম কেহ রেখো নাকো।
একথাটি মনে রেখো গো, নামে নাই সুসর ॥

বাল্মীকি। জনক রাজার বন্ধু আমি বাল্মীকি নাম।
আমি তোমার ধর্মপিতা পরিচয় দিলাম ॥
দেখে তোমায় সন্তোষ হলাম গো, এসো মা আমার ॥

সীতা। ধর্মপিতা যদি সীতার হলে গো আপনি,
এ দুর্দিনে হইল যখন সব জানাজানি,
জানাই প্রণাম দীন-দুঃখিনী গো পদে শতবার ॥

বাল্মীকি। পেয়ে সন্ধান এসেছি মা নিতে তোমারে,
পিতা জ্ঞানে এসো মম কুটীরে,
ধন্য হলাম পেয়ে তোরে গো, এ সবই তোমার ॥
দূরে গেল যত দুঃখ ছিল মরমে,
সতীশচন্দ্র সন্তোষ সীতা দেখে আশ্রমে,
হরি বলুন সর্বজনে গো জনম বলিবার ॥ —ঐ

১২

রাম। বল, ওরে লক্ষ্মণ, সীতা কোথায় এলি রেখে।
সীতার বারতা, জুড়াব ব্যথা, শুনে তোমার চাঁদমুখে ॥
লক্ষ্মণ। তোমার আদেশে গিয়ে অনায়াসে দিয়ে বনবাসে তাঁকে।
যখন ফিরে আসিলাম, দশা দেখে এলাম,
শতধারা দুটি চোখে ॥
রাম। কোন প্রাণে এলি, ভাই, বনে রেখে সীতায়,
ব্যথা কি বাজেনি তোর বুকে ?
না হয় পাগল আমি, কেন পাগল তুমি
হলে, ভাই, বল আমাকে ॥
লক্ষ্মণ। হয়ে তব আজ্ঞাকারী, করলাম কাজ ঝকমারি,
স্থান আমার হবে না নরকে।
আমার নরকেও স্থান হবেনা গো।
মহাপাপের পাপী আমি,
যার জন্যে মরেছিলাম, সেই সীতা বনে দিলাম,
এমন কাজ কে করে ত্রিলোকে ॥
রাম। সে আমার নয়ন তারা, দুঃখিনী দুঃখ-পাসরা
করতাম না নয়ন ছাড়া যাঁকে,
আমি কিরূপে জীবন রাখিব।
ও সে জীবন-ধনে দিয়ে বনে,
দিয়েছি বিনা দোষে, সে সীতা বনবাসে,
সন্তোষ রাখিতে প্রজাকে ॥

লক্ষ্মণ। অযোধ্যায় আসিয়ে অনলে প্রবেশিয়ে,
পরীক্ষা দেন প্রজার সম্মুখে
তবু সীতা মরিলনা, দিলে অগ্নিতে পরীক্ষা।
কষ্ট পাবে কাল-বিপাকে।

রাম। কেন ভাইরে লক্ষ্মণ, না বুঝে বিলক্ষণ
অলক্ষণ অভিশাপ দাও কাকে।
কপাল দোষে সবই ঘটে
মানুষ কেবল উপলক্ষ।
সতীশচন্দ্র বলে যা থাকে কপালে, কালে ফলে একে একে ॥

—মুর্শিদাবাদ

১৩

ও ভাই, সত্য বল না, কৈর না ছলনা, প্রাণের ভাই, লক্ষ্মণ, গুণমণিরে।
শূন্য রথ লইয়ে আলি রে আলয়ে কোন বনে রেখে চন্দ্রমণিরে ॥
মম মন্দ মতি, পতি হয়ে সতী বিনা দোষে দিলাম বনবাস।
না ভাবিলাম ত্রাস, গর্ভ পঞ্চমাস, করি গর্ভনাশ হইল সর্বনাশ ॥
শুনিয়া কুজনার কুবচন, হিতাহিত চিনে না করিলাম শোচনা,
তেজিলাম জনক-নন্দিনীরে ॥
সীতা নিরক্ষণ না করে, লক্ষ্মণ, প্রাণ যায় যায় না যায় লক্ষ্মণ।
ইচ্ছা হল মন গরল ভক্ষণ করি মরি বিলক্ষণ ॥
পুন না করিব ঐ মুখ দর্শন বিনা দোষে করিলাম উপক্ষণ।
বনে দিলাম একাকিনীরে ॥

—চট্টগ্রাম

১৪

মম প্রতি রাম কেন হলে বাম অবিশ্রাম মম মন শ্রীপদে।
তব দাসী রহি কোন দুষী নহি বনবাসী হই কি অপরাধে ॥
অদ্যাপি ঐ পদে নাহি হই দুষী যদ্যপি হইএ থাকি দাসী দোষী,
রাম হে, যারে স্থান দিলে পাএ তারে পুনরায় কর কিবা হাএ হাএ
মরি হে খেদে।
রাম, তুমি গুরু গুণান্বিত দীনদয়ান্বিত বিচারে পণ্ডিত ভুবনে কহে ॥
আমার কিবা কুআচার হয়েছে প্রচার কৈরে কি বিচার বনে দিলে ছলে ॥

সুখে থাকি কিবা মরিগো দুখে রাম নাম কভু না ছাড়িব মুখে, রাম হে ॥
শুন কৃপাধাম দুর্বাদলশ্যাম লৈলে কি রামনাম সে পড়ে বিপদে।
বিনা দোষে ভার্যে বন মাঝে তের্জ্যে সুখে যদি রাজ্যে থাক হে তুমি।
কুলবতী সতী গর্ভেতে সন্ততি বিনা দোষে বনে দিলে হে, স্বামি ॥
দয়াময় নাম বেদেতে প্রকাশ, কিন্তু এখন তাহা না হয় বিশ্বাস, রাম হে।
আমার গর্ভ পঞ্চমাস দিলে বনবাস তব কিছু ত্রাস নাই স্ত্রীবধে ॥ —ঐ

১৫

গর্ব কর না, খর্ব হইবে নিশ্চয় ঘনঘন যদি আনাকে না চিন ॥
আগে কর রণ এখনি পাবে তবে পরিচয়।
আমরা জেন্দহি তোমার বির্দ্ধ রামের যজ্ঞ হয়।
ধনুর্ধর নাম ধর, যদি থাকে সাধ্য, তবে কর যুদ্ধ।
এথায় গালবাদ্য কর, তুমি ত রামের ভাই, কর রামের বড়াই,
আমরা তোর রামের রাখি কি ভয়, অভিপ্রায় বুঝা যায় ॥
শিশু দেখি তুচ্ছ হএ অতিশয় ॥ আমরা লবকুশ নাম ধরি,
না মরি সমরে গতি কি তোমারে তৃণ হেন জ্ঞান করি।
আজুকার সমরে বাঁচিবে না, মরিবে—এককালে পাঠাইব যমালয় ॥ —ঐ

১৬

দেবর ডাড়াও ওহে বারেক ডাড়াও।
শুন, লক্ষ্মণ ধানুকী, আমি শ্রীরামের জানকী ॥
কার কাছে রাইখে যাও তাএ বৈলে যাও ॥
ডাড়াও ডাড়াও, দেবর, ডাকিলে শুন না ভয় কিহে, আমি
তোমার সঙ্গে যাবো না।
বারেক ডাড়ায়ে শুন গুটী দুই কথা।
অহে, সীতানাথের সীতা তুমি ফেলে যাও হে কোথা।
অহে লক্ষ্মণ রামের ভয়ে কঠিন হৃদয়।
ভায়াজায়া বৈলে তোমার দয়া নাহি হএ।
বলে দিলে তব ভায়া গর্ভবতী আপন জায়া।
তুমি ত তাহার ভায়া নাহি দয়া মায়া।

দেবর বনে দিলে ক্ষেতি নাই, লক্ষ্মণ আমি বলি তাই।
কাহার আশ্রমে রবো ভয় পাই ।
ভালো হয় তপোবন করাইলে দরশন
আনি এ ছলে, দেবর, ফেলে যাও।
তুমি মনেতে ভাইব না, সঙ্গেতে যাব না।
তোমার রামের কিরায় একবার ফিরে চাও ॥ —ঐ

১৭

এ কি ধন্যে কার কন্যে কি লাবণ্যে মরি হায় হায় ॥
একা কি জন্যে এ ঘোর অরণ্যে রাম রাম বৈলে উঠে পড়ে ধায় ॥
তড়িৎ জড়িত ভরিত রূপ, নমো ধরাধরে সুধার কুপ।
আসিয়া পশিল মৃগশিশুরূপ তএ গাএ মাত্র নেত্র দেখা যাএ ॥
সিন্দুর বিন্দু অধর ভালে, কেশর বেশর নাসাএ দোলে।
তাহে কর্ণমুলে শোভে কর্ণফুলে।
শোভে লোভে কত নামে মোহ যাএ ॥
করিকুম্ভ জিনি বক্ষবাঁকাখানি হরিমাজা জিনি কটি শোভনি।
রামরম্ভা তরু জিনি উরু গুরু চরণ মরণে কি বনের প্রায় ॥ —ঐ

১৮

কেনে গো কাননে একাকী ভ্রমণে তু নআনে বহিছে বারি।
কিবা ভাইবে মনে কান্দেছ আপনে
রাম রাম বৈলে ফুকরি ফুকরি ॥
পতিত ভুষণ গলিত কেশ, বসনাভরণ কিছু নাই লেশ।
বনে বনবেশ দেখি গো বিশেষ রাম হৃষীকেশ ?
তব কিঅ দেবি রাজার নন্দিনী, মনে হেন গণি।
কেনে একাকিনী হইএ তুঙ্কিনি গলিত নয়নি এ বিন্দু বরণী।
কান্দে কেনে বলি হরি হরি। —ঐ

১৯

আমাকে বোল রে, বাছা হনুমান, বলরে স্বরূপে হইল রণ কিরূপে ॥
দেখ তেনেয় (?) আমা সেই বল স্বন (?) আমায় অনাথিনী করিলে ॥

পাথারে ভাসাইলে, আমার কুলের শত্রু হইল দুইটি কুসন্তান।
কিরূপে তোমারে করিল বন্ধন, তাহা বল, বাছা, পবননন্দন ॥
কিরূপে মৈল ভরত শত্রুঘন, মম প্রাণ মম দেবর লক্ষণ ॥
কিরূপে সমরে শত্রুঘন মরে ॥
গেল কিরূপে রঘুনাথের গেল প্রাণ ॥ —ঐ

১৯

চল ঘরে যাই আর কেহ নাই,
তুমি আমি দুটী ভাই বিনে।
মনে হেন জ্ঞান ॥
বুঝি যাবে প্রাণ ধানুকি লক্ষ্মণের ধনুর্বাণ ॥
কাল যম প্রায় ঐ দেখা যায় একি হোল দায় ॥
না দেখি উপায়, হায়, প্রাণ যায় কি বিধি ঘটায় ॥
না সেবিলাম মায়ের চরণে একেতে দুঃখিনী ॥
জানকী জননী লবকুশ বলে সদায় পাগলিনী ॥
তাতে যদি তুমি আমি প্রাণে মরি ॥
দুঃখিনীকে কে মা বলিবে বল ॥ —ঐ

২০

শুন গুণধাম রাম, বাম সীতা প্রতি হইয় না,
তোমার দয়া হএ না বিনা দোষে বনবাসে দিবে অঙ্গনা।
শুন শ্রীরাম ধানুকী বিবেচনা হইলো এ কী।
ঐ পদ বহি মা জানকী অন্য জানে না ॥
যে সীতার কারণে তবো নাম রইল রাম রাঘব।
সে সীতাকে ভিন্ন ভাব কি বিবেচনা।
সীতা যদি অপরাধী হইএ থাকে, গুণনিধি।
বনে দেও তা নহে বিধি শুন মন্ত্রণার ॥
নব কানন গহিনে যাইতে বৈল না একে সীতা কুলবতী।
পঞ্চমাসের গর্ভবতি হেন সীতা তেজে পতি, প্রাণে সহে না ॥
পায় ধরি গলবাসে এই ভিক্ষা দেও দাসে।
সীতা থাকে বনবাসে যেতে বৈল না ॥ —

মহাভারত

সাবিত্রী সত্যবান

সাবিত্রী সতী যে ভাবে বাঁচালেন পতি
সতী নারীর কেমন রীতি হে, ঐ হে শুন কুলবতী।

সাবিত্রী—কে তুমি এখানে এলে সত্য কোরে বল খুলে
ও তাই শুনি কর্ণমূলে।
আমার ভয় হয় হৃদকমলে হে
তোমার দেখে বিকট আকৃতি ॥

যম— শুন শুন, ওহে ধনি, বলি তাই বিশেষ বাণী
আমি ধর্ম নৃপমণি, শুনে তোমার ক্রন্দনের ধ্বনিহে ;
আমি এলাম তাই শীঘ্র হে।

সাবিত্রী—কাঁদি আমি কিসের কারণ
শুন শুন, ওহে শমন, ও তা শুনিব বিবরণ।
তুমি বনে কিসের কারণ হে,
বুঝি দেখি এ নারী জাতি ॥

যম— এসেছি এ ভিক্ষার তরে
সে ভাব আমার নাই অন্তরে ; এখন ভিক্ষা দাও মোরে

সাবিত্রী—তুমি এসেছ হে ভিক্ষার লাগি,
এসে বল ভিক্ষা মাগি, তুমি হও ভণ্ড যোগী
তোমায় দেখে মন বিরাগী হে, কোন জনে হয় প্রবৃত্তি।

যম— সত্যবান তো নাইকো বেঁচে
তাহাই এলাম তোমার কাছে, কেন কাঁদছ মিছে।
ফিরে যাও আজ নিজ গৃহে হে ও আমায় দিয়ে পতি।

সাবিত্রী—পতি আমার আছে শুয়ে উরুতে মাথা দিয়ে
শমন যায়রে কি কোরে লয়ে
দিব কি আজ তোমার ভয়ে হে,
ওহে বর্তমান থাকতে সতী।

যম—পতি তোমার গেছে মারা

হোয়েছিল শিরঃপীড়া ডাকলে পাবেনা সাড়া

হোয়ে গেছে জীবন ছাড়া, এখন কাঁদলে আর পাবে কতি।

সাবিত্রী—পতি যদি যাবে ছেড়ে

সতী হব কেমনে করে বল এ সংসারে।

বল আজ আমারে ঐ কি হবে আমার গতি।

যম—আমি যখন ধর্ম জাতি

মিছে কেন কাঁদ সতী, ও বর মাগ সতী।

সত্যবানের জীবন ছাড়া হে,

তুমি যাহা চাও তাই পাবে, সতী।

সাবিত্রী—যদি বর দাও নিজ গুণে

শ্বশুর শাশুড়ী আছে বনে অন্ধ দু'জনে

তারা পেয়ে যাবে চক্ষু ভবনে হে,

ও হে তোমার দয়া হয় যদি।

যম—তাই হোল শুন নারী এখন যাও ঘর ফিরি,

তাতে যদি সন্তোষ না হও, সুন্দরী হে, তবে বল তোমার কি মতি।

সাবিত্রী—বলি কথা সকল খুলে

পিতার পুত্র নাই কো মূলে, ও বর দাও হৃদয় খুলি,

যেন পিতৃবংশে রয় এ কুলে হে, বংশে দিতে বাতি।

যম—মিছে কেন আস বৃথা তুমি হবে পুত্র মাতা

আমার এ সত্য কথা,

আমার এ সত্য বাক্য না হবে অন্যথা,

রোধ করে কে মোর গতি।

সাবিত্রী—তবে এই বার দয়া কোরে

দাও হে পতির জীবন ফিরে, এখন যাই ঘরে ফিরে।

পতি ছাড়া কেমন কোরে হে হব আমি পুত্রবতী॥

যম—পরাস্ত আজ হোল শমন

লও হে পতির পুনর্জীবন গৃহে ফিরে এখন

মম নাম করিবে শরণ আর হবে না দুর্গতি। —মুর্শিদাবাদ

২

সতী গো বাঁচি না যাতনায়।
এ সময়ে গহন বনে তোমা বই আর কেহ নাই।
আমি যে মাথা তুলতে নারি গো।
বুক ফেটে যায় বলতে কথা,
বলতে বলতে অচৈতন্য হয়ে গেল মৃত প্রায়।

সতী— ওকি হল গো আমার ও কপালে,
বাজের আঘাত কে মারিল আচম্বিত মাথায়।
নারদ মুনি বলেছিল, সেই কথা আজ ফলে গেল,
কি অপরাধ করেছিলাম আমি ভগবানের পায়।

মুক্তি— কেন কাঁদ গো বন মাঝে সতী
এ সংসারে কেউ কাহারও নয়,
একবার আসে একবার যায়।
কেঁদোনা কেঁদোনা তুমি চিরদিন থাকে রাজ্যভূমি,
এ সংসারে সবাই মরবে তোমার পতি একা মরে নাই।

সতী— ধর্মরাজ গো ধৈর্য ধরতে নারি,
তোমার পদে শরণ নিলাম স্থান দাও রাঙা চরণে।
অভাগীর গতি কর, বিপদ আমার গুরুতর,
ওগো ধর্মরাজ, পায়ে ধরি প্রাণপতি আমি চাই।

মুক্তি— সতী, শোন গো বলি তোমার কাছে,
সত্যবানে জীবন ছাড়া যা নেবে তাই চাও আমায়।
তোমায় দেখে মুগ্ধ হলাম, আজ বড় আনন্দ পেলাম,
হাতে শঙ্খ সিঁতির সিন্দুর থাকিবে আমার কথায়।

সতী— আমার মত দুঃখিনী কেউ নাই,
অন্ধ শ্বশুর রাজ্যহারা পিতার আমার পুত্র নাই।
সত্যবানের ঔরসে গো, শতপুত্র পাই যেন গো,
পঞ্চম বৎসরে অন্তরে উদরেতে জন্মায়।

মুক্তি— এ সংসারে হয় নাই, হবার নয়,
বলতে কেউ কি পারে, সতী, মলে পুনঃ জীবন পায়।

তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হোক, অশ্বপতির পুত্র হবে,
চক্ষু পাবে তোমার শ্বশুর রাজ্য পাবে পুনরায়।

সতী— আজি শুভ দিন ভাগ্য ভাল আমার
দয়া করে ধর্মরাজন দাও আমায়।
পতি লয়ে যে যাই আমার, পদে ধরে কাঁদি তোমার
পতি নইলে কেমন করে হইবে শত তনয়॥

মুক্তি— নাও, সত্যবান, দিলাম আমি প্রাণ,
এ সংসারে সাধ্বী সতী তোমার মত কেহ নাই॥
কৃষ্ণ পক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে চতুর্দশী করলে ব্রত
এসংসারে সে রমণীর বিধবার নাই যন্ত্রণা॥

সতী— পদে প্রণাম গো করি ধর্মরাজন, তোমার দয়ায়,
পেলাম পতি, এবার আমি গৃহে যাই।
উঠ উঠ, প্রাণনাথ, আছ কেন ঘুমায়ে।
উঠে একবার চেয়ে দেখ অভাগিনী অবলায়।
কেন ডাক নাই গগনে নাই বেলা,
কাঠ ভেঙ্গে বেচবো কখন বলতো, প্রিয়ে, আমায়।
সত্যবানের মনে পড়ে, অজ্ঞান হয়ে ছিলাম পড়ে,
যমের হাতে বেঁচে গেছে, হরিধ্বনি দেন সবাই। —মুর্শিদাবাদ

নিম্নের দুইটি পাঁচালী মহাভারতোক্ত অভিমন্যু নিধনে সুভদ্রা, উত্তরা এবং অর্জুনের শোক প্রকাশের বৃত্তান্ত লইয়া রচিত। ইহারা কথোপকথনের আকারে রচিত হইয়াছে। বাংলাদেশের লোক-নাট্যের একটি রূপ ইহাদের রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কৃষ্ণযাত্রার অনুকরণে ইহারা রচিত বলিয়া নাটকীয় কোন ঘটনার পরিবর্তে করুণরসের ভাবই ইহাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

৩

সুভদ্রা—ওরে বাছাধন, চাঁদ-বদন না দেখলে মন জ্বলে পুড়ে যায়।
কেন বিধি দিয়ে নিধি গো নিলে অকালে, মোর কপালে
কেন পড়ল ছাই॥

তোর পিতা যে জগৎশ্রেষ্ঠ, পুরুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট,
তোর মামা হয় স্বয়ং কৃষ্ণরে জগৎইষ্ট সেই।
তবে কেন আমি কষ্ট পাই ॥
কেন, দাদা, বদন ভারী, কেন চোখে ঝরে বারি,
হয়ে নিজে মুরোয়ারি গো, তব অরিরে বধ কেন করিলে না হেলায়॥

কৃষ্ণ— ও তুই কাঁদিস নাকো বোন, ও যা হবার হবে
কে খণ্ডাবে বিধির লিখন।
প্রতিকার তার করব এখন বোন, ও তুই রোদন ছাড়,
তোর মুখে কি কাঁদন শোভা পায়॥

সুভদ্রা—গীতাতে পড়েছি সত্য, অসার সংসার সব অনিত্য।
অভিমান্যু হয় অপত্য গো, দাদা, সেই কারণ, সত্যাসত্য
বিচার ভুলে যায়

কৃষ্ণ— ও তা ভুললে চলবে না, দাঁড় ধরে তুই থাক দাঁড়িয়ে তরী টলবে না।
অজ্ঞান হলে তোর চলবে না, বোন, বড় জ্ঞানী তুই,
জ্ঞানে মুনিঋষি হেরে যায় ॥

সুভদ্রা— রও, নারায়ণ, হৃদি মাঝে, মন যেন মোর বাজে কাজে।
যেন না যায় সকাল সাঁঝে গো, হৃদে বিরাজে,
ও পদপঙ্কজে রয় সদাই ॥

কৃষ্ণ— ও তুই ফিরে যারে বোন, ক্ষত্র জাতির নীতি ধরে চলিব এখন,
মরতে এসেছি যখন রে, তখন লোকাচার লোক দেখান
সব রকমি চাই ॥

উত্তরা— আমার সাধের পুতুল খেলা, এই খানে কি সাঙ্গ হলো।
মানুষ ছবি, দাদা, অভি ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলো ॥
বিধবা হারায়ে ধবো, কি রূপেতে গৃহে রব।
সঙ্গে লও সঙ্গিনী হবো, উঠ, নাথ, চক্ষু খোল ॥
বালিকা বয়সে আমি, কি পাপে হারানু স্বামী।
অনুমৃতা হবো আমি, পতি পাশে চিতা জ্বালো ॥

কৃষ্ণ— তুমি কেঁদো না, গো মা, তোমার রোদনে
বড় লাগছে বুকে ঘা।

একেতে বালিকা তুমি গো,
সোহাগিনী ছিলে দু'জনায়।

উত্তরা— হারাইয়া প্রাণেশ্বরে, কেমনে রহিব ঘরে।
দাও আমায় সঙ্গিনী করে, আজ হতে মোর সব ফুরালো॥

অর্জুন—ফিরে যা, মা, ফিরে যা তোর নিকেতন।
অভি গেল, থাকতে রবি জয়দ্রথের হবে পতন
দেখিব কাল এ সময়ে যোগ হইলেও সব অমরে,
জয়দ্রথে রক্ষী করে সংসারে নাই হেন জন॥
সখা হে, কাল যুদ্ধে যাবো, পুত্রহন্তাদের শিখাবো;
নইলে এমুখ না দেখাবো, করিব প্রাণ বিসর্জন। -ঐ

৪

দণ্ডী— বন মাঝে আজকে তুমি কেন কর ছলনা।
ছিলে ঘুঁড়ি হলে নারী, যেমন করে বল না॥
দণ্ডী রাজার নাম ধরি শিকার তরে বনে ফিরি।
অবন্তীতে বাস করি, জানাও গো সব ঘটনা॥

উর্বশী— শুন, রাজা, আমার কথা, বল্‌তে লাগে প্রাণে ব্যথা।
বলব তোমায় সব বারতা, করবো নাগো ছলনা॥

দণ্ডী— দিনেতে দেখি অশ্বিনী, অস্ত গেলে দিনমণি।
ইহার কারণ বল শুনি শুনতে মনে বাসনা॥

উর্বশী— উর্বশী নাম ধারণ করি স্বর্গেতে ছিলাম অপ্সরী।
শাপ দিলে হইগো ঘুঁড়ি নিশিতে হইল যে নারী॥

দণ্ডী— আমার সঙ্গে তুমি চল যাবে কিনা আমায় বল না।
তোমার রূপে মন মজিল, ওগো মৃগ-নয়না॥

পয়ার— তোমায় দেখে মন মজিল।
আমার সঙ্গে তুমি চল॥

দণ্ডী— তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি জানাই গো তোমায় শুন না
যদি তুমি যাও হে ছাড়ি এ প্রাণে আর বাঁচব না॥

উর্বশী— দেখ রাজা ভেবে মনে পাবে অশেষ ব্যথা প্রাণে।
সুখ নাই গো আমার প্রাণে চিরকালই যাতনা ॥

দণ্ডী— বাজে কথায় নাহি ভুলব, সঙ্গে তোমায় নিয়ে যাবো।
যা হবার তাই দেখে নিব ঘটাবে যখন ঘটনা ॥

উর্বশী— কে খণ্ডাবে কপাল বল, তোমার সঙ্গে যাবো চল।
বিধির নির্বন্ধ বল, নইলে মুক্তি হবো না ॥ —মুর্শিদাবাদ

৫

জয় জয় নারায়ণ, তুমি জগজন তারণ
সতীর মর্যাদা রাখ, করিয়ে কত যতন।
জয় হে কমলাপতি, তুমি অগতির গতি
জানি না ভজন-স্তুতি আমরা অবলাগণ।
সাধ্বী নারী যেবা হয় হরি তাঁর হন সহায়
অসম্ভব সম্ভব হয়, পুরাণে আছে লিখন।
নিরন্তর সেবেন সতী শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি
ভক্তি করিয়ে অতি শ্রীহরিরে করেন স্মরণ।
হেন সময় সত্যবান আসি সাবিত্রীরে কন
প্রিয়ে, আমি যাব বনে কাষ্ঠ আনয়ন করিতে
কষ্ট হয় রন্ধনেতে ফিরিয়ে আসিব এখন।
চমকিয়ে সতী কয়, নাথ, তব নাহি সময়
বেলা বেশি নাহি রয় প্রায় সন্ধ্যা আগমন।
হাসি সত্যবান কয় তোমার নাহিক ভয়
থাক বসি নাহি যেও, ফিরিয়ে আসিব এখন।
সাবিত্রী বলেন সতী, আমি যাব সংহতি
যদ্যপি হয়েছে রাত্রি ফিরিয়ে আসিব দুজন।
কি কারণে সঙ্গে যাবে, মিছা কেন কষ্ট পাবে
কাঁকর ও কাঁটা ফুটিবে তব কোমল চরণে।
মানিল না সাবিত্রী সত্যবানের বচন,
কতক্ষণে পৌছেন কষ্টেতে যে ঘোর বন।

এখানেতে বস' প্রিয়ে আমি ঐ গাছে উঠিয়ে
শুকনো ডাল আমি গিয়ে করিয়ে গো কর্তন।
কালের হইল কাল সত্যবান গাছে উঠিল,
বেছে বেছে শুকনো ডাল, কাটিয়ে কত নামাল,
প্রিয়ে, আমায় ধর ধর জ্বলিয়ে গেল শরীর
বাঁচিব না বুঝি আর, বলি গো কর শ্রবণ,
কালের হইল কাল, বদন কালিমা হল্য
প্রাণবায়ু বুঝি গেল, কি করিব আমি এখন,
রেখো হরি, বংশীধারী, তুমি হে পতি আমার,
তুমি হে পতিত-পাবন।
সতীর তেজ জ্বলিছে পারে না কেহ যাইতে
কাছে সকলে দাঁড়িয়ে আছে, করিতে নারে পরশন।
দূতগণ ফিরে গেল, ধর্মে গিয়ে সব বলিল
ধর্ম নিজে সাজি যেখানেতে সত্যবান।
কেনগো বসিয়ে সতী, কোলে নিয়ে, মা, মৃতপতি,
সংসারের এই নীতি জন্মিলে হবে মরণ।
কে, প্রভু, আপনি হন, শুনিয়া হইল জ্ঞান
হেরিলে পাপ নাশ হয়।
আমি হই মা, শমন, লইতে, মা, সত্যবান
লইয়া করি গমন,
বর মেগে নে, মা সতী, ছেড়ে দে, মা, সত্যবান
যদি প্রভু দিবেন বর, অন্ধ আছেন শ্বশুর
রাজত্ব নাহিক তার কর পুত্র-রাজ্য দান।
তথাস্তু বলিয়ে হরি নিলেন সত্যবানে ধরি
চলিলেন ধীরে ধীরে আপনার ভবন।
সতী সঙ্গ না ছাড়য় পিছু পিছু চলি যায়,
ধর্ম দেখিয়া বলে, কেন কর, মা, জ্বালাতন।
তোমাকে দিলাম বর তুমি ফিরে যাও, মা, ঘর,
আশা আর নাহি কর, মা, পাইতে মা পতিধন

বর মেগে লে গো, সতী, ছেড়ে দে গা সত্যবান,
যদি প্রভু দিবে বর, রাজত্ব নাহি পিতার কর পুত্র-রাজ্যদান।
শত পুত্র হোক মোর কর পুত্রে রাজ্যদান।
তথাস্তু বলিয়ে হরি চলিলেন
ধীরে ধীরে আপনা ভবন।
সতী সঙ্গ না ছাড়য়
পিছু পিছু চলি যায় বলে, কেন কর, মা, জ্বালাতন
সত্যবানে প্রাণদান দিলেন,
রাজ্য দিলেন সত্যবানে,
শত পুত্র প্রাপ্ত হইলেন ॥ —বাঁকুড়া

ভাগবত

ভাগবতের বিষয় বা রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া যে সকল পাঁচালী রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাহিনী দৃঢ়-সংবদ্ধতা লাভ করিতে পারে নাই। একান্ত ভাবমূলক বিষয়-বস্তু বলিয়া ইহারা গীতি-ভাবাপন্ন হইয়াছে, কাহিনী অত্যন্ত গৌণ হইয়া পড়িয়া কেবল অন্তরের অনুভূতিই ব্যক্ত হইয়াছে সেইজন্য ইহাদিগকে পাঁচালী বলিয়া উল্লেখ করা অনেক সময় কঠিন।

১

হ'ল রজনী অবসান, কোকিলে ধরিল গান,
ভোরে ভ্রমর করে গান গুন গুন স্বরে;
আলোকিত হ'ল ভুবন পুলকিত সর্বজন, সকাল বেলায় শয্যাত্যাগ করে।
শ্রীদাম আদি রাখাল সব, মনে মহা উৎসব
নন্দালয়ে গিয়ে সব, কেশব বলে ডাকে।
কোথায় রে, ভাই, নীলবরণ কাল বিলম্ব কি কারণ,
সাজাতে বল মাকে।
আমরা রাখাল উঠে ভোরে, ডাকতে এসেছি তোরে,
কালকের কথা করে দেখ, ভাই, স্মরণ।

সে কথা কি নাইরে মনে, কি কথা আমাদের সনে,
কি কারণে হয়েছে বিস্মরণ।
পুর্ব আকাশে উদয় ভানু, হাম্বারবে ডাকে ধেনু,
কানুকে, কি শুনতে পাওনা, কানু, মলিন হ'ল তারাগণ,
পরিষ্কার হল গগন, নব ঘন চেয়ে দেখ নয়নে।
চন্দ্র গেছে অস্তাচলে, বিলম্ব করা আর কি চলে,
রাখাল দলে তোরে এলাম ডাকতে, শুনতে পাওনা ঘনশ্যাম,
তোমায় ডাকছে বলরাম, শিঙ্গা বাজাছে অন্ধকার থাকতে।
চূড়া পীতধড়া পড়ে, নাচন দেখাও পাঁচন ধরে,
মায়ের মনকে ঠাণ্ডা কর কৃষ্ণ,
চলরে যাই গোষ্ঠ মাঝে, গেলে পরে সবাই হবে হৃষ্ট।
প্রখর হবে রবির কিরণ, যখন করিবে শরীর পীড়ন,
সে সময় থাকবি গাছের তলে,
পাবি নাকো কোন কষ্ট, ধেনু লয়ে চলে কৃষ্ণ,
ভানুর উদয় হল পুর্বাচলে। —মুর্শিদাবাদ

একা যাবনা কানাই বিহনে।
ওমা নন্দরাণী, সন্দ কি জননী, তোমার নীলমণি দিতে গোচারণে॥
মনের কথা, মাগো, করি প্রকাশন, বনে গিয়ে কত করি দরশন,
কত কাণ্ড করে ঐ পীতবসন, সর্বদুঃখনাশন ভাই কানাইয়ের গুণে॥
নির্ভয়েতে বনে করি বিচরণ রাখালগণে সদা হেরি শ্রীচরণ,
প্রেমানন্দে বনে করি গোচারণ, ভায়ের আচরণ হেরি রাখালগণে॥
বনে গিয়ে আমরা সকলে যতনে, রাজা করে রাখি তোর কালরতনে।
কেও ঘুমায়ে থাকি কেও থাকি চেতনে, কোন অযতনে রাখি নাকো বনে॥
দূর বনে গেলে ধবলীর পাল, বলায়ের হাতে সঁপি তোর গোপাল।
গোপাল ফিরায় যত আর যত গোপাল, ভুপাল হয়ে গোপাল থাকে একস্থানে।
থাকে ক্ষীর সর সবারি সদনে, কৌতুহলে তুলে ধরি চাঁদবদনে।
কভু তৃপ্তি রাখি যাচিগো সদনে, শান্তি সম্পাদনে ব্যস্ত জনে জনে॥

কি ভাবনা ভাব ভাবিয়া তনয়, ভেব না জননী, কানাই মানুষ নয়।
বনে গিয়ে যে সব করে অভিনয়, বিনয় করে, মাগো, বলি তোর সদনে ॥
দিব্যমূর্তি লোক এসে কত জনে, কানাই কাছে বসি নিরজনে,
কভু নৃত্য করে মত্ত হয়ে গানে, চেয়ে কানাই পানে ধারা বয় নয়নে ॥
রক্ত বর্ণ একজন এল হংসযানে, চারি মুখে সে কত কথা জানে।
কভু নৃত্য করে মত্ত হয়ে গানে, চেয়ে কানাই পানে ধারা বয় নয়নে ॥
সর্ব রাঙ্গা চক্ষু শ্যামা বরণ হাতি হ'তে তারা হয়ে অবতরণ,
প্রণাম করি ভায়ের ধরে দুটি চরণ, বলে নীরদ বরণ রেখো হে সে দীনে ॥
বৃষ আরোহণে বিনাশ ত্রিশূল করে, দীর্ঘ জটা মুখে ববম ববম করে।
বেষ্টিত চৌদিকে প্রমথ নিকরে, এসে বেণুকরে নিরখে নয়নে ॥
বদনেতে সদা বলে রাম রাম, দেখিলে মনে হয় দাদা বলরাম,
নাচে গায় শিঙ্গা বাজায় অবিরাম. কোথায় তাহার ধাম জানিব কেমনে ॥
যত্নে জটা হ'তে বাহির করে জল ধৌত করে ভায়ের চরণ যুগল।
নৃত্য করে প্রেমে হয়ে পাগল, হয়ে বিহ্বল পড়ে ধরা সনে ॥
ত্রিনয়নী দশভুজা এক রমণী, সিংহ পৃষ্ঠোপরে এল, মা, অমনি,
কোলে তুলে নিল তোমার নীলমণি, চাঁদ বদনে ননী দেয় সযতনে ॥
হরি নারায়ণ বলে আনন্দ বাণীতে, কানাই মানুষ নয় পার নাই চিনিতে,
আকুল হয়ে রাখালগণে এলাম নিতে, বনে দিতে আর বিলম্ব কর কেনে ॥—ঐ

৩

গগনে উঠিল ভানু চল, ভাই, কানু, গোচারণে।
চল, কানাই, গোচারণ বিলম্ব ভাই অকারণে ॥
দিশি উদয় নিশি পালাই, অন্ধকার দূরেতে পালায়,
শিঙ্গাতে ফুঁ দিল বলাই ভোরের বেলায় তোর কারণে ॥
উষার আসায় সবাই সুখী. পুর্ব আকাশে উদয় ভানুর উঁকি,
নলিনী প্রফুল্ল সুখী, নিরখি লোহিত অরুণে ॥
কমায়ে জ্যোতির বিন্দু, অস্তাচলে গেছে ইন্দু,
পাতায় পাতায় শিশির বিন্দু ঝরিছে কিরীট কিরণে ॥
এ সময়ে অলিকুলে মধুলোভে দুলে দুলে,
উড়ে বসে ফুলে ফুলে, দুলে দুলে সমীরণে ॥

চূড়া পীতধরা পড়ে, নাচন দেখাও পাঁচন ধরে,
মায়ের মনকে ঠাণ্ডা করে, চলরে বন বিচারণে।
গোপাল হয়ে গোষ্ঠে যাবি, মদন মুরলী বাজাবি,
সাজাবি এবং সাজিবি, বনফুলের আভরণে ॥
হাম্বারবে গাভীগণে ঐ ডাকে শোন প্রাঙ্গণে ;
তাই বলি পালের অঙ্গনে, গো পালকের বেশ ধারণে ॥
আনন্দে চরাবি গাভী, মধুর কথায় মন জাগাবি,
সাজাবি এবং সাজিবি নূপুর লাগাবি চরণে ॥
ছানা মাখন নবনীত, যে সব তোমার মনোনীত,
লয়ে হলাম উপনীত, কাজ কি বৃথা কাল হরণে ॥
প্রতিদিনের মত মাতবো, বনফুলের মালা গাঁথবো,
তোমার সঙ্গে খেলা পাতবো, আজ আবার নূতন ধরনে ॥
সঙ্গে লয়ে গিয়ে তোরে, রাখিব সদা সত্বরে,
আনন্দ পাব কত যে, গোবিন্দ তোর আচরণে ॥
বাহির হ'ল নন্দের গোপাল, চলরে চলরে গোপাল,
এলাম যত ব্রজগোপাল, হরিনারায়ণ সনে ॥ —ঐ

৪

কালা, আর দিওনা জ্বালা অবলায়।
দিবানিশি জলছি তোমার এ ব্রজ লীলায় ॥
কি মন্ত্রে ভুলালি কালা, তুমি হলে গলার মালা,
তোমার জন্য মন উতলা, কি দিয়ে ভুলাই ॥
মনে হয় নির্জনে বসি, দেখি কালার রূপরাশি।
কুটিলা কাল সর্বনাশী, বুঝে সব ফেলায় ॥
মনের মানুষ আছে বা কে, মনের কথা বলব কাকে।
মন যে আমার পড়ে থাকে কদম তলায় ॥
ছেড়ে সংসার সরে চল, না পারো তো মেরে ফেলো।
ভয়ে ভয়ে প্রাণ যে গেল কি ভাবে পলাই ॥
আজকের মত বেচাকেনা হয়ে গেল ষোল আনা।
বিদায় দাও হে, কেলোসোনা, এ গোপ-বালায় ॥

গিয়ে যদি বেঁচে থাকি, কাল হবে ভাই দেখাদেখি।
এসে ভাই সাজব ঠিকই, বনফুলের মালায় ॥
যা বলিলাম মনে রেখো, আসব ঠিকই আশায় থেকো।
এ রাধারে ভুলো নাকো, যদি কেউ ভুলায় ॥
এ জন্মে কি জন্মান্তরে রাধারে রেখো অন্তরে।
ফেলিওনা স্থানান্তরে যন্ত্রণার দোলায় ॥
করুণা যা আছে সঞ্চিত দাসী তার পায়ছে কিঞ্চিৎ।
সতীশ যেন হয়না বঞ্চিত চরণের ধূলায় ॥
এ ব্রজ মধুর মাধুরী, এ অবধি সাঙ্গ করি।
বলুন সবে হরি হরি বিফল নাই বলায় ॥ —মুর্শিদাবাদ

৫

বৃন্দে :— ফিরে যাও হে, কালা, কুঞ্জে এসো না।
আসব বলে আশা দিয়ে কেন এলে না ॥
কৃষ্ণ :— আসব বলে এলাম চলে গিয়েছিলাম রাস্তা ভুলে।
সারা নিশি গেলো চলে কত পেলাম যাতনা ॥
বৃন্দে :— বাজে কথা কেন বল গাঁথা মালা বাসি হল।
তোমারে লাগেনি ভালো ও তার দেখি নিশানা ॥
কৃষ্ণ :— বল, বৃন্দে, আমায় বলো, কি তুমি দেখেছো ভাল
মনের কথা খোল খোল গোপন করো না ॥
বৃন্দে :— কপালে কে সিঁদুর দিলে, বলো না গো আমায় খুলে,
কোন ফুলেতে মধু খেলে কও, কেলেসোনা ॥
কৃষ্ণ :— কাল গিয়েছে হুলি খেলা সিঁদুর দিলে দাদা বলা
তোমায় কেন করব ছলা, বৃন্দে ললনা ॥
বৃন্দে :— কঙ্কণের দাগ হবে কেনে বল নাগো আমায় খুলে
গরু চরাই বনে বনে কাঁটার নিশানা ॥
কৃষ্ণ :— কঙ্কণের দাগ হবে কেনে বলি, বৃন্দে, তোমার সামনে
এখন তুমি যাও হে চলে আমার কথা শোন না ॥
বৃন্দে :— নীল শাড়ি কোথায় পেলে বল বল চিকণ কেলে
কোন কুলবতী মজাইলে শুনতে বাসনা ॥

কৃষ্ণ :— বলাই দাদা দিলে শাড়ি মনের কথা প্রকাশ করি
দেখাও একবার রাইকিশোরী সন্দেহ করো না ॥

বৃন্দে :— রাই মজেছে অভিমানে পালাও তুমি মানে মানে
ওহে, গরু চরাও বনে বনে পীরিত জান না ॥

কৃষ্ণ :— যা হবার তা হয়ে গেল, বৃন্দে, তুমি চল চল
বেশী কথা কেন বল সইতে পারি না ॥
বৃন্দে, তোমার করে ধরি, দেখাও একবার রাইকিশোরী,
আর ধৈর্য ধরতে নারি প্রাণে বাঁচি না ॥

বৃন্দে :— বৃন্দের সঙ্গে কৃষ্ণ গেল শ্রীরাধার পায়ে ধরিল
নয়নে নয়ন মিলিল বাক্য সরে না ॥

রাধা :— রাধা বলে একি কর, প্রাণনাথ চরণ ছাড়,
তোমার ধরা শক্ত বড় কেউ ধরতে পারে না।
কুঞ্জবনে যুগল হল, মনবাসনা কেন ভুল
বদন ভরে হরি বল যমের ভয় ত রবে না ॥ —মুর্শিদাবাদ

৬

রাধা :— কেন এলাম যমুনার বাঁকে, আমার বসন চুরি করল কে,
সহচরী, প্রাণে মরি প্রাণ বাঁচে না এ দুঃখে।
বারবেলাতে নিতে এলাম জল,
সেই কারণে আজ এখানে পেলাম প্রতিফল।
এখন উপায় কি করি আমি পড়লাম বিষম পাকে ॥
শুন ওহে লম্পট কালা,
বারণ করি, বংশীধারী, দিও না জ্বালা।
তোমার মত এমন মানুষ দেখি নাই আর ত্রিলোকে ॥

কৃষ্ণ :— শুন ওহে গোপের নারী,
জানি না তোমার বসন কে করলে চুরি।
অবেলাতে সারি সারি কেন এসেছ জলকে ॥

রাধা :— শুন ওহে রসময়,
কত জ্বালা দিবে তুমি পেয়ে অসময়,
তোমার কাছে বসন রয় দেখছি যত গোপীকে ॥

কৃষ্ণ :— চোর বলো না বলি তোমারে,
চোর বলে আজ কেন গোপী ধরছ আমারে।
আমি বসন করলাম চুরি কে বলিছে তোদিকে।

রাধা :— ঐ ত তোমার কাছে দেখা যায়,
ঢাকলে কি আর যাবে ঢাকা, ওহে শ্যাম রায়।
শ্যাম, তোমার লাজ সরম নাই, দেখতে আমরা পাই চোখে॥

কৃষ্ণ :— দমকা ঝড়ে বসন উড়েছে,
উড়তে উড়তে লাগল এসে কদমেরী গাছে।
আমাকে চোর বল মিছে, বাঁধছে আমার বুকে॥

রাধা :— ঝড়ে যদি বসন উড়িত
পাঁচ ডালেতে গিয়া তখন বসন লাগিত।
তবে কি এক জায়গায় রইত, বুঝাও আমাদিগকে॥

কৃষ্ণ :— বনে বনে চরাই আমি গাই,
মনে যখন হয় তখন কৃষ্ণগুণ গাই,
বসনে আমার কাজ নাই শাসনে আনিবে কে॥

রাধা :— যা হবার তাই হল হে হরি,
বিপদে পড়েছি এখন দাও বসন ফিরি,
পরে আমরা যাব বাড়ী, কাজ কি আছে আর বকে॥

কৃষ্ণ :— বসন যদি নিবে গোপীগণ,
জল হতে ডাঙায় উঠে এস সর্বজন।
একে একে দিচ্ছি বসন তোমরা পর সুখে॥

রাধা :— যা হোক তোমার বুদ্ধি ভাল, শ্যাম,
এতদিনে আমরা মনে বুঝতে পারিলাম ;
জীবন দিলাম. যৌবন দিলাম আর কি দিব তোমাকে॥

কৃষ্ণ :— শুন শুন, ওহে গোপনারী,
কেমন ভালবাস তাহা দেখলাম পরখ করি,
এখন তোমরা বসন পরি ঘরে যাবে রাধিকে॥
শ্যামের বামে রাধা বসিল, রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলন এইখানে হল।
পাঁচালী সাঙ্গ হয়ে গেল হরি বল মুখে॥

হরিচরণ বলে হে হরি,
চিকণ কালা তোমার লীলা বুঝিতে নারি,
মরণ কালে অধম বলে দয়া করো আমাকে ॥ —ঐ

৭

মা গো, ধরি তব চরণে,
মোদের জীবনধন কৃষ্ণ দে, মা, বনে ॥
জীবনকৃষ্ণ গোপাল নয়নেরি তারা।
নয়ন-পুঁতলী ক্ষণে হয়, মা, হারা।
শ্রীদাম আদি রাখালগণ তারা
বারি বিরাম নাই, মা, তাহাদের দুনয়নে ॥
গোপাল লয়ে বনে পাই বড় সুখ,
বেণু রবে ধেনু ফিরাব কৌতুক।
ছায়াতে বসিয়ে হেরি চন্দ্রমুখ
সকল দুখ যায়, মা, গোপাল দরশনে ॥
গোপাল সঙ্গে গোপাল বাজায় যখন বাঁশী
দরশন করিতে কতই যোগিঋষি
কাননেতে তারা অমনি চলি আসি
অন্ন রাশি রাশি কোথা হতে আনে ॥
যে বনেতে দুষ্ট দৈত্যেরি গো ভয়,
সে বনেতে, মা গো, তোর রাখাল রাজা হয়।
কথা মিথ্যা নয় বলি সমুদয়
এ সব কথা কেবল জানে যোগিগণে ॥
কার কন্যা, মা গো, হেমিয়-বরণী
দশভুজা মুর্তি ভালে ত্রিনয়নী,
কোলে লয়ে, মা, তোর নীলকান্ত মণি,
দশ করে ননী তুলে দেয় বদনে ॥
দশ করে ননী বদনেতে দিয়ে
রাখে গো গোপাল কোলেতে করিয়ে
বল, মা, বল বাঁশীটি বাজাইয়ে কৈলাস ছেড়ে এলাম বৃন্দাবনে ॥

হংস পরে চরে আসে একজন,
তার পরে দেখি বৃষের বাহন
ঢুলু ঢুলু তার করে দুনয়ন
আর বলাই আছে বৃন্দাবনে ॥
আমরা জানি, মা, তোর গোপাল মানুষ নয়,
গোষ্ঠ মাঝে গিয়ে ব্রহ্ম গো আলয়
সেই পদদ্বয় ভাবে মৃতুঞ্জয়
মন ভয় পায় গোপাল নাম স্মরণে ॥
সাধে কি, মা, তোমায় দেয় কি বন্ধন,
পুর্বেকার কিছু ছিল গো সাধন,
দ্বিজ প্রতাপেরি এই বাঞ্ছা অকিঞ্চন
বাঞ্ছা কেবল, মা, তোর গোপাল কৃষ্ণধনে ॥ —ঐ

বৃন্দে, আমায় নিন্দা করো না।
বৃন্দে, তোমার কথা শুনে আমি মরি মনাগুনে
জীবনে পাই কতই যন্ত্রণা ॥
শ্রীদামেরি শাপে মথুরা-ভবনে
রাজা হয়ে বসলাম রাজ সিংহাসনে
এখন, বৃন্দা, বল যাই কেমনে
বলো রাইরতনে আমি যাব না ॥
চন্দ্রাবলীর দোষে দুষী রাধার পদে।
কত সেধে কেঁদে ধরলাম যুগল পদে,
বিদায় দাও এখন সাধের কালাচাঁদে
ঐ বিচ্ছেদ প্রাণে ধৈর্য ধরে না ॥
কুব্জা ধনি আমার পুর্বে বুড়ি ছিল
চরণ পরশে পরম সুন্দরী হইল
রূপে করে আলো মন হরণ করলো
তোমাদের রূপ আর ভাল লাগে না ॥

কুব্জা ধনি রাণী চন্দন দানের ফলে
করে মধুর লীলা চরণ পরশিয়ে
এখন রাইকমলে মজলে শিমুল ফুলে
ও সব বলে আর আমায় লজ্জা দিও না ॥
দ্বিজ পুর্ণ বলে কি হইবে গতি
দিনে দিনে আমার ঘটেছে দুর্গতি
শ্রীপদে নাহি মতি শুধুই কুকর্মে বৃত্তি
ও হে লক্ষপতি, করো করুণা ॥ —ঐ

৯

পার করে দাও ও কাণ্ডারী বিলম্ব আর করো না,
বিলম্ব আর করো না হে বেশী দেরী করো না।
আমরা যত গোপের নারী মাথায় করি দুধের হাঁড়ি,
দাঁড়িয়ে আছি সারি সারি ডাকলে সাড়া দিচ্ছ না ॥
সকলে এসেছি ঘাটে, দেখে তরী বাঁধলে এঁটে,
পড়েছি বিষম সঙ্কটে, মনে ভাব কি বলো না।
দধিদুগ্ধ আছে সাথে, দাঁড়িয়ে রয়েছি ঘাটে,
সন্দেহ হচ্ছে মনেতে তরী বাহিতে জান না।
তোমার লাগি আমি শুন, ও রাই কমলিনী,
তরণী লইয়া ঘাটে বসে আছি দেখ না।
বড়াই বলে, ও কাণ্ডারী, দেখেছি তোমার ভগ্নতরী,
কেমনেতে সাহস করি নৌকায় চড়ি বলো না।
তোমার নায়ের তলা ফাঁসা, গাবকালি তার নাই হে কষা,
হাল বৈঠার জীর্ণ দশা, তরী বাইতে জান না।
নাবিক বলে বড়াই বুড়ি আমি যে ভবের কাণ্ডারী।
শীঘ্র এস নৌকা পরি মনে সন্দেহ করো না।
কৃষ্ণ বলে যে জন ডাকে পার করে দিই আমি তাকে,
পার হইতে ভবার্ণবে আমি যে কাণ্ডারী দেখ না।
রাধা কৃষ্ণ স্মরণ করি নৌকায় চাপে বড়াই বুড়ী,
পার হইল তাড়াতাড়ি দেখ সব ব্রজগণা ॥

ত্রিপুরা কয় বিনয় করি, এখান থেকে সাঙ্গ করি,
বন্ধুগণে বদন ভরি হরি হরি বল না ॥ —মুর্শিদাবাদ

১০

লজ্জায় মরি, কেলেসোনা, কাপড় দাও না।
এমন করে গুপ্ত পীরিত ছড়িয়ে দিও না ॥

রাধা— শোন শোন, বংশীধারী, জলে কি আর থাকতে পারি,
আমরা ফিরে যাব বাড়ী, কাপড় কি দেবে না ॥

কৃষ্ণ— তোমরা কেন বসন খুলে, নেমেছিলে বল জলে,
আমি আছি জলে স্থলে তাও কি জান না ॥

রাধা— আমরা যে অবলা নারী, অত কি আর বুঝতে পারি,
বসন দাও হে তাড়াতাড়ি, দেরী করো না ॥

কৃষ্ণ— তাহা তোমরা বুঝবে ক্যানে, বুদ্ধি (জ্ঞান) নাই কি,
মনে প্রাণে, আজ বোঝাব কানে কানে, না বুঝালে ছাড়ব না ॥

রাধা— শোন বলি, চিকন কালা, আর আমাদের দিও না জ্বালা,
আমরা কানে হয়েছি কালা, একি করছ বুঝ না ॥

কৃষ্ণ— হাত তুলে পাড়ে এস, আমার বাম পাশে বস,
আমায় যদি ভালবাস, তবে কিসের যন্ত্রণা ॥

রাধা— মনে করি পাড়ে যায়, কিন্তু যে মরি লজ্জায়,
সব সঁপিলাম তোমারই পায়, আর কষ্ট দিও না ॥

কৃষ্ণ— শোন শোন চটচ ক্যানে, লজ্জা নাইক তোমাদের মনে,
যদি লজ্জা থাকত প্রাণে, তবে মাথার কাপড় খুলে বেড়াতে না ॥

রাধা— লজ্জা সরম সবই ছিল, তোমার জন্য সবই গেল,
কত জনে কত বললো, বলতে কেউ বাকী রাখলো না ॥

কৃষ্ণ— ভয়কি, ওহে রাজনন্দিনী, তুমি আমার চোখের মণি,
কে কি বলে আমি জানি, আর বলতে হবে না ॥

রাধা— যারা ভবে প্রেম জানে না, তারা খুবই দেয় যন্ত্রণা,
সবই জানে কেলেসোনা, তবে ক্যানে বুঝছে না ॥

কৃষ্ণ— সবই আমি বুঝতে পারি, আমিই খেঁচাই ভবের তরী,
বুঝব বুঝব মনে করি, মন মানে না ॥

রাধা— সবই জান, নীলমণি, তবে খেলছ কেন ছিনিমিনি,
হচ্ছে কত কানাকানি, তাও কি জান না ॥

কৃষ্ণ— গোপন থাকেনা ভালবাসা, শব্দ করে পিতল কাঁসা,
এইতো হল ভালবাসা, ভালবাসা গোপন থাকে না ॥

রাধা— বলি, ওহে চিকন কালা, গা আমার হয়েছে কালা ;
এইবার আমার মরবার পালা, দেখতে পেছ না ॥

কৃষ্ণ— একে একে উঠে এসে, বসন চিনে পরবা সে,
যাও সব নিজ আবাসে, আর কষ্ট দেব না ॥

রাধা— আদিত্য বলে, নীলমণি, বন্ধু তুমি রসিক জানি,
এই খানেতে হল মিলন হরি বল না ॥

১১

যশোদা— কতদিন গেল কেউ নাহি এল কেমনে ধৈর্য ধরি ।
যেদিন হতে গেছে কালা রয়েছি অনাহারী ॥
আমার শ্যামলের দই পাতা আছে ।
ঢাকা ননী তাহার নীচে ॥
সইতে না পারি উপায় কি করি, পাখী হতাম উড়ে যেতাম ।
শ্যামে কোলে নিয়ে শিরে চুমো দিয়ে মুখে ননী তুলে দিতাম ॥
নিশি ভোরে স্বপ্নে হেরে, আমার হিয়া দুরু দুরু করে ॥

পাঠ— অনেক দিন কানাই আমার মা বলে ডাকেনি,
কাছে আসে নি, ননী দে সে বলেনি ; গোপাল গোপাল,
তোর অদর্শনে আমার আশা কুয়াশায় মিশে গো ।

গীত

তু-বিনে কানু বনে যায় না ধেনু, বৎসগণে দুধ না খায় ।
হাম্বা হাম্বা রবে ছুটে যায় সবে কেবল উর্ধ্বপানে চায় ॥
শুক শারী উড়ে গেছে, ওরে কোকিল আর ডাকে না গাছে ।
ভালবাসায় ভালবাসায়, ওগো, বাসায় যেন কেউ বাসা বেঁধো না ।
মাগো, তোর কালা ফিরে এলোনা,
কি জ্বালা জ্বলে নিভে না ।
বেঁচে থাকতে প্রাণ বাঁচেনা এ কি, মা, হলো যাতনা ॥

পাঠ— কৈ সুবল কৈ আমার কালা চাঁদ ?
ওরে তোরা সব ফিরে এলি, কোথায় রেখে এলি আমার কালাকে।

সুবল— মা !

যশোদা— বল বল সুবল ওরে, তবে কি আমার কানাই ফিরে এলোনা,
ও কানাই কানাই।

সুবল— উঠ মাগো উঠ-উঠ, তুমি জ্ঞানবতী বট,
ওরে, মা কাঁদালো বাপ কাঁদানো কেউ চিন্তে পার না।

নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশটি কৃষ্ণযাত্রার একটি অংশ বলিয়া মনে হইতে পারে। কৃষ্ণযাত্রার কোন কোন অংশ বিচ্ছিন্ন পাঁচালীর আকারেও গীত হয়। কৃষ্ণ-যাত্রায় বিভিন্ন চরিত্র নিজেদের অংশে অবতীর্ণ হইয়া গীতি-সংলাপ নিবেদন করে, পাঁচালীতে তাহার পরিবর্তে একজনই গায়ক দোঁহারের সাহায্যে সমগ্র বিষয়টি পরিবেষণ করে। নিম্নে যে অংশকে 'পাঠ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা গদ্য-সংলাপ বলিয়া মনে হয়।

যশোদার গীত

কি কথা বলিলি, বলিসনা ও বুলি আমার শুনে প্রাণ ফেটে যায়।
মা বলে ডাকিতে কেবল একা কানাই ॥
কোন বিদেশিনীর বুক ভরিল,
আমার বুকে ছোরা মেরে কেন বিদেশীর বুক ভরিল।
আমি বিশ্বাস পেলাম তোদের হাতে দিলাম সেই অবিশ্বাসী কালা,
ওরে কালায় রেখে এলি কি ক্ষতি করিলি, কেমনে জুড়াব জ্বালা ॥
ওরে, এই বুঝি মোর ভাগ্য ছিল,
জীবনের জীবন হারালু ॥

নন্দ (পাঠ)—আর যাবনা, আর যাবনা, যশোদা আর যাবনা,
এর অর্থ তুমি বলতে পার ? এর পরমার্থ তোমাদের দ্বারা হবে কি ?
বল বল, রাণী, নীলমণি বলে কেন আর যাবনা ॥

গীত

কাঁদ যশোদা কাঁদবে নন্দ সদা নিরানন্দ জীবন, রাণী,
ব্রজের আনন্দ মথিয়া গেল মধুপুরে নীলমণি ॥

এখন কাঁদ কাঁদ সবাই নন্দের বাধা নাই,
যখন ছেড়ে গেল, যদি নীলকমল মোদের ভালবাসা হয় নাহি গো,
নন্দের বাধা বইতেন সদা, সদা আনন্দ মুখে,
মাঠে মাঠে ধেনু চরাইত কানু, দুঃখে দিন কেটে যায় গো,
দুঃখে দিন কেটে যায়।

যশোদার গীত—তুমি গেলে এলে রেখে এলে ছেলে আসবার কালে কি শুধালে।
কেন গোপনে রাখিলে মনের কথা বল খুলে ॥

নন্দপাঠ— বলব বলব আচ্ছা, পরে বললে হত না ?
তবে শোন যে টুকু আমার গোপন ছিল।

গীত

শোন গো শোন গো গোপন কথা গো বড় ব্যথায় প্রাণ যায়,
বলে বনমালী শোন বলি, ব্রজে কেহ মাতাপিতা নাই গো।

যশোদার পাঠ—আর কি বলেছে ! বল বল কেন বলতে বদন এমন হয় ॥

(গীত)— জন্মের মত গেল ছাড়ি বড় সাধের ব্রজপুরী

পাঠ— ওঃ ! ওঃ ! ওরে নিঠুর, বড় ব্যথা, সহ্য হয় না
কি বলেছিস কি বলেছিস !

সুবল গীত— কেঁদনা গো মাতা বলি মনের কথা, আমরা মা বলে ডাকিব !
নেচে বেড়াব তোমার আঙ্গিনায়, তুমি ননী দেবে খাব।
ওগো খেতে খেতে পড়বে মনে, আমাদের সেই নবঘনে। —ঐ

১২

কোথা সে নিশি শেষে এলনা যে নিরজনে।
হৃদ কমলে পুজব বলে বসে আছি সোপানে ॥
ব্যথার ব্যথী না হলে, বোঝে কি বলে
হৃদয় ধরা যায় না সম হৃদয় না হ'লে।
প্রাণের জ্বালা বুঝবে কেন, জ্বলে নাই যে দংশনে
বিরলে একাকিনী, হায়, মালা গেঁথে যায়
পরাইব বন্ধুর গলে বাসনা জাগাই,
উৎকণ্ঠিত হয়ে রহি জাগি তার আগমনে।

প্রিয়তম মম সে পুজিবার আশে
বিছায়াছি পরাণখানি অতি হরষে,
বিরহতে অবশেষে বাঁচিনা বা জীবনে।
আমায় লোকে জানে না কলঙ্কেরি ললনা
বলে সবায় ব্রজাঙ্গনা বৃথা গঞ্জনা,
লাঞ্ছনা অবমাননা সহে না আর পরাণে।
পড়ি রূপের ফাঁদে অন্তর কান্দে
ভ্রমরা বিহনে মলিন কোকনদে
দে গো তোরা দে বলে দে লভিব শুভ মিলনে।
আমায় চিনিল না ব্রজধামে কলঙ্কিনী
বিরহ-কাতরা আমি, জানে সে গো অন্তর্যামী কি অনলে পুড়ি দিবানিশি।
পরাণ দিয়ে চরণ পাব, মন বাঞ্ছা পুরাইব হৃদয় হরিল কালশশী ॥
গৃহের ঘরণী হয়ে, অবিরত কত সয়ে রহিব গৃহকোণে হায়।
কোন কাজে মন বসে না, চঞ্চল হিয়াখানা প্রেম-বন্যায় উথলিয়া যায় ॥
কালার বাঁশির তানে, কি সুর আঘাত হানে, অন্তরেতে শিহরণ জাগে।
পুষ্পিত এ তনুখানি, বন্দিতে চরণ দুখানি রহে যেন রক্ত জবা রাগে ॥
নিশি পোহায়া যায় কত কথা জাগে মনে ॥
ভালবাসা কালা সনে কত আশা মনে।
বোঝে না কি ব্রজবাসী কলঙ্কিনী ভণে ॥
হৃদয় হেরিতে নারে পাষাণী যত।
কি করিলে জন্ম নিলাম ভাব সত্যমত ॥
মন গহন মনে সকাল সাঁঝে।
কালিয়া বাঁশরী শুনি সদা হৃদ্‌মাঝে ॥
রাধা রাধা বলে ডাকে যখন বাঁশী।
কল্পিতে সে রূপখানি নয়নতে ভাসি ॥
মধুর বিহগ তানে বনভূমি কাঁপে।
উছলিত হিয়াখানি মধুর আলাপে ॥
সুর লহরী সাথে সোহাগ জাগায়,
দূর হতে তালে ডাকে আয়, আয়, আয় ॥

এমনি ভাবে হৃদয় আমার হরিল সে কালিয়া।
প্রেম করি রাখাল সনে পুড়ে মরি জ্বলিয়া ॥
এক দিকেতে গঞ্জনা আর একদিকেতে বিরহ।
বুঝিতে পারিনা আমি মায়াময় মোহ ॥
নিশি পোহাইয়া যায় কত কথা জাগে মনে।
বল গো তোরা বল তনু করে টলমল।
অবশেষে হেলিয়া পড়ি আঁখি ছলছল।
তরঙ্গ মাথাতে চঞ্চল প্রিয়জন বিহনে। —ঐ

১৩

মা, তোর নীলমণি দাও গোচারণে।
মাগো মা, মা ও তোর এ অধমে বিদায় করগো জননী ॥
ও মা যশোমতী, করিগো মিনতি,
বিদায় দিতে চিন্তা কর কেন সতী।
বলি তোমায় অতি হয়ো না কুমতি, ধরি, মাগো, তোমার দুই চরণে ॥
রাখাল সঙ্গে যাবে কত মজা পাবে,
রাখাল রাজা হয়ে আনন্দিত হবে।
সকল রাখাল কানায়ের ধারে, সিংহাসনে বসে থাকিবে বনে ॥
দূর বনেতে গেলে ভাই কানায়ের সনে কত কাণ্ড করি আমরা রাখালগণে,
হেরিয়া নয়নে কানায়ের বদনে ফল মূল ভেঙ্গে দিই গো এনে ॥
যত রাখালগণ আনন্দিত মন, পাই যদি, মা, তোমার যাদুধন।
লইব শরণ বলি গো বচন সাজায়ে দাও, মা, অতি যতনে ॥
ত্রিনয়নী দশভুজা এক রমণী সিংহ পৃষ্ঠ পরে এল মা আপনি।
কোলে তুলে নিয়ে তোমার নীলমণি চাঁদবদনে ননী দেয় সযতনে ॥
বনে দিলে, মাগো, তোমার যাদুধন, হবে না কোন অযতন।
আনন্দিত মন যত রাখালগণ সযতনে তোমায় দিব গো এনে ॥
বারে বারে কত বলিগো, জননী, সাজায়ে দাও, মা, তোমার নীলমণি।
বলায়ের বাণী, ধর গো জননী, অধিক বেলা মাগো হ'ল গগনে ॥
দুরমুজ আলী বলে, ও নন্দবনিতে, কানাই মানুষ নয়, মা, পার নাই চিনিতে।
ব্যাকুল হয়ে রাখালগণে এল নিতে বনে দিতে, আর বিলম্ব কেন ॥ —ঐ

বিবিধ পুরাণ

১

ওহে ভোলা, তোমার লীলা বুঝবার সাধ্যকার,
বুঝবার সাধ্য করহে, ভোলা, মহিমা অপার।
তোমার শ্বশুর দক্ষরাজা যজ্ঞ কোরেছিলো,
মনে মনে যুক্তি করে নিমন্ত্রণ করিল।
ইন্দ্র, ইন্দ্র বাহুবরে, কুবের পবন আর হুতাশন,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু নিমন্ত্রণ করিল।
যত দেবতা আসিল, দক্ষের কন্যা ছিল কজনা,
ওদের কি নাম তাও বলনা।
ওদের কোথাতে বসতি, বলবে সে সব, ভারতি গো,
ওদের বিয়ে কোথায় হলো,
ওদের স্বামীর নামটি বল, হল শুনিতে বাসনা,
ও শিব, আমারে বল না।
সকল দেবে আনলে আগে, শেষ বলে শিবদুর্গাকে,
দুর্গার আগে চলে গগন ও উপরে গো, বিপদ ঘটাব বলে,
মনের কথা রইল মনে।
সতী গ্যাখে সকল দেবে, কেবল নাহি গ্যাখে শিবকে।
দেবগণ সব বড় দুঃখে, নিমন্ত্রণ করে শিবকে.
কিসেরি কারণ বলবে সত্য বিবরণ।
শুনে তখন দক্ষ বলে, শিবকে নিমন্ত্রণ করিলে,
আমার মানের ক্ষতি হবে,
আমি বলি নাই সেই ভাবে, শুন তবে গুণের কথা,
গায় ভস্ম, মাথায় জটা, সদাই বেড়ায় গাঁজা খেয়ে,
থাকে শ্মশানেতে শুয়েগো, ভূতের সাথে বেড়ায় নেচে,
ব্রাহ্মণের একটি এঁড়ে আছে।
জামাইয়ের সৃষ্টিছাড়া কাজ, দেখেশুনে লাগে লাজ।
শিবনিন্দা শুনে সতী, প্রাণ ত্যাগগো করিল,
সংবাদ কহিল সে তো গেল।

শিব রাগান্বিত হল,
বলে, দেখিব দক্ষ বেটা, আজ তারে রাখে কেডা,
বলে, জটা নাড়া দিল, অমনি ভুতগুলো সব আসিল,
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সবাই মিলে, দিল যজ্ঞে আগুন জ্বেলে,
যজ্ঞ দপ্ দপ্ কোরে জলে উঠল।
গগন উপরে গো, তবে শিব সতীকে তুলে নিল ত্রিশূল উপরে গো,
ত্রিশূল উপরে তুলে লয়ে ঘুরাই শূন্য ভরে গো।
নয়টি তাহার মুণ্ড হ'ল, নয় মুণ্ড নয় দিকে গেল,
কোন মুণ্ড কেবা হল, কথাটি বলবে শাস্ত্র ধরে'নইলে দিব দফা সেরে।
ওহে হতভাগা হাবল আলীর এ সব ব্যাপার, ওহে ভোলা,
বুঝবার সাধ্য কার।

ওহে, হর হর দিগম্বর, লীলা কে জানে,
লীলা কে জানে হে হর, লীলা কে জানে ॥
তবে দালান কোঠা ছেড়ে ও হর বাসকর শ্মশানে গো,
আর শিক ভস্ম হাতে নিয়ে, ফিরো বনে বনে হে,
একি তোমার লীলাখেলা, পরনেতে বাঘের ছালা,
লীলা বুঝিতে না পারি।
তোমার কথায় বলিহারি।
তবে ভগবতীর অংশ হতে কালীর জন্ম হল,
হাতে দেখি একটি মুণ্ড, গলায় মুণ্ড মালাগো,
মুণ্ড কয়টি কার কার হবে, বলবে কথা প্রকাশ কোরে।
কথাটি বলবে শাস্ত্র ধরে নইলে দিব দফা সেরে।
তবে ভোলার মাথায় সাপের ফ্যানা, ধর কি কারণে,
কোন জাগাতে দ্বাদশ পায়ে, হেঁটে ছিল বলহে,
কার্তিক গণেশ দুটী ভাই, তারা মায়ের সন্তান হয়,
সন্তান কাঁদছে উচ্চৈস্বরে, ও সে কোন বিলের ধারে।
ও সেই হাবোল আলীর এ মিনতি রাখবে চরণে
ওহে হর তোমার লীলা কে জানে ॥ —মুর্শিদাবাদ

উদ্ধৃত পাঁচালীটির রচয়িতা শেখ হাবোল আলি, ইহার বিষয়বস্তু শিবের দক্ষযজ্ঞনাশ ও সতীর দেহত্যাগ। এই প্রকার প্রধানত মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে মুসলমান কবি রচিত বহু পৌরাণিক পাঁচালীর সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তী পাঁচালীটির বিষয়-বস্তু শ্মশানে মিলন। এই বিষয়ে বহু পাঁচালী রচিত হইয়াছিল।

একাকিনী কে গো, ধনি, মড়া লয়ে শ্মশানে।
তুমি কার রমণী বল শুনি তোমার কেহ নাই কি ভুবনে
হরিশ্চন্দ্র :—মড়াটী কি তোমার ছেলে, কাঁদছ বসে লয়ে কোলে,
ফিরিয়ে পাবে না মলে ভাঙলে মাথা পাষাণে।
শৈব্যা :— একটী মাত্র ছিল নন্দন, বিধাতা করিল হরণ,
অকালে হইল মরণ দারুণ কালের দংশনে।
হরি :— আমি এই ঘাটের মহাজন কর্ম আমার মড়া দাহন
ঘাটের কড়ি পঞ্চাশ কাহণ আগে আমায় দাও গুণি।
শৈব্যা :— শুন শুন, ও পাটুনি, আমি বড় কাঙালিনী
পেটের ভাতে টানা টানি দেব কড়ি কেমনে।
হরি :— কড়ি যদি নাহি আছে হেথা বসে কাঁদ মিছে
মড়া দাহন আমার কাছে হবে না কড়ি বিনে।
শৈব্যা :— আমি পরের ক্রীতদাসী শ্মশান ঘাটে একা আসি
এল না কোন প্রতিবেশী এই আমার দুখের দিনে।
হরি :— আমি হই চণ্ডালের চাকর তার হুকুমে চরাই শূকর
আদায় করি ঘাটের কর ছাড়বো কড়ি কেমনে।
শৈব্যা :- শুন শুন ও পাটুনী পরিধেয় বস্ত্রখানি চিরে দেব
অর্ধখানি লহ সন্তুষ্ট মনে।
হরি :— যা বলেছে কালু হাড়ি ছাড়ব না তার আধা কড়ি
যদি না জুটে কড়ি, যাহ অন্য শ্মশানে।
শৈব্যা :— ছিলাম আমি রাজরাণী এখন পথে ভিখারিণী
বিনয় করি, ও পাটুনি, দয়া কর প্রাণে।

হরি :— দেখে তোমার পুত্রের আনন, মনে হয় কোন রাজার নন্দন,
(তোমার) স্বামীর নামটী বল এখন, ঘাটের কড়ি দেব ছেড়ে।

শৈব্যা :— হরিশ্চন্দ্র বলে যারে খ্যাত আছে ভুবনে।

হরি :— কথা শুনে হচ্ছে সন্দেহ আমারে বল না মন্দ
আমিই রাজা হরিশ্চন্দ্র দেখ দেখ নয়নে।

কপালে রাজচিহ্ন ছিল তাই দেখে শৈব্যা চিনিল
মূর্ছিতা হয়ে পড়িল প্রাণপতির চরণে।
মড়া ছেলে লয়ে কোলে ভাসে রাজা আঁখিজলে।
শীঘ্র চিতা দাওগো জ্বেলে মরিব পুত্রের সনে।
চিতাতে জ্বালায়ে অগ্নি হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা রাণী
কোলে পুত্র গুণমণি পুড়িতে যায় আগুনে।
আসি ধর্ম হেন কালে হরিশ্চন্দ্রের প্রীতিবলে
বাঁচাইব মড়া ছেলে ভাবনা কর কেনে।
পদ্ম হস্ত বুলাইয়া দিল পুত্রে বাঁচাইয়া
রাজা রাণী লোটাইয়া পড়ে ধর্মের চরণে।
বলে, ধর্ম মহামতি, শুন শুন নরপতি,
তব সম ধর্মে মতি না হেরি ত্রিভুবনে।
বিশ্বামিত্র মুনি এল, তপজপ তার নষ্ট হল,
রাজার রাজ্য ছেড়ে দিল গেল মুনি স্বস্থানে,
হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান মিলন সংক্ষেপে হইল বর্ণন। —বীরভূম

মঙ্গলকাব্যের বিষয়ের মধ্যে প্রধানত চাঁদসদাগরের বিষয়-বস্তু লইয়াও বহু পাঁচালী রচিত হইয়াছিল।

৩

কিসের আশাতে এলি আজই আমার বাসাতে।
দাওনা উত্তর মোরে সত্বর খাঁটী সত্য ভাষাতে॥
নবীনা যুবতী তুমি, স্বচক্ষেতে হেরি আমি,
কোথায় তোমার জন্মভূমি, বল স্ব-প্রকাশেতে॥
ভাব দেখে ভাব যায় না জানা বল্ বলতে নেইকো মানা,
একটী চক্ষু কেন কাণা হল কোন কারণেতে॥

কি নাম ধরো সুন্দরী, কেন এলে চম্পানগরী,
রূপের বালাই লয়ে মরি, দুধ বেরোচ্ছে কশাতে ॥
দু'টী পদ, চারি হস্ত, মন প্রাণ কেন ব্যস্ত,
হয়েছ কি কোন দায়গ্রস্ত মশা বসে দশাতে ॥
মৃদু মন্দ মুখে হাসি, দেখতে বড় ভালবাসি,
হেরি তব মুখশশী, হাসি আসে হাসাতে ॥
যাওহে, ধনি, সরে দূরে বলি সকরুণ স্বরে,
পুজি আমি মহেশ্বরে রয়েছি এই নেশাতে ॥
প্রভু আমার ত্রিপুরারি, আমি হই তাঁর পুজারী,
ব্যাঘাত যদি হয় আমারি ভুগিবে দুর্দশাতে ॥
তোমায় আমি নাহি চিনি, বল তুমি গুড় কি চিনি,
পদে নূপুর কিনি কিনি বাজে যাওয়া আসাতে ॥
বেশ দেখে বেদনায় দহি, টলমল করে মহী,
গাত্রময় খেলিয়ে অহী, ভয় নাই কি কাল পোষাতে ॥
নেপাল বলে, মাগো, তুমি আসিয়াছ মর্ত্ত্য ভুমি,
শ্রীচরণে আমি নমি মন মজায় মা মনসাতে ॥

৪

বল ঠাকুর মশায় ঘটা কর কিসের তরে,
আমি ঘাটে কাপড় কাচি তুমি বসে জলের ধারে।
আমি গাঁয়ের মেয়ে, অনেক যাচ্ছি সয়ে
তুমি ছিপ ফেলিয়ে তাকাও কেন আড়ে আড়ে।

চণ্ডী— বলব কি মনের ভুলে, ফাতনাটা নড়ছে জলে
এই কেবল ঠোকর দিলে, ঢেউ দিও না ফতনাটা নড়ে ॥

রামী— কি কথা বল তুমি, বুঝিতে পারি না আমি
রজকের মেয়ে আমি তাইতো বল অমন করে ॥

চণ্ডী— কে বলে রজকের ঝি, তুমি আমার প্রাণের পাখী
তোমার আশাতে থাকি, ছিপ ফেলাই ছুতা করে ॥

রামী— বল, কিসের আশায় নজর দিয়ে ঐ ফতনায়
বসে ঐ ঘাটের মাথায়, মর কেন রোদে পুড়ে।

চণ্ডী— ধনি হে, রোদে পুড়ি, তাতে পাই শান্তি ভারি
তোমার আশায় সদাই ফিরি, সকল আশা দিয়ে ছেড়ে ॥

বগুড়া জেলার উত্তরে মহাস্থান নামক স্থানে করতোয়া নদীর তীরে কয়েক বৎসর পর পর বিশেষ বিশেষ তিথি নক্ষত্রের মিলনে পৌষ-নারায়ণী স্নান হইয়া থাকে। করতোয়া স্নান উপলক্ষে এই পাঁচালী শুনিতে আছে। ইহাতে উত্তর বাংলার সন্ন্যাসীদিগের উপদ্রবের একটি জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সন্ন্যাসীদিগের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' রচিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

শুন শুন, সভাপতি, করি নিবেদন।
নবীন কবিতা কিছু করহ শ্রবণ ॥
একদিন স্বর্গপুরে যত দেবগণ।
সভা করে বসিয়াছে দেব পঞ্চানন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরন্দর আর যম শনি।
বরুণ পবন গ্রহ দিক্‌পাল মণি ॥
পৃথিবীর বৃত্তান্ত কথা ভাবে মনে মন।
এবার পৃথিবীতে রাজা হবে কোন জন ॥
গোব্রাহ্মণ জীবহিংসা লোকে করে সদা।
শিষ্যের সাক্ষাতে হেন গুরুর অমর্যাদা।
বিশ্বাস ঘাতকী লোক স্থাপ্য গুপ্ত করে।
পরদারী পরহিংসা প্রতি ঘরে ঘরে ॥
মহাদেব কহিছেন চক্রপাণি স্থানে।
পাতকী উদ্ধার হবে নারায়ণী স্নানে ॥
যেমন রাবণ বধের হেতু বান্ধ্যাছিলে সেতু।
পাতকী উদ্ধার হৈতে আছে এই হেতু ॥
বৈশাখ মাসেত কথা উপস্থিত হৈল।
দৈবযোগে হেনকালে পৌষ মাস আইল ॥
পৌষ মাসের সোমবার অমাবস্যার ভোগ।
মূলা নক্ষত্রেত পাইল নারায়ণী যোগ ॥

বাইশ রাজা সাজে তখন স্নান করিবারে।
সাহেব লোকে উমেদারকে ডাক দিয়া বোলে ॥
রাজা যেন মহাস্থানে চলিতে না পারে ॥
মহারাজা রামকৃষ্ণ চলিলেন স্নানে।
আর যত রাজা ছিল ভাবে মনে মনে ॥
বর্ধনকুটীর রাজা আইল মনে হয়া হৃষ্ট
সুমঙ্গল রাজা আইল কুলীনের শ্রেষ্ঠ ॥
যুগল রায়ের পুত্র আইলেন থাকি জাফরসাহী।
গোপাল রায়ের পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের ভাই ॥
দামরুলের সন্তান আইল নামে প্রাণনাথ।
যে রাজা স্থাপিত কৈল দেব রঘুনাথ ॥
কচুয়ার লাড়ি আইল জামালপুরের আচার্য।
গোঁসাই ডোমনগিরি চলিলেন যেন দ্রোণাচার্য ॥
কালুর আচার্য আইল চাকস্তর নেড়ী।
গুপ্তজী চলিল যার কচুর কাড়ায় বাড়ী ॥
ভুতমুঠের মিঞা আইল খয়েরুল্লা নাম।
বদিজ্জামা চৌধুরী চলে সৈয়দ প্রধান ॥
কাগমারি অঞ্চলে যত জমিদার ছিল।
স্থান ত্যাগ করি তারা মহাস্থানে গেল ॥
পাকুড়ি হৈতে আইল ঠাকুর কাশীপতি।
চাঁদ ঠাকুরের পুত্র তিনি ইন্দ্র জিনি গতি ॥
বৈরার ঠাকুর আইল রাণী ভবানীর গুরু।
দানে অকাতর তিনি যেন কল্পতরু ॥
চৌগাঁয়ের রায় আইল সঙ্গে লইয়া হাতি।
দিঘাপতিয়া হৈতে আইল দয়ারাম রায়ের নাতি ॥
শিবগঞ্জ গোবিন্দগঞ্জ সেরপুর বগুড়া।
বেশ্যা কত সাজিলেন নৌকা ঘাট ভরা ॥
ঘরের মধ্যে কুলবধূ বোলেন ননদেরে।
তোমার ভাইকে বোল যাব স্নান করিবারে ॥

গর্ভিনী সাজিল ধাত্রী লয়া সাথে।
দিন ক্ষ্যাণ পুর্ণ হৈল প্রসবিল পথে ॥
দান ধ্যান করি সভে হইলেন খুসী।
সেরপুর হৈতে গেলেন অনুপ মুন্‌সী ॥
দান ধ্যান করি সভে হইলেন ঋষি।
মঙ্গলবারের দিন আইল ছয় শত সন্ন্যাসী ॥
তারা কাশীবাসী, মহাঋষি, উর্দ্ধবাহুর ঘটা।
বম্ বম্ বম্, গাল বাজাইছে, পায় পড়িছে জটা ॥
লেঙ্গটা সন্ন্যাসী তবে যে দিগেতে ধায়।
মুখে বস্ত্র দিয়া কত স্ত্রীলোক পলায় ॥
সন্ন্যাসী আইল বল্যা লোকের পড়্যা গেল শঙ্কা।
যুগল রায়ের পুত্র পলায় বাজাইয়া ডঙ্কা ॥
সন্ন্যাসী আইল বল্যা লোকের পৈল উতরোল।
যতেক বাঙ্গাল পলায় করি গণ্ডগোল ॥
এক বাঙ্গালে বোলে, আলো, শুন মোর বাই।
পুলাপুড়ি লগে লয়া দেশকে চল্যা যাই ॥
হিনান করিব্যাম্ দরগা দেখিব্যাম মনে ছিল হাদ।
পুড়ি মাগিক লগে আন্যা হবে কৈলাম বাদ ॥
হন্যাসী দারুণ বেটারা যদি লাগুল পাইব্যাম্।
বেস্তের বারি দিয়া দৈর‍্যা লয়্যা যাইব্যাম ॥
বেটারা দুষ্ট বর, হিপাহি দড়, থাকে পচ্চিম স্থাশে।
হাজারে হাজারে বেটারা লুট করিতে আইসে ॥
বেটাদের অস্ত্র আছে, রাখে কাছে বন্দুক টাঙ্গি তীর
তারার চিমঠা থাপে ঢালে ঢাকা শির ॥
দেখ শনা গোড়া আইসে, কুটমুটাইতে হিপাই আইসে আড়ে।
কিম্বাই কর‍্যা পড়ে জানি কোন বা মাউগের ঘাড়ে ॥
কেউ দৌড়্যা যায় আছাড় খায় বুকে লাগে খিল।
উর্দ্ধশ্বাসে কেউ দৌড়ে, ভাতারে মারে কিল ॥

মাগি, দৌড়া চল নাইক বল, অখন গেল মান।
ভাল মানুষে আবুরু রাখে পল্যা রাখে প্রাণ ॥
ভবানীগঞ্জের পথে আইলেন সভে।
জলে মলমূত্র তেজে দেশের স্বভাবে ॥
কবিতা রচিল দ্বিজ গৌরীকান্ত নাম।
নিবাস তাহার বটে নারুলি গ্রাম ॥
বগুড়ার পুর্ব ভাগ চেলপাড়া গ্রাম।
দ্বিজ কুলে উৎপত্তি সেই করে গান ॥ —বগুড়া

৬

বলি, ইন্দ্ররাজন্ কি কারণে গুরুপত্নী করিলে হরণ।
প্রকাশ করে সেই সব কথা জানাই বিবরণ ॥
বেশ বলেছ শুনলাম আমি করে যাব ভাব আমদানি,
অন্য ছিল যে অনেক নারী জানি তোমার উঠে নাই হে মন ॥
মামী হরণ করেছি যেমন বলেছে বেশ ইন্দ্ররাজন।
আমি জানাবো হে সেই বিবরণ শুনবে শ্রোতাগণ ॥
কল্পনা :—
আয়ান ঘোষ আমার মামা, জানেন সর্বজনে
রাধারাণী আমার পত্নী বলব না কেনে।
ছোট ছেলে কৃষ্ণধন জানাই সকল
তারপরেতে আয়ানের গায়ে হলুদ হয়
আয়ানের মনোবাঞ্ছা পুর্ণ হল তাই।
তারপর আয়ান ঘোষ পাল্কীতে চড়িল,
কৃষ্ণধন তখন কি না কাঁদিতে লাগিল।
বলছে, মামা, আমি তোমার সাথে যাবো,
নইলে যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জন দেব।
সেই কথা শুনে তখন পাড়াপড়শীগণ,
ছোট ছেলের দোষ নাই নন্দের নন্দন।
তারপরেতে কৃষ্ণধন বর সেজে গেল,
বৃষভানুর বাড়ীতে এসে তারা পৌছিল।

রাধারাণী মালা লয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল,
আয়ানের গলায় তখন পরাইতে আসিল।
কৃষ্ণধন বলছে, মামা, আমায় মালা দাও,
নইলে যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জন করাও।
সেই কথা শুনে তখন পাড়াপড়শীগণ,
ছোট ছেলের দোষ নাই, মালা দাও এখন।
রাধারাণী তখন মালা আমার গলে দিল,
আমার সাথে বিবাহ ঐখানেতে হলো।
তারপর এখনও যে সাত পাক বাকী আছে,
একে একে সে সব কথা জানাই এ সভাতে।
আমার মামী কি কারণে হয়,
ভক্তের কারণে নন্দের 'বাধা' বইতে হয়।
সাঙ্গ হলো আমার পালা, অধিক আর যাবে না বলা,
যত আছেন হরি বলা বলুন সর্বজন॥
এইখানে আমি রাখি, ইন্দ্ররাজ কি বলে দেখি,
দিও নাহে আমায় ফাঁকি শুনবে সর্বজন॥ —নদীয়া

নিম্নোদ্ধৃত পাচালীটিতে বিল্বমঙ্গল ও চিন্তার বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যাইবে। নানা সূত্র হইতে এই কাহিনীটি বাংলার সমাজে সেদিন বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

চিন্তা— রাত দুপুরে ধাক্কা দাও দ্বারে কে বল আমারে,
কিবা আশা পেয়ে মনে, এলে হে আমার পুরে॥
কোথায় থাক কি নাম ধর সত্য ভাষায় প্রকাশ কর,
আমার বুক করিছে দুরুদুরু তব তীব্র কণ্ঠস্বরে॥

বিল্বমঙ্গল—আমি বিল্বমঙ্গল নামটি ধরি, এলাম, চিন্তা, তোমার বাড়ী,
জানাই আমি প্রকাশ করি দাঁড়াইয়া তব দ্বারে॥

।— আলাপ এখন বন্ধ আছে, রাত্রি দুটো বেজে গেছে,
পুলিশে হাঁক মেরেছে, তাইতে চাপি দিলাম দ্বারে॥

বিল্বমঙ্গল—কি বলহে, চিন্তামণি, জানি তোমায় দিনরজনী,
তুমি আমার মাথার মণি, চেয়ে আছি তোমার তরে ॥
তব অনাদরে যাব মরে এখন বুকেতে ছুরি মেরে,
দেখ একবার নজর করে আসিয়া তুমি বাহিরে ॥

চিন্তা— শুনিয়া তোমার বাণী, কাঁদিছে মোর পরাণী,
যেন স্বর্গের সুধা আনি ভরিয়াছ বদন বিবরে ॥
আজি তব কথায় পড়িলাম বাঁধা, মানবো না আর কোন বাধা,
মনে হয় সে বাঁধন-ছাঁদা ছিল মোদের আশা করে ॥

বিল্বমঙ্গল—তুমি আমার নয়নতারা, তুমি আমার সাগর হারা,
তোমার তরে বাঁচল মড়া আছিলাম শুধু সংসারে ॥

চিন্তা— বল তুমি সত্য করে, কোথা ছিলে নদীর পারে,
পার হয়ে যেমন করে এলে হে আজ আমার দ্বারে ॥

বিল্বমঙ্গল—নদীর ঘাটে ভেলা ছিল, তাতে চ'ড়ে আসা গেল,
আগা বৃক্ষে ফলবে ফল, জাগিয়ে আশা তাই অন্তরে ॥

চিন্তা— তোমার গায়ে দেখছি পচা গন্ধ, তাইতে আমার প্রাণে সন্দ,
তোমার নেশায় করেছে অন্ধ, গায়ে কত পোকা নড়ে ॥
মানুষ যে চরাচরে পরকে আপন করতে পারে,
সেই মহামানব বিশ্ব পরে, সুখেতে দিন কাটায় বিভোরে ॥
অধম দুলাল চাঁদ কাতরে কহে, ভালবাসায় বাসি হয়ে,
ভালবাসায় বাসি লয়ে, যেতে পারি পরপারে ॥
এই পর্যন্ত সাঙ্গ করি, করব না আর বাড়াবাড়ি,
চাঁদ বদনে বলুন হরি বসিয়া এই আসরে ॥ —নদী:

মহরম

মুসলমান সমাজে প্রচলিত মহরমের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াও '
রচিত হইয়াছে। তবে ইহার একটি প্রধান অংশই জারিগানের অন্তর্গ
বলিয়া তাহা জারি গানে (পূর্বে দেখ) উল্লেখ করা হইয়াছে। জারি
প্রায় পাঁচালীর আকারেই গীত হয়, তবে পাঁচালীর সঙ্গে কোন সমবেত :
থাকে না, জারি সমবেত নৃত্যসম্বলিত গীত।

কালকে বেলা দুপুরে, এলি আজকে বেলা আছরে
কার্বা পড়েছেন হোসেন আলি,
বাবা, পিঠে করে নিয়ে গেলি খালি পিঠে ফিরে এলি
খালি পিঠ আজ আমারে দেখালি,
কেন খালি পিঠে এলিরে ছুটে কহ রে, দুলদুলি ॥
বাবা, দুলদুলি, তুই কথা নে, হোসেনের ছের এনে দে
কাটা ছেরে করব মিলামিলি ॥
দুলদুলি চিঁহি করে, নয়নে বারি ঝরে
সোনার মুখে হিরেলাল করে ঝিলি মিলি ॥
শুন রে, এজিদ বেহায়া, তোর প্রাণে কি নাই দয়া,
আজ নবিজির ভাঙ্গলি ফুলের কলি ॥

পুত্রের মৃত্যুশোকে মাতা ফতিমার শোক প্রকাশ গানখানির মূল সুর। কারাবালা মাঠে হোসেনের মৃত্যুর পর তাহার প্রিয় ঘোড়া দুলদুলি শূন্য পৃষ্ঠে গৃহে ফিরিয়া আসিলে ফতিমার শোক উথলিয়া উঠিল। তখন ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ফতিমা তাঁহার অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করিতেছেন।

একবার ডাকরে, হোসেন, মা বলে ॥
(ও বাপ) হোসেন রে, দেখে বুকের পাষাণ যায় গলে ॥
হোসেন শয়ন করত পালঙ্ক উপরে
সে দুলালি দুলায় হাওয়া পবন ভরে
কখন কখন দুলাতেন জিবরিল
সে সোনার মাণিক আজ ধূলাতে পড়ে ॥
চন্দ্র সূর্য আদি আসমানেরই তারা
হোসেন শোকে সব কাঁদছেন ফেরেস্তারা ॥
(ও) বাপ, নয়নতারা, কে মেরেছে ছোরা।
রক্তের ফোয়ারা ধারা যায় বয়ে ॥
নানাজি ছিলেন নবি দিনেরই দেওয়ান,
কোথায় আছেন, ও বাপ, আলি পালোয়ান,
যাহার দাপটে একদিন কাঁপিত জাঁহান।

তার ছেলের মরণ আজ হাতে কাফেরের ॥
বে-কায়দায় পড়েছিলাম খঞ্জর তলে
কাফেরে ঘিরিয়া আনে বন-জঙ্গলে।
সে সময়ে ডাকি, ডাকি সবাকারে
সে সময়ে দেখি সকল অন্ধকার ॥
ও তোর দুঃখ দেখে বুকের পাষাণ গলে ॥

আরব দেশে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী স্থানে কারবালা প্রান্তর। স্বামী বর্তমান থাকা কালীন সধবা জয়নব বিবিকে বলপূর্বক দামাস্কাসের রাজা এজিদ বিবাহ করিতে চাহেন। জয়নবকে বিবাহ করার ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এক পক্ষের নায়ক ছিলেন এজিদ, অপর পক্ষের নায়ক ছিলেন হজরত আলির পুত্র হোসেন। এই যুদ্ধে নিহত হোসেনের জননী বিবি ফতিমার শোক ও বেদনাকে পাঁচালী গানে রূপদান করা হইয়াছে।

হোসেন, আয় ভাই, দেখি চাঁদ বদন ॥
ও ভাই হোসেন রে, বিদায় হলাম এবার জনমের মতন ॥
একদিন বলেছিলেন নানা পয়গম্বর,
দু'ভাই এমামনকে লয়ে কোলেরি উপর।
(ওগো) বুঝিলাম অন্তরে আখের কারাকারে,
জহরে কহরে হবে তোমাদের মরণ ॥
ঠিক হল এখন নানাজির বচন
মনে বুঝে, ভাই, দেখলাম তাই এখন
(ওগো) বিধাতার লিখন কে করিবে খণ্ডন
মালম কলম কখন হবেনা হিলন ॥
ময়মুন নামে এক কুটনি বুড়ি ছিল
কাঁদতে কাঁদতে বিবি বানুর ডেরে গেল।
(ওগো) কান্দিয়া কহিল কপালে কি এই ছিল,
বিবাহ করবেন শাহা এমামন ॥
কুটনি বুড়ি ময়মনার কথায়
ঔষধ ভ্রমে বিধি গরল ভিজায়

শিকার হ'তে এলে, পিপাসা ও লয়ে
সরবত দেয় বিবি হাতে এমামন ॥
(ওগো) ভাল করতে বিবির মন্দ হয়ে গেল,
সরল মনে বিবি গরল দিয়েছিল।
(ওগো) মাফ কর আমায় ভাল হবে তোমার
(তোমার) বিবির দোষ নাই আমার কপালের লিখন ॥
খাওয়া মাত্র জহর হল কুশে আটকায়ে
সোনার বর্ণ তনু গেল কালি হয়ে।
বিবি তাই দেখিয়ে কপালে ঘা দিয়ে
কি হল বলে হলেন অচেতন ॥
জারে জার বিবি কাঁদিছেন তখন
দেখে তোমার ভাইএর দহিছে জীবন।
ধরে আপন হাতে পতি করলাম খুন
আপনার কপালে লাগালাম আগুন ॥
নিষেধ করি তোমায়, শুন, ভাই হোসেনা,
এজিদের বিরুদ্ধে তুমি যেও না যেও না।
(ও যে) বাদশাহী খাসখানা ছাড়িবে আপনা
ভাবিয়ে রববানা থাক, ভাই, এখন ;
ডেকে বলে, ভাই, ও ভাই এমামন
কাসেমকে তোমায় করিলাম সমর্পণ।
অনেক যত্নের ধন হয় না অযতন,
তুমি ভিন্ন তাহার কে জানে বেদন ॥
বাপজির গলা ধরে কাঁদছেন কাসেমন
বুকে জেলে দিলে শোকেরই আগুন।
কলিজাতে হয় তীর বরিষণ
এতিম করে, বাপজি, যাও কোথা এখন ॥
শিকার হতে ফিরে এলাম ভাই দুজনা,
জনমের মত আরত যাব না।
এভবে দু'য়ের আরও হবে না মিলন ॥

ওস্তাদ আব্দুল জব্বার কহিছেন কাতরে,
কি করিবেন খোদা ভাবি তাই অন্তরে
পড়ে মায়া ঘোরে এভব সংসারে
ভাব গণতে আমার গেলরে জীবন ॥

হজরত মোহম্মদ তাঁহার দুই দৌহিত্র এমাম হাসান ও এমাম হোসেনের মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, একজন জহরে (বিষপানে) অপর জন কহরে কারবালা মধ্যে মৃত্যু বরণ করিবে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। এজিদের গুপ্তচর বিবি ময়মুনের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া স্ত্রী কদবান সরবত ভ্রমে স্বামীকে স্বহস্তে বিষ পান করান। বিষপানে মৃত্যুর পুর্বের করুণ দৃশ্যকে অবলম্বন করিয়া এই পাঁচালী গানটি রচিত।

২

কোলে আয় রে প্রাণের যাদুধন।
তোর দুঃখ দেখে ফাটে রে জীবন ।।

শেরের ঘরে জন্ম আমার সেকোমে কে তোরে মারিল কারবালা ময়দানে।
দেখে তোর ঐ কাটামুণ্ডখানি বক্ষস্থলে কেবা জ্বালালে আগুন ॥
মদিনার কোলে বাদশা হয়েছিলে, কি জন্যেতে, বাবা, কারবালাতে গেলে।
আসিয়া ঠেকিলে কুমারের দলে, এই কি ছিল তোর কপালের লিখন ।।
দশমাস দশদিন তোরে উদরে ধরিয়ে কত যন্ত্রণা লয়েছি সহিয়ে,
খণ্ড খণ্ড দেহ নয়নে হেরিয়ে অভাগিনী মা তোর হল অচেতন ।।
ফোরাতের কুলে কাফেরের দলে আসিয়া ঘিরিলে পানি নাহি দিলে।
পানি নাহি দিলে সকলে মারিলে কি কুক্ষণে এলো সীমার মালায়ন ॥
প্রাণের হোসেন আলী নয়নের পুতুলি, কি দোষ পেয়ে তোর গলে দিলে ছুরি।
আহা, মরি মরি, দিনের কাণ্ডারী ডাকে তোর জননী, মেলরে নয়ন ॥
দেখি আলি সাহা মুখে বলে, আহা, রণমাঝে যাব ভাগ্যে আছে যাহা।
কাফেরে কাটিয়া আসিব ফিরিয়া, ময়দানে চালাব লহুর তুফান ।।
শুনে আলির বাণী মোহাম্মদ তখনি বলে, রণে যেতে পাবে নাকো তুমি।
রদ্ হয়ে যাবে সকল কাহিনী, কে খণ্ডিতে পারে বিধির লিখন ॥
তখন শুনে সে খবর যত পয়গম্বর আসিয়া ঘিরিল ময়দান উপর।
কান্দে জারে জার বানাইল কবর জানাজা পড়ে করিল দাফন। —মুর্শিদাবাদ

আধ্যাত্মিক

কতকগুলি পাঁচালীতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা বর্ণিত হইয়াছে। যদিও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কাহিনীমূলক রচনাই পাঁচালী, তত্ত্ববিষয়ক দীর্ঘ রচনায় কোন কাহিনী না থাকিলেও তাহা সাধারণ ভাবে পাঁচালী বলিয়াই পরিচিত। তবে তাহা রচনার দিক দিয়া পাঁচালী, ভাবের দিক দিয়া নহে।

১

ব্রহ্মাণ্ড হয়ে খণ্ড হয়েছে এই দেহ ভাণ্ড,
মেদ অস্থি মেরুদণ্ড খোলা।
তার মধ্যে ত্রিবেষ্টিত, তিনটি নাড়ী সুশোভিত,
সুষুম্না, ইরা, আর পিঙ্গলা॥
সৃষ্টির বিধান অনুসারে ছ'টি চক্র থরে থরে
পুষ্পাকারে আছে তাহা গাঁথা।
কোন চক্রে কি রং ধরে, কয় দলে তা শোভা করে.
সবিস্তারে বলে যাই সে কথা॥
যাকে বলে মলদ্বার তারি উর্ধ্বে মূলাধার,
রক্তবর্ণে চারিদল নির্মাণ।
তার উর্ধ্বে লিঙ্গ মূলে, সুশোভিত ষড়দলে,
সিন্দূর বর্ণ চক্র অধিষ্ঠান॥
আছে চক্র নাভিমূলে, যুক্ত তাহা সপ্তম দলে,
নীলবর্ণ নামটি মণিপুর।
হৃদয় চক্র অনাহত দ্বাদশ দলে সুশোভিত,
কুন্দবর্ণ বর্ণনা মাধুর॥
তার উর্ধ্বে কণ্ঠস্থলে শুভ্রবর্ণ ষোড়শ দলে
বিশুদ্ধাখ্য নামে চক্র খ্যাত।
আজ্ঞা চক্র যারে কয় ভ্রু-যুগলের মধ্যে রয়
স্বর্ণ বর্ণ দ্বিদলে শোভিত॥
ছ'টি চক্রের এই তো ইতি কিবা বর্ণ কি আকৃতি
বলা হল সবই সভাস্থলে।

আছে পদ্ম সহস্র মার দেহ ব্রহ্মে স্থিতি তার
সুশোভিত সহস্রটি দলে ॥
বলব এখন সবিস্তারে কোন চক্রে কে বসত করে
কি নাম ধরে কি আকারে রয়।
দেহের তত্ত্ব জানেন যিনি, ঠিক কিনা তা বুঝবেন তিনি,
অন্যের পক্ষে শ্রবণ মাত্র, ভাই ॥
মূল চক্র মূলাধারে, ঐরাবতের পৃষ্ঠোপরে,
সৃষ্টিকর্তা বিরাজ করে রক্তোৎপলবর্ণ ধরে,
চারিটি বেদ চারি করে, বামে শক্তি নামেতে ডাকিনী ॥
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, হাত আছে চারিখানা।
বর্ণ যেন কাঁচা সোনা সুলক্ষণা সহাস্য বদনী ॥
সঙ্গে লিঙ্গ শঙ্কর, অধোমুখে আছেন হর.
শিরে শোভে কুল-কুণ্ডলিনী।
ভুজঙ্গিনী মূর্তি ধরে সার্ধ ত্রিবেষ্টিতাকারে
বদন দিয়ে ব্রহ্মদ্বারে সুধা পানে সদা আহ্লাদিনী ॥
যথা চক্র অধিষ্ঠান, বরুণ দেব অধিষ্ঠান
শুভ্র কান্তি মকর বাহন।
নিরাকার দৃশ্য তার, নীল বর্ণ চমৎকার,
রাকিণী শক্তির উপর চতুর্ভুজ পীতাম্বর,
নিরন্তর ভাসেন নারায়ণ ॥
বলে যাই তারপর, মণিপুর নামটি যার
তিন কোণে তিনটি দ্বার, মধ্যে মুক্তি ভয়ঙ্কর,
রুদ্রদেব আছেন ত্রিশূলপাণি ॥
রাকিণী নামেতে ধরা বামে শক্তি পীতাম্বরা,
চতুর্ভুজা ভয়ঙ্করা, আছেন খাড়া বর্ণ শ্যামাঙ্গিনী ॥
তারপরে অনাহত অর্ধ চন্দ্র সুশোভিত,
কর্ণিক ভিতরে স্থিত বাণ লিঙ্গ আছেন মহেশ্বর,
বামে শক্তি কাকিনী রূপে নব সৌদামিনী
তিন চক্ষু বাক্য মধুর স্বর ॥

বিশুদ্ধ চক্র যেখানে, পঞ্চানন পাঁচ বদনে
দশ হস্তে করেন সুধা পান,
হাকিনী শক্তি তার বামে, পিপসিতা সুধা পানে,
পঞ্চস্বর সদাই হানে, মত্ত করেন পঞ্চাননে,
পরস্পরে দুটি জনে, নয়ন-বাণে পুরয়ে সন্ধান ॥
ভ্রুমধ্যে আজ্ঞাচক্র, আছেন শিব ইতরাক্ষ
নাই দুঃখ সদানন্দ তথা।
বামেতে শক্তি হাকিনী হাত আছে তার চারিখানি,
অগ্নিবর্ণা দুটি তাহার মাথা ॥
ঐ চক্রের দু'টি দলে, দুই দলে দুই বর্ণ জ্বলে,
মধ্যস্থলে মনের বসতি।
ষঠো চক্রের বিবরণ, শাস্ত্রে যাহা নিরূপণ,
করিলাম এখন বর্ণণ সভাতে সম্প্রতি ॥
বলি এখন তারপর, আছে পদ্ম সহস্রার,
স্থিতি শঙ্খিনীর উপর, সহস্রদল শোভাকর,
প্রতি দলে নিরন্তর, পঞ্চাশত মাত্রিকা বর্ণ জ্বলে।
অমাশূন্য পূর্ণ শশী, বিরাজ তথায় দিবানিশি,
শূন্যাকারে আছেন বসি গুপ্ত আত্মা পদ্ম মধ্যস্থলে ॥
সেইত মধুর বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণের সর্বক্ষণ,
যুগল মিলন দরশন তথা।
কল্পবৃক্ষের প্রতি ডালে সুশোভিত বনফুলে
আছে বৃক্ষ উর্দ্ধ মূলে অধঃ তার ডাল-পল্লব-পাতা ॥
সেই ত কৈলাস শিবলোক, সেই গোলোক ব্রহ্মলোক,
সবই সত্য সেই ত নিত্যধাম।
যে ভাবে যে জনা ভাবে, সে ভাবে যে জনা পাবে,
সাধলে হবে পূর্ণ মনস্কাম ॥
আনন্দময় সে শহরে যেতে বাঞ্ছা যার অন্তরে,
গুরুবাক্য বিশ্বাস করে, দাঁড়িয়ে প্রথম মূলাধারে
কুল-কুণ্ডলিনী মারে, জাগিয়ে তার শক্তির জোরে,

সুষুম্নার পথটি ধরে, ধীরে ধীরে করিবে গমন।
সাধন সিদ্ধ ক্রমে ক্রমে, ছটি চক্র অতিক্রমে,
গিয়ে করবেন নিত্যধামে যুগল দরশন॥ -মুর্শিদাবাদ

লৌকিক

সমাজের নানা সমসাময়িক এবং লৌকিক বিষয় লইয়া পাঁচালী রচনার রীতি চিরকালই প্রচলিত আছে, তবে ইহারা স্বাভাবিক কারণেই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। সাময়িক মূল্য শেষ হইয়া গেলেই ইহারা সমাজে বিস্মৃত হইয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত পাঁচালীতে দেশে ক্যানেল কাটা হইবার ফলে চাষীদিগের যে দুঃখ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

দেশে সোনার ফসল ফলালে রে ঐ ক্যানেল এসে।
তোরা থাক্‌রে বসে দেশের চাষী সেই আশার আশে॥
ক্যানেল এল না কাল এল সোনার দেশটি ধ্বংস করলো।
মোদের বুকে রক্ত চুষে খেল এমনি রাক্ষুসে॥
কেড়ে নিল জমি জমা দেয় না টাকা ষোল আনা।
বল্‌লে বেশী জরিমানা যেতে হয় কোর্টে॥
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে আন্‌ল ক্যানেল এ বাংলাতে।
পেটপুরে ভাত পাই না খেতে এ জমি চষে॥
সময়ে জল দেবার তরে, দিলে যে বাঁধ দামোদরে,
জল উঠে বাঁধের উপরে যায়রে বাঁধ ফেঁসে॥
(ফলে) সোনার বাংলা গেল ধুয়ে কি ফল পেলাম ক্যানেল পেয়ে
ভুলেও দেখলে না চেয়ে আমাদের দেশে॥
প্রাণ গেল কত শত ভেবে আমি বলব কত।
ঝরে অশ্রু অবিরত শোকের উচ্ছ্বাসে॥
মালিহাটী আর ঐ কান্দারা মাধাইপুর ময়নাপাড়া।
সয়মন্তপুর হয় আধমরা ডুবে যায় শেষে॥

ঘরের মানুষ রইল ঘরে পারলো না আসতে বাহিরে,
জল পেয়ে সেই মাটির ঘরে যায় দেওয়াল ফেঁসে ॥
কেঁচুনে কোরগাঁ ঘোষপাড়া ছিল সালিন্দের বিলে যাহারা,
টিয়া বরুট বস্তিপাড়া গেলরে ভেসে ॥
জলে ভাসে মাতা বক্ষে শিশু, গরুগাড়ী অনেক কিছু,
শবের বোঝা পিছু পিছু পিছু যায়রে, হায়, ভেসে।
আমাদের এই ঘোর দুর্দিনে পাঠায় খাদ্য এরোপ্লেনে
বলে করে নাও ভাগ জনে জনে আছি যে পাশে ॥
পাশ কাটিয়ে গেল চলে চাইল না আর নয়ন মেলে।
ভাসালে, হায়, নয়ন জলে মানুষ নাই দেশে ॥
(ও ভাই) জনে জনে হও হুঁসিয়ার শুনি বন্যা আবার।
৫৭ সাল করবে কাবার রইবে না আর কেউ বেঁচে ॥
স্মরণ করি সরস্বতী, সালারের বলে গো শক্তি।
কি হবে অধমের গতি রেখো, মা, এ দাসে ॥ —বর্ধমান

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে রূপকচ্ছলে কলিকাতা সহরের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

২

মানব-দেহ কলিকাতা, ভাই, ক্রেতা চমৎকার।
তুলনা নাইক তার ॥
মনে বুঝে দেখ, ভাই, রতি তফাৎ নাই
আছে দুই গ্যাসের আলো দেখতে পাই।
ক'রে সোনার সহর দীপ্তকার ॥
লালবাজারে জোর দেখে চোখে লাগে ঘোর,
চিনেবাজার চিনলে পাবে ধর্মতলার মোড় ॥
আছে ভারী মজার রাধাবাজার
শেষে স্মরণ হয় সবার ॥
থানা বাজার চাইনী আছে দোকানদার ধনী।
বহু রত্ন থরে থরে হীরে লাল চুনি ॥
যায় জীবে ঠকে দেখলে চোখে
সাধুতে করে এ ব্যাপার ॥

আছে বাজার টেরেটি ও সে বিষম নটখটি
যাস্‌না মনে করি বারণ সব হবে মাটি,
গেলে বৌ-বাজারে পড়িব ফেরে,
প্রাণ বাঁচানো হবে ভার ॥
সেই হাড়কাটার গলি আছে বর্তমান কলি,
হাড় কাটে ঘাড় মুচড়ে ধরে দেয় নরবলি,
আছে পটলডাঙ্গা সানকি ভাঙ্গা,
চোরবাগানে খবরদার ॥
মাথাঘসার গলিতে যায় সবাই চলিতে
শঙ্কা লাগে সে সব কথা মুখে বলিতে,
বাজার তালতলা থাকে না স্মরণ,
মরণ কলিঙ্গের মা-কার ॥
খাসা লালদীঘির পানি বড় মিষ্ট তা শুনি।
কেউ বলে ভাই নোন্‌তা লাগে ধর্মে হয় হানি,
যে তায় বুঝেছে সেই মজেছে,
মিটেছে মনের বিকার ॥
চাপা রয় চাঁপাতলার সেই চতুর রং খেলা
নিত্য গুরু সদয় হবে সাঁকার ঠোলা ;
আছে ইটালি পদ্মপুকুরে
তিনঘাটে তিন অবতার ॥
যদি বাগবাজারে যাও, ভাই ভারী কাজ বাগাও
হরিনামের মণ্ডা কিনে ঠাণ্ডা হয়ে খাও।
গেলে মুচিখোলা, কলুটোলা, নিমতলা হবে সার ॥
মেছোবাজার ঠন্‌ঠনে কথা শক্ত টনটনে,
সামলে সুমলে সিমলে যেও নইলে ঠনঠনে ;
আছে মাণিকতলা, সোনাগাছি,
যোড়াসাঁকোর খুব বাহার ॥
সেই আহিড়ীটোলাতে, ভাই, বাঁউড়ি চালাতে,
পার যদি লভ্য হবে নিত্য খেলাতে,

তুই নয়ন মুদে যাবি সিধে,
সামনে পাবি শ্যামবাজার ॥
থেকে যেও শোভাবাজারে মজা পাবি আখেরে,
দরমাহাটা পাথুরেঘাটা রোজা বেশ করে।
হয় টাঁক-শালেতে টাকার গঠন,
সেইখানে মন চলে আমার ॥
বড়বাজার হাটখোলা হয় কতরূপ খোলা,
আপন মুখে গোপন কথা যায় নাকো বলা,
আছে হাব্ড়ার ধারে কলের গাড়ী
যাওয়া আসা বারংবার ॥
সেই নারিকেল ডাঙ্গায় কত রত্নধন মাঙ্গায়,
কার সপ্ত ডোঙ্গায় বুদ্ধি লয়ে পোরে এক চোঙ্গায়।
সে হারিয়ে আসল পুঁজিপাটা
বেলেঘাটা পায়না পার ॥
খুঁজে দেখলাম মৃজাপুর; পাবে ধনরত্ন প্রচুর,
বাদুর বাগান কুমারটুলি থাকল বহুদূর,
সেই কালীঘাটে সিদ্ধপাটে
স্মরণ করে নমস্কার ॥
আছে গঙ্গাধারে গড় কামান পাতা থরে থর,
তার ভিতরে আছে কত রঙীন রাঙ্গনী ঘর।
তার দ্বারে দ্বারে অস্ত্রধরে
খাড়া রয় পাহারাদার ॥
আছে বাজার বহুতর, বাজার পেস্তা ভরপুর,
ললাটেতে লাটের বাড়ী জিহ্বায় জজের ঘর,
আছে কণ্ঠাতে কালেক্টর বসে কাছারী করে গুলজরে ॥
আলিপুরের জেলখানা মনে বুঝে দেখ না,
দেহের মধ্যে চিন্তা গারদ নাই তার তুলনা,
পাবে মেটে কলেজ হিন্দু কলেজ
এই দেহের হলে বিচার ॥

দেহতত্ত্ব পরিচয় দেহ উল্টাডাঙ্গা হয়,
আজব কাণ্ড মনুমেণ্টে মূল পদার্থ রয়।
আছে চুলে চুলে চুল গণি,
গুণে কে করে সুমারে ।।
এই মানব দেহখান আছে কত রূপ বাগান,
কলিকাতা তার কোথায় লাগে ইংরাজের নির্মাণ,
আছে চৌদ্দ পোয়ার চৌদ্দ ভুবন,
খোদ খোদা করে তৈয়ার ।।
বাজার বাহান্ন ধারা, গলি তিপান্ন মারা,
দেহের মাঝে দেখ খুঁজে আছে ঠিক করা,
আছে যাদুঘর এই দেহের ভিতর,
দেখলে মন ফিরবে না আর ।।
এই জান বাজার খাঁটি কথা কই মোটামুটি,
আছে সইখোলা নাপতে বাজার,
মেটেবুরুজের মাঝার,
গোঁসাই কুবীর চাঁদে কয় কথা মিথ্যা কিন্তু নয়,
ভাণ্ডেতে ব্রহ্মাণ্ড আছে জান্তে পারলে হয়,
যাদুবিন্দু বোকা লাগল ধোঁকা
উলু বনে দেয় সাঁতার ।। -মুর্শিদাবাদ

পশ্চিম বাংলার একটি বন্যার বর্ণনা নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে শুনিতে পাওয়া যাইবে—

৩

এবার বাংলা দেশে ঘটে গেল দায়।
চাষী লোকের ভাঙ্গল বাসা আশায় পল ছায় ।।
সৃষ্টি ছাড়া শনির দৃষ্টি বৃষ্টিছাড়া নাই।
ময়ূরাক্ষীর বন্যা এসে জগত ও ভাসায় ।।
ঘরবাড়ী সব পড়ে গেল কোথায় কিছু নাই।
চালের উপর ছেলে হলে আমরা শুনতে পাই ।।

চোখের দেখা যায় না ঢাকা শুন, ও রে ভাই,
বৰ্দ্ধমানের সে রাজধানী হলো জলময়,
কাটোয়ার কোটে জল ঢু'কে, ভাই, ঘর গিয়েছে ফেটে,
কত পুরুষ-নারী ভাসছে স্রোতের চোটে।
হরিনাম দিয়ে দেখ সেই যে নদীয়ায়
প্রেম-বন্যাতে ডুবিয়ে দিল গৌরনিতাই।
বন্যাতে, ভাই, চালা চুলো সব গিয়াছে ভেসে,
আবার কংগ্রেসকর্মী বাঁচাইল নৌকা নিয়ে এসে।
কলিকাতার সে রাজধানী সেও তো নাইকো বাকী,
মোটর বাস সব অচল হলো, বলব আমরা কাকে।
হায়, হায় মরি, মরি, জলময় হয়েছে ॥
কংগ্রেসের লোক চাল চিঁড়ে ভাই লোককে এনে দেয়।
ও রে, টাকাকড়ি কম্বল কাপড় লোককে বিলায় ॥
অনাহারে মানুষ মরে, ছাগল ভেড়া গাই,
কতেক মরে কতেক ঠিকানা তার নাই ॥
সারা বৎসর জমি চাষ করে, ভাই, খাই ॥
এবার বুট-মসুরী গম-খেসারী তাতেও দানা নাই ॥
কালে কালে দেখব কত গত হয়ে যায়।
সর্বনেশে জরীপ এসে সকলকে জ্বালায়।
পরচা হাতে সকলেতে অফিসেতে যায়।
ওরে, আমিন বাবু করলে কাবু কার জমি কার হয় ॥
নরনারী লাগা লাগি ভোট দিতে যায়,
সবাই মিলে বল তোমরা কংগ্রেসের জয় ॥
বাইতিগাছায় থাকি মোরা খবর রাখা দায়।
একটি মজার কথা শুনলাম আমরা বলতে করি ভয় ॥
নয়না গাঁটি হলো মাটি আর তো কিছু নাই।
জমি জায়গা বন্দক দিয়ে লোন নিতে সব যায় ॥
অল্প সুদের টাকা বলে সকলেতে যায়।
টিপ দিয়ে এক সঙ্গে পাঁচ জনাতে পায় ॥

বাড়ীর গিন্নি বেজার হলো ভাত রাঁধেনা ভাই।
আমার 'মুড়কীমালা' বন্দক দিলি তোর ঘরে কাজ নাই ॥
গাঁয়ে মলো পাখ পোকালি মাঠেতে ধান নাই।
খশম খাকি মেয়েদের সব ঘটে গেল দায় ॥
সকল জিনিষ চড়া দামে বাজারে বিকাই।
দেখে শুনে বিধবাদের সব বায় চেগেছে, ভাই ॥
আবার আমরা করব বিয়ে কারে করি ভয়।
ও রে রাত দুপুরে বিছানাতে ছাড়পোকাতে খায় ॥
আর একটি মজার কথা আমরা বলে যাই।
এখন ইন্‌জেক্সনে ছেলে হচ্ছে স্বামীর দরকার নাই ॥
জাতির বিচার আচার ব্যবহার চল্‌বে না রে, ভাই।
হাড়ি মুচি কায়েত ধোপা এক হতে সব চাই ॥
বিয়ের প্রথা থাকবে না রে যা আমাদের হয়।
এখন কাগজে নাম সই করলে বিয়ে হয়ে যায় ॥
ধেড়ো মেয়ে দপ্তর হাতে ইস্কুলেতে যায়।
হাওয়া খেতে বেড়ায় পথে চোখে চশমা দেয় ॥ —মুর্শিদাব

৪

পুরুষ— হায় গো, বিধুমুখী, চোখে কেন পড়ে জল,
আমি পায়ে ধরি, ও সুন্দরী, মনের কথা খুলে বল।
তোর ঐ চাঁদ মুখ দেখে, আছি মনের সুখে—
আমি কতটকু ভালবাসি কি বলবো তোকে ;
তোর হৃদয়ে হৃদয় রেখে আমার
তাপিত প্রাণ হয় শীতল ॥

নারী— ভাল বাসহে যেমন, ভালবাসি হে তেমন
তোমার ঐ ভালবাসা
সয়ে না গোমন।
চুলকিয়ে তুলনা বরণ—
এবার টিপতে এসো টেপা কল ॥

পুরুষ— ধনী, তুই বজার গোড়া,
তুই শিল আমি নোড়া—
আর দুজনাতে বাঁটনা বেঁটে গড়ি ঝাল বড়া ॥
তোর রসের কড়া রসে ভরা
রস পড়ে অনর্গল ॥

নারী— পুরুষের মুখে খুব চাটি কাজে আমড়ার আঁটি
বলে, এক চাপরে ফাটাই গো শুন গো মাটি।
এইবার মরবে তোমার কুটকুটি তুমি ক্ষেতে এস কেচকা ফল ॥

পুরুষ— এই কলির ও নারী সদাই মন ভারি,
মুখ বেঁকিয়ে বসে থাকি যায় বোলে হারি।
আবার খেতে দেয় না ভাত মুড়ি, উপায় কি, ভাই করি ॥

নারী— ওকি ভাবছো বসে মন পাবি বা কিসে,
বলেছিলে সোনার চুড়ি দেব পৌস মাসে।
আবার দুমাস গেল চৈত মাস এলো, তোমার মুখে ভাল আছে ছল।

পুরুষ— মন করো না ভারি হাতে সোনার চুড়ি
আর গলাতে হার, কানে দিব পাশমাকুরী।
আনার কলি শাড়ী দেব, ও তুই বাহার করে চলে চল,
হায় গো, বিধুমুখী, চোখে কেন পড়ে জল ॥

নারী— পুরুষ নারী হলো মিলন ভারী
যত্ন করে দেব এবার ঘরে ভাত-তরকারী,
আবার হাসিমুখ আনন্দ ভারি মন হলো উজ্জল ॥
অধম কালিদাসে কয়, শুনুন মহাশয়,
নারীর পদতলে পরে আছেন ভোলা মৃত্যুঞ্জয়।
আমি আশা করি, আশাধারী যেন শ্রীপদে পাই স্থল। —ঐ

পুরুষ ও নারীর কল্পিত কথোপকথনের ভিতর দিয়া কৌতুকরস সৃষ্টি পাঁচালীর একটি প্রধান বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর গানকে সাধারণত লকাপ গানও (পূর্বে দেখ) বলে। তবে আলকাপ গান কথাটি কেবল মুর্শিদাবাদ এবং তাহার সংলগ্ন অঞ্চলেই প্রচলিত।

পুরুষ— বাবারে, একি হ'লো বিষম দায়।
আমি কি খাব, কি নেব, কি করি কোথা বা যাই ॥
ভবঘোরে প'ড়ে ঘুরিছে জীবন, স্থির নহে মন, সদা সর্বখন,
কন্যা পুত্র ধন, হল বহুজন,
তাদেরই বা আজ কি খাওয়াই ॥
ভব মাঝে যদি জানতাম এত জ্বালা,
এ ফাঁদে পড়িত, আছে কে এমন শালা,
হিমু শশী কলা, দেখে হ'লাম ভোলা,
এখন কানেতে ধ'রে ঘুরায় ॥

স্ত্রী— শোন শোন বলি প্রাণেরই বল্লভ,
না বুঝেও যদি বাড়াও পল্লব,
পুর্ব কথা ভাব, গুপ্ত কথা সব সে সব কি মনেতে নাই ॥
সুধা বলে গরল করিয়াছ পান,
সে সব কথা বলে হবে কি এখন।
রাখ লজ্জার কথা, দাও হে ছিন্ন কাঁথা,
সংসার ত্যাগী হ'য়ে, এ প্রাণ বাঁচাই ॥
মণিমুক্তার লোভে সিঁদ কাটে ঘরে,
প্রথম সিঁদ আমার, জাগিছে অন্তরে,
এখন পড়ে গেছে ফেড়ে, কড়ি লয়ে করে,
গারদ ছাড়া, ও গো, উপায় যে নাই ॥

পুরুষ— শোন শোন বলি, শোন হে সুন্দরী,
ত্রিশ বাল্য মম, চক্ষে বহে বারি,
ব'লে হরি হরি ঝোলা কান্ধে করি।
বাধ্য হ'য়ে ওহে, সাজিব যে গোঁসাই ॥

স্ত্রী— তুমি না হয় ওহে সাজিবে গোঁসাই,
আমার চলাচলের করে দাও হে উপায়,
ষাট কোলে, বালাই হয়েছে মেলাই
তাদের ফেলে আমি কোথায় এখন যাই ॥

পুরুষ— সকলে না হয় হবো হে বিরাগী,
কন্যা পুত্র লয়ে. হব অনুরাগী,
লোক বলবে যোগী, খাব ভিক্ষা মাগি,
তাহে তো মোর আর কোন ক্ষতি নাই ॥

স্ত্রী— হেন বলি, নাথ, উচিত নয় কো বলা,
কেমনে ত্যজিব, হার তাগা বালা,
হয়ে কুলবালা, কেমনে নি' ঝোলা,
রকম তোমার দেখি বলিহারি যাই ॥

পুরুষ— ওহে, প্রিয়ে, তুমি হইবে বৈষ্ণবী,
মিছে হার বালা, হবি গৃহত্যাগী,
নবদ্বীপে যাবি, কত শিষ্য পাবি
কত গরবে বসিবি, ওলো রাই ॥

স্ত্রী— বাতুল হয়ে গেলি গঙ্গাভরা ধুকো,,
কেমনে টানি ওরে আখ্‌ড়ায় বসি হুঁকো,
ওরে উল্টো চোখে কুশলেতে থেকো
তোর মতের মুখে পড়ুক, ওরে, ছাই ॥

পুরুষ— যত পরিহাসে কৃষ্ণনিন্দা হবে,
এসবেসে ধনি, কেহ না আর যাবে,
কুলনাশা সবে কুল কোথায় পাবে,
কুলনাশী যারা করে কুলের বড়াই ॥
কান পেতে শোন্, ওরে লক্ষ্মীছাড়া,
কুল খাবি যারা, বৈরাগী হ'বে তারা,
আমি কি হয়েছি তব কুল ছাড়া
সেই কথাটি আমি তোরে শুধাই ॥
শোন বলি তোরে, ওরে মালসা মুখী,
দিনে দিনে তুই হলি কাঁচা খুকি,
কৃষ্ণনামের মাঝে নাই ফাঁকি ঝুঁকি
(ওলো) কি বোধ বা দিয়ে তোরে বোঝাই ॥

স্ত্রী— হরি ভজতে বলিস্, কি হ'বেরে ভজে,
কন্যা পুত্র ছেড়ে বৈরাগী কুলে মজে,
তিলক কেটে ওরে সে বসবে সমাজে,
ওটা যে হবে না আমার দ্বারায় ॥

পুরুষ— বুঝে স্থজে বলিস্, হতভাগী মাগী,
কৃষ্ণনামের লাগি মহাদেব যোগী,
হয়ে ভুক্তভোগী, খেলো ভিক্ষা মাগি,
ও তার সোনার অঙ্গে মেখে ছাই ॥

স্ত্রী :— কৃষ্ণ-ভজে রাধার জীবন গেল দুঃখে,
হেন কৃষ্ণ ভজতে বলিস্ কোন মুখে,
ভজে কমলালো বারি ঝরে চক্ষে,
বোনের মুখে ওরে আমি শুনতে পাই ॥

পুরুষ— ক্রোধ পাসরিয়া বুঝে বলিস্ খেপী,
নারদ খেপা হ'লো, মহাদেব যোগী,
জগাই মাধাই পাপী, ছিল দেশ ব্যাপি
হরি নামে তারা পেল যে রেহাই ॥

—নদীয়া

পাটকাটার গান

পাট কাটিবার সময় সমবেত ভাবে যে গান গাওয়া হয়, তাহাই পাট কাটার গান। ইহা কর্মসঙ্গীত বা সারিগানের অন্তর্গত। তবে ইহাতে সারিগানের রূপ তত স্পষ্ট নহে।

পাট কাটিবার গান কিংবা ধান কাটিবার গানের মধ্য দিয়া সারিগানের রূপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার একটি প্রধান বাধা এই যে, ইহাদের মধ্য দিয়া তাল রক্ষা করিবার কোনও সক্রিয় উপায় নাই। নৌকা বাইচের গানে বৈঠার সাহায্যে তাল রক্ষা করা হয়; কিন্তু ধান কাটাই হউক কিংবা পাট কাটাই হউক ইহাদের মধ্যে তাল রক্ষা করিবার মত কোন যন্ত্র গায়কের হাতে থাকে না। এমন কি, পা ফেলিবার তালে তালে যে কোন কোন সারি গানে তাল রক্ষা করা যাইতে পারে, ইহাদের মধ্যে সেই ভাবে পা ফেলিবারও কোন অবকা

সৃষ্টি হয় না ; সুতরাং তালরক্ষা করা সারিগানের যে একটি বিশিষ্ট ধর্ম, তাহা ইহাদের ভিতর দিয়া সুষ্টুভাবে পালন করা যাইতে পারা যায় না। সেইজন্য ধানকাটা কিংবা পাট কাটার গান ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। বহুল পরিমাণে ইহারা রচিতও হয় নাই। বাংলার বিপুল লোক-সঙ্গীত সংগ্রহের মধ্য হইতে যে কয়টি মাত্র ধান কাটা কিংবা পাট কাটার গান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্য দিয়া কোন বিশিষ্ট রস কিংবা বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ হয় নাই, ইহাদের কয়েকটি আধুনিক রচনা বলিয়াও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। রাজসাহী জিলা হইতে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত পাট কাটার গানটি এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

পুবের থনে আইল বাতাস নদী অইল তল।
আশ পিরথিমি সাগর ভাইসা চরায় নামল জল ॥
(জোনা ভাইরে।)
কাঁচি বাগি সঙ্গে লইয়া পাট কাটিতে চল।
(জোনা ভাইরে।)
পুবের থনে বইছে বাতাস নামছে ম্যাঘের ঢল।
এক নিমেষে তুই না জাহান করব বুঝি তল ॥
(জোনা ভাইরে।)
ঝড় বাদলে দিন মজুরী নিব ট্যাহা ট্যাহা।
শিগ্‌রি কইর‍্যা বাইরাও, রে ভাই, চালাও বিষম ঠ্যাহা ॥
(জোনা ভাইরে।)
বিহান বিকাল দিব খাওন পাবদা বোয়াল কই।
তাহার লগে পাইবা আরও হাটের সরস দই ॥
(জোনা ভাইরে।)
কাঁচি বাগি সঙ্গে লইয়া পাট কাটিতে চল ॥ —রাজসাহী

পাতানাচের গান

পুরুলিয়া জিলার আদিবাসী সমাজে পাতা নাচ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। এই নৃত্য উপলক্ষে যে গান হয়, তাহা পাতা নাচের গান। কোন কোন অঞ্চলে এই সকল গান আদিবাসীদিগের নিজস্ব উপজাতীয়

ভাষায় গীত হয়, ইহা আচার-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া গানের ভাষা সাধারণত পরিবর্তিত হয় না ; কিন্তু বর্তমানে আদিবাসী সমাজেও বাংলা ভাষায় গান রচিত হয় এবং হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে এই গান এবং নাচ প্রবেশ করিবার ফলে পাতানাচের গান বাংলাতেই বেশির ভাগ শুনিতে পাওয়া যায়। এই নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া জীবনের সখীত্ব পাতানো হইত, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী এবং সঙ্গিনী মনোনীত করা হইত বলিয়া ইহার নাম পাতা নাচ। আবার কেহ কেহ মনে করেন, করম উৎসব উপলক্ষে পাতাশুদ্ধ একটি করম গাছের ডাল ঘিরিয়া এই নৃত্য চলে বলিয়াও ইহার নাম পাতা নাচ। এখন বিবিধ উৎসব উপলক্ষেই এই নাচ হইতে পারে ; এমন কি উৎসব না থাকিলেও অবসর মত ইহার অনুষ্ঠান হইতে কোন বাধা নাই।

১

শুন গো, আয়ান দাদা, কুল কলঙ্কিনী রাধা।
কালার সনে বনে করে খেলা,
চল, দেখাই দিব এই বেলা।
তুমি জান রাধা সতী রাখালেতে মজে মতি
কাপুরুষের মত রে তোর খেলা
চল, দেখাই দিব এই বেলা॥ —বেলপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

২

তমালেরি বনে সেই তরু কদম তলে
সদাই বাঁশী বলে রাধে রাধে,
গো সেই বৃন্দাবনে। —ঐ

৩

রামরাবণে যুদ্ধ হয়েছিল লঙ্কাপুরে
বুকে শেল মারিল রাবণে গো।
সীতা লয়ে লঙ্কাকে গেল। —ঐ

৪

এক তরফা ডিক্রী করে সাক্ষী দেব দু'নয়নে
মন চুরি করে কোথায় পালালিরে প্রাণধনে॥ —ঐ

একটা বুড়ার দুটা বেটা, হাতির শুড়ে মানুষ মাথা
একটা বুড়ির দুটি বেটি লক্ষ্মী সরস্বতী।
ও বুড়া, তোর ঘরকে গো না যাব আমি। —ঐ

৬

আম ধরে ঝোঁকা ঝোঁকা তেঁতুল ধরে বাঁকা
ফুল ধরে পাতে পাত তবু লাগে চ্যাকা। —ঐ

৭

আমার বন্ধুর আনাগোনা বাড়ি নামুকে আনাগোনা
বাড়ি নামু যেওনা, হে সাঁই, ইন্দুরে হানিছে কোঁড়া ধান। —ঐ

৮

পাহাড়ে তোর বটে ঘর তাই এসেছি সাঙ্গাবর,
সাঙ্গা হবার বড়োই মনে ছিল সাধ
বেহায়া পুরুষে দাগা দিল। —ঐ

৯

কোন নদী বহে নিরাধার
কোন নদী বহে হবকি ভবকি, প্রিয়া, হায়রে,
কোন নদী বহে নিরাধার, তারা কেনি বহে নিরাধার
সুবর্ণরেখা বহে নিরাধার
কাঁসাই নদী বহে হবকি ভবকি প্রিয়া, হায়রে,
তারা কেনি বহে নিরাধার। —ঐ

১০

ও ভাব কার দিনা দুই—প্রেমেরি বাজার
কোথা দেখবি পরিবার, বুঝে দেখ মন কেবা কার,
আঁখি মুদিলে অন্ধকার···ভেবে দেখ কেবা কার···বাজার।—ঐ

পাতানাচের গানে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। অথচ পাতানাচের গানে যে প্রেম-প্রসঙ্গ নাই, তাহা নহে। নিম্নোদ্ধৃত গানটির মধ্যে যমুনার উল্লেখ কোন সূত্র হইতে আসিয়া থাকিলেও কিংবা শ্যাম নটবর রূপে নায়ক চরিত্রের উল্লেখ থাকিলেও ইহা বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা প্রভাবিত

একথা বলিতে পারা যায় না। কৃষ্ণলীলা ঝুমুর হইতে ইহাদের মধ্যে কোন কোন সময় রাধা এবং কৃষ্ণের নাম আসিয়া থাকিবে।

১১

কচরা কুড়তে গেলম মাঝবনে দেখা পেলম,
হরি সখা ধরত আঁচলেরে।
নটবর যমুনা ভুলাল রে,
যমুনা ভুলালে হে।
চৈত্র বৈশাখ মাসে বড়রে তিষা পাইছে—
এখন বাউ বাতাস পাকাল উড়িয়ে রে,
যমুনা ভুলালে হে।
ছাড় ছাড় ছাড়, হরি, আমারই আঁচলি এখন ছাড়িলে ঘর ফিরে যাই।
শ্যাম এটবর যমুনা ভুলালে হে,
চল গো ফুল তুলতে যাব মালির বাগানে, হায়, হায়, মালির বাগানে
আনব ফুল গাঁথবো মালা পরবো দুজনে॥ —ঐ

১২

সকালে উঠিয়ে ছেলে খেলিতে বেড়াল রে,
খেলিয়ে বেভুল হল, মা, পাসুরাল রে।
কার ঘরে আছ, বাছা, বেরা ডাক দিয়ে রে,
অভাগা মায়ের প্রাণ যায় বিছরিয়ে রে।
বাপ মারিল বাছা মায়ে বলে দূর রে,
চল আমরা দুটি ভাই সন্ন্যাসী বেড়ায় রে।
নগরে মাগিব ভিখ, সাগরে বেড়ায় রে,
মথুরার বনে গিয়ে রাধানাথ নিব রে। —ঐ

১৩

লেহ সখি চূড়া ধড়া লেহ মোহন বাঁশী।
না রহিব আমি হব গো সন্ন্যাসী॥ —ঐ

১৪

রাম যদি রাজা হোত সীতা হোত ধনীরে।
পঞ্চবটী বনে সীতা কে করিল চুরি রে॥ —ঐ

১৫

নীচেতে জল যাছে ওপ্‌রে গরম বালি রে।
চলিতে না পারে সীতা করিছে বিকলি রে॥ —ঐ

১৬

ঘরের বাদী ননদিনী মাঠের বাদী পর রে।
যমুনা ঘাটের বাদী শ্যাম নটবর রে॥
মাথার বাদী ঘোমটা নাকের বাদী নথ রে॥
পায়ের বাদী ঝুম্‌কো চলিতে লাগে ভার রে॥ —ঐ

১৭

শাল গাছে শুঁয়া পোকা ওইটাই বটে ছেলের কাকা,
মার, বুধা, বলে দিবে দয়ালকে, কি দোষে ছাড়িছে আমাকে।
—বেলপাহাড়ী

১৮

বঁধু গেছে মধুপুর যাতে হবে কেশরপুর
বঁধুয়াকে বাঘুয়ায় ঘেরেছে, না জানি শ্যাম পথ ভুলে গেছে,
বঁধুয়াকে বাঘুয়ায় ঘিরেছে। —ঐ

১৯

বাঘমুড়ীর পাহাড়ে কত রঙ্গের ফুল ফোটে,
দিদিগো, দাঁড়ায়ে তুলিতে মন করে, বাঘমুড়ীর পাহাড়ে,
পাখী বসে পাথরে, অনাহারে পাখীর জীবন গেল পাথরে। —ঐ

বাঘমুণ্ডীর পাহাড় পুরুলিয়া জিলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। পুরুলিয়া জিলার বহু লোক-সঙ্গীতে নানাভাবে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এখানে বাঘমুড়ী পাহাড়ের যে পাখী অনাহারে মরিতেছে, সে পাখী রূপক হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে। আদিবাসী প্রভাবিত সমাজের লোক-সঙ্গীতে রূপকের ব্যবহার ব্যাপক।

২০

আ গুণ গুণ শুনে যা চরকার বাজনা রে।
চরকা আমার নাতিপুতি চরকা আমার গতি।
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি। —ঐ

২১

তোর জন্যে, তোর জন্যে জরিমানা,
তোর জন্যে যাব জেল খানা
তবু না ছাড়িব আনাগোনা। —ঐ

২২

এক কণা চাল দিব মাড়ে ভাতে বুঝে নিব,
পেট না ভরিলে তোকে গাল দিব, আজ তোকে রাঁধুনি শিখাব। —ঐ

২৩

সজনা শাগে নূতন মাড়ে রাঁধ, ছোট্‌কি, চাঁড়ে চাঁড়ে,
দেখনা ছোট্‌কি চাল গিলামে বাঁইগে
বড়কারা আসিছে সিনাই। —ঐ

২৪

আম তলের মাটিয়া আর হুদকে উঠে ছাতিয়া,
আ মনে পড়ে—অ শ্যামের পুরানা পিরীতি, আ মনে পড়ে। —ঐ

২৫

ও বঁধু, তেই দিনে বিঁধেছে নয়ন বাণহে সেই দিন হ'তে,
ও আমার পরাণ ব্যাকুল হে সেই দিন হ'তে। —ঐ

২৬

ধরণী ধরেছে তিলে পিপীলিকা হস্তি গিলে রে,
মাকড়সার সূতায় হস্তি বাঁধা আছে
ই জগতে গাছে নাই পাতা আছে
পর্বত সমান গাছ অসংখ্য তার গাছ পাতরে
বল, সাধু, সে বৃক্ষের মুল কোথায় আছে।
জল খাবার বেলা গেল জল খাচ্ছে
ই জগতে জল নাই জল খাচ্ছে
ই জগতে পাতা নাই পাতা খাচ্ছে। —ঐ

২৭

বঁধু আমার বাঁকুড়াতে যাবে
এসে বঁধু পথ ভুলে গেছে,

সখীরে বঁধুয়াকে বাগুয়ায় ধরেছে
না জানি, শ্যাম, পথ ভুলে গেছে।

নিম্নোদ্ধৃত গানটির ভাষা লক্ষ্য করিবার মত। ইহার মধ্যে বাংলা শব্দের মধ্যে মধ্যে নির্বিচারে হিন্দী বা কুর্মালি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরুলিয়ার লোক-সঙ্গীতের ইহা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের নানা আদিম জাতির ভাষা কি ভাবে বাংলা ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ক্রমে বাংলা ভাষার কুক্ষিগত হইয়াছে, ইহা তাহার প্রমাণ। রাজনৈতিক প্রতিপত্তির দ্বারা ভাষার প্রভাব বিস্তার লাভ করে না, এই বিষয়ে যে ভাষার বিশেষ শক্তি আছে, সেই ভাষাই নিজের শক্তিতে প্রচার লাভ করে।

২৮

দে না ছোটকি, চাল গিলা সেবাইঙ্গে
বড়কারা আমাদের আসিছে সিনাইঙ্গে
একে আমার জুটা হাত বাঢ়াইং দেঙ্গে বাসি ভাত।
ঝুড়ি কাটটা দেন সলগায়েঙ্গে।
সনল্যা শাগে বাসি মাড়ে
রাখ, ছোটকি, চাঁড়ে মারে বড়কারা আসিছে সিনাইঙ্গে
কুঁচ্চি ডালে কঁচ বেলে তেজপাতা মেলাইয়াঁ দিলে
আর তুড়ি ব্যাঙটা দে না মেশাইয়েঁ। —ঐ

২৯

প্যারী বলে, সহচরী, করি কি উপায় হে,
বল দেখি, দূতী, প্রেমেরি বাজার। —ঐ

৩০

মন, দিন গেল এ জনমের পারা,
রামলক্ষ্মণ ছুটি ভাই জগতেরি সার।
কি কর কি কর, ভাই, বসে দিশাহারা
পদ্মপাতেরি জল সে জল করে টলমল,
পড়িতে বিলম্ব নাই ফলে আছে ঠেসা
মন, দিন গেল এ জনমের পারা॥

৩১

ছোট ছোট হনুগুলো লুদা লুদা পেট
বাছা হনুরে, সাগর ডিঙ্গিতেই মাথা হেঁট।
খাইতে নারকেল ফেলাইতে চপা
বাছা হনুরে, ফেল চপা অশোকেরি বনে॥ —ঐ

৩২

বাঁশীর গানে চিতে ভয় না রাখে কুলকে।
বাঁশী বাজে পঞ্চম স্বরে সুধাবিন্দু হৃদে ঝরে
নয়ন বাঁকা চলন বাঁকা সেই ত হরে মনকে
বাঁশীর গানে চিতে ভয় না করে কুলকে॥
হেন লগনে গায় নাথ বিনে প্রাণ যায়।
সদাই রোদন বিরস বদন না হেরিলে শ্যামকে,
বাঁশীর গানে চিতে ভয় না করে কুলকে। —ঐ

৩৩

লক্ষণ আইল ধেয়ে দেখব জানকীকে যেয়ে
জানকী জানকী জানকী বলে ডাকছেন লক্ষ্মণ।
ও মা, দাও দরশন, কি বলিব, মা, এলে এখন॥
অযোধ্যা নগরে ঘর নামটি হল রঘুবর
ভরত শত্রুঘন দুই ভাই।
ভরতকে মোর রাজ্য দিয়ে আমারে বন পাঠাইয়ে
কাল সীতা করেছি হারা গো,
কে দেখেছো বলে দে, তোরা। —ঐ

৩৪

হাতীশালে হাতী কাঁদে ঘোড়ায় না খায় পানী,
মহল ভিতরে কাঁদে কোশল্যা সুন্দরী যে রে,
জানকী যাবেন বন শ্রীরামলক্ষ্মণ যে রে, জানকী যাবেন বন॥ —ঐ

৩৫

আথ বাড়ীর শেয়াল রাজা বনের রাজা বাঘ রে।
বিয়া ঘরে মেয়ে রাজা সমান খুঁজে ভাগ রে॥ —ঐ

পুরুলিয়ার একটি প্রচলিত প্রবাদ এই, 'বিয়া ঘরে ম্যাঞা রাজা' অর্থাৎ বিবাহ ব্যাপারে স্ত্রীজাতিরই অধিকার, ইহাতে তাহাদেরই স্বেচ্ছাচারিতা চলে। আদিবাসী সমাজে বিবাহানুষ্ঠানে পুরুষের কোন স্থান নাই, তাহারা নির্বিচারে মদ্যপান ছাড়া আর কিছু করে না ; কিন্তু স্ত্রী-সমাজ নৃত্যগীতসহ সকল আচার পালন করিয়া থাকে। এ কথাই সঙ্গীতে বলা হইয়াছে।

৩৬

শুকনা গাছেতে ফুটেছে ফুল।
কেমনে ভুলিব, বঁধু, ডালিমের ফুল ॥
তুলিতে তুলিতে হয়েছি ব্যাকুল
কেমনে তুলিব, বঁধু, ডালিমের ফুল। —ঐ

৩৭

অনেক ধেয়ালি তবে নরজন্ম পাওলি।
মানুষ থোড়াই জীবন, সখি, কৈ হল গো, আমার হরিসাধনা।
শিশু না কালে হরি গেলাম ভুলে,
তখন ভালমন্দ কিছুই জানি না।
কই হলো গো, আমার হরিসাধনা।
যুবা না কালে অনুমতি দেলাই কাহি
তখন বিরহ অনল দহনে, কই হ'ল গো হরিসাধনা।
এবে বেলাই বৃদ্ধ রহি গেল সাধ
এখন দিন পূর্ণ আঁখি সুঝে না, কই হল গো, হরিসাধনা।
না হল গো আমার গুরুর ভজনা, সখি, আমার হল না। —ঐ

৩৮

ধরণী ধরেছে তিলে পিপীলিকায় হস্তী গিলে
মাকড়সার সূতায় হস্তী বাঁধা আছে।
ত্রিজগতে গাছ নাই পাতা খাছে ॥
মাছিতে পর্বত নাড়ে হস্তীকে ধরিয়া ফাঁড়ে
জল খাবার বেলা হল জল খাছে।
ত্রিজগতে জল নাই কোথায় পাছে ॥

পর্বত সমান গাছ অসংখ্য তার ডাল পাত
তাতে মণিমুক্তার হার কত গাঁথা আছে,
বল, সাধু, সে বৃক্ষের মুল কি মতে আছে।
যে জগত ধরে আছে সে জগত কোথায় আছে
জগতে জগত নাই মঙ্গল গাহিছে
বল, সাধু, সে বৃক্ষের মুল কি মতে আছে। —ঐ

৩৯

বাগমুড়ির পাহাড়ে কিসের ধূলা উড়েরে।
রাজার বেটা বাব্‌রি কাটা ঘোড়া ছুটাছে রে ॥
বাগমুড়ির পাহাড়ে নানা রংয়ের ফুল রে,
দিদি গো, দাঁড়ায়ে তুলিতেই মন করে ॥ —ঐ

৪০

আগে ছিল মটর গড়ী, এবার হল রেল গাড়ী,
(আবার) উপড়ে উড়িছে উড়াকল গো—
কলকাতা কঠিন শহর ॥ —ঐ

৪১

ছানা কাঁদে, মা, মা।
মুড়ি দিলেও ভুলে না ॥
থাম, বাছা, ভাত যে রাঁধি।
তোর বাপ বেজায় যে রাগী ॥ —ঐ

৪২

হাতে লিব তুলদাঁড়ি, চলে যাব লাহাবাড়ী,
সেহ লাহা সিকি সেরে বিকব,
নাগরকে দেখিতেই হাট যাব।

হাতে তুলাদণ্ড লইব, লাহা বা গালা বিক্রয়ের গদিতে যাইব। চারি আনা সের দরে লাহা বা গালা বিক্রয় করিব। নাগরকে দেখিবার জন্য হাটে যাইব।

৪৩

মাঝ কুল্‌হি আখড়া গোটা গাঁ মাম শ্বশুরা
ছলকিতে মন যায় আগেতে মাম শ্বশুরা। —ঐ

৪৪

চল, সখী, তুল্‌কে জোড়া মহুল তল্‌কে।
বাজিল নাগরে বাঁশী ফিরে চল ঘরকে॥ —ঐ

৪৫

উঠিল পুর্ণিমা চাঁদ ভাল হল ভাল হল রে।
অ ফুল ফুটিল রে রসতলায় মন রহিল, ভাই॥ —ঐ

৪৬

মাকাল ফলটি দেখতে ভাল উপর লাল ভিতর কালো
মুখে দিলে লাগে তিতো তিতো।
কাঁঠালের গায়ে কাঁটা ভাঙ্গলে আঠা খেলে মধু মিলে।
যে জন ভাব জানে যে জন প্রেম জানে তার এমনি কি ধারা—
কিনে নেয় বিনা মূলে।
যে জন রসিক হয় মুখের কথা চোখে কয় রসিক বলি তারে,
রসিক হয়ে চিনি তুলে তারা লয়ে যায় গো জলে,
হেন দুর্গাচরণ বলে, সব মানুষ কি পিরিত করে
যাদের পীত মালা গলে দুলে।

৪৭

হরি, দুঃখ দাও হে, যে জনারে।
তার কেউ দেখে না মুখ ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ
দুঃখের উপর দুখ সুখ নাই সংসারে॥
হরি, দুখ দাও যে জনারে।
জলে কৈলাম ঘর জলে জলে আগুন
পোড়ে কোঠাবাড়ী ফুটে কালি চুণ
হরি যার কপালে যখন ধরাও হে আগুন
তার লোহার কড়িতে ঘুন ধরে॥
ক্ষেতে হয়না শস্য বৃক্ষে হয় না ফল
দুগ্ধবতী গাভী দুধহীন সকল।
সরোবর শূন্য শুকায়ে যায় জল
জল বিনা মৎস্য মরে॥

পুর্বাপুর্ব ধন গাড়া থাকিলে সে ধন যায় স্থানান্তরে
দলিল পত্রে পোকা ধরে।
নীলকণ্ঠ কয় তখন বেড়াও ছুটে ছুটে
খেটে লুটেও পেট না ভরে
হরি, দাও দুখ দাও যে জনারে॥ —ঐ

পাতানাচের গানে কোন আধ্যাত্মিক কথা ব্যক্ত হয় না। বাস্তব জীবনের নানা সুখদুঃখ অভাব-অভিযোগের কথাই ব্যক্ত হয়। এই গানটিতে যে আধ্যাত্মিক ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা কদাচ পাতানাচের গানে শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা পাতানাচের গান নহে। সম্ভবতঃ ঢুয়া গান। কিন্তু সংগ্রাহকেরা পাতানাচের গান বলিয়াই ইহা সংগ্রহ করিয়াছে। ইহার কারণ, অজ্ঞ গায়কেরা ইহাকে পাতানাচের গান বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছে।

৪৮

ঘোর কলিতে বিবাহ করা কেবল যন্ত্রণা।
বিধবাদের হাতে চুড়ি, সধবাদের হাতে চুড়ি,
তারা পরে চুড়ি বেনারসী ঢাকাই শাড়ী বই পরে না।
তারা চাবি কাঠি খুঁটে বেঁধে অনন্ত বই পরে না,
নীলকণ্ঠ কয়, ভাই, স্মৃতিকণ্ঠ ভজবি যা, ভাই, রাধাকৃষ্ণ,
ভবে পাবি না যন্ত্রণা॥
ঘোর কলিতে বিবাহ করা কেবল যন্ত্রণা॥

৪৯

রং ফিরে যুগল চুড়ি উঠেছে
(আমার এই দেশেতে)।
চুড়ি করে ঝলমল্ টিকল করে বিকল,
বাজু বাউটী আগবালাতে সকলি সাধ মিটেছে।
রং ফিরে রং যুগল চুড়ি উঠেছে (আমার এই দেশেতে)।
ঘরে যেয়ে সি-কে (স্বামীকে) বলে, পয়সা দাও বাক্স খুলে।
কুসুম দিদির মতন চুড়ি পরব তিন পুরে
রং ফিরে আজ যুগল চুড়ি উঠেছে
আমার এই দেশেতে।

৫০

ছোট মোট পুকুরটি বহুত মাছ আছে,
খেলিতে বাহিরিল মাছ শিয়াল ধরে খাছে।
অন্তরে কি জীয়ন্ত আছে ভারে মাথায় নিয়ে যাছে
অর্ধপূরণ খেয়ে নিছে।
দাঁত নাই তার আঁত নাই পাষাণে চিবাচে
অন্তরে কি জীয়ন্ত আছে।
বড় বড় শোল মাছে শিয়াল ধরে খাছে,
একটি দোঁড়া মাছ খেয়ে না ফুরাছে,
অন্তরে কি জীয়ন্ত আছে ॥ —ঐ

৫১

চল চল ঝঁট করি কে যাবে মথুরাপুরী
বিকিব পসরা দধি কৃষ্ণেও দেখা পাইগো যদি
লাভ হৈবে দ্বিগুণ ভারি।
ব্রজনারী, কে যাবে মথুরা পুরী,
চাঁচর চিকুর ও সে সে কেশ, সে নীল যোগীর বেশ,
ব্রজের ব্রজাঙ্গনা গেল ছাড়ি কে যাবে মথুরাপুরী।
সতুদাসকে নিবে সঙ্গে করি।
ব্রজনারী কে যাবে মথুরাপুরী ॥ —ঐ

৫২

শ্যাম শ্যাম সবাই বলে, শ্যাম কি ধন গাছে ফলে।
পেমের বেদন রসিক না জানে রাধার সনে বনে করি খেলা,
সখিরে, তাইত নিলাজ লোকে বলে। —বেলপাহাড়ী

৫৩

পান খাই চিবি চিবি খয়ের খায় রতি,
বুড়ার পিরীত রাতে নিতুই মাথে মেথি। —ঐ

৫৪

গাছের মধ্যে তুলসী পাতার মধ্যে পান।
স্বামীর মধ্যে রাধানাথ পুরুষ ভগবান। —ঐ

৫৫

ঘরের শোভা আঁচির পাঁচির বিলের শোভা ধান
সাঁতের শোভা পড়ের বেটা, যেমন কচি চাঁদ ॥ —ঐ

৫৬

ঝাড় তলের মাটিয়া, হুজকে উঠে ছাতিয়া,
মনে পড়ে সে তো পুরান পীরিতি —বাঁশপাহাড়ী

৫৭

এক বাঙ্কা দুই বাঙ্কা তিন বাঙ্কা করি
নয়নে নয়ন বাঙ্কা না দেখিলে মরি।
আল কি রূপে, কি রূপে হেরিলাম তরু তলে গো।
চল, সখি, চল যাব জলে ॥ —ঐ

৫৮

মরিব মরিব, সখি, নিশ্চয় মরিব গো
মরিলে রথে যাব পবনে উড়িব গো।
এমন সোনার দেহ সাধিতে মিলায়ে গো ॥ —ঐ

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসিদ্ধ একটি পদ কোন সূত্রে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়া ইহা কি রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার মত। ইহা হইতে শ্রীরাধার আর্তিভাব দূর হইয়া গিয়াছে, ইহা সাধারণ বৈরাগ্যমূলক কবিতার রূপ লাভ করিয়াছে।

৫৯

সীতায় ধান মেলে লো ওই কদমের তলে
বার বাতের কাপড়খানি তের বাতের দড়ি,
পিছলে পিছলে পড়ে কাঁখের কলসী।

৬০

গাই গেল রণে বনে বাছুর গেল নিধুবনে
গুলিন কাঁদে জোড় পাকুড়
বাগাল কাঁদে অযোধ্যার বনে ॥

৬১

বাইজে বাহালে শশী, বিটি ছানা মুখে বাঁশি
বিটি ছানার চুল রাখা দায় গো, —ঐ

৬২

যদি কাশি ফুটিয়ে ফুরায় গো।
বাঘমুড়ির পাহাড়ে হলুদ বরণ ফুল ফুটে,
দিদি গো, দাঁড়ায়ে তুলিতে মন করে ।। —ঐ

৬৩

ধ্বজা মাড়া চুটিটা হাতে নিলাম বুন্দিটি
লহাক ধরিব আর দুটি। —ঐ

৬৪

হিজলি মাধবপুর কাঠালিয়া কতদূর
হারগড়া বেকয়নাচ লাইগেছে।
তুরুপ তুপ কুইলাপালে ॥ —ঐ

৬৫

হলুদবনে বনে ও যে কাশে বনে বনে
নাকছাবিটা হারাই গেল গো—ও তাই কান্‌ছে বনে বনে,
ও তাই ভাবছে মনে মনে ॥ —ঐ

৬৬

আখড়া তো গো, ধনি, ছোচ দে,
দুয়ার রহিগেঁ, ধনি, গোবর দে।
আখড়া তো গো, ধনি, নিল রসিকা
আরো পাবি গো, ধনি, এমন সুন্দর আখড়া। —ঐ

৬৭

আজকালের বহু-বিটি ওলটায়ে বেঁধেছ ঝুঁটি গো
আগুদিকে আয়না চিরুন পিছুদিকে বেল কলি।
ধনি, যে সাজ সাজলি, চমকে বিজলি ॥ —ঐ

৬৮

কুলি কুলি যাইতেছিলাম উড়মালটি গেলি,
সরুবালি, দিদি, বাহিমল কাঁই গেলি গো। —ঐ

৬৯

বড় বাঁধের বড় মাছ ছোট বাঁধের ছোট মাছ,
রাজার পখুরে, দিদি, হিঁসল পুঁটি মাছ॥ —ঐ

৭০

চৈত বৈশাখ মাসে পুর্ণিমা লাগিছে চাঁদে—
ঐ চাঁদে, দাদা, অযোধ্যা শিকার॥ —ঐ

৭১

কুলহি কাদা পায়ে আলতা, ওগো মা, তায় আইসিছে লিতে,
মা মা গো, বলে দিবি তোর জামাইকে ঘরকে ফিরে যাতে। —ঐ

৭২

গাই আইল বাছুর আইল বাগাল কোথা রইল,
এ কড়া কদম তলায় বাগাল বাঁধা রইল। —ঐ

৭৩

ভীমার্জুনের কলিয়ে সরযুমুখী ধান রে।
হাতে শাঁখা কোমর বাঁকা মাথায় গাঁদার ফুল রে॥ —ঐ

বাঁশপাহাড়ীর সংলগ্ন ভীমার্জুন একটি ক্ষুদ্র গ্রামের নাম। গ্রামের অধিবাসী অধিকাংশই জাতিতে সাঁওতাল, ভাষায় বাঙ্গালী।

৭৪

বাড়ী না যয় চাঁদ উঠেছে পৃথ্বিম করে আলা
কালি ঝুমরী, তুমি বিনা দুনিয়া আঁধার।
কোন নদী বহে হবো কি ভাবো কি,
পিয়া, হায় রে, কোন নদী বহে নিরাধার—॥

৭৫

ওরে, রাতিয়া রহিলে জাতি যায়,
দিদি গো, বলে দে—
কেমনে নদীয়া হবো পার, দিদি গো বলে দে।

হাটে যদি বেলা ডুবে কেমনে ফিরিব একা
দিদি গো বলে দে.........
নাচনীরা নাচ করে পায়ে লাগে ঘাস, ও পণ্ডিত ভাই—
বামনীর হাটে কিনবো রে মিঠাই।
যমুনার কিনারে বাঁশী কাঁদিছেন গো, রাই রূপসী,
ওরে মথুরা যাওয়া হলো দায়।
দিদি গো, বলে দে কেমনে নদীয়া হবো পার॥ —ঐ

৭৬

বাঁধ নামর চিটা মাটি মাদল বনাব হে।
উঠ, বেহাই, ধর মাদল বিহানকে নাচাব হে॥ —ঐ

৭৭

ছ্যাং গর্ গর্ ছ্যাঁকা পিঠা দেখ না, জামাই, কেমন মিঠা,
খাতে খাতে বড়ই মিঠা। —ঐ

৭৮

মাছ বাঁধি ছ্যাঙ্ ছ্যাঙ্ ছানা কাঁদে হ্যাং হ্যাং;
চুপ, ছানা, বাইসাম করি রে, তোর বাপের মার খেতে লারি।—ঐ

৭৯

মাছ ধরি হালা হালা পলাশ পাতার থালা রে;
নদী নালা শুকুই গেল তরকারীর জ্বালা রে। —ঐ

৮০

আইল রসরাজ চেউনী গাঁথিব মনো মতনে
আসিবে শ্যাম নবঘনে।
কুলি কুলি জল যায় ছানার হাতে ঘুনি রে,
কই, ছানা, কত মাছ, শুধায় বেঙ্ টুনি রে। —ঐ

বাঁশের বাখারি হইতে তৈয়ারী এক প্রকার জিনিষের নাম ঘুনি।
। পরগণা অঞ্চলেও ইহাকে ঘুনি বলে।

৮১

এক বাঙ্কা দু বাঙ্কা তিন বাঙ্কা হরি,
নয়নে নয়ন বাঙ্কা না দেখিলে মরি।

কি রূপে, কি রূপে হেরিলাম তরুতলে গো,
চল, সখি, চল যাব জলে। —বাঁশপাহাড়ী

৮২

হাল ভাঙ্গিল, দাদা, জোয়াল ভাঙ্গিল রে,
ষোলশ গোপীন্, দাদা, ভাঁড়ায়ে রহিল রে। —ঐ

৮৩

আইল রেল গাড়ী কুটির বামে তাড়াতাড়ি,
ঘামে ভিজিল শিলিক শাড়ী আজ্ঞে লেসং ছাড়াছাড়ি। —ঐ

৮৪

চল যাব জলকে
জোড়া মহুল তলকে
এড়ি (গোড়ালি) দমকে মাটি দলকে
নারবে আমরাকে ভাগাতে। —ঐ

৮৫

এতটুকু নাচনী ছানা এক মুঠা চুল রে।
হাতে শাঁখা, কোমর বাঁকা উড়ে গাঁদা ফুল রে॥ —ঐ

৮৬

রাড়ী দুখী, বাঁড়ী দুখী সবাই নীল শাড়ী,
শহরে চলিতে হাত লাড়ি। —ঐ

৮৭

মনে করি আসাম যাব, জোড়া পাংখা খাটাইব
আসাম গেলে বধিবে পরাণ, হে বাঁকা শ্যাম।
ফাঁকি দিয়ে পালালি আসাম হে, বাঁকা শ্যাম॥ —ঐ

ছোট নাগপুর এবং মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের সকল লোক-সঙ্গীতেই নায়িকার আসাম কিংবা ভুটান যাইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অসামাজিক প্রণয়ে লিপ্ত হইয়া নায়ক-নায়িকা সাধারণত দেশত্যাগ করিয়া যায়। দেশত্যাগ করিয়া তাহাদের একমাত্র যাইবার স্থল আসাম বা উত্তর বাংলার চা-বাগান অঞ্চল। সেখানে গিয়া তাহারা কুলির কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

আসামে জীবিকা সন্ধানকারী নায়কের জন্য দেশে পরিত্যক্তা নায়িকার বিচ্ছেদ সঙ্গীতও ইহার অন্যতম বিষয়।

৮৮

আথিটি তাথিটি পিয়ারা পাতা,
মেজদিদি তোমার কর্তা কোথা।
কর্তা গেছে ক'লকাতা,
এক বালিশে জোড়া মাথা
আলো জ্বেলে, প্রাণ, কহ কথা।
একথা যেন লোকে শুনে না,
চুমু খেলে যেন নথ ভাঙ্গে না। —ঐ

এই গানটির মধ্যে ছড়ার ভাবটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মনে হয়, ইহা অন্য কোন স্থান হইতে গিয়া এই অঞ্চলে প্রচলিত হইয়াছে।

৮৯

তোমাদের ঘরকে বসতে গেলাম
ব'স বলে আর বল্‌লে না,
এচো নেচো ফায়দা মেলা
গরবে রা কাড়লে না। —ঐ

৯০

দালান গোড়ায় দুর্বাঘাস,
কোলকাতাতে বারোমাস,
হায়রে সাধের, ময়না,
এমন চাকরা-ভাতার হয় না;
সকল কাজে ফাঁকি দিয়ে দিবেক শুধু গয়না। —ঐ

৯১

ঘর করি মীনার বাপের সঙ্গে
ঝাঁপ দিব গাঙ্গে,
ঘি যোগাইয়ে খাই ঘোল,
তবু করে গণ্ডগোল,
ঠেঙ্গায়ে মোকে বিড়ি ঠেঙ্গা ভাঙ্গে।

আমি অতি অভাগিনী
দোষ দিব কি তোকে ;
ঘর করি মীনার বাপের সঙ্গে। —ঐ

৯২

হিজলী মাধবপুর কাটাইলিয়া কতদূর নাচ।
হাড়া গাড়া বিকয়েলার লেগেছে,
তুড়ুক তুপা কুইলাপালে ॥ —ঐ

কুইলাপাল পুরুলিয়া জিলার একটি গ্রামের নাম। ইহার কথা নানাভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়।

৯৩

মামারে, ভাগিনা বড় রে সঙ্গতিয়া,
মামা, চল যাব অযোধ্যা শিকার যে। —ঐ

৯৪

লা বা গালা পুরুলিয়া জিলার প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ। এক সময় ইহার ব্যবসায় করিয়া স্থানীয় জনসাধারণ প্রচুর লাভবান হইত। তাহার কথা নানাভাবে এই অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাগমুড়ির পাহাড়ে লায়ের বড় চটিরে।
লায়ের দৌলতে দিদির আগ দাঁতে মিশিরে ॥ —ঐ

৯৫

এক হাতে তেলের বাটী আর এক হাতে ঝারি,
কাঁকের কলসী পড়ে খসরি খসরি।
খসরি খসরি পড়ে কাঁকের কলসী। —ঐ

৯৬

এতটুকু কুয়াটি পাতালভেদী পানি,
গৌরী শ্যামলী পাণি বহি গেলি,
রাজার বেটা পাণি মাগে গো। —ঐ

৯৭

নৈতন পুকুর আড়ে জোড়া রেকড কড়কড়িয়া
তারিও সঙ্গে ফুল পাতার কররবরিয়া।

বেহান আমার গুণমণি, তার লেইগে কথা শুনি,
বনে শুনি গো, বেহান, বাঁশরি বাজল
বেহান, ছম্ ছম্ ছম্। —ঐ

৯৮

বনের সারলী ফুল গায়ে সোহকে।
দিদি, যাইও না জলকে খোঁপা দোলকে॥ —ঐ

৯৯

কুলি কুলি যাতে ছিলি।
চাঁপার কুলি কুড়ায় আনি॥
চাঁপার কলি এতই না সুন্দরী।
খোঁপায় আছে কদমেরি কলি॥ —ঐ

১০০

কুলি কুলি যাতে ছিলি ঝিঙা টপায় ঠেস খালি
ভালরে ভালা, সখী
জীবন যৌবন আমার না রহিল, সখী। —ঐ

১০১

বনকে যে যায়েছিলি, দিশা পবন হারায় হলি,
ভালোরে ভাল, সখী, জীবন-যৌবন আমার নাও॥ —ঐ

১০২

বনে ফুটে বুনো তিল ফুল বন হলো আলো।
বিটি ছানা মিছা জনম শ্বশুর ঘর আলো॥ —ঐ

১০৩

রঁাধি দিও বাঁটি দিও গো
তিতা কলোমী শাক্ রঁাধি দিও॥ —ঐ

১০৪

চাল করলাম চিঁড়া করলাম।
বাইরন যাবার তরে।
নিরলে বসিয়ে কাঁদে তমালেরই ডালে।
হে শ্যাম, বাইরন যাবার কালে॥ —ঐ

১০৫

বাদনা মোর ভাঙ্গা জমিন্।
জোস্নাতে মোর ধান ॥
শিশিরে কি ধান পাকে বিনা বরষণে।
না দেখে কি মন মানে বিনা দরশণে ॥ —ঐ

১০৬

যমুনার জলে কালো সে জলে সিনাতে ভালো—
ঘসিতে মাজিতে বেলা গেল,
কদম তলে কে ছিল শ্যাম বরণ ॥ —ঐ

১০৭

তেলের বাটি এক হাতে ধরে,
যমুনায় সিনাতে যাবে রাধিকা সুন্দরী ॥ —ঐ

১০৮

ছোট ছোট পুকুরটি পদ্মলতায় ঘেরা।
ডুব দিতে গেল বেলা ছেড়ে গেল কালা ॥ —ঐ

১০৯

যমুনাকে জলকে গেলে পায়ে বেঁধল
শ্বশুর হাসেন বড় মাছ গো পায়ে বেঁধল।
তেল দিয়ে ভাজিল জল দিয়ে ঝোল শ্বশুর চাইখ্যা দেখগে,
শ্বশুর কেমন মিঠে লাগল ॥ —ঐ

১১০

আষাঢ় মাসের ছাতু কুঁড়া এখন শুকাছে।
সেই যে দিদি মারেছিল এখনও দুখাছে ॥ —ঐ

১১১

রাস্তা ছাড় রাস্তা ছাড় যাচ্ছে রাম কলি,
মায়ের গলা বিছাল দড়ি বৌ কাঁধে করি। —ঐ

১১২

আষাঢ় মাসে দোল হয়ে স্বামী মরেছে,
শাঁখা পরব না, শাঁখারী ঠাকুর, আমার কপাল ভেঙেছে। —ঐ

১১৩

আয় লো জয়া আয়, বিজয়া, আয় লো তোরা আয়,
হরগৌরী পুজবি যদি সন্ধ্যা নিয়ে আয়। —ঐ

১১৪

কাঁঠাল পাকা সরু চিড়া কাকে খাওয়ালে।
চির দিনের ভালবাসা প্রাণে কাঁদাইলে॥ —ঐ

১১৫

বনে ফুটিল ফুল গাঁকে আইল বাসরে।
পথে যাতে যে গা করে টলমল রে॥ —ঐ

১১৬

ঘুগি রাজা বিষম জ্বালা কন শালায় ঝড়িল ঘুগি,
দে না নাগরকে র্ঁাধিতাম বারেক দুবার ঘুগি ঝাঁড়াই লিতাম,
ছানার মাকে পিড়ায়। —ঐ

১১৭

গাছের মধ্যে তুলসী পাতার মধ্যে পান রে
স্ত্রীর মধ্যে রাধিকা পুরুষ ভগবান রে। —ঐ

১১৮

নাকে দোলে নাক মাছুরী
ও গো, গলে দোলে সোনা
লোক শুধালে বলে দেবে পছিমা ঘরের কইনা। —ঐ

১১৯

ওগো, ধনি, তোমার নীলবসন ভিজে গেল গো নয়ন জলে গো,
ওগো রাধে, মান করে কি কাঁদতে হয় গো,
তোমার নীলবসন ভিজে গেল,
ওগো রাধে, ছি ছি, এমন মানে কি কাজ আছে। —ঐ

১২০

পুরবে পশ্চিমে মইয়া শ মেলে সদাগর ঢেরা লিও
কুলি মোরা বউরা তলে কি গো ঢেরা লিও

বার থাকায় বার হাত টাকাকে ষোল হাতা
কিনি দিও গো মোকে
পড়িয়া পাটন কাপড়ী কিনে দিও। —ঐ

১২১

বাড়ীর দিকের ঝিঙা লতা কুলির দিকে যায়,
বড় বৌ নিমনমুখী ঝিঙা নাহি খায়। —বাঁশপাহাড়ী

১২২

আম গাছে আম নাই ফাপর কেনে মার রে
তোমার দেশে আমি নাই আঁখি কেন ঠার হে। —ঐ

১২৩

ঝইর গাছে পিকলি, বেটাছেলের বিকলি
ডাঁড়ায়ে কথা কয়ে এখনি, কে বটে, রাই, বল এখনি। —ঐ

১২৪

কালা কুলের গরব রাখাল নারে হরে নিরি কুল,
যে যায় শুধু বনে বনে সে কি নারীর বেদন জানে!
নারীর মন জাগাবি যদি বদন তুলে চাইবি,
আকাশ পানে চাইলে পরে দেখতে পাই কদমের ফুল।
কালা হরে নিলি কুল। —ঐ

১২৫

বড়কারা আসিল সিনাই রে
সতীন ছাড়া ডুবলি আমায় রে
চাল মিলাতে ভুলাই গেছে,
খাজার বাপে আসিল সিনাই রে
সতীন বাদে ডুবালি আমায়
আস্‌তো ভাতে চুরি বাদ্ধ্যা দেন মিশাইয়ে॥ —ঐ

১২৬

আষাঢ়েতে গেলে, বন্ধু, শুয়া বনে দেখা,
শাঁখা করি দাম দায় বার টাকা ছুটিলতা
পিরীতের নাই লেখা জোখা।

উপর ডালে কারিগর নাম ডালে বাসা
উড়ে গেল হংস রাজা পড়ে রইলো বাসা,
কানু হে, দেহের গরব কর মিছা। —ঐ

১২৭

শাক তুলতে গেলি মিনা তুললি লতা পাতা,
কি শাক তুললি মীনা বুড়ার সঙ্গে দেখা।
ওরে মীনা মইরা গেলো,
এমন সুন্দর মীনা বর হইল বুড়া। —বাঁশপাহাড়ী

১২৮

ঘরের শোভা আচীর প্রাচীর খেতের শোভা ধান হে।
সীতার শোভা পরের বেটা যেমন নতুন চান্ হে॥ —ঐ

১২৯

কুলি মুড়ায় তাঁতির ঘর কাপড় বুনে ছর ছর।
শুন্, তাঁতি, বলে দিবে তাঁতনকে,
নীল শাড়ী চরখায় বুনিতে॥ —ঐ

১৩০

কুলি কুলি যাইতেছিল ছিপায় ঠেস্ খালি,
বঁধু হে, দহ বলি, ডাঙ্গায় ঝাঁপ দিলি। —ঐ

১৩১

লাচের মধ্যে দেখলি বুরু তামাড যে,
সজনি, বিনিরে মৃদঙ্গে ভাঁড় ছলকে।
ঘোড়ার মধ্যে দেখলি, সঙ্গিক ঘোড়া যে,
সজনি, বিনিরে চাবুকে ঘোড়া চমকে।
মাছের মধ্যে দেখলি দাঁড়িকা মাছ যে,
সজনি, বিনিরে পানিয়ে মাছ ছলকে। —ঐ

ইহার ভাষা পাতকোমা ভাষা বা পাতকোমা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষা বলিয়া পরিচিত।

১৩২

সরু কাপড় পরবো না, বঁধু, সায়া না হলে,
দে, কালাচাঁদ, শায়া কিনে গাঁয়ের পরবে। —ঐ

১৩৩

কালিয়ার বাগানে যাস্ না তুই উজানে,
বলব মনের কথা ভুলবি না স্বপনে।
কভু দরশনে আমি না হেরি নয়নে।
তোমায় ছাড়া হলে বাঁচি না পরাণে।
রাধাকৃষ্ণ দু'জনে প্রেম করে গোপনে,
কেমন ভালবাসা বুঝবি মনে মনে॥ —ঐ

১৩৪

বাড়ীর নাময় চাঁদ উঠেছে পিথিম করে আলো,
কালী ঝুমরি, তুমি বিনে দুনিয়া আঁধার কালো॥ —ঐ

১৩৫

কোন নদী বহে হবো কি,
ডরোকি পিয়া হায় রে, কোন নদী বহে নিরাধার। —ঐ

১৩৬

গাই আলো বাছুর আলো কোথা রইল,
একড়া কদমের তলায়, বাগাল বাঁধা রইল। —ঐ

১৩৭

বড়কির বড় সাজ ছোটকির ছোট সাজ
হারে হার মাদুলি তো নিল সকল সাজ॥ —ঐ

১৩৮

কুলি কুলি যার্তিছিলাম রুমালটা ভুলে এলাম সরু বালি,
তুই বাহিরি মল কাঁই তুই চলি গেলি,
ও তাই সরু বালি॥ —ঐ

১৩৯

আম ফলে ধোঁকা ধোঁকা তেঁতুল কেনে বাঁকা রে,
কুল ফলে পাতে পাত

তবু লাগে জোঁদারে।
কুল ফলে পাতে পাত ॥ —ঐ

১৪০

আষাঢ় মাসে ঝিরি হিরি পানিয়া বরষে ভিজি গেল,
দাদা, লাল পাগড়িয়া ভিজি গেল। —ঐ

১৪১

আপনার খাবো দাবো পরের কথা না শুনিব,
দিদি গো চল, দিদি, কাছাড় পালাবো ॥ —ঐ

পূর্বে আসাম পলাইয়া যাইবার কথা শুনিয়াছি, তাহারই সূত্র ধরিয়া আসামের অন্তর্গত কাছাড়ের চা বাগানে যাইবার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

১৪২

কালিয়া কুটিলা মাথা সাজিছে গো, মোহন চুড়া,
নাচ্চা নাচ্চা আয় গো তোরা মাথায় সাজিয়েছে মোহন চুড়া।

১৪৩

সাঁঝে ফুটে ঝিঙা সকালে মলিন রে,
আজ কেনে কালার বদন মলিন গো। —ঐ

১৪৪

উপর ডালে কারিকুরি বাম ডালে বাসা,
উড়ে গেল পংখীরাজ পড়ে রইল বাসা।
মানুয়ারে দেহের গরব কর না। —ঐ

১৪৫

আমার বিটি ছোটই আছে, বাজারে সিংগাইন পোঁছে,
জামাই, তুমি আমার বিটিকে বাসিও পর যে গো। —ঐ

১৪৬

নাচ কর খেল কর যতনে রাখ গো,
ইণ্ডিবেটি যতনে রাখো হিমলে রাখ গো,
কামরাঙা দেহ বিটি দিলটি যতনে রাখ গো।
পান গো খাইলে গুয়া গো চিবালে। —বাঁশপাহাড়ী

ইহা বিবাহের গান রূপেও গীত হয়। ইহাকে পাতা সেরেঙও বলে। পরবর্তী গানটিও তাহাই।

১৪৭

জোড় তলায় জোড়া বাঁশী তেঁতুল তলে কেদিরি বাঁশী
কেদিরি বাঁশী শুনি দাঁড়াতে মন যায়।
তিরি (স্ত্রী) আয়ু রোদের জ্বালায় রাগে চলিল। —ঐ

১৪৮

মনে দেখি মনস্তাপ, দিব নাকি জলে ঝাঁপ
কোন সে লম্পটিয়া সঙ্গে করেছিলি ভাব,
ভাবে শুনে দেহ হৈল আমার অসার।

১৪৯

বনকে যে গেলি সইঙ্গা দিশা পবন হারায়লি,
ও তোর বন মাঝে, ও তোর ফুল মাঝে
শ্যামকে ভুলাব, ধনি, কত ছলে।
ও তোর বন মাঝে, ও তোর ফুলমাঝে। —ঐ

১৫০

দেখি মন লোলকে,
মাথার উপর তিতি কাল ঝলকে ঝলকে॥ —ঐ

১৫১

কেউ করে ফোঁটা জটা কেউ করে জপ মালা
কেউ পরে জটা বাকলধারী কিসে মিলে হরি।
সাধুজন গুরুজন কেহ কহ ত বিচারি।

১৫২

ঘরে শোভে অচির প্যাচির ক্ষেতের শোভা ধানরে।
শীতের শোভা লবের ব্যাটা যেমন নৈতন চান্দরে॥

১৫৩

হায়রে আমার পৌটকা ব্যামতি,
বাতাসে উড়ায়ে দিল থালা দোনাটি।

১৫৪

ওহো, তোমার মুখের হাসি জাগে খনে খন
কবে পাব দরশন ॥
এই পথে আমি যাইগো, এই পথে ফিরি,
ধূলায় লুটিয়ে গেলেন হরি।
নামটি নাইক মনে তিন ভুবনে হরি,
হনুয়া বলে কবে পাব দরশন, নামটি নাইক মনে ॥ —ঐ

এই গানটির মধ্যে হনুয়া নামে যে একটি ভণিতা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার বাড়ী ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত পচাপানি গ্রাম। সে মুণ্ডাজাতীয় লোক, হনু মুড়া বলিয়া পরিচিত। ১৯৬৫ সনে তাহার বয়স ৮৫ বৎসর ছিল। নিজের রচিত গান সে নিজেই সেই বয়সেও গাহিয়া সকলকে শুনাইয়া আনন্দ লাভ করে। গানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় নৃত্যও প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহার স্মৃতিতে অগণিত গানের সংগ্রহ।

১৫৫

আঁধার জোছনা আর আঁধার ঘরের শুস্‌না
চোখের কাজল জলে ধুয়ে দিস্‌না।
তুই, ধনি, রাঁধলি, তুই ধনি বাঁটলি।
তুই, ধনি, সুতলি ফুলাস্‌, সজনি,
তুই, ধনি, আঁধারি আঁধারে জোছনা,
আর আঁধার ঘরে শুস্‌না।
চোখের কাজল জলে ধুয়ে দিস্‌না ॥ —পচাপানি (ঝাড়গ্রাম)

১৫৬

বাদনা মো চিটামাটি মাদল বলবে হে,
বৌবেহাই ধর মাদল বেহাইকে নাচাব হে ॥ —ঐ

১৫৭

মামী ভাগ্‌নী জলকে গেল মামীর কলসী ডুবে না,
যা গো, ভাগ্‌নী, বলে দিবে তোর মামার ঘর করবো না।
ওগো মামার ঘর করবো না ॥ —ঐ

১৫৮

পুরুল্লাতে দেখে এ্যালাম দালানে ধান প্যাকেছে,
এমন চাষী চাষ করেছে শিয়ালে ধান মাড়িছে। —ঐ

১৫৯

এস, মাগো, সরস্বতী, ছাগলে ধরেছে হাতী,
ইঁদুরে বেড়াল ধরে খায় রে মোহন গাঁজা। —ঐ

১৬০

মাছ রাঁধে ছ্যাং ছ্যাং ছানা কাঁদে হ্যান হ্যান,
ও, ছানা, চুপ দে, তোর বাপের মার খেতে নারি। —ঐ

১৬১

ভাঙ্গা ঘরে দিনের আলো আলো মুখে শুইও না।
তুমি আমার চোখের কাজল জলে ধুইয়া দিও না। —ঐ

১৬২

গাড়ী নাম রেল চলে কতনা শব্দ করে।
নীল বরণ ধোঁয়া ওড়ে, চল, যাব রেল দেখিতে। —ঐ

১৬৩

ঘটি কটি মাজিবো, মাঝা ঘরে রাখিবো।
জল ঘটি নিয়ে শ্যামকে আইস আইস ডাকিব। —ঐ

১৬৪

কুলি মুড়ায় টানাটানি, ছাড়, লোহা দিব আমি।
বুড়া বয়সে নাগা দিল খালভরার এত মনে ছিল। —

নিম্নের পাঁচটি গান ছো-নাচ উপলক্ষেও গীত হয়।

১৬৫

আচম্বিতে ভীরগু রাম দিলে দরশন।
যে ভাঙ্গিবে হরধনু তারে সীতা কন্যা দান। —

১৬৬

অগ্‌গেতে রাম মধ্যমণি পশ্চাতে লক্ষ্মণ,
তিন জনে যুক্তি কইরে যাবেন মেথিলা ভবন। —

১৬৭

বোম্ বোম্ ভোলা বামে গিরি বালা,
মাথায় জটা ত্রি-শূল ধরা নাচেন গৌরী ভোলা। —ঐ

১৬৮

আসছেন মহাবীর পবন নন্দন,
পবন পুত্র স্মরণ করেন কিসেরই কারণ। —ঐ

১৬৯

আচম্বিতে সোনার মৃগ দিলে দরশন,
এই মিরিগ ধইরে দেও,
গুণেরই শ্রীরামলক্ষ্মণ। —ঐ

১৭০

নিমন্ত্রণ করি না, ভাই, ডরে
তুমি গাঁজার নেশায় পাগল হইয়েছিলে।
শ্বশুর ঘরের লোক এসেছে মন বড় খারাপ
শ্বশুর বলে, চলগো ঘর, মন সরেনা আর। —ঐ

১৭১

তুমি আমার কেবা ছিলে
আমায় বিকে তুমি টাকা নিলে।
পাকা খাতায় লেখাইলে সাত পুরুষের নাম কালিয়া সাত॥
ফাঁকি দিয়ে তুমি পালালে আসাম।
সাহেব দিল কোদালের কামাড় কলিয়া নাম।
একটি ত্রুটি কথা বলে গাম করালে চিপুসরে
চিপু দেখে উড়িবে পরাণ, রে কলিয়া··· —ঐ

১৭২

কাটুল হল কাপড় কিনি গণ্ডো বড় মুনি,
কি আনন্দে হল, ভাই, একবাটি তেলেতে,
১৩৫৩ সালে দেওয়ায়া মাড়পানি দেওখাও চাটিনী।
চা না খাহিলে ছোট বলে তেরশো তিপ্পান্ন সালে॥ —ঐ

১৭৩

ধনী, নিচিতপুর, বেজ বাজার কতদূর,
ও হো যে সাধনপুর,
রাইতি যে কাদা কতদূর ও হো যে। —ঐ

১৭৪

বাকলপরা জটাধরা শ্রীরাম হলেন বনচারীকেকয়ের বচন।
শ্রীভরতকে রাজ্য দিয়ে শ্রীরাম গেলেন বনে,
দুঃখ রইল মনে।
মায়ের নিত্য বদন দেখি ঝুরত কোশল্যা
এ বাঁচায় কাজ নাই, মা, কাজ নাই পিরীতে।
বড় দুঃখ রইল।
রাম বলে, ওগো, কতই পিতার কথা
চারিখণ্ড লেখে দিলা পড়েছি পুরাণ।

১৭৫

শাল গাছে সলোনি দাদার বহু লোলনি,
দাদার বহু খুঁজে মরে সোনার বাঁধা চিরুণী। —ঐ

১৭৬

চল যাব জলকে জোড়া মহুল তলকে,
বাজলো শ্যামের বাঁশরী ফিরে চল ঘরকে। —ঐ

১৭৭

চৈত-বোশেখ মাসে কাঁচা বাঁশে ভ্রমর বসে,
ভাবি দেখ গো, সংসারে আর কি রইব বাপ ঘরে॥

১৭৮

আইল পুবের ঝড় নিয়ে গেল টুয়ের ঘর,
দেখ, দিদি, আষাঢ়ের ঝড়ে বিজলীতে খামঘুঁটা নড়ে।

১৭৯

কুলি কুলি যাস না তুলহা নলি ছুঁস না,
কুল গেলে কলঙ্ক হবে কুলের বাহার হ'সনা।

১৮০

ভীম অর্জুনের কুলি মোরা সজনমুখী ধান হে,
হাতে শাঁখা কোমর বাঁকা মাথায় গাঁদা ফুল হে। —ঐ

১৮১

ঝিঙা ফুলটি ঝিঙা ফুলটি রাখিব ছাতার আড়ে,
কাকেও দেখাব নাগো আমার রঙ ছাড়ি দিব। —ঐ

১৮২

ঝিঙা তুলি ডালি ডালি আর ঝিঙা জালি হে,
শিশু ছাইলার বিহা দিয়ে অন্তর হইল কালি হে। —ঐ

১৮৩

বাঘবাঘিনী হাল বাহে বুঢ়া ডাল মুঢ়া ঝারে।
শিয়াল বঁধু ধান বুনে সমান খুঁজ, ভাই ॥ —বেলপাহাড়ী

১৮৪

বল, কোন লম্পইটার সনে করেছিলেম ভাব।
ভাবি গুণে দেহ হল সার আমার
ভাবিগুণে প্রাণ হল সার ॥ —ঐ

১৮৫

পুরণিমা রাতিয়া
(আর) হাতে হেরকিন বাতিয়া ॥
মনে পড়ে সখি পুরানো পীরিতিয়া।
জোসোনাকে রাতিয়া।
বেলতোলার মাটিয়া ॥
পুরণো পীরিতি ছেড়ে গেল ॥ —ঐ

১৮৬

কাঁকর হাতে আর রাঙ্গা লাঠি গামছা মোর দেহিরে চমকি গেলা।
কাঁকর হাতে বোয়াফুল মোর খোঁজারেতে মোহ কি গেলা।
রাজাকা হাতে রাঙা লাঠি গামছা দেহিরে চমকি গেলা।
রাণীকা হাতে বৌয়াফুল মোর খোঁজারে মোহকি গেলা ॥ —ঐ

১৮৭

তুলি খাইও না কুচিফুল তুইলো না
কুচি ফুলের মালা বঁধুর গলে দি'ও না। —ঐ

১৮৮

কুলি কুলি কাগজী ফুল তুইল না,
কাগজী ফুলের মালা বঁধুর গলে দিওনা। —ঐ

১৮৯

খোল ভুঁয়ের গোদা হাঁড়ী কিরকিট বনের কাঠরে,
খায়েলে খায়েলে, বঁধু, হয়াএ্যলে ভাতরে। —ঐ

১৯০

আমাদের দেশে কাঠ নাই জোনার খাঁড়ায় র াধে।
কোন দেশের বিদেশী এ্যাসে খাঁয়ে গেল বাসি। —ঐ

১৯১

উপরে গরম বলা তল তাতা বালি গো।
চলিতে না পারে রাই করিছেন বিকাল গো॥ —ঐ

১৯২

বড় বড় পাহাড়ে বড় বড় ওল যে।
হাঁ গো, হাটে বিকিবাটে গোণ্ডগোল রে॥ —ঐ

১৯৩

সকালে শুয়ে উঠি, আয়ো বলে দেগো বিটি সামলে টাকা আয়ো।
বিনা আলে টাকা আয়ো সহজে হয় নাই,
কামরাঙ্গা দেই, আলো, সকলে পড়িল॥ —ঐ

কোন কোন অঞ্চলে সাধারণত চৈত পরবে ও বৈশাখ পরবে পাতানাচ হয়। রোহিন অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ই তারিখ আনুষ্ঠানিক ভাবে বীজ বপনের দিনও পাতানাচ হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৬ তারিখেও এই পাতা নাচ হয়।

১৯৪

তোমার মন কেমন রে আমার মন উড়াতে বলে
জনমেতে পাখি নাই হলাম পালক নাই হলে রে,
আমার মন উড়াতে বলে। —ঐ

১৯৫

কুঁকড়া, মা, ডাকিল, ওঠো দিদি, বিদেশে যাইও,
শিহুড়ি জেলা দিদি সাঁকো ধারে।
পরের বেটা যদি বিপথে হয় তো,
বিপথে পড়ে তো, ওলো, দিদি, মায়া না ছাড়। —ঐ

আদিবাসীর ভাষা হইতে কি ভাবে পাতানাচের গানগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা জন্মলাভ করিতেছে, নিম্নলিখিত কয়েকটি গান তাহার নিদর্শন। বাংলা ব্যাকরণের কোন শাসন এখানে স্বীকার করা হয় নাই। যদৃচ্ছা বাংলা এবং আদিবাসী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; সেইজন্য সাধারণ পাঠকের নিকট অর্থবোধ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

১৯৬

বড়দা দুলালী কুলি যাতে দুলালী কথা লো বলে,
বাঁইবামা বাজারে আপিসকা দুয়ারে সিপাহী টপে টাপ
কেন, দুলালী, বারণ করিব লো।
জাতি দুলালী ঘুঁচায়া দিল। —ঐ

বড়দা গ্রামের নাম।

১৯৭

দিলে হীরা লাল শাড়ী হাতে হীরা শাবনের শাড়ী,
কুচিত কুলি হীরা যাইও না, বাছারে,
শাবনের শাড়ী হীরা ধূলা লাগিল। —ঐ

১৯৮

দেশে দেশে বেড়ালাম, কোন দেশে মনে নাই বহে,
কোন দেশে মনে নাই থামে,
জলে ঝাঁপ দিব, মায়, জীবা যায় কতক্ষণ,
দম দিয়ে গো, মা, দেশে বলিব। —ঐ

১৯৯

মানভুঁই পুটি দিনেরাতে সারাদিন কাঁদে,
না ইটি কাঁদ পুঁটি না পুটি ভাব,
তোমার তিরি (স্বামী) পুঁটি বিদেশে গেল। —ঐ

২০০

দে গো বা চাল চিঁড়া লেগে আঁচলে লিও,
তিনো দিন খাব, মা, তিনটি আমড়া,
এ চিঁড়া খায়ে, মা, কতদিন রইব। —ঐ

২০১

আখড়া, মা, ঢুল ঢুল,
আখড়া তলে বিটি দাঁড়ালি কে যে,
সোনাগাড়া (গ্রাম) সযাতন
ধনসিং মানসিং লিখি দিল তোমায় নাচিতে বারণ। —ঐ

২০২

ঘর ছাড়ি দুয়ার ছাড়ি
ওগো, মীরা, যাবি গো কুথায়।
সরগে যাবি, মীরা, পাতালে যাবি,
ওগো, মীরা, যাবি গো কুথায়। —ঐ

২০৩

ই বছর নামাল যাব আর বছর সিনোট যাব,
নামালের টাকা লিবু সোনা বিষ্টুপুর শাড়ী,
দাঁড়ারে, লিবু সোনা শাড়ীরে লিবু। —ঐ

২০৪

(বড়) দাঁড়া হারা ঘরে পানফুঁগি বিটি বাড়িল
পানফুঁগি বিটি বাড়িল।
লিক্‌লিকে বেটা তোমার কবজে রাখিবে
পানফুঁগি বিটি লাগি ছাতি আড়িল ॥ —ঐ

২০৫

দাঁড়া হারা ঘর বলে বিরিহিরি পিঁড়া বলে,
ঘরে নাই তিরি, মা, তিরি নাই ঘরে,
দই চিঁড়া খাতে, মা, কতদিন রইব। —ঐ

২০৬

ঘর মাদ আঁচির পাঁচির তুয়ার বাঁধ ষোলটি তুয়ার,
তিরি মরিল গুয়াগাছ তলে, তিরি মরিল মাদ গুয়াগাছ তলে,
বামনবাটি লোক মাদ মাটি দিল। —ঐ

২০৭

সাঁজে ফুটে ঝিঙ্গা ফুল সকালে মলিন হে,
আজ কেন কালার বদন মলিন হে, আজ কেনে। —ঐ

২০৮

ফুটিল পারুল ফুল, বাবা গো, অনেক দূর,
তোর মন শুকনো দেখে আমার মন ভাঙ্গিল রে॥ —ঐ

২০৯

জোড়গাছে রাগে বঁধুকে সাজালে বাঁশীরে
আমি গেলে নন্দলাল ভাঙ্গিবে কলসীরে।
পাড় বঁধু, চর বঁধু, দেখিবে তামাসা রে॥ —ঐ

২১০

বড় বড় পাহাড়ে ফুটিল পলাশের ফুল গণি গণি গো,
বিনি সুতা মোটা সুতা হার গেঁথে দেবো,
সাঁইয়াকে পরাব আমি॥ —ঐ

২১১

জয়পুরের জয় আম পাতরে ধরেছে আম,
দিদিলো, জয়পুরের পাথর দালান,
দিদিলো, তোকে ধরাব আদালতে
দিদিলো, তোকে ধরাব ইস্কুলেতে॥ —ঐ

২১২

কোন্ ঘাটে নামে রাজা দশরথলাল চিকনকালা হে,
কোন্ ঘাটে নাচে হনুমান।
কোন্ নদী বহে ছলকি ছলকি,
কোন্ নদী বহে নিরধারে।

কোন্‌খানে ফুটে হলদিরে ঝিঙ্গা ফুল,
কোন্‌খানে ফুটে লাল শালুক ফুল,
কোন্ রাতে ফুটে হলদিরে ঝিঙ্গাফুল মালাদহে ॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটি পাতা গান বলিয়া সংগৃহীত হইলেও ইহার প্রকৃতি সাধারণ পাতানাচের গান হইতে একটু স্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে ভবপ্রীতার ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, তাহার অর্থ এই যে, মৌখিক রূপ ইহাতে লিখিত রূপ লাভ করিয়াছে এবং তাহা পুনরায় মৌখিক প্রচারিত হইয়াছে।

২১৩

তুমি বনমালী আমি কুসুম কলি।
তোমার প্রেম-সূতায় মালা, গাঁথব দুজনে মিলিয়ে রবো ॥
তুমি শ্রী পঙ্কজনা আমি শ্রী যমুনা।
তোমায় হৃদয়ে মাঝাতে তুলি রাখব দুজনে মিলিয়ে রবো ॥
তুমি দিবাকর আমি শশধর,
তোমার আলোক পেলে সদা হাসব হাসব দুজনে মিলিয়ে রব ॥
তুমি ফণিবর আমি বাজিকর।
দিগম বলে, আর কদিন বাঁচব বাঁচব দুজনে মিলিয়ে রবো ॥
কালোনিশি অবসানে বংশী বাজুক মিলনে,
আমি মিশাইব অধরে অধর গো
আজ নিশি মোরে ক্ষমা কর ॥
আজ ব্যাকুল হবে তাহারি অন্তর গো,
আজ নিশি মোরে ক্ষমা কর ॥
আজ মদনে হাসিবে ফুলশর গো,
আজ নিশি মোরে ক্ষমা কর।
বিষম কুসুম বনে দাহিলে রাধার প্রাণ,
কুপিত হবে আমারই অন্তর গো।
আজ নিশি মোরে ক্ষমা কর ॥
না রহিবে উপায় আমার গো, আজ নিশি মোরে ক্ষমা কর ॥
ভবপিতার গতি রাধা কর গো।
আজ নিশি মোরে ক্ষমা কর ॥ —বেলপাহাড়ী

পানখিলের গান

পুর্ব মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম শ্রীহট্ট অঞ্চলের হিন্দু সমাজের বিবাহের একটি প্রাথমিক আচারের নাম পানখিল। পাঁচ জন এয়োতে মিলিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে পানের মধ্যে খিলি বা খড়্‌কে পরানোর নাম পানখিল। ইহাকে পানখিলি এবং পান ভাঙ্গানিও বলে। পানের মধ্যে খিলি দিবার অর্থাৎ খড়্‌কে পরানোর একটি ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্য আছে। ইহাতে দাম্পত্য জীবনের পরস্পরের যোগ (union) সাধন বুঝায়। বিবাহাচারের মধ্যে বরকনের ইহাই মিলনের প্রথম রূপক। বর এবং কন্যা উভয়ের বাড়ীতেই এই আচারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মেয়েলী সঙ্গীত ইহার মধ্যে অপরিহার্য।

১

পুরবাসিগণ. সুপারি কাট গো নারীগণ।
আইস আইস আইস মিলি—আইসা দাও পান খিলি
যার হস্তে সোনার কাটারী, সে আইসা কাটে সুপারি।

—পুর্ব-মৈমনসিংহ

২

আয়গণে ডাকাইয়া, উঠানখানি লেপাইয়া
লক্ষ্মী আইসা দিলাইন আলিপন।
লক্ষ্মী দিলাইন আলিপন, গঙ্গা আইতে কতক্ষণ (রাম রে),
গঙ্গা আইসা বসাইল মঙ্গলঘট।
গঙ্গা বসাইল মঙ্গলঘট, পদ্মা আইতে কতক্ষণ (রাম রে),
পদ্মা আইসা জ্বালাইন্ ঘিয়ের বাতি।
পদ্মা জ্বালাইন্ ঘিয়ের বাতি, কালী আইতে কতক্ষণ (রাম রে),
কালী আইসা দিলাইন জোকার।
কালী আইসা দিলাইন জোকার, দুর্গা আইতে কতক্ষণ (রাম রে),
দুর্গা আইসা দিলাইন পানখিল। —ঐ

পার্ব্বণ-সঙ্গীত

যে সকল সঙ্গীত বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে কিংবা নির্দিষ্ট তিথিতে বিশেষ কোন সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে গীত হয়, তাহাকে সাধারণত পার্বণ-সঙ্গীত বলা যায়। ইংরেজিতে ইহাকেই Calendric song বলে। বিবাহ-সঙ্গীত যেমন পারিবারিক জীবনের বিবাহের প্রয়োজনে গীত হয়, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত তাহার পরিবর্তে বৃহত্তর সামাজিক জীবনের উৎসব অনুষ্ঠান অর্থাৎ পূজাপার্বণ ইত্যাদি উপলক্ষে গীত হয়। বৎসরের মধ্যে ইহাদের গাহিবার সময় নির্দিষ্ট থাকে. বিবাহ-সঙ্গীতের মত বৎসরের যে কোন সময় ইহারা গীত হয় না। বিশেষতঃ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য যে গান সুনির্দিষ্ট আছে, সেই অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ইহারা অন্যত্র কোথাও গীত হয় না। ইহাদের এই বিষয়ে যে একটু অনমনীয়তা (rigidity) আছে, তাহাই ইহাদের ক্রমবিকাশের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, পূজার মন্ত্রের মত ইহারা প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট এক একটি রূপের মধ্যে সুনির্দিষ্ট হইয়া যায়। যে সকল পূজাপার্বণের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক, সেই সকল পূজাপার্বণ সমাজের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গেলে ইহাদেরও বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠে। লোক-সঙ্গীত ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে রকম বিকাশ লাভ করে, ইহারা সেই ধর্ম হইতে অনেকখানি বিচ্যুত হইয়া পড়ে। সেইজন্য সাধারণত ইহাদের বিনাশ হয় , কিন্তু বিকাশ হয় না। সুতরাং অতি অল্প ক্ষেত্রেই ইহাদের মধ্যে সাহিত্যিক গুণের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তবে বাঙ্গালীর পূজাপার্বণের মধ্যে যে একটু বিশেষত্ব আছে, তাহা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, পূজাপার্বণের শাস্ত্রীয় আচারের অন্তরাল দিয়াও ইহার একটি লৌকিক আচারের ধারা সর্বত্রই প্রবহমান থাকে। সেই লৌকিক আচারের মধ্য দিয়া অনেক সময় মানবিক গুণ বিকাশ লাভ করে। অধিকাংশ অনুষ্ঠানের সঙ্গেই এক একটি লৌকিক কাহিনীও জড়িত হইয়া যায়, সেই লৌকিক কাহিনীটিই বিচিত্র মানবিক গুণ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

প্রথমত বৎসরের বিভিন্ন মাসে যে সকল পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা অনুসরণ করিয়াই পার্বণ-সঙ্গীত রচিত এবং গীত হয়। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সঙ্গীতের একটি অংশ আঞ্চলিক সঙ্গীতের মধ্যেও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যে সকল সঙ্গীত কেবলমাত্র সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী

প্রচলিত পুজা-পার্বণে গীত হইয়া থাকে, তাহাই এখানে পার্বণ-সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ়—বৎসরের এই তিনটি মাসে অনুষ্ঠিত কোন সামাজিক উৎসবের বিশেষ কোন সঙ্গীত সংগৃহীত হইতে পারে নাই। এই সময়ে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহাদের অধিকাংশের সঙ্গেই ছড়ার সম্পর্ক থাকিলেও কোন সঙ্গীতের সম্পর্ক থাকে না। আঞ্চলিক সঙ্গীতের মধ্যে ইহাদের কিছু কিছু নিদর্শন পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রাবণ মাসে ব্যবহৃত একটি পার্বণ-সঙ্গীত এখানে উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রথমতঃ শ্রবণ মাসে যে মনসার পুজা হয়, সেই উপলক্ষে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়। একটির নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১

লামো, মনসাদেবী, শঙ্কর-দুহিতা।
জরৎকারু মুনি-পত্নী আস্তিকের মাতা॥
ব্রহ্মার দুর্লভ রথ দিয়াছেন বাপে।
সেই রথে লামো, মাগো, পূজার মণ্ডপে॥
হংসবাহন রথে জয় পদ্মাবতী।
অষ্টনাগ লইয়া লামো দেব পশুপতি॥
জালুমালু দুই ভাই কার্তিক গণাই।
সঙ্গে করে নিয়া লামো পাত্র নেতাই॥
আলিপন চিত্রপট রক্ত পদ্মপাতে।
আতপ তণ্ডুল ক্ষীর ঘৃত মধু তাতে॥
স্থানে স্থানে পাতিয়াছে রক্ত পদ্মপাতে।
কুশিয়ারি খণ্ড খণ্ড শোভিয়াছে তাতে।
হংস কবুতর বলি ছাগ মেষ সনে।   —মৈমনসিং

পালা

বাংলা কাহিনীমূলক লোক-সঙ্গীতে পালা শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত গানের পালা শব্দের অর্থে গানের বিষয় বুঝায়; দ্বিতীয়ত পালা শব্দের অর্থে সমগ্র বিষয়ের এক একটি অংশও বুঝায়। সুদীর্ঘ মঙ্গল গানের

একদিনের দিবা ভাগে যে অংশ গীত হয়, তাহাকে দিবা পালা এবং রাত্রি ভাগে যে অংশ গীত হয়, তাহাকে রাত্রি পালা বলে। পালা শব্দটি সংস্কৃত 'পর্যায়' শব্দ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।

যাত্রা গানের বিষয়কেও পালা বলে, যেমন 'সাবিত্রী সত্যবান পালা', 'নল দময়ন্তী পালা' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রক্তকরবী নাটককে বলিয়াছেন ইহা নন্দিনী নামে এক মানবীর পালা। রবীন্দ্রনাথও গানের বিষয় অর্থে পালা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

পুর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের প্রচলিত গীতিকা বা ballad কে সাধারণভাবে পালাগান বলা হয়। যেমন 'বাগুনীর পালা', 'কুড়া শীকারীর পালা' ইত্যাদি। পালা বলিতে যেমন মঙ্গলগানের এক একটি বিছিন্ন অংশ বা অধ্যায়কে বুঝায় পালাগান বলিতে পুর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের লোক-সমাজে সমগ্র একটি গীতিকা (ballad) বুঝায়। ইহা একই পালা শব্দের বিভিন্ন আঞ্চলিক ব্যবহার মাত্র।

পাহাড়ী রাগ

প্রাচীন বাংলার একটি রাগের নাম পাহাড়ী রাগ। 'গীত-গোবিন্দে' ইহার উল্লেখ নাই, কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' ইহার বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে। পাহাড়ী শব্দটি হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহা বাংলার সম্ভবত পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী কোন পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীর সঙ্গীতের রাগ। ইহা কোন শাস্ত্রীয় রাগ নহে। রাজমহল পাহাড়ের দ্রাবিড় ভাষাভাষী অদিবাসী উপজাতিকে মাল পাহাড়ী বলে, তাহাদের সঙ্গীতের কোন রাগ বাংলার সমতল ভূমিতে আসিয়া প্রচলিত হইয়া পাহাড়ী রাগ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে।

পাশা খেলার গান

বিবাহের একটি আচারের নাম পাশা খেলা, ইহা কেবলমাত্র আঞ্চলিক স্ত্রী-আচার নহে, ইহা সারা বাংলাদেশ ব্যাপী অতি প্রাচীনকাল হইতে এবং পুরুষের সমাজে প্রচলিত। মুসলমান সমাজের বিবাহাচারেও ইহার প্রচলন আছে। বরকনের পাশা খেলিবার সময় এয়োরা গায়—

আজ কি আনন্দ—
কি আনন্দ হৈল গো সখি—রস-বৃন্দাবনে,
শ্যাম নাগরে খেলে পাশা মনোমোহিনীর সনে।
আজ কি আনন্দ—নিকুঞ্জের চারি ধারে কুঞ্জ লতার বেড়া;
কখন উঠে চন্দ্র সুরুয কখন উঠে তারা।
আজ কি আনন্দ—
সাক্ষী হৈও চন্দ্র সুরুয কইন্যার জ্যেষ্ঠ ভাই;
তোমার বোনে খেলে পাশা, আমার দোষ নাই।
আজি কি আনন্দ—
তোমার বোনে হার্‌লে পাশা দাসী হবে পায়,
শ্যাম-নাগরে হার্‌লে পাশা ভূষণ দিবে গায়।
আজি কি আনন্দ।— —ত্রিপুরা

২

পাশা খেলার গানে রাম আর কৃষ্ণ অনেক সময় একাকার হইয়া যায়, নতুবা রামের হাতে বাঁশী আসিবে কোথা হইতে ?

পাশা খেলে কে গো, পাশা ঢালে কে গো,
পাশা খেলে কিশোর আর কিশোরী।
খেলিতে খেলিতে পাশা, হারিলেন শ্রীহরি।
রামে ঢালে পাশা বারো, সীতায় ঢালে তেরো,
লক্ষ্মণে উঠিয়া বলে, দাদা, বুঝি হারো।
রামে যদি হারে পাশা নিব হাতের বাঁশী,
সীতায় যদি হারে পাশা হব নিজ দাসা।
পাশা খেলে গো। —ঢাকা

৩

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর ভণিতা পাওয়া যাইতেছে; ইহা তাঁহার রচিত রামায়ণেরই অংশ—

আজি কি আনন্দ হৈল জনক ভুবনে।
রামচন্দ্র খেলছেন পাশা জানকীর সনে॥

উত্তম শীতলপাটী ফুলের বিছানা।
সখীরা করিছে রঙ্গ কত না বাহানা ॥
আজি কি আনন্দ হৈল,
সোনার পাতিল শরা, সোনার একুশ কড়া,
তাহাতে খেলিছে পাশা অষ্টসখী ঘেরা।
চন্দ্রাবতী কহে পাশা খেল বিনোদিনী
পাশাতে হারিবেন এবার রাম গুণমণি। —মৈমনসিংহ

৪

বিবাহের গানে ক্বচিৎ রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়—

শুভক্ষণে খেলছে পাশা রাই সনে বংশীধারী,
চারিপাশে রঙ্গ করে সর্ব সহচরী।
আমার মনে এই আশা কৃষ্ণের সঙ্গে খেলব পাশা।
পাশাটি হারিলে দেবা কি এই বাক্য কইরাছি আমি।
কৃষ্ণ হারলে বংশী দিব রাধে হারলে হার দিব,
এই বাক্য কইরাছি আমি।
রাধিকা— তোমার বংশী বাঁশের আগা
আমার হার হাজার টাকা।
কৃষ্ণ— আমার বংশীর স্বরে গোপীগণের মন হরে
কেন কর বংশী নিন্দা। —ঐ

কুমারিয়া সরা পাতিল কামরঙ্গের পাটি
পাশাটি খেলিতে বসে জমিদারের বেটি।
কেবা হারে কেবা জিতে আগে কর প্রমাণ
রামে হারিলে দিব আট অলঙ্কার
বউয়ে হারিলে দিব দিদিরে ব্যবহার।
পাশাটি খেলিয়া কৃষ্ণ পলাইতে লাগিল
সঙ্গের সঙ্গী লোকে খুঁজিতে লাগিল।

বৃন্দাবন চণ্ডীবন সকলি খুঁজিল
জয় রাধার মন্দিরে যাইয়া দর্শন পাইল।
দরশন দে রে, কৃষ্ণ, দরশন দে,
রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন রাস বৃন্দাবনে। —ঐ

বিবাহের স্ত্রী-আচারে যে পাশা খেলার গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কখন শ্রীরামচন্দ্র কিংবা শ্রীকৃষ্ণকে সীতা কিংবা রাধিকার নিকট জয়লাভ করিতে শুনিতে পাওয়া যায় না।

পুতুল খেলার গান

ছোট ছোট মেয়েরা পুতুল খেলার সময়ও কখনও কখনও গান গায়; নির্দিষ্ট কোন গান তাহার জন্য না থাকিলেও এই বিষয়ক দুই একটি গানেরও সন্ধান ওয়া গিয়াছে।

১

পুতুল খেলার বিয়ে লো সই।
আমার পুতুলটি বর হোবে সই॥
তোর পুতুলটি কনে।
আমরা কনের গয়না গাঁটি নুবো গুণে॥
আমরা বরের মাসী পিসী।
লুচি মোণ্ডায় হোব খুসী॥
আমরা এয়ো করব বরণ
ডালা মাথায় নিয়ে॥ —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

পুতুলনাচের গান

পুতুলনাচের প্রকৃতি এবং বিষয় অনুযায়ী ইহার পটভূমিকায় নানাপ্রকার পরিবেষণ করা হইয়া থাকে। নানাপ্রকার পুতুল হইলে বিভিন্ন প্রকৃতির খণ্ড গীতি এবং দীর্ঘ আখ্যায়িকা ভিত্তিক একই প্রকৃতির পুতুল হইলে ধরণের গীত গাওয়া হয়। নিম্নোদ্ধৃত গানগুলি বিভিন্ন বিষয়ক পুতুলের উপলক্ষে গাওয়া হয়।

প্রথম গানটি বন্দনারূপে গাওয়া হয়। কিন্তু বিনা পুতুলে বন্দনা হয় না
এখানে একটি কৃষ্ণের পুতুল প্রদর্শিত হয়।

১

আমার এই বাসনা পুরাও, সাঁই,
একবার হয়ে বাঁকা, দাও হে দেখা, গুণধাম।
কোথায় আছ, দয়াময়, তরাও গো আমায়,
জ্ঞান চক্ষে হেরে, আমার পূর্ণ কর মনস্কাম,
আমার এই বাসনা পুরাও, সাঁই।

২

মনে হইতেছে, এখানে একটি বন মানুষের পুতুল নাচিতেছে—

আমাদের বুন মানুষের হাড়ে কত গুণ, জলে লাগায় আগুন।
ডিঙ্গলাকে কাঁচকলা বলে, পটল কা বেগুন,
জলে লাগায় আগুন।
উস্‌তাদের গুণ জাহির করি,
নুনকে করি চুণ, জলে লাগায় আগুন।
আমাদের বুন মানুষের হাড়ে কত গুণ, জলে লাগায় আগুন।—

৩

এইবার একটি পেত্নীর পুতুল—

এবার মোরে হব প্রাণ পিপেশী,
শাওড়া তলায় করব বাসা রাশি রাশি।
কালোরে কালবরণী, কালো রূপে করব আলোনী,
কালো মেঘের কোলে দেখি, অতি কালো,
ছুলে পরে রঙ্‌ হবে কালো।

৪

এইবার পুতুলনাচের মধ্য দিয়া দাম্পত্য জীবনের একটি সরস চিত্র দে
যাইতেছে—

ওলো সুন্দরি! কার কথায় করাছো তুমি মুন ভারি,
আমি যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারি,
কার কথায় করাছো তুমি মুন ভারি।

তুমি আমার বালাম চাল, যেমন অড়হরের ডাল,
গোল আলু, চিংড়ি ভাজা, আলু পটল চচ্চড়ি,
কার কথায় করাছো তুমি মুন ভারি।
তুমি আমার রৌদ্রের ছাতা, শীতের কাঁথা, মশার মশারি,
তুমি আমার রসে ভরা রসগোল্লা, তুমি আমার ডালপুরি,
কার কথায় করেছো তুমি মুন ভারি —ঐ

এইবার ঝাড়ুদারের পুতুল নাচিতেছে—

৫

ঝাড়ুদারী কর্ম করি, করিব না আর এ চাকুরী,
খিদের জ্বালায় জ্বলে মরি, রাজা হ'ল মোদের বুরী।
ঝাড়ুদারী কর্ম করে, খেতে পায় না পেটটা ভরে,
ক্ষিদের জ্বালায় জ্বলে মরি, করিব না আর চাকুরী। —ঐ

ঝাড়ুদারেরা সাধারণত পশ্চিমদেশীয় লোক ; সেইজন্য চিত্রটিতে বাস্তব রূপ
ার জন্য এইবার হিন্দীভাষার ব্যবহার করা হইতেছে—

৬

ম্যায় তু ঝাড়ু দে চুকা ফজল মে হো,
কাহে বুলাবে আদমি,
না মিলে ছুটী, গমকা রুটী,
লেড়কা বালা ভুক্‌মে মারা হো, কাহে বুলাবে আদমি। —ঐ

এইবার ফরাসদারের পুতুল—

৭

বারে বারে ফরাসদারে, ডেকোনা হে আর,
যাচ্ছি ফিরে রাজদরবারে, আমি ফরাসদার।
আমি ফরাসদার কি হে, তুমি ফরাসদার,
বারে বারে ফরাসদারে, ডেকোনা হে আর। —ঐ

এখন ভিস্তিওয়ালার পুতুলের নাচ দেখা যাইবে—

৮

কাহে ভেস্তিবালা, একেলা ভবানীপুর কামেলা,
রাজার হুজুরেতে যাব মোরে পানি দিতে,

আসতে হইল মোর, দু'দণ্ড বেলা, ভবানীপুর কামেলা,
মিঠা পানি আনতে বাবু বলেন আমারে।
মিঠা পানি মিলিল না মোর এ ত্রিসংসারে।
মোর, দারকা, দামুদর নদী, কানা, কুয়া, গঙ্গা, বাঁকি,
লাগাত পদ্মার ধার অবধি,
গেলছিলাম, মোরে মিঠা পানি মিলিল না, মোর এ ত্রিসংসারে। —ঐ

এইবার বেদের পুতুলের নাচ—

৯

মহারাজের বেদে আমি, আমি বেদে বড় গুণী,
সাপ ধরি গো, জোড়া জোড়া, হলহোলা ঢামনা ঢোঁড়া,
আরো দেখি পানি বুরা, বেছে বেছে ধরি ইনি।
মহারাজের বেদে আমি, আমি বেদে বড় গুণী। —ঐ

কোনও নায়িকার নৃত্য এখানে দেখা যাইবে—

১০

ডুব মারি ভাই, ডুব মারি,
ঝপ্ ঝপাঝপ্ প্রেম-সরোবরে,
আর কিছু নয়, আর কিছু নয়,
দুনিয়া আকুল, যাক তরে যাক তরে।
ফুলের মালায় আয়, ফুলের মালোয় বয়,
ডাকছে কত রঙ বিলাসে,
আয়, আয়, আয়।
আয়, কে নিবি আয়, হৃদয় নিয়ে মাথামাখি,
আয়, কে যাবি আয়। —মুর্শিদাবা

দীর্ঘকাহিনী বা পালা অবলম্বন করিয়া যে পুতুল নাচ হইয়া থাকে, তাহ পটভূমিকায় সাধারণত পাঁচালী, কীর্তন, মালসী এই সকল সুরে গান হয়, কো কোন সময় মধ্যে মধ্যে গদ্য সংলাপও থাকে। সাধারণ পাঁচালী, কীর্তন, ঝু হইতে সেই সকল গান স্বতন্ত্র নহে।

পুরাণের গান

সংস্কৃত পুরাণের কাহিনী পণ্ডিতের কিংবা কথক ঠাকুরের মুখ হইতে শুনিতে পাইয়া তাহা অনুসরণ করিয়া নিরক্ষর গ্রাম্য কবি মুখে মুখে যে গান রচনা করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছে, তাহা পুরাণের গান বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহার দুইটি ভাগ, একটি গীত, আর একটি পাঁচালী (পাঁচালী দেখ)। লৌকিক অংশে গীতির নিদর্শন এবং অন্যান্য অংশে কাহিনীমূলক রচনার নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে।

পীরকীর্তন

পীর বা মুসলমান ফকির দরবেশদিগের অলৌকিক জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া যে সকল কাহিনীমূলক গীত রচিত হইয়া থাকে, তাহা পীরকীর্তন নামে পরিচিত। হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই গান ভক্তিভরে শুনিয়া থাকে। মুসলমান গায়েন হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের বাড়ীতেই আসর করিয়া এই গান পরিবেষণ করে। ২৪ পরগণা জিলা এবং মেদিনীপুর জেলাতেই এই গানের প্রচলন বেশি। ইহাতে সত্যপীরের কাহিনীই সর্বাধিক জনপ্রিয়।

পীর বাতাসী

'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় প্রকাশিত একটি পালাগানের নাম 'পীর বাতাসী'। ইহার কাহিনীটি এই প্রকার :

বিনাথ জন্ম দুঃখী। সাত মাস বয়সে পিতৃহীন হইল, পরের বাড়ীতে ধান ভানিয়া বিধবা জননী তাহাকে যখন ছয় বৎসর বয়স করিয়া তুলিল, তখনই বিনাথ মাতৃহীন হইল। এক ধনী সদাগরের গৃহে সে গরুর রাখালী করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার কুড়ি বৎসর বয়স হইল, সে সুন্দর বাঁশী বাজাইতে শিখিল। তাহার আশ্রয়দাতা সদাগরের কন্যার নাম সুজন্তী। তাহার বয়স বার। সদাগর একদিন বিনাথকে লইয়া বাণিজ্যে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পথিমধ্যে নৌকাডুবিতে কংসনদীর জলে ভাসিয়া চলিল।

নদীতীরের অরণ্যে এক পীর বাস করিত, সে ওঝার বিদ্যা জানিত। তাহার এক কন্যা, নাম বাতাসী। সে পিতাকে লইয়া নদীর জল হইতে

বিনাথের মৃতপ্রায় দেহ তুলিয়া আনিল। পিতার নির্দেশ মত ঔষধ বাটিয়া আনিয়া খাওয়াইল। জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া বিনাথ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বাতাসীকে দেখিল। বিনাথ মনে করিল, বাতাসীর পিতার নিকট ওঝার বিদ্যা শিখিবে। বিনাথ ক্রমে বাতাসীর প্রতি গভীর আসক্ত হইল। ক্রমে বিনাথ একজন খ্যাতিমান ওঝা বলিয়া সমাজে পরিচিত হইল। কিন্তু ইহাতে পীর তাহার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাহাকে বধ করিতে চাহিল। জানিতে পারিয়া বিনাথ পলাইয়া যাইতে চাহিল। বাতাসীর নিকট বিদায় লইয়া সে পলাইয়া গেল। দেশে ফিরিয়া বিনাথ দেখিল, সুজন্তী অন্য একজনকে ভালবাসে, তাহার কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। তখন বাতাসীর জন্য বেদনায় তাহার অন্তর করুণ হইয়া উঠিল। বাতাসীও তাহার নিজের দেশে বিনাথের জন্য উন্মনা হইয়া দিন কাটায়। ক্রমে বিনাথ তাহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইল; কিন্তু পীর ওঝার শত্রুতায় তাহার সর্পদংশনে মৃত্যু হইল। বাতাসী তাহার প্রণয়ীর মৃতদেহ লইয়া নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

প্রেম-সঙ্গীত

লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ প্রেম-সঙ্গীত। কিন্তু প্রেম-সঙ্গীত সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। পূর্বে আঞ্চলিক সঙ্গীত নামে যে একটি বিস্তৃত বিষয় নির্দেশ করিয়াছি, তাহার এক বিপুল সংখ্যক সঙ্গীত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রেম-মূলক, এ কথা উদ্ধৃত নিদর্শনগুলির মধ্য হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্বোদ্ধৃত আঞ্চলিক সঙ্গীতের অন্তর্গত ঝুমুর, ভাওয়াইয়া ও ঘাটু গান প্রধানত প্রেম-সঙ্গীত। তথাপি ইহাদের মধ্যে এমন এক একটি আঙ্গিক ব্যবহৃত হইয়াছে, যে জন্য ইহারা একটি সর্বজনীন ভাবমূলক রচনা হওয়া সত্ত্বেও, বাংলার সর্বত্র প্রচার লাভ করিতে পারে না। কেবলমাত্র বহির্মুখী আঙ্গিকই নহে, ইহাদের সুরের মধ্যেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে। সেইজন্যই ইহাদিগকে আঞ্চলিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এমন কতকগুলি সঙ্গীতও আছে, বিষয়-বস্তুর গুণে ইহারা বাংলার সর্বত্র প্রচার লাভ করিবার পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি হইতে পারে না; প্রকৃত পক্ষে ইহারা বিশেষ কোন অঞ্চলে উদ্ভুত হওয়া

সত্ত্বেও ইহারা নিজেদের আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করিতে পারে। প্রধানত তাহাদিকেই এই অধ্যায়ের মধ্যে উদ্ধৃত করা যাইবে।

প্রেম-সঙ্গীতগুলিকেও কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, প্রথমত ভাবমূলক, দ্বিতীয়ত বর্ণনামূলক। ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীতকেও দুইটি ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন লৌকিক এবং পৌরাণিক। পৌরাণিক অর্থে এখানে কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণই বুঝিতে হইবে। কারণ, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী অবলম্বন করিয়াই এই শ্রেণীর সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি, এই রাধাকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ হইতে আসেন নাই, তাহারাও লৌকিক চরিত্র, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার একটি সুনির্দিষ্ট ধারা এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে প্রধানত অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া ইহাদের স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হয় নাই—একটি আদর্শ সর্বদাই ধারাটিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে ; সেইজন্য লৌকিক ধারা হইতে ইহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম-সঙ্গীতে যেমন মিলনের এবং তাহার বিভিন্ন অবস্থার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতে বিরহ ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য ইহারা ধূলি-বালির স্পর্শে কোনদিক দিয়াই মলিন হইয়া উঠিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'সেখানে বাস্তবিকতার কোঠা পার হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। প্রাত্যহিক ঘটনা সাংসারিক ব্যাপার, সামাজিক রহস্য সেখানে স্থান পায় না। সেই অপরূপ রাখালের রাজ্য বাঙালি ছড়া রচয়িতা ও শ্রোতাদের মানস রাজ্য।' ('গ্রাম্য সাহিত্য', রবীন্দ্রনচনাবলী ৬, পৃ. ৬৫৭)।

রামসীতা কিংবা হরগৌরীর কাহিনী লইয়া যে সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত গার্হস্থ্য জীবন-বিষয়ক, প্রেম-বিষয়ক নহে। সুতরাং এই অধ্যায়ে তাঁহাদের নাম শুনিতে পাওয়া যাইবে না।

রাধাকৃষ্ণ

১

ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমরূপ কই, বিশাখা, আন্ গো তারে।
অহরহ প্রাণ কেমন করে, তুষের অনলের মত দহে অন্তরে,
আমার জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে, কি দিয়ে নিবাব তারে ?

অন্ত দিবস অবশেষ কালে, আচম্বিতে শ্যামের বাঁশী জয় রাধা বলে,
আমি রব শুনিয়ে চম্‌কে উঠলাম, গেলাম না কুটীলার ডরে।
মইজাছি এ তিন রসে,
তিন ভাবে তিন দিকে টানে, পাই না গো দিশে,
আমি স্থির হইয়ে রব কিসে, দিশা পাই না কই তোমারে॥
(আমি) কইতে নারি সইতে গো নারি,
বোবার স্বপনের মত গুমরি গো মরি,
আমার এ যৌবন যায় বিফলে,
বুক ফেটে যায় তারি গো তরে॥ —মৈমনসিংহ

বল বল, অ সুবল ভাই,
কেমন আছে বিধুমুখী, কমলিনী রাই।
যার কারণে বৃন্দাবনে, রে সুবল, আমি কান্দিয়া সদা বেড়াই॥
আমি গিয়াছিলাম মান সাধিতে, সাধলাম রাইয়ের চরণ ধরে;
নয়ন মেইলে চাইল না গো রাই॥
মনেছিল আশা, দিল দাগা রে,
আমার এই পিরীতের কার্য নাই॥ —ঢাকা

কৃষ্ণপ্রেম রাধার নাম যার অন্তরে।
তার দাগ লেগেছে দাগের মত; সদা দু'নয়ন ঝরে॥
কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক যে জনা,
কথা কয় বা না কয় প্রাণ-সজনী, দেখলে যায় চিনা;
অ তার সাক্ষী আছে উপাসনা,
প্রেমরসে হেলে পড়ে ঢুলে পড়ে॥
কৃষ্ণপ্রেমে যে জন মইজাছে,
রাধা প্রেমসাগর মাঝে সে রত্ন পাইয়াছে;
তারা পার হইয়ে ওপারে গেছে, কুলমান ত্যজ্য করে॥ —ঐ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'বংশীখণ্ডে'র পদের সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত পদটির তুলনা করা যাইতে পারে—

৪

আমার মন ত ভাল না রে,
হ'ল একি জ্বালা।
শাশুড়ী ননদী বৈরী, সে ঘরে বসতি করি,
ঘরে জ্বালায় ননদিনী গো, বাইরে জ্বালায় কালা॥
হল একি জ্বালা॥
যখন কালার কথা মনে পড়ে,
প্রাণ কান্দে আর চিত্ত কান্দে, যেন পাগল করে ;
আমার মনে বলে বনে যাই গো, বাদী হয় কুটীলা॥
হ'ল একি জ্বালা॥
যখন আমি রাস্তে বসি, তখন কালা বাজায় বাঁশী,
নাই গো তার নিশি দিশি, বাঁশীর গানে পাগল করে ;
আমার প্রাণ করে উতালা॥
হল একি জ্বালা॥ —ঐ

রাধা বিনে প্রাণ বাঁচে না, কেমনে পাসরি তায়।
যারে, উদ্ধপ, ব্রজের সংবাদ জেনে আয়।
অকস্মাতে মধুপুরী, মনে পৈল সে মাধুরী,
প্রাণ উদ্ধপ,—
সে দিন হতে ব্রজ ছেড়ে এসেছি রে নদীয়ায়॥
যে সুখে পোহায় রজনী, মন জানে আর আমি জানি,
রে প্রাণ উদ্ধপ,—
আমি শুইলে স্বপনে দেখি, জাগিলে না দেখি তায়॥
রাধা আমার প্রেমের গুরু, মনবাঞ্ছা কল্পতরু,
রে প্রাণ উদ্ধপ,—
নিজহস্তে দাসখত লিখে দিলাম রাঙ্গা পায়॥— —ঐ

উদ্ধবকে প্রাদেশিক উচ্চারণে উদ্ধপ বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে।

৬

কল্পতরু রে, তোমরা নি দেইখাছ শ্যামরায়।
জবাফুলে গৌরব করে আমার সর্ব অঙ্গ লাল,
আমায় নিয়া খেলা করে ব্রাহ্মণের ছাওয়াল।
কচুয়ে গৌরব করে আমার লম্বা লম্বা ফুল,
আকালে পাকালে আমি রাখি জাতিকুল।
সাপলায় গৌরব করে আমি উত্তম জলে ভাসি,
সারারাত্র ভরিয়া আমি চন্দ্রের লগে হাসি।
কদম্ব ফুলে গৌরব করে আমার সর্ব অঙ্গে রেণু
মোরে নিয়া খেলা করে নন্দের ঘরের কানু।
চাঁদেত গৌরব করে আমি লয়ে উঠি তারা,
রাধিকায় গৌরব করে আমি কানুর গলের মালা। —ঐ

৭

যাইতে যমুনার জলে একটী চুলা দেখলাম রাজঘাটে,
ভিন্ন দেশী পরবাসী রুসৈ কৈরা খাইছে।
(হায় গ রসের ননদিনী)।
হাতে হাড়ি মাথে খড়ি, (অ ননদিনী গ), ভিজা না কাষ্ঠ খড়িখানি,
কাঁচা চুলা রুসৈ করতে ঝ'রেছে সোনা আঁখির পানি।
(হায় গ রসের ননদিনী),
শৈল মচ্ছ, শালুয়া মুলা (অ ননদিনী গ),
এক হাতে দেখছি রুসৈর হাঁড়ি,
আগুনের ছলে বন্ধু ফিরে বাড়ী বাড়ী।
(হায় গ রসের ননদিনী)
নারীর দেশে বাঘের ভয়, (অ ননদিনী গ),
একেলা পরবাসী বাইরে রয় ;
ডাক দিয়া আন তারে আমার এই মন্দিরে।
(হায় গ, রসের ননদিনী)। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটির মধ্যে একবার মাত্র যমুনার উল্লেখ এবং ননদিনীকে

সম্বোধন ব্যতীত রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের আর কিছু নাই। এখানকার যমুনা এবং ননদিনীর উল্লেখ রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী নিরপেক্ষও আসিয়া থাকিতে পারে। বিশেষত যে চিত্রটি এখানে পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহা রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের লৌকিক কিংবা পৌরাণিক কোন অংশেরই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। ইহাতে দেখা যায়, এক বিদেশী পথিক নদীতীরে চুলা তৈয়ার করিয়া রান্না করিয়া খাইবার আয়োজন করিতেছে। গ্রাম্য যুবতী তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া আশ্রয় দিবার কথা তাহার ননদিনীকে বলিতেছে। সুতরাং ইহা লৌকিক সঙ্গীত, যমুনা এবং ননদিনীর উল্লেখ সত্ত্বেও রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই।

৮

আমারে শুনাইও ঐ কৃষ্ণের নামটী গ, প্রাণসখী, আমার।
কি ক্ষণে জলেরে আইলাম, প্রাণসখী গ (সখী অ গ), কালা উঠে মনে,
কলসী ভাসিয়া যায় দুই নয়নের জলে।
কি ক্ষণে রান্ধনে আইলাম, প্রাণসখী গ, (সখী অ গ) শুইনা বাঁশীর তান,
মোর চিত্ত ভুইলা রইল শুইনা বাঁশীর গান।
কি ক্ষণে রান্ধনে আইলাম, প্রাণ সখী গ, (সখী অ গ),
চাইলা দিলাম জল,
পোড়া চাউল ভাইসা উঠে, জলে না হয় তল।
কি অপরূপ দেখে আইলাম, প্রাণসখী গ, (সখী অ গ),
চাঁদার উপর চাঁদ,
শুধা তনু লইয়া আইলাম ঘরে, প্রাণ রইল মোর বান্ধা।
আমি যদি মরি, প্রাণসখী গ, (সখী অ গ), তোমরা সবে আইও,
তোমরা লইও কৃষ্ণের নাম মোর কানে শুনাইও।
আমি যদি মরি, প্রাণসখী গ, (সখী অ গ), না ভাসাইও জলে,
মোরে নিয়া বাইন্ধা রাইখ তমাল গাছের ডালে।
হাত দিয়া দেখ, প্রাণসখী গ, (সখী অ গ), রাধার শরীর,
ধানটা দিলে খৈটা ছিটে রাধার ফাটে যে অন্তর।
কালিয়ার চঞ্চল আমি, সখী গ, (সখী অ গ), যার পানে চায়,
নাগিনী দংশিলে যেমন বিষে অঙ্গ ছায়। —ঐ

তোরা বাইর হলো, বাইর হলো, দূতী, কোন্ বনে লুকাইল কানাই
দূতীর গলায় কুন্দের মালা বৃন্দার গলায় দিয়ে,
যায় গো সুন্দরী রাধে মথুরা বেড়াইয়ে।
এই খানেতে দেখলাম কৃষ্ণ, এই খানেতে নাই,
ফুল বৃন্দাবনে আমি হারাইলাম কানাই।
আমি যদি মরি প্রাণে তোমরা সবে আইও,
তোমরা লইও কৃষ্ণের নাম মোর কানে শুনাইও।
আমি যদি মরি প্রাণে, অ গ দূতী, না ভাসাইও জলে,
মোরে নিয়া বাইন্ধা রাইখ তমাল গাছের ডালে। —

১০

রাধা বলে প্রাণ কেঁদে ওঠে রে,—
ভাই রে, সুবল।
কি দিয়ে বুঝাব চিত্ত
ধৈরয না মানে পরাণে রে—
ভাই রে, সুবল।
সুবল আমায় কর সুখী, দেখায়ে রাই বিধুমুখী,
তারে না দেখিলে প্রাণে মরি,
উপায় কি করি এখন রে—
ভাইরে সুবল।
তুই ত আমার অন্তরঙ্গ, করা রে কিশোরী-সঙ্গ,
রাধা অঙ্গে দিয়ে অঙ্গ
পুরাই মনের বাসনা রে।
শাশুড়ী ননদী ঘরে, যেতে হবে খুব হুসা'রে,
ভাল চতুর জেনে তোরে
পাঠাইলাম কি জানি কি ঘটে রে।
রাধারাণী জগৎবন্ধু যারে, পঞ্চতত্ত্বে কৃপা করে
নিষ্ঠারতি হলে পরে,
রাধারাণী কৃপা করে তাহারে। —ঐ।

১১

আমার হৃদাসনে দাগ লাগাইল গো,
শ্যামবন্ধু কালীয়ায়—।
সাপের বিষ ঝাড়িলে নামে গো,
প্রেমের বিষ উজান ধায়।
যত ওঝা বৈদ্যের নাইগো সাধ্য
ঝাড়িয়া বিষ নামাইয়া যায়
আমি নগর দিয়ে হাঁইটে যাইতাম গো
কত লোকে মন্দ কয়।
ওগো পরের নিন্দা পুষ্পচন্দন
অলঙ্কার পড়্যাছি গায়॥
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী,
কেমন জানি শুনা যায়।
ইচ্ছা হয় গো ভ্রমর হইয়ে
উড়ে পড়ি বন্ধুয়ার গায়॥ —ঐ

১২

আমি রাধার এই হৈল ভাবনা, সই গ, বন্ধুয়া বন্ধুয়া বৈলে।
যমুনায় জলেরে যাইতে, প্রাণসখী গ, (সখি অ গ), দেওয়ায় করল আন্ধি,
হারাইয়া রাজপন্থ কৃষ্ণ বৈলা কান্দি।
তোমরা যতেক সখী (সখী অ গ) জলেরে নি গো যাইবা,
যাচিয়া যৌবনধন আমার বন্ধুরে নি গো দিবা।
যমুনার জলেরে যাইতে সখী (সখী অ গ) পন্থে পড়ল বাধা,
ভাঙ্গিল কাঙ্কের কুম্ভ, রাধার হস্তে রৈল কান্ধা।
হেন মনে লয়, প্রাণসখী গ, (সখী অ গ). পসার দোকান পাই,
তোলায় মাপিয়া বিষ খাইয়া মৈরা যাই। —ঐ

১৩

কি বল কি বল, সই গ, কি বল আমারে,
আমি ঘরে না রহিতে পারি, সই গ, বন্ধুর বাঁশীর স্বরে।

আমি যে কলঙ্কী, সই গ, লোকে মোরে দোষে,
সহইরা বাজাইয়া লোকে মুখ চাইয়া হাসে।
বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ী, সই গ, মধ্যে ক্ষীর নদী,
উইড়া যাইবার সাধ ছিল পাখা না দেয় বিধি।
বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ী সেই গ, মধ্যে নলের বেড়া,
হাত বাড়াইয়া পান দিতে দেখ্‌ল কপালপোড়া।
আম ধরে ঝোপাঝোপা, তেঁতুল ধরে বাঁকা,
দেশের বন্ধু বিদেশ গেলে আর না হবে দেখা।
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে, সই গ, তারে বলে টিয়া।
মৈলে যে জিয়াইতে পারে দরশন দিয়া। —ঐ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'বংশীখণ্ডে'র মূল স্বরটি এই গানটির মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্বে এবং পরে আরও দেখা গিয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন খণ্ডে প্রধানত 'বংশী এবং পারখণ্ডে'র বিষয় বাংলার নানা লোক-সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলা অর্থাৎ যে অঞ্চল হইতে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই অঞ্চলেই নহে, বাংলার পল্লী অঞ্চলের সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ পদ ছড়াইয়া আছে। তবে মুখে মুখে তাহাদের রূপ কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে মাত্র।

১৪

আইক্ষের জলে বক্ষ ভাইসা যায়।
যাইতে যমুনার জলে দেওয়ায় করল আন্দি,
হারাইয়া রাজপন্থ কৃষ্ণ বৈলে কান্দি।
(গ জলেরে যাইও না),
কলসী ভরিয়া রাধে থুইল উঁচা পাড়ে,
কলসী ভাঙ্গিয়া গেল বিনোদ রাখালে,
(গ জলেরে যাইও না)।
শাশুড়ী ত দিব গালি, ভাই বান্ধইবা শোকী,
কিমতে ভাঙ্গিয়া আইলা সুবর্ণের কলসী।
(গ জলেরে যাইও না)।

বাড়ীর কাছে আছে আমার কুমারিয়া সইয়া,
এমন চাইয়া দিব কলসী রাধার মাজা চাইয়া,
(গ জলেরে যাইও না)।
সোনার কলসী দিব রূপার কান্দা,
কান্ধার মধ্যে লেইখা দিব কলঙ্কিনী রাধা,
(গ জলেরে যাইও না)। —ঐ

১৫

শ্যামের বাঁশী রে, তুমি আর বাজিও না।
সই, গ সই, উচ্চ পর্বতে বসি, কৃষ্ণে বাজায় মোহনবাঁশী,
বাঁশীর স্বরে হৈরা নিল অবলার প্রাণ।
সই, গ সই, বাঁশীটি বাজাইয়া কৃষ্ণে থুইল কদম্ ডালে,
লিলুয়া বাতাসে বাঁশী রাধা রাধা বলে।
সই, যেই না দেশের বাঁশী ছিল, সেই দেশ করল আন্ধ,
আমার দেশে আইল বাঁশী যেন পুর্ণিমার চান্দ।
সই, যেই না ঝাড়ের ছিল বাঁশী, ঝাড়ের লাগাল পাই,
ঝড়ে পরে উপাড়িয়া দরিয়ায় ভাসাই। —ঐ

১৬

অ গ সই, আরের লগে কও কথা,
কেশ যে ছিঁড়িব, কঙ্কণ ভাঙ্গিব, পাষাণে কুটিব মাথা।
গ সই, শ্যাম যে গিয়াছে মথুরা নগরে, রাধার আর কলঙ্ক গেল না।
সই, গ সই, ভূমির উপরে পঙ্কের বসতি, তার উপরে ডাল,
ডালের উপরে কংশারি বসতি, জীবনের কত রাখি সাধ,
সই, গ সই, আঙ্গুল কাটিয়া, কলম বানাইয়া, নয়নের জলে তার কালী,
কলিজা ছিঁড়িয়া সে লিখন লিখিয়া পাঠামু শ্যাম বন্ধুর বাড়ী। —ঐ

১৭

আমার বন্ধুরে তোমরা রাখ মানাইয়া, গ সজনী।
কালা যায়, কানুয়া যায়, দূতী দেখ বাহির হৈয়া,
শ্রীরাধার বন্ধুয়া যায়, তোমরা রাখ মানাইয়া।
(সজনী গ, বন্ধুরে রাখ মানাইয়া)।

পরথমকার যৌবন, রাধে, কোটরায় সাজাইয়া,
সর্ব অঙ্গে দিল চন্দন পুষ্পেতে মিশাইয়া।
(সজনী গ, বন্ধুরে রাখ মানাইয়া)।
দ্বিতীয়ার যৌবন রাধে অঞ্চলে ঢাকিয়া,
তৃতীয়ার যৌবন রাখ্‌ছি বন্ধুর লাগিয়া,
(সজনী গ, বন্ধুরে রাখ মানাইয়া)।
পাড়া না পড়শী রাধার প্রাণের বৈরী,
দুই চোরায় যুক্তি কৈরা ভাঙ্গিল পীরিতি।
(সজনী গ, বন্ধুরে রাখ মানাইয়া)।
মধুর স্বরে বাঁশী বাজে, সখি অ গ, শুইনা যা গ তরা,
কৃষ্ণপ্রেমে দহে অঙ্গ, রাধার কি লইয়া ঘরে থাকা।
(সজনী গ, বন্ধুরে রাখ মানাইয়া)।

১৮

সখী গ, সব না সখীর মুই আইলাম জলেরে গ।
মাইলা দেওয়ায় চালাইল বাও, দারুণ পবনের বায়,
গায়ের বস্ত্র উড়াইল রে।
আমার সোনা বন্ধু দেখল সর্ব গাও।
সখী অ গ, না জানি রান্ধন, না জানি বাড়ন,
না জানি হলুদের বাটা,
দারুণ পাড়াপড়শী কি না নামটি রাখিল রে,
নামটী রাখল কলঙ্কিনী রাধা।
সখী অ গ, আমি চাঁদেরে দিমু সেই তুল বানাইয়া
সূর্যেরে দিমু গলার হার,
আজুকার চাঁদ সূরুষ বিলম্বে উঠিস রে,
সোনা বন্ধু রৈয়া যাউক মন্দিরে আমার।

১৯

কি অভাবে কাঙ্গাল হইলাম রে, আরে, শ্রীদাম দাদা।
আমার ধড়াচূড়া মোহনবাঁশী রে সব নিয়েছে রাধা॥

অষ্ট সখী নিয়ে সাথে,
দাসখত লেখলাম আপন হাতে, সেই দেনায় ঋণ হই তাতে,
তিন কিস্তিতে ঋণ শোধিব, আমায় মুক্ত দেয় না রাধা ॥
রাধার প্রেমে ঋণী হইয়ে,
পীতধড়া ত্যজ্য করে, দাস খত দিলাম লেখে,
দাসখত লিখে দিয়ে, ভাই রে, আর ভুলিতে নারি রাধা। —ঐ

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য শ্রীরাধার মনে যে আতি প্রকাশ পাইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের মনেও শ্রীরাধার মিলনের জন্য সেই আতিই প্রকাশ পাইয়াছে। সখা সুবলকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধা-সম্পর্কিত তাহার সুগভীর অন্তর্বেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানে দাদা শ্রীদাম ইহার লক্ষ্য হইয়াছে।

২০

কি দেখলেম, সজনি, তরু কদম তলে গো।
যমুনার জল আনতে যাইতে, দেখলেম নয়নে আচম্বিতে গো,
তিলেক না পারি পাশরিতে,
ও সে যে ভুবনমোহন রূপ, গলায় বনমালা গো।
পদের উপর পদ থুইয়ে পাঁচনিতে ঠেকাইয়ে গো,
দাঁড়াইছে ত্রিভঙ্গ হইয়ে,
ও সে যে ভুবনমোহন রূপ, গলায় বনমালা গো। —ঐ

নিম্নোক্ত গানটি জলপাইগুড়ি হইতে সংগৃহীত বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও জলপাইগুড়ির প্রাদেশিক ভাষা ইহাতে নাই। সুতরাং ইহা জলপাইগুড়ির প্রবাসী বাঙ্গালীর কিংবা অন্য অঞ্চলের অধিবাসী কোন ব্যক্তির সংগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হয়।

২১

ও শ্যাম, মুখ তুলে আমারে চাও, সরল মনে কথা কও,
পায়ের নাচন, বাঁশীর বাজন আমারে শিখাও।
ও কি, কালারে, তুই কালা গলার মালা,
তোকে ধরে মোর এত জ্বালা,
তুই যাকে চাবু তাকে পাবু
তোর বাদে মুই সবই খোও ॥ —জলপাইগুড়ি

২২

কইও তো,

প্রাণবন্ধুর লাগল পাইলে, আর নি হইব দেখা গো, অভাগী
রাধা মইলে।

তোরা তোরা কে কে যাবি মধুপুরে গো, সখী অ, প্রাণবন্ধুর
লাগল পাইতে।

রাধিকার দুঃখের কথা গো, আমি লিখিয়া পাঠাই।
নিঃসরে কি ধান গো সখী, বিনা বরিষণে,
সম্বাদে কি জুড়ায় প্রাণ গো, বিনা পরশনে। —ত্রিপুরা

২৩

বাঁশরী বাজিল লো যমুনার কিনারে চললো জলকে যাই,
ইচ্ছা হয়, মা, কুলে কালী দিয়ে কালার সঙ্গে চলে যাই।
একটি ডালে দুটি পাখী বসে তোমরা করছ কি,
আর ডেক না সোনার কোকিল, কেষ্টহারা হয়েছি। —বর্ধমা

২৪

কই রইল প্রাণবন্ধু শ্যামরায়, দিবানিশি উঠে মনে,
আমার শ্যাম বিনে প্রাণ যায় গো যায়।
আপন জেনে সাধে সাধে, প্রাণ সঁপিলাম তার পদে,
না জানি কোন অপরাধে আমার সাধের নিশি বয়ে যায়।
বন্ধুর বিচ্ছেদানলে, সদা আমার অঙ্গ জ্বলে,
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে, নিবাইতে নাই উপায়।
নূতন নূতন পুষ্প দিয়া, বিনা সূতে হার গাঁথিয়া,
তারে থইলাম সাজাইয়া, আমি দিব মালা কার গলায়।
বলে পাগল দীননাথে, প্রবোধ না মানে চিতে
পাইলাম না জীবন থাকিতে, মইলে কি আর পাওয়া যায়।
—(সেরপুর) মৈমন

পদটিতে পাগল দীননাথের ভণিতা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সত্ত্বেও ইহার লোক-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় নাই। কারণ, ভণি গানগুলি যে সুরে বাঁধা, ইহার মধ্যে তাহার কিছু ব্যাতক্রম দেখা যায়

ভণিতাটি এখানে অবান্তর মাত্র, তবে কোন কোন সময় বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে পল্লীকবিরাও ভণিতা দিয়া থাকেন, ক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়।

২৫

সুবল রে, প্রাণের সুবল, রাইকে এনে দেখা ॥
ভাই বলি তরে রে সুবল, দাদা বলি তরে।
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী আন্যা দে আমারে, রে সুবল সখা ॥
সুবল রে, হাতে ধৈরা দেখ্ রে, সুবল, আমার গায়ে।
বিনা কাষ্ঠে জল্‌ছে আগুন আমারি হৃদয়ে, রে সুবল সখা ॥
সুবল রে, তুষের আনলের মত জলে রে ঘুষিয়া।
জল দিলে না নিভে আনল, নিবাইবাম কি দিয়া, রে সুবল সখা।

—মৈমনসিং

২৬

চিত্ত-চোরা বন্ধু আমার রহিল কোন দেশে গো, প্রাণ-সজনি,
মনচোরা বন্ধু আমার রহিল কোন দেশে ॥
সখীরে, মনের দুঃখ কেউ না জানে,
পোড়া মনে বোঝ না মানে,
বন্ধু-হারা হইয়া আমি ফিরি পাগল বেশে।
পাইয়া তারি ভালবাসা, ছাড়িলাম সংসারের আশা,
এক দিনের জন্য দেখা দিল না আইসে গো, প্রাণ-সজনি,
মনচোরা বন্ধু আমার রহিল কোন দেশে।
সখীরে, যৌবন মালঞ্চ ফুল, শুকাইলে গাছের মূল,
দিন ফুরাইলে সোনার মানুষ পাব কৈ শেষে।
আমি নারী কুলবধূ—নতুন যৌবন ঘৃত-মধু
অযতনে নষ্ট হইল, অঙ্কুর বয়সে গো, প্রাণ সজনি,
মনচোরা বন্ধু আমার রহিল কোন দেশে ॥

—ঐ

২৭

সমীরণে আমার কানে এ কার গান গায়—
শ্যাম প্রেমের কাঙ্গালিনী রাধায় কেন বা কাঁদায় ॥

নিঃশ্বাস করিয়া বন্ধ, কান পেতে রই হইয়া ধন্ধ ;
বোঝা যায় না ভাল মন্দ, কী খবর জানায় ॥
"শ্যা শ্যা" শুধু শুনি কানে, "ম" কথাটা কয় না কেনে ;
প্রেমত আমার তারি সনে, প্রাণ কান্দে যার দায় ॥
ওরে, মলয়, কইও গিয়া, শ্রীরাধা তারি লাগিয়া,
কুল মান সব ত্যজিয়া, কান্দিয়া বেড়ায় ॥
পাইয়া অবলা নারী, বুক ভেঙ্গে প্রাণ কর্‌ল চুরি
দাগা দিয়া গেল পাশুরি, নিঠুর শ্যাম রায় ॥ —ঐ

২৮

আমার সরল প্রেমে গরল কে কৈরাছে রে নাগর বিনোদিয়া।
(নাগর বিনোদিয়া আমার রে বন্ধু বিনোদিয়া)
মনে রাইখ, মনমোহিনী, মনেতে রাখিয়া রে নাগর বিনোদিয়া।
শ্রীচরণে লিখিও নামটী ঐ চরণে দাসী বলিয়া রে নাগর বিনোদিয়া।
কঠিন তোর মাও বাপ কঠিন তোর হিয়া
পাইলাম না রে প্রাণ-বন্ধুয়া
চিত্ত বান্ধা দিয়া রে, নাগর বিনোদিয়া।

২৯

দেখরে ও ভাই, সুবল সখা, তুই নি রে ভাই চিন্‌বে।
ঐ রমণী কে যায় গো জলে।
আগে পাছে অষ্ট সখী ইসারায় কথা বলে।
চিকন মাজায় নীলাম্বরী বাতাসে হেলে ঢলে,
ঐ রমণী কে যায় গো জলে,
মদনমোহন খোঁপা বাইন্ধাছে নানা ফুলে,
তাতে গুঞ্জরে অলি দলে দলে
ঐ রমণী কে যায় গো জলে।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বিষয়ক এই পদটিকে বৈষ্ণব পদাবলীর এই বিষয়ক শ্রে পদের সঙ্গেও তুলনা করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা যেখ ব্রজবুলি, সেখানে যে কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়, তাহাতে গীতিকবিতার ভাব স্ফূতিলাভ করিতে পারে না। এমন কি, যেখানে তাহা বাংলা, সেখানেও

একটি রীতি অনুসারী রচনা বলিয়া তাহাও স্বতঃস্ফূর্ত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সেই ক্রটি নাই বলিয়া ইহার আবেদন প্রত্যক্ষ।

৩০

কলিজা ছেদিল গো আমার শ্যাম-পীরিতের বিষে।
প্রেম-জ্বালায় মৈলাম গো, সই, বারণ হইবে কিসে॥
কেউ কিছু জানিলে আমার বুকে দেও গো ঘইষে।
সারা অঙ্গ জর্‌জর্ রক্ত গেল শুইষে॥
মৈলাম, মৈলাম, মৈলাম গো সই, বিরহ নিঃশ্বাসে।
বন্ধুয়ারে কেমনে দেখি, রইল বা কোন দেশে॥
যাও, যাও, সখী, তোরা ঔষধের তালাসে।
আমার ভবব্যাধি দূর হইবে কৃষ্ণ শান্তিরসে॥
চারা গাছে ফল ধৈরাছে, উড়াইল বাতাসে।
আর কত কাল রাখব যয়বন বন্ধুয়ার আশে॥ —ঐ

৩১

ওগো, কুঞ্জবনে কালোশশী
কে বাজাইলে বাঁশের বাঁশী।
বাঁশী শুনে অন্তরো জুড়ায় (ধুয়া)॥
কাঁখে কলসী লয়ে গো রাধা যমুনাকে যায়।
বাঁশ লই বাঁশরী লইগো তরুল বাঁশের আগা,
বিনে ফুঁকে বাজে বাঁশী বলে রাধা রাধা। —সাঁওতাল পরগণা

সাঁওতাল পরগণার প্রাদেশিক ভাষা ইহাতে শুনা যায় না।

৩২

মেঘো আঁধারো রাতি, নাগরো বাজিল বাঁশি
একা কেনে গে ধনি।
একালা কোশোর বনে ডেরা লাগে রে,
মেঘো আঁধারো রাতি, কাঁহে বাজে গে ধনি।
নাগোরা মান্দল বাজে পঁহিলা সাজে।
আয় মায় লক্ষ্মী সরস্বতী ক্যারোরে মিনতি
নাগোরা মান্দল বাজে পঁহিলা সাঁজে। —ঐ

৩৩

দুঃখু কইও বন্ধের লাগ পাইলে গো নিরলে ॥
আমার বন্ধু রঙিচঙি, জলের উপর বান্ছে টঙ্গি গো,
দুই হাত উড়াইয়া বন্ধে ডাকে গো নিরলে,
দুঃখু কইও বন্ধের লাগ্ পাইলে ॥
আমার বন্ধু কালাচান, তিল কুড়াইয়া বুনছে ধান গো,
সেই ধানও খাইল রাজার আঁসে গো নিরলে ;
দুঃখু কইও বন্ধের লাগ পাইলে ॥ —মৈমনসিং

পদটিতে যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ উপজীব্য হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই। ইহা নিতান্ত লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত বলিয়াও গ্রহণ করা যায়। একমাত্র প্রণয়ীর নামে কালাচাঁদ শব্দটিই কৃষ্ণপ্রসঙ্গের নির্দেশক নহে ; পরবর্তী দুইটি পদ সম্পর্কেও এই কথা বলিতে পারা যায়।

৩৪

আমি বন্ধের প্রেমাগুনের পোড়া, সজনী সই গো,
আমি মইলে পোড়াইস না তোরা ॥
সই গো, যেদিন বন্ধে ফেইল্যা গেছে,
এই পোড়া আমায় দিয়া গেছে গো।
সেই পোড়ায় পুড়িয়া আমি হইয়াছি আঙ্গেরা ॥ —ঐ

৩৫

কার ঘরের রঙিলা বিলাইরে—
বিলাইরে—
কাইল খাইছিলে ভাজা মাছ আইজো আইছো লোভে,
দুই কান কাটা যাইব তোর কুড়ালের কুবে রে।
কার ঘরের রঙিলা বিলাইরে ॥
বিলাইরে,
পুবের পাড়ায় থাকো, রে বিলাই, পশ্চিম পাড়ায় থানা,
এই বিলাইর কারণে আমার বাঁও চোখটি কানা রে ॥

বিলাইরে,
ফুটি ফুটি মেঘের মাঝে বাইরে কেনে ভিজ,
ঘরের পাছে ছাইত্যানী গাছ কাইট্যা ছাতি ধর রে ॥ —ঐ

৩৫

পাহাড়ে পড়িল ডাল, নদীতে নামিল বান,
রে বঁধুয়া শ্যাম, মাঝ বানে যাইছে বাঘকপাঞ্জ
রে বঁধুয়া শ্যাম। —সাঁওতাল পরগণা

৩৬

সুবলকে সাইধাছেন হরি, ও ভাই তোরে বিনয় করি,
এনে দে না প্রাণের কিশোরী, হে দারুণ বিরহ-জ্বালা
আর সইতে নারি হে। —পুরুলিয়া

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমসঙ্গীতের ভিতর দিয়া সাঁওতাল পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহট্ট কাছাড়ের বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চল পর্যন্ত একদিন যে এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। তবে ইহাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে যে অখণ্ডতাই দেখা যাক না কেন, ইহাদের সুরগত আঞ্চলিক পার্থক্য ছিল। তথাপি প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে বিরহ কিংবা বিচ্ছেদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়াই ইহার মধ্য দিয়া যে বেদনার সুর ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া অনেকখানি সুরগত ঐক্যও সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া অনুভব করা যায়। মানুষের অন্তর্মুখী বেদনা এক সুরেই বিশ্বব্যাপী অভিব্যক্তি লাভ করে। সেই সূত্রেই ইহাদের মধ্যে অখণ্ডতা দেখা যায়।

৩৭

সই লো সই, মনচোরা চিকন কালো কই রইল কই ॥
সই লো সই, যে অবধি কালার প্রেমে বিকাইলাম পরাণ,
সাগরে ভাসাইয়া দিলাম জাতি কুল মান।
ননদী কুটিলা রাগী সদায় থাকে আড়ে, আমি মনোদুঃখে রই।
আয়ান ঘোষের বেতের বাড়ি আর বা কত সই ॥
সই লো সই, আগে যদি জানতাম প্রেমে তারা হইবে বাদী,
তবে কি আর প্রেম করিয়া কানতাম নিরবধি ;

না যাইতাম যমুনার জলে না হেরিতাম কালা,
না খাইতাম বেতের বাড়ি না সইতাম জ্বালা,
আমার প্রাণ গেল, গো সই।
সাধ করাইয়া কলঙ্কের ডালা মাথে তুল্‌ল্যা লই ॥
সই গো সই, সাধ কইরে লইয়াছি মাথে শ্যাম-কলঙ্কের ডালা,
সাধ কইরে পৈরেছি গলে শ্যাম নামের মালা ;
রসিক নাগর শ্যাম কালাচান, বুকের রত্ন পাটা,
শ্যাম-পিরীতি বাজল বুকে টেংরা মাছের কাঁটা ;
মইলাম মৈলাম গো, সই।
চাতকিনী পাখীর মত ব্যাকুল হইয়া রই।
আমার প্রাণ গেল গো সই ॥ —মৈমনসিংহ

৩৮

ও প্রাণ কানাই রে, তৈলের বাটি গামছা হাতে ;
চল যাই যমুনার ঘাটে,
কলসী ভাসাইয়া নিল সোতে রে, ও প্রাণ কানাই রে ॥
ও প্রাণ কানাই রে, বন্ধু যদি স্বজন হইত,
কলসী ধরিয়া দিত,
যাচিয়া যয়বন করতাম দান রে, ও প্রাণ কানাই রে ॥
ও প্রাণ কানাই রে, আমার বাড়ির উপর দিয়া,
পড়শী বাড়ীতে বইও গিয়া,
আমারে শুনাইয়া কইও কথা রে, ও প্রাণ কানাই রে ॥
ও প্রাণ কানাই রে, আমি ত অবলা নারী, তরু তলে বাড়া ভানি,
বদন চুয়াইয়া পড়ে ঘাম রে, ও প্রাণ কানাই রে ॥
ও প্রাণ কানাই রে, বন্ধু যদি আপন হইত,
শইল্যের ঘাম মুছিয়া দিত,
নয়ালী যয়বন করতাম দান রে, ও প্রাণ কানাই রে ॥
ও প্রাণ কানাই রে, মাইগা মরায় তামুক খায়,
আগুন দিতে পরাণ যায় রে,
আইতে খাইতে মারে নলের বাড়ি রে, ও প্রাণ কানাই রে ॥

ও প্রাণ কানাই রে, কুক্ষণে বাড়াইলাম পাও,
খেওয়া ঘাটে নাহি নাও রে,
খেওয়ানীরে খাইছে জংলার বাঘে রে, ও প্রাণ কানাই রে ॥
ও প্রাণ কানাই রে, যে মোরে করিবে পার
তারে দিবাম গলার হার রে ;
মন প্রাণ সঁপিয়া দিবাম তারে রে, ও প্রাণ কানাই রে ॥ —ঐ

৩৯

সখী, তোরা জাইন্যা আয়,
গুন্ গুন্ সুরে বাঁশী কে বাজায় ॥
সখী রে, আড়াল থাইক্যা বাজায় গো বাঁশি রব শোনা যায়।
বাঁশির ধ্বনি কানে শুনি গৃহে থাকা হইল দায় ॥
সখী রে, মনটা আমার কেমন করে সাপে যেন বেঙ্ দৌড়ায়।
উঠিতে না পারি আমি দাঁড়াইলে মাথা ঘুরায় ॥ —ঐ

৪০

নিদাগেতে দাগ লাগাইছে প্রাণের বন্ধু কালিয়ায়।
মৈলাম মৈলাম গো, সখী, প্রেম জালায়।
কি হইল কি হইল গো, সখী, প্রেম দায় ॥
হাঁইট্যা যাইতে পাড়ার লোকে মন্দ বলে সর্বদায়।
লোকের নিন্দন পুষ্প চন্দন অলঙ্কার পৈরাছি গায় ॥
কলসী কাঁখে লইয়া রাধে যমুনার জল ভরতে যায়।
জলে থাইক্যা কাল নাগে দংশিল রাধার পায় ॥
সাপের বিষ ঝাড়িলে নামে প্রেমের বিষে উজান ধায়
উঝা বৈদ্যি নাই গো দেশে ঝাড়াইয়া বিষ কে নামায় —ঐ

লৌকিক

বাংলা দেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই', এই কথা মাত্র আংশিক সত্য। বাংলাদেশের যে অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব যত কম, সেই অঞ্চলের প্রেম-সঙ্গীতে কানুর নাম তত কম শুনা যায়। এমন কি, যে অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রচারও হইয়াছে, সেই অঞ্চলেরও লোক-সঙ্গীতের একটি বিশাল অংশে

কানুর নাম শুনিতে পাওয়া যায় না; সাধারণ নর-নারীর পরিচয়েই নায়ক-নায়িকার প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত প্রেম-সঙ্গীতগুলি তাহার প্রমাণ।

১

হায় রে, বন্ধু নাই দেশে।
পত্র লইয়া যাও রে, কোয়িল, আমার বন্ধুর উদ্দিশ্যে॥
আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানাইলাম রে, নয়নের জল কালি।
কলিজা ফাঁড়িয়া লিখন লিখিয়া পাঠাইল বন্ধুর বাড়ী॥
আমার বন্ধু চৈলে গেছে বৈদেশ নগরে।
মাসে মাসে দিতাম চিঠি কইয়া গেছিল মোরে॥
আমার বন্ধু বসত করে নিদয়ারই ঘরে।
সেই বন্ধুর কারণে আমার পরাণ কাইন্দ্যা মরে॥ —মৈমনসিংহ

চন্‌চনা দেহার মধ্যে রে, বন্ধু, কতই দুঃখু মনে।
এমনি পামরের দেশ মায়া নাই তার মনে॥
প্রাণ বন্ধে কি করলে আমারে।
বার মাসের বার রে পুষ্প ফুটে রে বাগানে।
কোন ফুলের কোন লইজ্জৎ ভমরায় সে জানে॥
প্রাণ বন্ধে কি করলে আমারে॥
আগে যদি জানতাম রে, বন্ধু, তুমি চন্দনের কাঠ।
অঙ্গেতে মিশাইয়া রাখতাম তুমি চন্দনের বাস॥
প্রাণ বন্ধে কি করলে আমারে।
আগে যদি জানতাম রে, বন্ধু, তুমি সন্ধ্যার ফুল॥
শিয়রে বান্ধিয়া রাখতাম তোমার যত মূল।
প্রাণ বন্ধে কি করলে আমারে॥ —ঐ

৩

ও কোকিল রে, আমার বন্ধু আসবে বলে
পান সাজায়েছি বাটা ভইরে॥
সে পান বাসি হইয়া গেল॥

ও কোকিল রে, আমার বন্ধু খাবে ভাত
কিনে আনব মাগুর মাছ।
গোয়ালা বাড়ী দিছি দৈ-র বায়না
ও কোকিল রে, যদি পারিত করাত চাও
ছাড় তোমার বাপ মাও।
এদের ছাড়িয়া চল যাই॥ —ঐ

কলসী ভাসাইয়া নিল গো হীরা মন বাতাসে,
আমি কেন বা আইলাম জলে,
কেন বা আইলাম জলে গো।
কেন বা আইলাম জলে॥
যাবু ভাইয়ের বাড়ীর কাছে কত শত কুমার আছে,
একটি কলসী দাও আমারে রাধাকৃষ্ণের নামের গুণে
আমি কেন বা আইলাম জলে॥ —ঐ

যদি যাবে, কবে আসিবে বলিয়া যাও।
প্রবঞ্চনা কইরে মোরে কাহার পানে রাইখে যাও॥
যদি ফিরে না আসিবে অভাগিনীর মাথা খাও।
কবে আসিবে বলিয়া যাও॥ —ঐ

৬

জাগ জাগ, চেংরা গো বন্ধু, কত নিদ্রা যাও।
আমি ডাকি অবলা নারী চক্ষু মেইলে চাও।
সই গো, চক্ষু মেইলে চাও॥
বন্ধু আমার ঘোমের গইরা (ঘোরে) কি
রূপ (রূপে) জাগাই।
দুই হস্তে দুই ডালিম দিয়া বন্ধুরে জাগাই।
বন্ধুরে জাগাই সই গো, বন্ধুরে জাগাই॥ —ঐ

৭

প্রেম করিয়া মৈলাম গো, সই, বিচ্ছেদের জ্বালায়।
ঘটে ঘটে আমার বন্ধু গোপনে খেলায়॥
বন্ধুর প্রেমের এমনি ধারা, আয়ু থাকতে প্রাণে মরা,
প্রেম ফাঁসি গলে দিয়া হাসায় আর কাঁদায়।
আমি ত অবলা নারী, যয়বন জ্বালায় জ্বৈলে মরি,
একবার রূপ দেখাও মোরে নইলে প্রাণ যায়॥
হৃদ-কমলে মধুভরা, উইড়ে যায় কাল ভম্‌রা,
শুকায় যে পিরীতির ফুল গাছের আগায়॥
জন্ম-মৃত্যু যাহার নাই, তারি সঙ্গে প্রেম চাই,
সঙ্গে বন্ধু চিন রে, মন, বেলা বইয়া যায়॥ —মৈমনসিং

৮

আর কত রাখিব রে যয়বন সোনা বন্ধুর লাগিয়া॥
পাড়া পড়শী সবাই বৈরী কইনা রে ডরাইয়া।
ঘরে আছে কাল ননদী সদায় মারে জ্বালাইয়া॥
জল ভরিতে যাই গো, সখী, কলসী কাঁকে লইয়া।
কুলমান সব দিয়াছি সায়রে ভাসাইয়া॥
বাকী দুইটি আঁখি গেল বন্ধুর পথ চাইয়া॥ —ঐ

৯

কেমনে পোহাইব রজনী, প্রাণের বন্ধু রে,
কেমনে পোহাইব রজনী॥
বন্ধু রে, যয়বনে পিরীতি মিঠা, পান মিঠা চূণে।
তোমার সাথে প্রেম করিয়া অন্তর কাটে ঘূনে॥
বন্ধু রে, অস্ত যখন যায় রে, ভানু, আনন্দ হয় মনে।
অভাগিনীর দুঃখের নিশা আসে রে সামনে॥
বন্ধু রে, সিঁতির সিন্দুর নাকের বেসর কে দেখবে নয়নে।
কখন উঠি কখন লুটি নিশি জাগরণে॥
বন্ধু রে, ভোমরার আশে বসন্তে ফুল ফুটে বনে বনে।
আমার যৌবন-কলি অ-ফোট রইল তুই বন্ধুর বিহনে॥ —ঐ

১০

হারাইয়া তালাস করি প্রাণবন্ধু আমার, হায় দিল বেকরার।
হারাইয়া তালাস করি, প্রাণবন্ধু আমার ॥
সখীরে, পাইয়া অমূল্য ধন, সময়ে না করলাম যতন,
সেই ধনের তুলনা নাই এই জগতে আর ॥
সখী রে, যাইবার কালে গেছিল কইয়া, সেই অবধি আছি চাইয়া,
আইজ পাব, কাইল পাব বলে মাশুকের দিদার ॥
সখী রে, জানি না সে এমন হবে, প্রেম শিখাইয়া ভুইলে রবে ;
তবে কি আর ছাড়তাম তারি যুগল চরণ ॥
সখী রে, কুল মান গেল ভাসি, বাজল না রে মিলন বাঁশি,
অন্ধ হইল দুইটি আঁখি কলিজা অঙ্গার ॥ —ঐ

লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা কেবলমাত্র বিচ্ছেদ-বেদনার ভাবই প্রকাশ করিয়াছে, ইহার মধ্যে মিলন কিংবা তাহার আনন্দের কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। বেদনাই যে মধুরতম সঙ্গীতের জননী এই সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া তাহাই প্রকাশ পায়। ইহাদের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মধ্যে নারীমনের বেদনার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম-সঙ্গীতে যেমন সুবলকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণও নিজের অন্তর্বেদনা ব্যক্ত করিয়াছে, ইহাতে তাহা নাই।

১১

আইস রে. রসিক বন্ধু, একবার আইস দেখি।
একবার আইস দেখি রে, বন্ধু, একবার আইস দেখি ॥
রঙ্গে ঢঙ্গে প্রেম করিযা আমায় দিল ফাঁকি।
কঠিন বিষম যন্ত্রণার আর কত দিন বাকী ॥
চাতকিনীর মত আমি তোমার ভাবে থাকি।
আসরে বইলে, প্রাণবন্ধু, আমি সারা নিশি জাগি ॥ —ঐ

১২

আমি ত শুনি না বাঁশি যে শুনে সে যাবে।
তোমার বাঁশি বাজলে বা কি হবে ॥

যে শুনেছে বাঁশির ধ্বনি, কুল ছাড়িয়া কলঙ্কিনী ;
এ কুল, সে কুল, দুকুল হারা কান্দিয়া জনম কাটাইবে ॥
আপনা হইতে জাগাও যারে, সে কি ঘুমে থাকতে পারে ;
ঘুমাইলে স্বপনে দেখি কান্দিয়া জাগিয়া উঠিবে ॥
যার ঘরের কোণে বাজাও বাঁশি,
সে থাকিবে উপবাসী, তাহার নিদ্রা সব পাশরি
বাঁশির সুরে মন মজাইবে ॥
একে ত হইয়াছি অন্ধ আর শুনি না কানে।
শুনাইলে শুনাইতে পারে দয়াময় নাম যার হবে ।। —ঐ

১৩

আমারে বানাইলে পিরীতের দেওয়ানা, রে কালিয়া সোনা।
আমারে বানাইলে পিরীতের দেওয়ানা ।।
বন্ধু রে, কুল দিলাম, মন রে দিলাম, দিলাম ষোল আনা।
আমার বাড়ীর আগ্ দুয়ারে কার আনাগোনা রে কালিয়া সোনা ॥
বন্ধু রে, ঘরে পোড়া বাইরে পোড়া, পোড়া পিষ্ঠ সিনা।
তোমার সনে প্রেম করিয়া মুখ পুড়িলাম দুনা রে, কালিয়া সোনা ॥
বন্ধু রে, এ অভাগীর মনের দুঃখু অন্যে ত জানে না।
শুনিলে উজান বইত গঙ্গা আর যমুনা, রে কালিয়া সোনা ।। —ঐ

১৪

চিত্ত চোরা বন্ধু আমার রহিল কোন দেশে গো, প্রাণ-সজনী,
মন-চোরা বন্ধু আমার রহিল কোন দেশে ।।
সখী রে, মনের দুঃখু কেউ না জানে, পোড়া মনে বুঝ না মানে,
বন্ধুহারা হইয়া আমি ফিরি পাগল বেশে,
পাইয়া তারি ভালোবাসা, ছাড়িলাম সংসার আশা,
এক দিনের জন্য দেখা দিল না এই যে গো, প্রাণ-সজনী।
সখী রে, যৌবন-মালঞ্চ ফুল শুকাইল গাছের মূল
দিন ফুরাইলে সোনার মানুষ পাব কই শেষে।
আমি নারী কুলবধূ, যয়বন ঘিবৃত মধু,
অযতনে নষ্ট হইল অঙ্কুর বয়সে গো, প্রাণ-সজনী ।। —ঐ

১৫

আমি রূপের পাগল হইলাম রে জলের ঘাটে গিয়া।
সখী রে, কালত কাজল আঁখি যার পানে যায় চাইয়া।
সেই আংখির তুলনা নাই রে জগৎ জুড়িয়া ॥
রে জলের ঘাটে গিয়া ॥
সখী রে, এই ঘাটেতে কেউ যাইও না কলসী কাঁখে লইয়া,
শ্যাম কালায় পাত্‌য়্যাছে ফাঁদ পিরীতের লাগিয়া।
বাঁশির স্বরে পাগল করে পরাণ লয় কাড়িয়া।
রে জলের ঘাটে গিয়া ॥
সখী রে, তোমরা সবে কেউ যাইও না কদমতলা দিয়া।
শ্যাম কালিয়া নেংটা করে বসন নেয় কাড়িয়া ॥
রে জলের ঘাটে গিয়া ॥
সখী রে, তোমরা সবে ঘরে যাও গো, ভরা কলসী লইয়া।
কইও খবর সবার আগে মোরে কুম্ভীরে গেছে লইয়া ॥
রে জলের ঘটে গিয়া ॥ —ঐ

১৬

দুঃখিনীরে অকূলে ভাসাইয়া ;
কোন বা দেশে গেল আমার প্রাণবন্ধু কালিয়া ॥
ও বন্ধু রে, আর কিবা বলিব তোরে,
যা করে, মোর কপালে করে,
যয়বন কালে না চাহিলা ফিরিয়া।
তুমিত কঠিন হিয়া, গেলা মোরে পাশুরিয়া,
বারেক যদি পাই তোমায় না দিব ছাড়িয়া ॥
ও বন্ধুরে, এত যদি ছিলরে মনে,
পিরীতের শিকল কেনে পরাইলা আদর করিয়া।
তুমি যদি ছাড় মোরে, দুঃখু দেও বারে বারে,
দিবা নিশি রইব চাইয়া চাতকিনী হইয়া ॥ —ঐ

১৭

কোথায় রইলা, প্রাণবন্ধু, দেখা দেও আমায়।
কত যুগ গেল, বন্ধু, মরি প্রেম-জ্বালায়।
বন্ধু রে, দেখা দেও আমায় ॥
বন্ধু রে, মাছের মত ডুব্ব্যা রইলাম তোমারি আশায়।
সে আশা নৈরাশ হইল, বন্ধু, তুমি রইলে কোথায় ॥
বন্ধু রে, দেখা দেও আমায় ॥
বন্ধু রে, আমারে ভাসাইলে তুমি নয়নের জলে।
দিবানিশি পুড়াইলে পিরীতের আনলে ;
এ দুঃখু কেউ সইবে না ধরায়।
বন্ধু রে, দেখা দেও আমায় ॥ —ঐ

১৮

শুকাইল কমলের কলি, সই গো, নতুন গাছের ডালে।
পিয়ার জ্বালায় শরীর কাল ভাসি নয়ন জলে।
সবাই দেখে পিয়ার মুখ আমার নাই কপালে ॥
কোয়িলা কয় কুহু কুহু বুল্‌বুল্ নাচে ডালে।
আমার মনের দুঃখ রইল মনে এই বসন্তকালে ॥
বুকের জ্বালা বুকে রইল, সই গো, তুষের আগুন জ্বলে।
চিত্ত চিরইয়া দেখাইবাম প্রাণবন্ধু আসিলে ॥
মন-ভমরা গন্ধ পাইয়া কান্দিল নিরলে।
আনিয়া দেখাইও তারে মরণের কালে ॥ —ঐ

১৯

ভাল চাইতে মন্দ হইল আশায় আশায় যায় জীবন,
বল সখীগণ, কবে হইবে আমার বন্ধুর দরশন ॥
সখী রে, নয়ান জলে বয়ান ভাসে,
না জানি সে কোন্ বা দেশে,
তোমরা যবে যায় তালাশে, কইও আকিঞ্চন।
কিবা দোষে কৈরা দোষী, সে হইয়াছে পরবাসী,
মুই আভাগীর লয় না খবর কিসের কারণ ॥

সখীরে, মা ও বাপ হইল বৈরী, ছাড়িলাম ঘর বাড়ী,
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরইয়া ফিরি পাগলের মতন।
যে দুঃখু হৃদয় মাঝে, কই না কথা লোক-সমাজে,
এত কৈরেও পাইলাম না রে নিষ্ঠুর বন্ধুর মন ॥
সখী রে, জগৎ জুড়ে দেও ঘোষণা,
কেউ যেন আর প্রেম করে না,
পিরীতি বিষম রে জ্বালা নিশার স্বপন।
মিছা প্রেমের পৈড়া ফান্দে, হিয়ার পংখী সদায় কান্দে,
চিন্তায় অঙ্গ জর্‌জর্‌ নিকটে শমন ॥ —ঐ

২০

তোর কারণে বনে বনে কান্দিয়া হয়রান, রে নিষ্ঠুর বেইমান।
তোর কারণে বনে বনে কান্দিয়া হয়রান ॥
বন্ধু রে, স্বপনে রাজত্ব দিলে,
প্রেম শিখাইয়া ভুইলে রইলে ;
অপরাধ ক্ষমা কৈরে চরণে দেও স্থান।
প্রেম-জ্বালা সইতে নারি
কোন দিন নাকি জ্বইলে মরি,
তোর নামের কলঙ্ক গাইবে জমিন আছমান ॥
রে নিষ্ঠুর বেইমান ॥
বন্ধু রে প্রেম বাগিচায় ফুটছে ফুল,
সৌরভে তার প্রাণ আকুল,
নতুন ফলে বৈসে একবার মধু কর পান।
বুক ফেটে যায় দারুণ বিষে,
তুই, বন্ধু, বুঝিবে কিসে,
বিনা মুল্যে বিকাইলাম জাতি কুল মান ॥
রে নিষ্ঠুর বেইমান ॥
বন্ধু রে, লায়লীর পিরীতের কাঙ্গাল,
কান্দে মজনু চিরকাল,
তোর বাহানা গেছে জানা নির্দয় পাষাণ।

প্রেম-যমুনায় দিয়ে সাঁতার
এই দুর্দশা ঘটল আমার,
লাভের আশায় প্রেম করিয়া বাড়িল লোকসান ॥
রে নিষ্ঠুর বেইমান ॥ —ঐ

বাংলার প্রেম-সঙ্গীতেও যে লায়লা এবং মজনুর প্রেমের আদর্শ প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল, এই গানটি হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। রাধা এবং কৃষ্ণের সম্পর্কের মধ্যে যে দিব্য ভাবের স্পর্শ আছে, লায়লা-মজনুর প্রেমে তাহা নাই। ইহা অধিকতর মানবিক। সেইজন্য সেই চিত্রটিই বাঙ্গালী কবির মানস-পটে অধিকতর জাগ্রত ছিল বলিয়া মনে হইতে পারে।

২১

প্রাণ বন্ধুয়া বিনে গো আমার চিত্তের কথা কেউ জানে না।
যারে বলি আপন আপন, সে আমায় আপন বলে না ॥
চিত্তের বেদন কেউ জানে না ॥
বন্ধু আমার নাই গো দেশে ;
মৈলাম গো, সই, হা-হুতাশে,
হায় রে, তা দেখে না ;
মনে লয় উড়িয়া যাইতাম, বিধি আমায় পাখা দিল না ॥
চিত্তের বেদন কেউ জানে না ॥
গহীন গাঙ্গের শীতল জলে,
ডুবলাম কতই কুতুহলে,
হায় রে, জ্বালা নিভে না।
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে গো, জলে আগুন আর নিভে না।
চিত্তের বেদন কেউ জানে না ॥
মাকালের রঙ্ দেখতে ভাল,
উপরে লাল তার ভিতরে কাল,
হায় রে, আগে জানি না।
না জাইনে গরল খাইলে গো, বিষের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না ॥
চিত্তের বেদন কেউ জানে না ॥

যায় অন্তরায় প্রেমের ব্যাধি
সেই ত জানে নিরবধি,
হায় রে, অন্যে জানে না।
শত রোগের বৈদ্যি মিলে গো, এই ব্যাধির ঔষধ মিলে না॥
চিত্তের বেদন কেউ জানে না॥ —ঐ

২২

আমায় পাগল করিলে, রে বন্ধু, পাগল করিলে।
আগে ভালবাসি, দিয়া মুখের হাসি
অবশেষে দোষী আমায় বানাইলে॥
আগে যদি জানি, হব কলঙ্কিনী
অনাথিনী কৈরে যাইবে ফেলে।
ও তোর কথায় না ভুলিতাম সুখে থাকিতাম,
জীবন যৌবন দিতাম না ঢেলে॥
শুনিয়া বাঁশরী, ছেড়ে ঘর বাড়ী
সাজিতে ভিখারী ছিল রে কপালে।
কার কাছে যাইব কারে জানাইব,
কত যে আগুন হৃদয়ে জ্বলে॥
মনে হইলে মুখ, ফেইটে যায় রে বুক
মুখেতে অসুখ তুমিই করিলে।
আমার মরণ সময়, যদি রে মনে লয়,
দেখিয়া যাইও দুই আঁখি মেলে॥ —ঐ

২৩

আমি মরিলে যেন পাই গো তারে।
সারাটা দুনিয়া, দেখিয়াছি ঘুরিয়া, ভিখারি সাজিয়া দ্বারে দ্বারে॥
(আমি) শুনিয়াছি কানে না দেখি নয়ানে,
আসমানে জমিনে সদায় ঘুরে।
বন্ধু বাঁশিটি বাজায়, হাসায় আর কান্দায়,
তালাশে লুকায় ছলনা কৈরে॥

বন্ধু শুইয়া মোর বিছানায়, সঙ্গেতে ঘুমায় ;
ঘুমাইলে জাগায় আদর কৈরে।
আমার পিপাসার জল, সহায় সম্বল,
চঞ্চল পাখী বদ্ধ পিঞ্জরে ॥
আমি কহি নিরবধি, কিবা অপরাধী
জনম অবধি কান্দি উচ্চৈঃস্বরে।
আমি হইয়াছি সারা, জীয়ন্তে মরা,
ধরা না কেবল দিল আমারে ॥ —ঐ

বৈষ্ণব পদাবলীর একটি সুপরিচিত পদের সঙ্গে এই পদটির তুলনা করা যাইতে পারে ; অথচ বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা যে ইহা প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা মনে হইবার কোন কারণ নাই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-পদাবলীই যে লৌকিক প্রেমগীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।

২৪

বন্ধু কই রইল রে।
অকুলে ভাসাই, বন্ধু, কই রইলা রে।
লহর দরিয়ার বুকে মইলাম সাঁতারিয়া।
কি দুঃখ বুঝিবে, বন্ধু, কিনারে দাঁড়াইয়া ॥
বন্ধু রে, কুল নাই, কিনারা নাই উঠেছে কত ঢেউ।
এমন নিদান কালে সঙ্গী নাই মোর কেউ ॥
বন্ধু রে, তোমার আশায় ভাসিয়াছি সকল হারাইয়া।
কোন পরাণে এখন তুমি রইলে পাশুরিয়া ॥
বন্ধু রে, সোতের সেওলা হইয়া ভাস্যা ফিরি একা।
প্রাণ থাকিতে একবার আইস্যা দিলে না আর দেখা ॥
বন্ধু রে, পাহাড়ে কান্দিতাম যদি পাষাণ হইত পানি,
দুনিয়াতে রইয়া যাইতে লোকের জানাজানি ॥ —ঐ

২৫

আমার প্রেম কইরা আর সুখ হইল না প্রেমিক না হয়ে।
তুই গঙ্গাস্নানের ফল পাবি কি কুয়ায় ডুবিলে, প্রেমিক না হয়ে ॥

আমি আখ বইলে চাবাইলাম বাঁশ
বাঁশে না পাইলাম শাঁশ, কেবল গালের সর্বনাশ,
প্রেমিক না হয়ে ॥
ও তুই রসগোল্লার স্বাদ পাবি কি চিটে গুড় খাইলে।
কিঞ্চিৎ মধু পাবার আশে হাত দিতে চাও বল্লার চাকে,
বল্লা কামড়াইয়ে দিবে তুমি পাবা না মধু।
সতীর মধু পতির কাছে, অসতীর মধু যেমন ছেমুলের মুলে
আমার প্রেম কইরে সুখ হইল না,
প্রেমিক না হয়ে ॥

২৬

সে যে ধরা দিতে চায় ধরে না কেহ,
অনলে পুড়িয়া মরে বুক পেতে আছি।
অনল বুকে উথলিছে অনলে প্রাণ যায়।
হায়, সে যে ফিরে চেয়ে দেখে না আমায়
অনলে পুড়িয়া মরি ॥ —ঐ

২৭

আর পিরীতি করবো না, সই, এই পিরীতে দুঃখ হইল,
যে কবে পিরীতের কথা, তার সনে না কবো কথা,
তুইলে লব বেলপাতা কাশীত্ যাইয়া শিব পুজিব ॥ —ঐ

২৮

সজনি, সই গো, দুই নয়নের পলক হইল বাদী।
নয়ন পলক না থাকিলে হেরিতাম রূপ নিরবধি ॥
জল আনিতে ঘাটে গেলাম, জলের ছায়ায় রূপ দেখিলাম,
হায়রে ঢেউ হইল বাদী ;
মনে লয় সে রূপরাশি হৃদয়ে আঁকিয়া গো রাখি ॥
গিয়াছে মোর কুল মান, বাকী শুধু আছে প্রাণ,
আর দুইটি আঁখি ;
কাঙ্গাল ঈশ্বর চান কয় মনের খেদে, দাগা দিছে দারুণ বিধি ॥ —ঐ

এই চিত্রটির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের একটু ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। তাহা হওয়াই সম্ভব, কারণ, তাহাতে কাঙ্গাল ঈশ্বরচাঁদ নামক একজন কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। কাঙ্গাল ঈশ্বরচাঁদ, মনে হয়, বাউল ; তাহার রচিত গান তাহার শিষ্যেরা গাহিয়া বেড়াইত। পরবর্তী বাউল সম্প্রদায়ে যে ভাবে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ গিয়া অধিকার স্থাপন করিয়াছিল, তাহারই সূত্রে ইহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের ছায়াপাত হইয়াছে।

২৯

যা রে, কোকিলা, তুই আমার পতি গেছে যে দেশে,
অমন করে জ্বালাতন করিসনে আর নিত্তি এসে।
শুনে তোর কুহুস্বর, উস্কে উঠে পরাণ আমার,
প্রাণপতি মোর দেশান্তর, ছাড়্‌গে তথায় তোর কুহুস্বর ;
কাঁচা বুকে লাগলে আঘাত পাইনে কোন দিশে ॥ —ঢাকা

৩০

তামাক খেয়ে গেলে না রে, কবিরাজ, কত দুঃখ মনে যে বল,
ঐ যে চান্দের পাশে তারা হাসে তেতুলপাত শুকাল।
মরা গাঙ্গে কুমীর ভাসে শুকায় মুঙ্গীর ফুল,
এই ভরাকালে হলেম্ রাঁড়ী, কবিরাজ, যৌবনে ফুটিল ফুল ॥ —ঐ

৩১

দরদি নিগম কথা শুন্‌লি নে হেলায়,
আমি অচল পয়সা হলাম ভবের বাজারে,
তোরা বুঝ্‌লিনে, দেখ্‌রে বেলা যায় ॥

৩২

এ ফুল পালি কনে লো ছোট বউ সাঁজের বেলায়।
জল আনিতে গিয়াছিলাম সানবান্দা ঘাটে,
ভেসে যেতে চাঁপা ফুল তুলে নিলাম হাতে।

৩৩

ও ভাইরে, ঝাঁকে ওড় ঝাঁকে পড় তারে বল সাড়া,
বল মোর বঁধুয়ার কাছে, ভাই, পিরীতি প্রাণ মরারে।

ওরে নলের আগায় নলফুল বাঁশের আগায় টিয়া,
কইয়ো মোর বঁধুয়ার আগে না যেন করে বিয়া রে
কি জঞ্জাল করিলি, ভাই রে।
যখনে কল্লাম পেরেম্ সানবাঁধা ঘাটে,
আকাশের চন্দর যেন, ভাই, তুলে দিল হাতে রে,
তুলে দিল হাতে ॥ —ঐ

৩৪

বাঁশের ছোবে বক পৈড়াছে ডাইক ডাহে বিলে।
নয়ান বন্দু হিনান করে গো, হারি থুইয়া টীলে ॥
বন্দুর বাড়িত যাবার চাইছিলাম (ও হায়—) পৈষ মাহাও যায়।
কেমন কৈরা হুজাইরে, বন্দু, হাতুরী সাই মরে গায় ॥
ইব্যান্ দুক্কু রাখমু কনে (ও হায় রে—) ওরে আমার বন্দু আইল কৈ।
মার পুতিতে হাইরে চীনা, খরায় হুধকী চৈ ॥ (রে চৈ) ॥
ওরে আমার, বন্দুরে, আর দুক্কু না সয় দিলে ॥
ওরে ও, বগিলা, তুই পাহা দিয়া ডাক।
ই বছরডা গেলে হুজ্মু দিয়া নাইলা হাগ ॥ (রে হাগ) ॥
ওরে আমার, বন্দুরে, আর দুক্কু না সয় দিলে ॥ —ঐ

৩৫

ওরে ওরে অসমতি হুন হুন ও! বরা যৈবনে নিছুশ যাহন যায়।
উমুর ঝমুর কইরা নিছে পরাণ তোমার পায় ॥ (ও কইলজারে!)
বরা বান্দরে আহ গাঙ্গৎ ডাহে বান,
হোলা হুক্যায় কান্দার পাড়ো বুন্ছি আমুন দান।
আলের মুঠ্ঠি করছি হৈলা (ওরে হায়)—
আমার, দহীনদারী গর বৈরাছি বল্দের পাহায় ॥ (ও কইলজারে!)
আলান্ পালান্ উজার অইল গো—কে হেচিবে পানি,
আমার, কাইন্দা কাইন্দা নানীর ওগো চহৎ পড়ছে ছানি ॥
(ও কইলজারে!) —ঐ

৩৬

সোনা বন্ধুয়া রে,
বিকাইলেম ঐ রাঙ্গা পায়।
বিকাইলে কি করবে বাপ মায়।
সোনা বন্ধুয়া রে ॥
মন প্রাণ দিয়া বন্ধেরে কইও গিয়া,
বিকাইলে নি কিনবে গো আমায়!
সোনা বন্ধুয়া রে ॥ —ঐ

৩৭

কোন দেশে গেলারে, পরাণ. কোন্ দিকেতে গেলা,
তোমার লাগি ভাত বাইরাছি—ভাটি ধরছে বেলা রে পরাণ,
বাগুন সিদ্ধ দিছি রে, পিয়ু, আর কাঁঠালের হালি,
গরম গরম খাও আইসেরে পিয়ু মিছা বাড়াও বেলা ॥
নতুন লনী ঘনরে মাঠা, খাওন হৈবে ভালা।
আইস আইস, বন্ধুরে, আমি রইয়াছি একেলা ॥
ভাতের উপর তেলের গো হাত মোর বুলাইছি যতনে,
মাছিয়ে বসিছে, পিয়ু, কইর না আর বেলা ॥ —ঐ

৩৮

কাইল বলে গেলারে, বন্ধু, কত যে কাল হইল,
ও বন্ধুরে—
আর কতদিন বাকী সেই কাইলের বন্ধু
একবার এইসে বল, বন্ধুরে।
তুমিত দূর দেশে গেছ, বন্ধু, আমি রইলাম ঘরে. বন্ধুরে—
তোমার পায়ে আমার বুকে, বন্ধুরে, বান্ধা কিসের জোরে—
যৌবন জোয়ারের পানি রে, বন্ধু, ভাটা লাগলেই যাবে,
নারীর জনম মিছা হইলে, বন্ধুরে, তুমিও দুঃখ পাইবে।
বন্ধুরে,—
আন্ধাইর নিশিতে, বন্ধু, আমি তোমার মুখ দেখি,
বিনাইতে মাথার বেণীরে, বন্ধু, ঝরে দুইটী আঁখি।

বন্ধুরে ! আইস আইস, প্রাণের বন্ধু, তুমি রে জুড়াও আমার হিয়া—
অভাগিনী নারী তোমার কান্দে পন্থ চাইয়া, বন্ধুরে। —ঐ

৩৯

ও প্রাণ কানাইও, তৈলের বাটী গামছা হাতে,
চল যাই যমুনার ঘাটে, কলসী ভাসাইয়া দিব জলে,
ও প্রাণ কানাই ও ! —ঐ

৪০

ঘরে তো শাশুড়ি গঞ্জনি, বাইরে তো
তিরবধী গঞ্জনি, আরে বিধি গঞ্জনি,
অন্তরে ভিতরে বিদ্ধি কেউ জানে না। —পুরুলিয়া

৪১

পতি বিদেশে গিয়াছে, ফিরিবার কোন নাম নাই। একদিন বধূ অধৈর্য হইয়া গিয়া শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল—

"শাশুড়ী ত বলিরে গুণের শাশুড়ী, বলিরে,
হ্যারে তোমার পুত রহিল কোন দ্যাশেরে।"
"আমার যে পুতরে, ও বউ রে, পঞ্চফুলের ভোমর রে,
হ্যারে, এক ফুলে রহিল মন মজিয়া রে।
ঘরেতে আছে রে, ও বউরে, কোটরা ভরা সিন্দুর রে,
তুমি উয়াই দেইখা পাশইর রাম সাধুরে।
ঘরেতে আছে রে, ও বউরে, বাক্‌স ভরা জেওর রে,
তুমি উয়াই দেইখা পাশইর রাম সাধুরে !"
"ও কৌটার সিন্দুর রে, ও শণউড়ী, আমি বাতাসে উড়াব রে ;
ও বাক্সের গয়নারে ও শাউড়ী আমি লুটারে বিলাব রে,
আমি তবু যাব রামসাধুর তালাসে রে। —ফরিদপুর

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে লৌকিক প্রেম-চিন্তার ধারার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের ছায়া কি ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৪২

কইও দুষখু বন্ধের লাগ্ পাইলে গো—নিরলে।
আমারে নি আছে বন্ধের মনে গো।

আমার বন্ধু রঙ্গি চঙ্গি, কদম তলা বান্‌ছে টঙ্গি,
আমারে নি আজও মনে করে গো।
আমার বন্ধু চিকন কালা, গলায় শোভা বনমালা,
হাতে শোভা ঐ না লো মুরলী গো।
বাঁশী বাজায় কদম্বেরি তলে গো।
আমি মৈলে এই করিও, দাবানলে না দহিও,
না ভাসাইও যমুনার জলে গো।
আমি মৈলে এই করিও, না কান্দিও, না পুড়িও,
বাইন্দা রাইখো তমালের ডালে গো।
কইও তুষখু বন্ধের লাগ্‌ পাইলে। —ঢাকা

৪৩

ঘাটে নাও লাগাইয়া, রে তুমি, পান খাইয়া যাও।
পান খাইয়া যাও রে, বন্ধু, কথা শুইনা যাও।
কোন্ দেশের মানুষ, গো তুমি, কোন্ বা দেশে যাও,
একখান কথা কও বা না কও, পান খাইয়া যাও।
বিনয় কৈরা ডাকছি তোমারে গো, একবার ফিইরা চাও,
ঘাটে নাও লাগাইয়া তুমি পান খাইয়া যাও। —ঐ

৪৪

মরমসখী গো, বলুক বলুক লোকে মন্দ, কার কথা কে শোনে,
আমি ছাড়ব না, সই, প্রেমলালসা এবার যদি বাঁচি গো প্রাণে॥ —চট্টগ্রাম

৪৫

কাউয়া কালা কুইলা কালা, আঁখির পুত্তলি কালা,
আর ও কালা অঙ্গের নিশানা, ওরে কালরূপে জগতজোয়ারে অ বঁধুয়া।
মনর শান্তি অইল না তোর জ্বালায় আর পরাণ তো বাঁচে না। —ঐ

তোঁয়ার প্রেমে দেবালী অইয়া, খুসির আমি মজনু অইয়া।
তোঁয়ার নামে তসবী লই, জুইপ্যাম মালা নীরবে বই।
বিনা সূতায় গাঁথথ্যম মালা, পরাই দিয়ম বন্ধুর গলায়। —ঐ

দেবরের সঙ্গে সম্পর্কের টলতার বিষয় নিম্নের দুইটি গানেই ব্যক্ত হইয়াছে।

৪৭

বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ী মধ্যে ক্ষীরো নদী।
উড়ে যাবার আশায় করি পয়ার দেন নি বিধি॥
বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ী মধ্যে নলের বেড়া।
হাত বাড়ায়ে পান দিতে দেখ্‌ল দেওর ছোঁড়া॥
পান দিলাম সুপারী দিলাম, চুনো দিয়ে খাইও।
আরো কোন কথা থাকে কদমতলায় যাইও॥ —খুলনা

৪৮

আমার বাড়ী যান, হে দেওরা, খাইতে দিব পান।
আর শুইতে দিমো শীতল পাটি যৈবন করব দান॥ —জলপাইগুড়ি

৪৯

রস্থা বন্ধু গেল ছাড়িয়ে সদা দিলে মোর দাগ লাগাই।
এমন রসের কালে কার সোয়ামী ঘরত নাই?
ছোডো কালে বিয়া দিলরে মা বাপের চোখে ছাই,
আরে রঙ্গুম হাই ভুলি রলি কন্ হতীনের ছল্লা পাই। —চট্টগ্রাম

৫০

আমার বিবাহ দিয়ে ভুলে থেকো কিনা গিয়ে
আমার প্রিয়ে, কামশরে বিঁধিছে পাঁজরেতে,
ফিরে একবার হের গো নয়নে।
তোমার মুখের হাসি বড় আমি ভালবাসি,
কিন্তু পাই না দেখবারে।
ভোমন পামরে গায় ঐ বিরহে প্রাণ যায়,
ফিরে একবার হের গো নয়নেতে॥ —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

৫১

নিম্নোদ্ধৃত পদটি লৌকিক ভাবসম্মিলনের পদ—

স্বপনে নাগর বর বসিয়েছে পালঙ্কেতে পরে,
আজ যে দুখের দিন গেছে সে, সই, বলবো গো কার কাছে।

হারা হ'য়ে প্রাণধন মিছাই দেহ আছে,
আজ যে দুখের দিন গেল, সই. বলবো গো কার কাছে।
এই দেখাতে হ'ল দেখা মিছাই দেহ আছে,
আজ যে দুখের দিন গেল, সই, বলবো গো কার কাছে।
অধম নরু বলে বিধাতা আমার কপালে
কতই দুখ লিখেছে, সই, বলবো গো কার কাছে ॥ —ঐ

৫২

হের লো, প্রাণ-সজনি, বিগত সুখ-রজনী নত্র সুধাকর,
শুকাইল পুষ্পমালা শয্যা মনোহর।
কুঞ্জে এল না নাগর ॥
প্রস্ফুটিত নলিনী রে সুগন্ধে মৃদু সমীরে বহে নিরন্তর।
গুণ গুণ স্বরে খেলেন সুখে ভ্রমরা নিকর।
কুঞ্জে এল না নাগর ॥
কুঞ্জে বসি একাকিনী কি করিব বল, সঙ্গিনী, উদিত ভাস্কর,
ভবপিতা ভাবেন মনে চরণ সুন্দর।
কুঞ্জে এল না নাগর ॥ —ঐ

যে অঞ্চলে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব যত বেশী বিস্তারলাভ করিয়াছে, সেই অঞ্চলের প্রেম-সঙ্গীতগুলি তত বেশী কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে কৃষ্ণলীলা ঝুমুরগান সৃষ্টি হইবার ফলে, তাহাতে যেভাবে লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতগুলি প্রভাবিত হইয়া অলঙ্কার দ্বারা কৃত্রিম হইয়াছে, চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রেম-সঙ্গীতগুলি তাহার প্রভাব হইতে দূরবর্তী ছিল বলিয়া ইহাদের সহজ রূপটি বহুলাংশে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। বৈষ্ণব প্রভাবিত অঞ্চলে 'কানু ছাড়া গীত নাই' এ'কথা প্রেম-সঙ্গীতের পক্ষে সত্য হইলেও বৈষ্ণব প্রভাবের বহির্ভূত অঞ্চলে সকল প্রেম-সঙ্গীতই লৌকিক, তাহাদের মধ্যে কানু নামের গন্ধ নাই।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কতকগুলি প্রেম-সঙ্গীত মাঝির গান বলিয়াও পরিচিত। কারণ, ইহাদের নায়ক প্রধানত মাঝি। চট্টগ্রামে সমুদ্রগামী নৌকাকে সাম্পান বলে। সুতরাং এই মাঝিদিগকেও সেখানে সাম্পানের মাঝি বলা হয়। ইহারা উপকূল পথে আকিয়াব হইয়া রেঙ্গুন যাতায়াত করে, বিদেশে

গিয়া নূতন সঙ্গিনী লাভ করিয়া গৃহের কথা ভুলিয়া থাকে তাহাদিগের প্রোষিতভর্তৃকা পত্নীদিগের বেদনাই ইহার বিষয়।

মাঝির গান

ওরে উজান গাঙ্গের নাইয়া, বাতাস বুঝি ছাড় নৌকা
আকাশ পানে চাইয়া, ওরে উজান গাঙ্গের নাইয়া॥
ওরে পুরাণ মাঝি, হও রাজি খাঁড়ি লও চিনিয়া,
বালুর চরে ঠেকিলে নৌকা কুল পাইবানা বাইয়া।
ওরে উজান গাঙ্গের নাইয়া॥ —চট্টগ্রাম

২

বসে রইলাম খাল কুলে
সন্ধ্যাবেলা ওরে মাঝি, ভাই, নৌকা মিলে।
আদর করি পার করিলে রসের যৌবন দিয়ম তোরে,
সন্ধ্যাবেলা, ওরে মাঝি ভাই, নৌকা না মিলে॥ —ঐ

অ ভাই, চাঁদ মুখে মধুর হাসি
দেয়াল্যা বানাইলি সাম্পানের মাঝি।
বাহার মারি যারগে সাম্পানরে।
ন মানে উজান ভাটি।
কুতুবদিয়ার পাছিম ধামে সাম্পানঅলার ঘর।
লাল বঅটা তুলি দিয়ে সাম্পানর উঅর॥
রস্তা, বন্ধু, গেল ছাড়িয়ে সদা দিলে মোর দাগ লাগাই,
এমন রসের কালে কার সোয়ামী ঘর ত নাই? —চট্টগ্রাম

ফকিরি গান, ফকিরে গান

মুসলমান দরবেশ এবং পীর ফকিরের নামে প্রচলিত এক শ্রেণীর দেহতত্ত্ব, বৈরাগ্য বা অধ্যাত্মমূলক গানের নাম ফকিরি গান। অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের মধ্যে রূপকের ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহারা যথার্থ বাউল (পরে দেখ) গান নহে ; কারণ, যে সুনির্দিষ্ট আধাত্মিক চিন্তা অনুসরণ করিয়া বাউল গান রচিত হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে তাহা অনুসরণ করা হয় না। বরং তাহার পরিবর্তে এক একজন বিশিষ্ট ফকিরের নিজস্ব অধ্যাত্মচিন্তা তাহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয়।

১

চাঁদ লেগেছে চাঁদের গায়ে আমরা ভেবে করব কি ?
ঘর আছে তার দুয়ার নাই মানুষ আছে তার বাক্য নাই ॥
কেবা দেয় তাহার আহারাদি কে দেয় তার সন্ধ্যার বাতি।
ছয় মাসে হয় কন্যা স্থিতি, নয় মাসে তার গর্ভবতী ॥
এগার মাসে তিনটি সন্তান কোনটায় করে ফকিরী।
আলম গা ফকিরে বলে মায়ে ছুঁইলে পুত্র মরে ॥
এই তিন কথার মানে বলে তারাই হৈবে ফকিরী,
মায়ের পেটে বাবা জন্ম তারে তোমরা বল কি ? —রাজসাহী

২

হারে তোর গুরু যা বলেছে শুনরে, মনপাখী।
ভেবে ভেবে হলি যেমন ধারা চাতকী ;
দিনে রাতে খেতে শুতে মনকে বোঝাও নানা মতে
অধম লালা বলে জীব সাধুথায় যুবাকালে ॥ —মুর্শিদাবাদ

ফল ভাসানোর গীত

পূর্ব বাংলা বিশেষত পূর্ব মৈমনসিংহ, উত্তর ত্রিপুরা এবং পশ্চিম শ্রীহট্ট অঞ্চলে বিবাহ-সঙ্গীতের মধ্যে এক শ্রেণীর মেয়েলী গীত প্রচলিত আছে, তাহাকে

ফল ভাসানোর গীত বলে। প্রকৃত পক্ষে ইহা গর্ভাধান বিবাহের সঙ্গীত। গর্ভাধান বিবাহের রাত্রিতে বধূ পাঁচটি ফল আঁচলে বাঁধিয়া পতিসহ নিশিযাপন করে; পরদিবস প্রত্যুষে উঠিয়া সেই পাঁচটি ফল অনুষ্ঠানিক ভাবে জলে ভাসাইয়া দেয়। তারপর জলে ডুব দিয়া উঠিবা মাত্র ভাসমান যে ফলটি বধূ নিজের হাতের কাছে পায়, তাহাই মুঠি দিয়া ধরিয়া ফেলে। ইহা দ্বারা পুত্রসন্তান কিংবা কন্যাসন্তান জন্ম লাভ করিবে, তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলিয়া মনে করা হয়। এই বিষয়ের একটি মেয়েলী সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হইল।

১

দেখ, প্রভাত সময় ফল ভাসাইতে যায় গো বধূ
ক্ষীর নদীর সাগর।
নাগর রে জাগরণ কইর‍্যা উঠিল সুন্দরী,
ফল ভাসানের সময় হল চলে তরাতরি।
আবের কাকৈএ সুন্দরী বেশ কইর‍্যাছে বেশ,
পারিজাতের খোঁপা সুন্দরী বান্ধাইছে বিশেষ,
শ্বশুর বাড়ীর সম্মুখে পঞ্চ ঘর মালী,
সড়ক ছুলিয়া দেউক ফল ভাসাইবাম আমি।
সড়ক ছুলিয়া মালী না বুলাইল ঝাড়ু,
দুই পা ভরিয়া গেল চম্পক ফুলের রেণু,
আগে আগে শাশুড়ী যায় পাছেতে ননদী,
মধ্যে কইর‍্যা লইয়া চলে জনক রাজার ঝি।
ফলেরে ভাসাইয়া কন্যা নিরখিয়া চায়,
বাইঙ্গনের কলি যেমন জলে ভাইস্যা যায়। —মৈমনসিংহ

ফিকির চাঁদি

রামপ্রসাদ প্রবর্তিত শ্যাম-সঙ্গীতের সুরকে যেমন রামপ্রসাদী সুর বলা হয়, ঙ্গাল ফিকির চাঁদ প্রবর্তিত বাউল গানের বিশেষ এক গীতিসুরকে ফিকির দি সুর বলা হয়। ফিকির চাঁদি বাউল সুরের বিশেষত্ব সম্পর্কে সঙ্গীতাচার্য রেশ চন্দ্রচক্রবর্তী লিখিয়াছেন,—

"ফিকিরচাঁদি'র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলা চলে। আমরা পূর্বে পল্লী-সঙ্গীতে এক ধরনের ঝিঁঝিঁট রাগ ও খাম্বাজ ঠাটের উল্লেখ করেছি। 'ফিকিরচাঁদি'র রূপটি একটু আলাদা। কঁসৌলি ঝিঁঝিঁট যা' ভাটিয়ালীতে খুব বেশী প্রচলিত তার রূপটি হচ্ছে,— স র ম, প ম গ ধ স ণ ধ, ধ স-স র গ, র গ স I এর সঙ্গে ফিকিরচাঁদির তুলনা করা যাক্ :—II স I স র I গ প-I ধ ন-I ধ স স I ন ধ প I প ম গ I-গ র I র গ ম I গ র স I- -II। খুব সূক্ষ্মবিচার না ক'রেও বলা চলে, এতে বিলাবল পর্যায়ের রাগের প্রভাবই বেশি। এই প্রসঙ্গে একথা ব'লে রাখছি যে, বিলাবল আমাদের যাবতীয় দেবস্তুতি ও তত্ত্বমূলক সঙ্গীতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী সুর। অধিকাংশ সংস্কৃত স্তোত্র বিলাবলের শুদ্ধ স্বর সাহায্যে গাইলে ভাল শোনায়—গাম্ভীর্য রক্ষার পক্ষে এই ধরনের সুরই ভাল—এটা অনেকেই স্বীকার করবেন। তবে এক কারণে বৈঠকী সঙ্গীত হিসেবে এই গাম্ভীর্য বাউলে রক্ষিত হয়নি—সেটি হচ্ছে বাউলের ছন্দোবাহুল্য, তারও কারণ বাউল গান গাইবার সময় নাচে। বলাবাহুল্য, এ পাগলের নাচ নয়। সাধারণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করলেও বাউলের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে—এ নৃত্য তাই বেপরোয়া মাতামাতি নয়, তাই বাউলের নাচে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তালেও বৈচিত্র্য অর্থাৎ তাল ফেরতা আছে। এক হিসেবে বাউল গান শুধু কানে শোনবার নয়, চোখে দেখবারও বস্তু। বাউলের একতারা, নৃত্যের ভঙ্গী, ভাবের উচ্ছ্বাস, সবই সামনে থেকে দেখে শু'নে তবে বুঝতে হয়; এ সম্পর্কে নন্দলালের আঁকা বাউলের চিত্রটি মনে করা যেতে পারে। এখানে শ্রাব্যের সঙ্গে দৃশ্যসঙ্গীতের প্রত্যক্ষ সমন্বয় ঘটেছে।

এই বাউল গানে একটু আগেই দেখতে পেয়েছি যে, বিলাবল অঙ্গীয় রাগের প্রভাব রয়েছে। তা ছাড়া একথা বলাও হয়েছে যে, বাংলার লোক-সঙ্গীতে ঝিঁঝিঁটের প্রভাবটাই সবচেয়ে ব্যাপক। বাংলা দেশে বিভাসের এক বিশেষ রূপ চলতি আছে—এটিও বিলাবল অঙ্গের এবং এই সুরেও অনেক পল্লীসঙ্গীত আছে, তবে এই সব পল্লীসঙ্গীতে মাঝে মাঝে একটু কোমল নিখাদ ব্যবহার করার দিকে ঝোঁক রয়েছে, আর তা' করলেই কিছুটা ঝিঁঝিঁটের সঙ্গে সম্পর্ক জন্মে যেতে পারে।" —বাংলার লোক-সাহিত্য, ৩য় সং, পৃ. ৬৮১-২

ফুল আখড়াই

প্রাচীন বাংলা এবং এখন পর্যন্ত আদিবাসী অঞ্চলে নৃত্যগীতের স্থানকে সাধারণত আখড়াই বলে। মূলত তাহাতে যে গান হইত, তাহাকেই আখড়াই গান বলিত। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে ক্রমে বিশেষ এক প্রকৃতির গান আখড়াই (পুর্বে দেখ) বলিয়া পরিচিত হইল। ক্রমে এই আখড়াই গান ভাঙ্গিয়া আর এক শ্রেণীর গান রচিত হইয়াছিল, তাহা হাফ্ আখড়াই (পরে দেখ) নামে পরিচিত হইল। হাফ্ আখড়াই গান প্রচলিত হইবার পর প্রাচীন বা পুর্ববর্তী আখড়াই গানকে ফুল (Full) আখড়াই বলিত। ইহার নিদর্শন পুর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে ('আখড়াই' দেখ)।

ফুলপট

চট্টগ্রাম অঞ্চলের একশ্রেণীর কাহিনীমূলক সঙ্গীতের নাম ফুলপট। ইহার সঙ্গে পটের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু মনে হয়, একদিন এই সম্পর্ক ছিল, বর্তমানে তাহা লোপ পাইয়া ইহার মধ্য হইতে কেবল মাত্র গীতি অংশ রক্ষা পাইয়াছে। ইহা কাহিনীমূলক বলিয়া সাধারণত পাঁচালীর সুরেই গীত হয়। ইহার কোন অংশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

ফেলুয়া ভুলুয়ার গান

উনবিংশ শতাব্দীর নূতন যাত্রায় নর্তক-নর্তকী সাজিয়া কাহিনীর মধ্যে মধ্যে যে সকল চরিত্র আনন্দ দান করিত, তাহাদের মধ্যে ফেলুয়া ভুলুয়া চরিত্র অন্যতম। নৃত্য সহযোগে নানা তাল-প্রধান যুগ্ম সঙ্গীত তাহারা পরিবেশন করিত। গানের মধ্য দিয়া নানা লৌকিক এবং সাময়িক বিষয়ের অবতারণা করা হইত। সেইজন্য অধিকাংশ গানই আজ স্মৃতিতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন গানই প্রায় সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। কেবলমাত্র নূতন যাত্রার বর্ণনার মধ্যে তাহার নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল গানে কোন সাহিত্যগুণও নাই।

বঙ্গাল রাগ

প্রাচীন বাংলার একটি সুপরিচিত রাগের নাম বঙ্গাল রাগ। গীত গোবিন্দে ইহার উল্লেখ নাই, কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' ইহার ব্যাপক উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে বঙ্গাল, বঙ্গালী বা বাঙ্গালী নামে রাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার প্রাচীনতর নাম বঙ্গাল রাগ, সঙ্গীত-বিষয়ক পরবর্তী গ্রন্থাদিতে ইহা 'বাঙ্গালী' এবং 'বঙ্গালী' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। শ্রীরাজেশ্বর মিত্র তাঁহার বাংলার সঙ্গীত' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে 'সঙ্গীতদর্পণ' এবং 'সঙ্গীত পারিজাত' হইতে ক্রমান্বয়ে এই দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া ইহার সম্পর্কে যাহা মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল—

'বাঙ্গালী উত্তয়া জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসষড়্জভাক্।
রিধহীনা ১ বিজ্ঞেয়া মূর্ছনা প্রথমা মতা।
পূর্ণা বা মত্রয়োপেতা কাল্লিনাথেন ভাষিতা॥

সঙ্গীতদর্পণ মতে এ রাগটি ঔড়ব। গ্রন্থের টীকায় বলা হয়েছে—"সোমেশ্বর নারায়ণ-সুধাকর-সিংহভূপালানাং মতে ইয়ং সম্পূর্ণা।"

বঙ্গালী রি-ধ-হীনা স্যান্মতীব্রতরসংযুতা।
নি-তীব্রেণাপি সংযুক্তা স-স্বরোত্থিত মূর্ছনা॥

অর্থাৎ আরোহণ অবরোহণ এই রকম—"স জ্ঞা হ্মা পা না র্সা - র্সা না পা হ্মা হ্মা সা। পারিজাতে এর বিস্তার দেওয়া আছে। এটি প্রাতঃকালীন রাগ। (পৃষ্ঠা ১০৪ পাদটীকা)।'

ইহা যে আদিবাসী সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়া লোক-সমাজের মধ্য দিয়া ক্রমে উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করিবার ফলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। (বঙ্গালী রাগিণী দেখ)।

বঙ্গালী রাগিণী

বঙ্গালী রাগিণী সম্পর্কে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, 'বাংলার আদিবাসীদের সংস্কৃতির আর একটি বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া

যায়, আদিম কালের বাঙ্গালাদেশের সঙ্গীতের সৃষ্টিতে। ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হইল বঙ্গাল রাগিণী। ইহাতে সন্দেহ নাই যে ইহা বাংলাদেশের ভূমিজ রাগিণী। ইহার আদিরূপ কি ছিল, তাহা আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের আদিবাসীদের সঙ্গীত সৃষ্টির অকাট্য প্রমাণ বলিয়া ইহাকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি।' ('বাঙ্গালী রাগিণী', সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩, পৃঃ ৯৩)।

বঙ্গালী রাগিণীর সংস্কৃত ধ্যানে ইহার এই পরিচয় পাওয়া যায়—

কক্ষ-নিবেসিত-করন্ত-ধরায়তাক্ষী
ভাস্বৎ-ত্রিশূল-পরিমণ্ডিত-বামহস্তা।
ভস্মোজ্জ্বল নিবিড় বদ্ধ-জটা-কলাপা
বঙ্গালীকেতি অভিহিতা তরুণার্ক বর্ণা॥

ইহার স্বররূপ এই প্রকার: সা গা মা পা নি সা ১ ওড়ব মা ধা নি দা রি গা মা।

বঙ্গালী রাগিণী বাঙ্গালাদেশ হইতে উত্তর ভারতে গিয়া কালক্রমে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। হিন্দী ভাষাতে ইহার অসংখ্য ধ্যানসঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। আটটি ধ্যান উক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১

পাণি পিতরিকো ধরৈ বামে হাতে ত্রিশূল
জটামুকুটা বুখিত ভসম্ বঙ্গালি তয়মুল,
কংকে বিভূখিত করণ্ড ধরে শিরে পিঙ্গো জটা তপসী জগায়োহৈ।
তেজো সমে সম সুর বিরাজত ইয়ো, অঙ্গ অনঙ্গো হুকো মনমে হৈ।
রাগ বঙ্গাল বিরাজত ভুপর ইয়োহি সুনে বস হো তন কোহী।

বচন গান

খনার বচন কিংবা ডাকের বচন জাতীয় এক শ্রেণীর রচনা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত আছে, তাহা প্রধানত ছড়ার আকারে আবৃত্তি রূপেই প্রচলিত, প্রচলিত লোক-গীতির কোন সুর তাহাদের সঙ্গে যুক্ত করিয়া গানের আকারে ইহাদিগকে প্রচার করিবার রীতি দেখা যায় না। তথাপি কোন কালে

ইহাদের অনুরূপ কোন রচনা গীতাকারে পরিবেষিত হইয়া থাকিবে। কারণ, বচনগান বলিয়া একটি কথা বাংলার লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে।

বনবিবির গান

সাধারণ মুসলমান সমাজের বিশ্বাস অনুযায়ী সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বনবিবি। তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক গীতিকাহিনী খুলনা এবং ২৪ পরগণা জিলার দক্ষিণ ভাগে সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপক প্রচলিত আছে। মৌখিক গীতি-কাহিনীটি সংগৃহীত হইয়া 'বনবিবি জহুরানামা' নামে কিছুকাল পুর্বে বটতলায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

কলিঙ্গ নগরে এক সদাগর ছিল। সে সুন্দরবনে মোম ও মধু সংগ্রহ করিত। একবার সে যখন সুন্দরবনে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল, তখন তাহার বালক ভাইপোটিকেও সঙ্গে লইল, তাহার নাম দুখে। দুখে তাহার দরিদ্রা বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। একমাত্র পুত্রকে গভীর অরণ্যে পাঠাইয়া দুখের মাতা কাঁদিয়া বনবিবিকে ডাকিল—

কাঙ্গালের মাতা তুমি বিপদনাশিনী।
আমার দুখেরে, মাগো, তরাবে আপনি॥

দলবল সহ সদাগর গিয়া গভীর বনে প্রবেশ করিল। দক্ষিণ রায়ের পুজা করিয়া সদাগর নৌকা হইতে অবতরণ করিল, দুখে নৌকার মধ্যেই রহিল, সদাগর ও তাহার লোকজন মধু আহরণের জন্য বনের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল। সকল দিন অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিয়া একবিন্দুও মধু পাইল না, দক্ষিণ রায় ছলনা করিয়া বনের সমস্ত মধু গোপন করিয়া ফেলিলেন। অসীম নৈরাশ্যে সদাগর সন্ধ্যায় নৌকায় ফিরিয়া আসিল, অবসন্ন দেহে অল্পকাল মধ্যেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। দক্ষিণ রায় স্বপ্নে আবির্ভূত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সদাগর দুরবস্থার কথা জানাইল। দক্ষিণ রায় বলিলেন, 'তোমার অভিলাষ পুর্ণ করিব, কিন্তু তৎপুর্বে দুখেকে আমার নিকট বলি দিতে হইবে।' সদাগর প্রথমত ইহাতে অস্বীকৃত হইল, কিন্তু পরে মনে মনে তাহাকে দক্ষিণ রায়ের পায়ে বলি দিবে বলিয়া স্থির করিল। দক্ষিণ রায় প্রসন্ন হইয়া তাহার নৌকা বোঝাই করিয়া মোম ও মধু দিয়া দিলেন। দেশে রওয়ানা হইবার সময় সদাগর দুখেকে

ঠেলিয়া নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিয়া গেল। দুখে কোনমতে নদীর তীরে আসিল, অমনি দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্রের রূপ ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। দুখে চক্ষু মুদিয়া বনবিবিকে স্মরণ করিল, বনবিবি আসিয়া তাহাকে কোলে লইলেন, ব্যাঘ্ররূপী দক্ষিণ রায় পলাইয়া গেলেন। বনবিবির আদেশে তাহার ভ্রাতা জঙ্গলী দক্ষিণ রায়কে বন হইতে তাড়াইয়া দিতে গেল। দক্ষিণ রায় তাড়িত হইয়া জেন্দা গাজী (বা বড় গাজী খাঁ)র শরণাপন্ন হইলেন। জেন্দা গাজী তাঁহাকে অভয় দিলেন। বনবিবি দক্ষিণ রায়কে ক্ষমা করিলেন।

এই কাহিনীতে যেমন দক্ষিণ রায়ের উপর বনবিবিরই মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, হিন্দুসমাজে প্রচলিত রায়মঙ্গলের কাহিনীতে পরিণামে দক্ষিণ রায়েরই প্রতিষ্ঠা নির্দেশ করা হইয়াছে।

বনদুর্গার গীত

অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী এক লৌকিক দেবীর নাম বনদুর্গা। পূর্ববঙ্গ বিশেষত পূর্ব মৈমনসিংহ, উত্তর ত্রিপুরা, পশ্চিম শ্রীহট্ট এবং ঢাকা জিলার মহেশ্বরদি পরগণায় তাহার পূজা উপলক্ষে লৌকিক মেয়েলী গীত শুনতে পাওয়া যায়।

১

কই গেলা গো, মালী ছেড়া, হের আইসা চাই,
পথখানি চাইচ্ছা দেও সইয়ের বাড়ীত যাই।
কই গেলা গো, মালী ছেড়ি, হের আইসা চাই,
পথখানি ছিটাইয়া দেও সইয়ের বাড়ীত যাই।
কই গেলা গো, গুণের ননদ, হের আইসা চাই।
চুড়ি গাছি পরাইয়া দেও সইয়ের বাড়ীত যাই।
কই গেলা, প্রাণের দেওর, হের আইসা চাই,
সোয়ারিখান আনাইয়া দেও সইয়ের বাড়ীত যাই।
কই গেলা গো, গুণের শাউড়ী, হের আইসা চাই,
শঙ্খ সিন্দুরে সাজাইয়া দেও সইয়ের বাড়ীত যাই।—পূর্ব মৈমনসিংহ

২

আজি কি আনন্দ, সই গো, মথুরাত যাইতে,
শাড়ী বদল করুইন তানা দুই সইয়ে।

আজি কি আনন্দ, সই গো, মথুরাত যাইতে,
শঙ্খ বদল করুইন তানা দুই সইয়ে।
আজি কি আনন্দ, সই গো, মথুরাত যাইতে,
সিন্দুর বদল করুইন তানা দুই সইয়ে ॥ —ঐ

৩

ভক্তিভাবে পুজবাম তোমারে বনদুগ্‌গা গো,
বন-দুগ্‌গা,—ভক্তিভাবে পুজবাম তোমারে।
হাস কৈতর দিয়াম, জুলুঙ্গা ভারিয়া গো,
বনদুর্গা,—ভক্তিভাবে পুজবাম তোমারে। —ঐ

লামো লামো. বনদুর্গা, যাইট, শেওড়ার তলে,
কি মতে নামবাম আমি শাড়ী নাই সাথে ?
সইয়ারে পাঠাইয়া দিছি সহর বাজারে।
শাড়ী যে আনিছেন, সইয়ায় পিন্ধিবার লাইগে ॥
নামো নামো, বনদুর্গা, যাইট শেওড়ার তলে।
কিমতে নামবাম আমি শঙ্খ সিন্দুর নাই মোর সাথে ॥
সইয়ারে পাঠাইয়া দিছি মুন্সীগঞ্জের হাটে।
শঙ্খ সিন্দুর যে আনিছেন সইয়ায় কাগজে ভইরে ॥ —ঐ

৫

মায়ে ত জিজ্ঞাস করুইন, দুর্গা গো ভবানী,
ভর্তি দুপরিয়া কালে রইলা কেনে একেশ্বরী ?
একলা নয় গো, মা, লগে পঞ্চ দাই।
বাবা ঠাকুরের শেওড়ার নীচে বইয়া পুজা খাই ॥
খুড়ীয়ে ত জিজ্ঞাস করুইন, দুর্গা গো ভবানী ;
ভর্তি দুপরিয়া কালে রইলা কেনে একেশ্বরী ?
—একলা নয় গো খুড়ী, লগে পঞ্চ দাই।
কাকা ঠাকুরের শেওড়ার নীচে বইয়া পুজা খাই ॥ —ঐ

বসনরার গীত

পূর্ব মৈমনসিংহের পল্লীসমাজে বসন্ত ঋতুর দেবতা বসনরাকে উপলক্ষ করিয়া রচিত মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। বসনরা শব্দটি এই পদ্ধতিতে বসন্তরাজ শব্দটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, যথা বসন্তরাজ>বসন্তরাঅ>বসনরায়> বসনরা। তাঁহার সম্পর্কিত গানগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, তিনি 'বসন্ত রোগের দেবতা' নহেন, তিনি বসন্ত ঋতুরই-দেবতা। পল্লী বাংলার ইহা মদনদেবের পূজা বা বসন্তোৎসব। প্রথমেই বসনরার জন্য পুষ্পচয়ন করিবার গীত—

১

কে তুলরে পুষ্প তুমি রাজবাড়ীর মধ্যে।
ডাল ধইরা তুল পুষ্প সাজি ভইরা আন?
সুদামে তুলে ফুল রাজবাড়ীর মধ্যে।
ডাল ধইরা তুলে ফুল বসনরায়ের লাগিয়ারে। —পূর্ব মৈমনসিং

উত্তম ঠাকুরের মত বসন্ রায় নামক দেবতার পূজা বসন্তঋতুতে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বসন্ত ঋতুকে উত্তম ঠাকুরের মত (পূর্বে দেখ) একটি নররূপী দেবতা বলিয়া কল্পিত হয়,

২

কি কর, বসন্তের মাগো, নিশ্চিন্তে বসিয়া?
তোমার বসাই বিয়া করে এয়ো জানাও গিয়া।
কিবা এয়ো জানাইবাম্ আমি হস্তে-পান লইয়া,
বসাইর ধ্বনিতে এয়ো আসিবো চলিয়া।
কি কর বসন্তের মাগো, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
তোমার বসাই বিয়া করে ঢুলি জানাও গিয়া।
কিবা ঢুলি জানাইবাম্ আমি হস্তে পান লইয়া।
বসাইর ধ্বনিতে ঢুলি আসিবো চলিয়া॥ —ঐ

৩

সুন্ধা গাছি লাগাইলাম্ আওড়া বেড়া দিয়া,
এ কি সুন্ধা, গন্ধের আগলি সুন্ধা, কে চুরি করল রে?

সকল বাসর বিচরাইলাম, সুন্ধার বাস না পাইলাম,
এ কি সুন্ধা, গন্ধের মুরলী সুন্ধা, কে চুরি করলো রে ?
অমুকের ধুতির কোণায় সুন্ধার বাস পাইলাম রে।
এ কি সুন্ধা, গন্ধের মুরলী সুন্ধা, কে চুরি করলো রে ?
অমুকের ধুতির······

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে বসন্ত রায়ের বিবাহের কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে। চৈত্র রাজার কন্যার সঙ্গে বসন্তরাজের বিবাহ।

৪

বসন্‌রা বিয়া করে চৈতা রাজার কন্যা রে।
বিয়া করলা বসন্‌রা, বিধান পাইলা কি ?
হাতী পাইলাম ঘোড়া পাইলাম,
আরো পাইলাম কন্যারে।
বিয়া করলা বসন্‌রারে বউ থইলা কৈ ?
বসন্‌রা বিয়া করে চৈতা রাজার কন্যা রে। —ঐ

বসন্ত রায়ের সঙ্গে চৈতা রাজার কন্যার বিবাহ হইল—ইহার পরিকল্পনার মধ্যে পল্লী বাংলার প্রকৃতিবোধের একটি বিশেষ পরিচয় প্রকাশ পাইল।

৫

আম ধরে ঝুকা ঝুকা তেঁতই ধরে বেঁকা রে,
চল, বসন্‌রার বিয়া।
বসন্‌রা বিয়া করে, অমুকে দিবো টেকারে,
চল, বসন্‌রার বিয়া। —ঐ

হস্তেতে মোহন বাঁশী চরণে নূপুর—
নাচিতে নাচিতে আইল বসাই ঠাকুর।
কি কর, গো অমুকের মায়, গৃহেতে বসিয়া—
বসাই ঠাকুর নৃত্য করে দেখ আসিয়া।
অমুকের মায় উইঠ্যা বলে, কি বর দিল মোরে ?
সামনের বছর জামাই দেখবাম ঘরে।

অমুকের মায় উইঠ্যা বলে, কি বর দিল মোরে ?
সামনের বছর বউ দেখবাম ঘরে। —ঐ

এই পর্যন্ত যে গানগুলি শুনিতে পাওয়া গেল, তাহাতে বসনরাকে বসন্তঋতুর দেবতা বা মদনদেব বলিয়া মনে করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে মনে হয়, বসন্ত রোগের সঙ্গেও তাহাকে একাকার করা হইয়াছে, বসন্ত ঋতু চলিয়া যাইবার পূর্বে তিনি যেন বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াই মৃত্যুবরণ করিলেন বলিয়া মনে হইবে—

৭

চাটি ফালাও, পাটি ফালাও, গায়ে উঠলো জ্বর,
এক দিনের জ্বরে গো বসাইর চক্ষে ঢুলুম ঢুলুম,
দুই দিনের জ্বরে গো বসাইর গায়ে ঠসা ঠসা,
তিন দিনের জ্বরে গো বসাইর শয্যা করলো কালী।
মায় বলে, ও পুত্র বসাই, কি না কার্য করলে,
ভাল বরাহ্মণের মেয়ে বাছিয়া রাড়ী করলে ?
শঙ্খ ভাঙ্গে ঝামুর ঝুমুর, শাড়ী ছিড়ে লাসে,
শীষের সিন্দুর মুইছা গো ফাল্‌তে বড় দয়া লাগে।
বইনের কান্দন আইতে গো যাইতে, মায়ের কান্দন সার,
ঘরের স্ত্রীর কান্দন দেশের ব্যবহার। —ঐ

বসন্ত যেমন আসে, তেমনই চলিয়া যায়, যৌবনের উল্লাসে চৈত্ররাজের কন্যার সঙ্গে বিবাহ হইবার পরক্ষণেই তাহার উপর মৃত্যুর ছায়া আসিয়া পড়ে, তাহার বিদায় লইয়া যাইতে বিলম্ব হয় না। সেইজন্যই এখানে তাহার বিদায় বা মৃত্যুর সঙ্গীত শুনা গেল।

কখনও কখনও বসন্ত রায় কানাই বা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেও একাকার হইয়া যান—

৮

খেইল জমেছে কানাইর কদমতলে রে,
কালাচাদ, মিল আইয়া কদম্বের তলে।
খৈ-চিড়া লইয়া ডাকে রে মায়,
কালাচাদ, মিল আইয়া কদম্বের তলে !

দুই হাত উড়াইয়া মায় ডাকে রে,
কালাচাঁদ মিল আইয়া কদম্বের তলে।
মেষ-মহিষ লইয়া ডাকে মায়,
কালাচাঁদ, মিল আইয়া কদম্বের তলে। —ঐ

৯

বসন্তের বিদায়কে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রার সঙ্গে তুলনা করা হইতেছে—

গাঙ্গের পাড়ে সরল ধুতুরা,
তার নীচে ঠাকুরে বাজায় মন্দিরা ;
আমি কি ছল করলাম রন্ধনরে বসাইয়া,
ঠাকুর যাইতে না দেখিলাম চাইয়া।
ও তোরা, ব্রজগোপী, আন রে ফিরাইয়া,
ঠাকুর যায় গো রাধারে ছাড়িয়া।
গাঙ্গের পাড়ে সরল ধুতুরা,
তার নীচে ঠাকুরে বাজায় মন্দিরা।
আমি কি ছল করিলাম বাঁশীরে বানাইয়া,
ঠাকুরের হস্তে না দিলাম উঠাইয়া।
ও তোরা, ব্রজগোপী, আন রে মানাইয়া,
ঠাকুর যায় গো রাধারে ছাড়িয়া।
গাঙ্গের পাড়ে সরল ধুতুরা,
তার নীচে ঠাকুরে বাজায় মন্দিরা।
আমি কি ছল করলাম চূড়ারে বানাইয়া,
ঠাকুরের শিরে না দিলাম উঠাইয়া।
ও তোরা, ব্রজগোপী, আনরে ফিরাইয়া,
ঠাকুর যায় গো রাধারে ছাড়িয়া।
গাঙ্গের পাড়ে সরল ধুতুরা, তার নীচে ঠাকুরে বাজায় মন্দিরা।
অমি কি ছল করলাম নূপুররে গড়াইয়া,
ঠাকুরের পায়ে না দিলাম পরাইয়া।
ও তোরা, ব্রজগোপী, আনরে ফিরাইয়া।
ঠাকুর যায় গো রাধারে ছাড়িয়া॥ —ঐ

বসন্তরায়ের গীত

বসনরাকেই (উপরে দেখ) কোন কোন ক্ষেত্রে বসন্ত রায়ও বলা হয়। এখানেও ঋতুরাজ বসন্তই লক্ষ্য, তবে কোন কোন সময় বসন্তরোগও তাহার সঙ্গে একাকার হইয়া যায়।

বন্দনা গান

যে কোন গীতি-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক শুভ-সূচক গানই বন্দনা গান, তথাপি পুরুলিয়া অঞ্চলের ছো নাচ উপলক্ষে বিশেষ এক শ্রেণীর গানে গণেশ বন্দনা শুনিতে পাওয়া যায়; কারণ, গণেশ-বন্দনা দিয়াই সর্বত্র ছো-নাচ আরম্ভ হয়। নির্দিষ্ট গণেশ-বন্দনার গানকেই এখানে বন্দনা গান বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে।

১

বন্দি প্রভু গণপতি বিঘ্নয়ে শুভ মুরতি,
পশুপতি শুভ অবতার হে,
তব ভরসায় করে কত রাজ বিপত্তি সংহার হে ॥
সিদ্ধিপ্রদ বুদ্ধিদাতা কণ্ঠে আনি তব মাতা
মহিষ মর্দিনী যার নাম হে।
প্রবাল মিশ্রিত তনু, জিনি প্রভাতের ভানু
গজেন্দ্র বাহন চমৎকার হে ॥
অহে, রত্ন অলংকার রক্ত বস্ত্র চমৎকার
আজানুলম্বিত যার নাম হে।
চন্দ্রচূড় ত্রিনয়ন চারিধারে সুশোভন
এক দণ্ড গুণের আধার হে ॥
কর্ণেতে শোভন কর মধুলুব্ধ মধুকর
কহ রাজা বিপক্ষ সংহারে।
যে করে তব পূজন ধরায় ধন্য সেইজন
নাহি বিঘ্ন দুর্গতি তাহার হে ॥
বিঘ্ন রাশি নাশ কর দেহ মোরে নিতি বর ॥ —বাঁশপাহাড়ী

নিম্নে একটি সাঁওতালি বন্দনা গান উদ্ধৃত করা হইল।

২

হয় দ হয় সে হিসি দে হিসি দে
বাহারেঞাং সদ ও ওটাসে।
কুলি তলাতে হয় জিউই লাড়েচ্ হয়
আথড়া রেদ, হায় রে, সদ্ ওটাং সে। —পুরুলিয়া

অর্থ : বাতাস, আস্তে আস্তে বও, নানা ফুলের গন্ধ কুলির (গ্রাম্যপথের) মাঝখান দিয়া বহিয়া গিয়া তুমি গ্রামবাসীদিগকে মুগ্ধ কর এবং আখড়ার (নৃত্য সভার) মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়া তুমি সভার মন তৃপ্ত কর।

বন্দের গান

এই গান গাহিয়া দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। তাহাদের একদলে নামাজ অর্থাৎ ইস্‌লামের বাহ্যিক রূপ এর দোষগুণ, অন্য দলে ইমান অর্থাৎ ইসলামের আন্তরিক রূপের দোষগুণ আলোচনা হয়। মোটের উপর উভয়েই নিজের গুণ ও অপরের দোষ দেখাইয়া জয়ী হইবার চেষ্টা করে।

১

নামাজ

এ সংসারে অহঙ্কার মত্ত কেহ হইও না।
শয়তানের ফেরেরে পড়ে খোদাকে কেহ ভুলোনা।
খোদার ফরমান নামাজ রোজা, করলে পরে পাবে মজা,
না করিলে দিবে সাজা আপনি পাক রব্বানা॥
পাঁচ অক্ত নামাজ পড়, যদি যাবে বেহেস্ত ঘরে,
এই ভাবেতে জোগাড় করে রাখো, ও ভাই মোমিনা॥
পঞ্চনবীর পঞ্চ নামাজ, ফরমিয়াছে এই ভবের মাঝ,
খোদার বন্দা কর ধেয়ান করিতে কেও ভুলো না॥
নামাজের গুণ আছে যত বয়ান তা করিব কত,
কি বলিব সে সমস্ত আমি অধীন জানি না॥
নামাজেতে বেহেস্ত পাবে আর নামাজে রওস্থন হবে,
জুলমোতেরও আঁধার মাঠে ছুটবেরে নূর পসিনা॥

সংসারেতে কর যাহা মযুত হলে পাবে তাহা,
খুঁজে লেহ এই বেলা মযুত কাওকে ছাড়বেনা ॥
অধীনের কথা ধর খোদার নামে সেজদা কর,
নইলে পস্তানা হবে সেথায় খুঁজে পাবে না ॥
বলি আমি বারে বারে আয়রে আমার সারা ধরে,
ডাকছি, ভাই, আদর করে রাগ মনে থেকো না,
দেখি, আদরের লোক নয় রে এরা, ডাকলে কেন দিবে সাড়া,
রাজ্জাকের না খেলে তাড়া নবীর দীনে আসবে না ॥

—কাঠিয়া (বীরভূম)

২

ইমান

ইমান ছাড়া সারার চারা ফুটবে বলে কেমনে।
তুমি যতই কর আঁচা পাঁচা হারবো না আজ আইনে ॥
ইমান যাহার নাইরে ধড়ে, কেমনে সে নামাজ নামাজ পড়ে,
চিরিক ঝাঁয়ের বাজি করে ভাবিয়া দেখ মনে ॥
ইমানের বীজ সারার চাষে, বপন কর মনের খুশে,
ফুটবে চারা হেসে হেসে মাতবে সারা জাহানে ॥
গাছের না থাকিলে গাছ বাঁচে কি ভূমণ্ডলে।
গাছের শক্তি শিকড় মূলে নইলে গাছ বাঁচবে কেনে ॥
সেই গন্ধ ছুটিয়ে যাবে সংসারও মাতিয়া যাবে,
অনায়াসে বেহেস্ত পাবে লেখা আছে কোরাণে।
আস্মানের ময়দানেতে, আল্লার প্রথম বিচারেতে,
বান্দা সব যাবে সেজদাতে আল্লাকে একিন জেনে ॥
নামাজ পড়তে নাইরে বাধা, নামাজ পড়গা হয়ে সিধা,
তবেই হাতে আসবে খোদা দেখগা সবার বিধানে ॥
তওক্কা আল্লার উপরে বাঁধ ইমান মজবুত করে,
পানা ফিলার ময়দান পরে বেঁচে যাবে জীবনে ॥ —ঐ

নামাজ

নামাজ পড় রোজা কর নবীজির কলেমা পড়ে
রোজ হাসরে নাবি তবে নবীজিরও হাত ধরে।
নবীর ফরমান নামাজ রোজা, করলে পরে আছে মজা,
না করিলে দিবে সাজা বুঝবিরে তুই আখেরে ॥
যদি যাবিরে, ভাই, বেহেস্তে ঘরে, আয়রে নবীর সারা ধরে,
নইলে মুলকির নকীব ধরবে গোরে হিসাব দিবি কি তারে ॥
নামাজ রোজা ছেড়ে দিবি, ইমানের কি মজা পাবি,
দেখরে, শয়তান, মনে ভেবে দোজাখ হাঁকছে তোর তরে ॥
সেই দোজাখে পড়বি যখন, মনে মনে বুঝবি তখন,
বাবা বললেও ছাড়বে না রে বেনামাজিদের তরে ॥
যদি বেহেস্ত যাবার আশা কর, মুরশিদেরও চরণ ধর,
বলে জানাই সভা পরে মিনতি করো জোরে ॥
এই বেকুব যে সব বলছে হেথায়, মন দিবে না সে সব কথায়,
নামাজ পড়বেন সকল শ্রোতায় আল্লাজীরও নাম ধরে। —ঐ

৪

ইমান

পয়দা করে পরোয়ারে ত্রিসংসার নবীর নূরে।
রোজ হাসরে নূর ফোয়ারা ছুটবে কপাল উপরে ॥
নূর হইতে পয়গাম করে পয়দা করে পরোয়ারে
রাখিলেন আরশ উপরে মিজাম উপরে ॥
নবীজীরও নূর হইতে, বিন্দু বিন্দু ফোয়ারা ছুটে,
ফোঁটার ফোঁটা নূরের গোটা রাখিলেন যতন করে ॥
তওবা নামে গাছ হইল, তাতে সব নাম লেখা গেল,
সেই গাছেতে পাতা হলো কার সাধ্য সুমার করে ॥
যত জীব আছে সংসারে, তত পাতা গাছ উপরে
মেকী বদি মালুম করে দেখিয়া পাতার করে ॥

ইমানদার হইবে যারা তার পাতা তাজা থাকিবে
নূরেরও তামুল্লা জলবে সেই পাতারও উপরে ॥
বেইমান হইবে যারা পাতা তার হইবে নোংরা
গাছের নীচে আছে ধরা দুই ফেরেস্তা দুই ধারে ॥
যখন পাতা পড়বে খসে, উড়াইয়া সুবাতাসে
ফেরেস্তা আনিবে খুঁজে রাখিবে পাতার তরে ॥
মালেকাল মযুত হেথা আত্মা লয়ে যাবে সেথা
হিসাব করে রাখবে তথা দেখিয়া পাতার তরে ॥
যে জন ইমানদার হবে তার আত্মা ইল্লিনে যাবে
বেইমানেরা সিজ্জিনীতে পড়বে খোদার কহরে ॥
যদি ইল্লিনেরো আশা কর মুরশিদেরও চরণ ধর
বুঝে সুজে নেকী কর ইমান বেন্ধে অন্তরে ॥ -ঐ

৫

নামাজ

নামাজ নিন্দা করলি কেন সরার খবর না জেনে।
উম্মর কাজির দোররা বুঝি তোদের পড়ে না মনে ॥
তোর বাপ দাদা ছিল নামাজী—সরিয়তে সরার কাজী
তার কথা না মেনে পাজি গল্প করিল ইমানে ॥
তার মা ছিল শয়তানের বেটী—চিনতো না নামাজের পাটী
সকালে তোর বাবা উঠি ঠুকুন দিত বিছানে ॥
এর বাবা সারা শিখালে—ঘষত গিয়ে মায়ের কোলে
মায়ে স্বভাব শিক্ষা পেলে অবোধ ছেলে কি জানে ॥
আজ পড়েছো কালের হাতে—মুক্তি নাই তোর কোন মতে,
দাঁড় করাবো জুম্মার ওয়াক্তে ধরে তোমার দু'কানে ॥
শয়তান ধরলো তোদের পিছে,—জুতোয় সোজা করবো শেষে
খারাবী তোর ভাগ্যে আছে আসবি না দীনে।
নামাজ যাহার দিলে গাঁথা—তাহার দেলে ইমান পোক্তা
বেনামাজী যদি কুত্তা তোর কথা মানবে না কেনে ॥

মুল না চিনে বাবার কালে হাদিসকে অমান্য করলে
নাচারে ইলিয়াশ বলে মুক্তি নাই তোর নিদানে ॥ —ঐ

৬

ইমান

ইমান ছাড়া নামাজ পড়া হবে না,
কেন মিছে বকো দলীল দেখ কি আছে আর ঠিকানা ॥
ইমানকে কর খাঁটি, তবেই পাইবে ছুটী যেদিন হইবে মাটি
ইমান জোরে পাবে মুক্তি বলিগো তার ঠিকানা ॥
শুধু নামাজের করছি আশা, শেষে হবি নৈরাশা, তোর আশা নিরাশা,
বে-ইমানের কিবা দশা হইবে তা জানে না ॥
ইমান হলো গাছের গুঁড়া নামাজ তার ডাল ফ্যাংরা, ও তাই
জানিস না তোরা
গাছের গোড়া না থাকিলে কোন কালে বাঁচে না ॥
ও যখন পড়বি রে সেই তুফানে, হাঁসোরের ময়দানে,
আছে যত বে-ইমান
তখন পড়বি রে, দোজাখ আগুনে উদ্ধার হতে পারবি না ॥
যদি ইমান না থাকে খাঁটী, তোর নামাজ রোজা সব মাটী,
তোর পাপের নাইরে গতি।
শেষকালে তোর সবই মাটী হইবে ইমান বিনা ॥
এদের বাপ দাদারা মুসল্লি, মসজিদে মারে ঠুলি, শুধু নেংটীকে খুলি,
দাঁড়াইছে নিয়ৎ করি শিরনী কোথায় পাবো না ॥
তাইতে কহিছে রাজ্জাক আলী ঈমান আনি হও ওলি,
তাই শুনরে মুসল্লি,
আছেন যত ভাই মুসল্লি ইমান ছাড়া চলবে না ॥ —ঐ

৭

নামাজ

নামাজ পড় রোজা কর ছেড়োনা দিনের ধ্বজা
নামাজ রতন কর সাধন বেহেস্তে উড়াবি মজা ॥

শুন শুন, ভাই, মোমিনা পড় নামাজ পঞ্চগানা
বেহেস্তে হবে বসতখানা বাহিরে ইমান তাজা ॥
নামাজ রোজা ছেড়ে দিলে, পড়বি রে তোরা মুস্কিলে
জাহান্নাম দোজখে ফেলে করবেরে পটল ভাজা ॥
এই যে নামাজ রোজা বিনে ইমান যাবে অকারণে
মিছা সবাই বকিস কেনে বে শয়তান বাউল ভজা ॥
নামাজ বিনে জমজম শয়তান বেহেস্তে পাইনি নাকতে
সেই ইমানের করিস গুমান নামাজকে করে কাজা ॥
সামনে পেলে নূর নবিজী, ঘোচাত তোর বেতমিজি,
মেরে মেরে জুতা বাজি পড়াত নামাজ রোজা ॥
না পড়িলে পঞ্চ অক্তে কাজ দিবে না ইমানেতে
জ্বলবি সদা দোজখেতে যেমন রে ইটের পাঁজা ॥
অধীন ইলিয়াশ বলে, নামাজ পড় ভাই সকলে,
ফল পাইবে পরকালে বেহেস্তে পাইবে জায়গা ॥ —ঐ

বরাড়ী রাগ

প্রাচীন বাংলা সঙ্গীতের একটি রাগ বরাড়ী। 'গীতগোবিন্দ', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (বরাড়ী) 'সঙ্গীত-দর্পণ' (বরাটি) ইত্যাদিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার সম্পর্কে 'বাংলার সঙ্গীত' (প্রাগুক্ত) গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে—
'লোচন রাগতরঙ্গিণীতে ছত্রিশটি রাগের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি গাতীয় অথচ ক্রমে তীরভুক্তি (তিরহত) দেশের সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে :। এই রাগগুলির মধ্যে বরাড়ী অন্যতম' (পৃ, ১০২)। 'রাগতরঙ্গিণী'তে গাচন ছয় প্রকার বরাড়ী রাগের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—রাঘবী, পাহাড়ী, , মাধবী, ভাটিয়ালি এবং নেপালী। ইহাদের সকলগুলি না হইলেও কোন নটি যে বাংলা দেশে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ত উদ্ধৃত বরাড়ী রাগের একটি গীত এই প্রকার—

১

কোন মুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহি জান এবেঁ তোঁ আপনার নাশ ॥

যে হৈবেক দৈবকীর গর্ভ্ত অষ্টম।
অতি মহাবল দেখি তোহ্মার যম ॥
কহিলোঁ মোঁই সকল তোহ্মার ঠাঞ।
এবেঁ মনে গুণী কর জীবন উপাএ।

বর্ণনামূলক সঙ্গীত

কাহিনীমূলক (narrative) সঙ্গীতের বিপরীতধর্মী একশ্রেণীর লোক-সঙ্গীত আছে, তাহাদিগকে বর্ণনামূলক (descriptive) সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করা যায়। তাহাতে অনেক সময় কোন বস্তু, নারী বা প্রকৃতির রূপ বর্ণনা থাকে। বরকনের রূপ-সজ্জার বর্ণনাও ইহার একটি প্রধান অংশ, তবে তাহা বিবাহ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা কাহিনীমূলক সঙ্গীতের অন্তর্নিবিষ্ট থাকে বলিয়া ইহাদিগের স্বাধীন কোন পরিচয় সাধারণত প্রকাশ পায় না। যুদ্ধ, ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির বর্ণনাও এই শ্রেণীর গানের অন্তর্গত হইয়া থাকে।

বয়াতীর গান

পুর্ব বাংলায় লোক-সঙ্গীতের ব্যবসায়ী গায়েনকে বয়াতী বলে। তাহারা নানা শ্রেণীরই গান গাহিয়া থাকে, নির্দিষ্ট কোন গান তাহাদের নাই। তবে বিশেষ বয়াতী বিশেষ গান গাহিয়া থাকে ; একজনই সাধারণত সকল শ্রেণীর গান গাহে না। তাহারা সাধারণত কোন সমসাময়িক ঘটনা বর্ণনামূলক সুদীর্ঘ গানের মধ্য দিয়া প্রকাশ করে, কোন পৌরাণিক বিষয়ক গান গাহে না। ইহারা হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ভুক্তই হইতে পারে! তাহারা যেমন ব্যবসায়ী হয়, তেমনই সৌখীন গায়কও হইতে পারে। হাটে বাজারে পথিমধ্যে জনতার সমুখে গান গাওয়াই তাদের বৈশিষ্ট্য। হিন্দু বয়াতিগণও বারোয়ারীতলায় কিংবা চণ্ডীমণ্ডপে স্থান পায় না। তাহারা সাধারণত নমঃশূদ্র শ্রেণীভুক্ত এবং গাহিবার বিষয় বস্তুও তাহাদের নিতান্ত লৌকিক।

হিন্দু-মুসলমান বয়াতীরা সাধারণত সমমাময়িক ঘটনামূলক পাঁচালী জাতীয় গানই অধিক গাহিয়া থাকে। বয়াতী শব্দের অর্থ সাধারণভাবে বর্ণনাকারী বুঝিতে হয়।

বংশীহরণ গীত

ফরিদপুর জিলার নলিয়া গ্রাম হইতে 'বংশীহরণ গীত' নামক এক শ্রেণীর-গীত সংগৃহীত হইয়াছে। সংগ্রাহক অজিতকুমার মুখোপাধায় লিখিতেছেন, (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪০)—

"কৃষ্ণলীলা গানের সঙ্গে সে নৃত্য হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় 'শ্লোক নৃত্য', শ্লোক মানে ছড়া, এর মধ্যে রাইমিলন, নৌকা বিলাস, বংশীহরণ ইত্যাদি ছড়াই প্রসিদ্ধ।

অদূরে কানাই মধুর স্বরে যমুনার তীরে বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন, তা শুনে রাধা ও সখীদের 'ধড় ছ্যাইড়া প্রাণ কাইড়া লইয়া যায়।' সবাই ঠিক করলেন, কানাইয়ের বাঁশী চুরি করতে হবে, এসব মতলব টের পেয়ে চতুর কানাই হাতের বাঁশী ছাইড়্যা দিয়ে কালকূট ভুজঙ্গ হইয়ে দংশিলেন শ্রীমতীর গায়। যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, সখীরা ধরাধরি করে নিয়ে এল, তখন রাধা ঘোষণা করে দিলেন, যে তার অসুখ ভাল করে দিবে, তাকে তার গলার হার পুরস্কার দিবেন। এ কথা শুনে কানাই বৈদ্যরূপে রাধার অসুখ সারিয়ে দিলেন এবং রাধা তাঁর গলার হার দিতে চাইলে,

বৈদ্যরাজ বলে রাই গলার হারের কার্য নাই
দিবা মোরে প্রেম আলিঙ্গন,
যদি দয়া কর রাই, প্রেম আলিঙ্গন আমি চাই,
অন্য ধনের নাহি প্রয়োজন।
তখন রাইরে ঘিরে যত সখীগণে কি আনন্দ মনে মনে,
দরশনে পুর্ণ হল আশ,
দেহ যৈবন সমর্পিয়ে, বৈদ্যরাজ-সন্তোষিয়ে,
করিলেন প্রেম প্রকাশ।'

—ফরিদপুর

ব্রজবুলি

মধ্য যুগে বিদ্যাপতি কর্তৃক মৈথিল ভাষায় রচিত পদাবলীর অনুকরণে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ পদাবলী রচনায় মৈথিল এবং বাংলায় মিশ্র যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহাকেই ব্রজবুলি বা ব্রজবুলি ভাষা বলে। ইহা একটি

কৃত্রিম ভাষা। সাধারণ ভক্তের বিশ্বাস ছিল, ইহাই ব্রজ বা মথুরা বৃন্দাবনের ভাষা, রাধাকৃষ্ণ এই ভাষাতেই প্রণয়লীলা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মথুরা এবং বৃন্দাবনের যে প্রাদেশিক ভাষা, তাহাকে ব্রজভাখা বলে, তাহার রূপ স্বতন্ত্র। লোক-সঙ্গীতে ব্রজবুলি ব্যবহৃত হয় নাই, তবে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ করিতে গিয়া পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কোন কোন ঝুমুর গানে ব্রজবুলি ভাষাও ক্বচিৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। কৃত্রিম ভাষায় কোন দেশেই লোক-সঙ্গীত রচিত হয় না, বাংলাদেশেও তাহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

ব্রতের গান

বিভিন্ন মেয়েলী ব্রত উপলক্ষে যে গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই ব্রতের গান। তাহা আনুষ্ঠানিক (Calendric) বা আচার (ritual) সঙ্গীতের অন্তর্গত। কারণ, বিশেষ বিশেষ ব্রত উপলক্ষেই সেই গান শুনিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন উপলক্ষে তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না। বিশেষ ব্রত লুপ্ত হইলে তাহার সম্পর্কিত গীতও লুপ্ত হয়। বিভিন্ন ব্রতের নাম উপলক্ষে ইহাদের উদ্ধৃতি বিভিন্ন স্থানেই দেওয়া হইয়াছে, এখানে তাহাদের একটি মাত্র উল্লেখ করা গেল।

উত্তরবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত কার্তিকব্রতের গান অত্যন্ত ব্যাপক। কাতিক ব্রত প্রধানত কৃষিব্রত, কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান হয় বলিয়া ইহার এই নাম। তবে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর ন্যায় কার্তিক পুত্রদাতা, ইহা কার্তিক ব্রতের গান হইতেও জানিতে পারা যায়।

পুজার আগের দিন সংযম, সেই দিনই পুজামণ্ডপ তৈরী করিবার রীতি, এই সময়ের গান,

১

বিছাইয়া আইলাম পাটী রাবণের কাছে,
নিজ পতি ব্রাহ্মণ বাঁশেরে গেছে।
অবিয়স্থা কাতিক ঠাকুর উদামে রইছে,
যেও গেছে বাঁশেরে, সেও না আইল।
অবিয়স্থা কাতিক ঠাকুর উদামে রইছে,
নিজপতি ব্রাহ্মণ ছনেতে গেছে। —ত্রিপুরা

এইরূপে পর পর রুয়া, বেত ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া গীত হয়।

কার্তিক পুজার দিন সারারাত্র গান গাহিবার নিয়ম। এই বিষয়ে একটি গীত,

২

যেই হাটে যায় রে কার্তিক খরচা করিবারে,
সেই হাটে যায় রে উষা ছত্র ধরিবারে।
কার্তিক ঠাকুর যায় রে ঘট কিনিবারে,
সেই হাটে যায় রে উ॰া ছত্র ধরিবারে। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গীতটি কালীপুজার গীত হইলেও ব্রতগীতের স্বরেই মেয়েলীকণ্ঠে ইহা গীত হয়।

৩

আমার এই বাসনা, শবাসনা পূজ্‌ব জবা বিল্বদলে
বইস, মাগো, হৃদ্‌কমলে।
আর কিছু তো চাই না, মাগো, জায়গা দিও চরণতলে
বইস, মাগো, হৃদ্‌কমলে॥
ভক্তি জবা সুচন্দনে এইনাছি, মা, রেখ যতনে
ভক্তিবারি মিশাইয়ে অর্ঘ্য দিব গঙ্গা জলে॥
শরৎ তোমার অবোধ ছেলে, নিও না, মা, আর কুপথে,
বইস, মাগো, হৃদ্‌কমলে। —ত্রিপুরা

কালীপুজার পর ভাইফোঁটা, সেই ব্রত উপলক্ষে তুইটি মেয়েলী গীত এই,

আশ্বিন যায়, কার্তিক আইয়ে গো ;
দ্বিতীয়ার চান্দে দিল দেখা।
ভাই দ্বিতীয়ারে দিলাম ফোঁটা।
অরে ওরে, করুয়াল, তুই সহরে যাইতে,
ভাই-ফোঁটার কথা শুনতাম, গোবর আইন্যা দিতে।
ওরে ওরে, করুয়াল, তুই সহরে যাইতে,
ভাই-ফোঁটার কথা শুনতাম, মেথী আইন্যা দিতে।

ওরে ওরে, করুয়াল, তুই সহরে যাইতে
ভাই-ফোঁটার কথা শুনৃতাম্ আগ্রী আইন্যা দিতে। —মৈমনসিংহ

৫

আশ্বিন যায় কাতিক আইতে গো
ভাই-ধনেরে দুতীয়া দিব রঙ্গে।
পারারি ডাকাইয়া বইনে রঙ্গী গুয়া পাড়িল গো,
ভাই-ধনেরে দুতীয়া দিব রঙ্গে।
বারুইয়া ডাকাইয়া বইনে ঝারি পান কিনিল গো।
ভাই-ধনেরে দুতীয়া দিব রঙ্গে। —ঐ

ব্রহ্মসঙ্গীত

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করিবার পর ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেই এক শ্রেণীর বৈরাগ্য এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনার ধারা প্রবর্তন করেন, তাহাই ব্রহ্মসঙ্গীত নামে পরিচিত। তিনি ইহার প্রথম রচয়িতা; তাঁহার রচিত সঙ্গীতই ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীত হইত। বাংলা দেশের বৈরাগ্যমূলক লোক-সঙ্গীতের ধারা অনুসরণ করিয়াই ইহারা রচিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে উচ্চ ব্রাহ্মধর্মোক্ত উপনিষদের কোন ব্যাখ্যা প্রকাশ করা হয় নাই বলিয়া ইহাদিগের মধ্যে লোক-সঙ্গীতের কিছু কিছু যে লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রামমোহন রায়ের রচিত বলিয়া পরিচিত নিম্নে দুই একটি গান উদ্ধৃত করা হইল।

১

একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ।
কেন এত আশা তবে এত দ্বন্দ্ব কি কারণ॥
এই যে মার্জিত দেহ, যারে এত কর স্নেহ,
ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ,—
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও সত্যেরে শরণ॥

নিজ গ্রামে পর গৃহে চোর প্রবেশিলে মন।
লোকে শুনে তাহে কত মনে মনে ভীত হন
নবদ্বারী দেহপুরে, কালরূপী তস্করে,
নিত্য পরমায়ু হরে, নাহি তার অন্বেষণ।
মোহ রাত্রি তম-ঘন, মায়ানিদ্রায় প্রাণিগণ,
প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ।
শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান-অসি করে ধরে,
জাগিয়া—কৃতান্ত চোরে কর নিবারণ॥

কেমনে হব পার, সংসার পারাবার,
বিনা জ্ঞান সরণী বিবেক-কর্ণধার।
শুন রে মন-মানস, স্বীয় কলুষ কলস,
কর্মগুণে বাঁধা সদা কণ্ঠেতে তোমার।
ঘোরতর মায়াতম, আশা পবন বিষম,
প্রবৃত্তি তরঙ্গ রঙ্গে, উঠে বারবার ;—
মানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তারা,
কাম ক্রোধ মোহ লোভ, জলচর দুর্নিবার।
মমতাবর্ত বিশাল, তাহে ভাসে মোহব্যাল,
মাৎসর্য পাথর জল, নাহি পারাবার ;
কালধীবর করাল, পেতেছে ব্যাধির জাল,
ধরে লবে প্রাণযান, নাহিক নিস্তার॥

বাউল গান

বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ ধর্ম-সঙ্গীত। অনেকে ধর্ম-সঙ্গীতকে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন না ; কারণ, ধর্ম বাংলার লোক-সমাজের উপর সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না। এই দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মাচার বিভিন্ন, সুতরাং একান্তভাবে একটি ধর্মের মতবাদ আশ্রয় করিয়া যে সঙ্গীত

রচিত হয়, তাহা সামগ্রিক ভাবে লোক-সমাজের নিকট আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং ইহার মধ্যে যে আবেদন সৃষ্টি হয়, তাহা সম্প্রদায়গত বা Sectarian।

ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব, নীতি কিংবা দর্শন সাহিত্য নহে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; জীব হিংসা পাপ; সদা সত্য কথা কহিবে--ইহা সাহিত্য নহে, অথচ ধর্মের ভিতর দিয়া চিরকাল এই সকল বাণী প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। বাংলার পল্লীর সহজিয়া তত্ত্বের গান, নাথধর্মতত্ত্বের গান, দেহতত্ত্ব, বাউল, মুর্শীদ্যা, মারফতী, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি যে বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি বিরাট অংশ ইহাদের মধ্য দিয়াও এক একটি তত্ত্ব কথাই প্রচারিত হইতেছে; কিন্তু বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের তত্ত্বকথাগুলি নীরস সূত্র কিংবা সংক্ষিপ্ত সারের মত প্রকাশ পাইতেছে না—বিচিত্র রসমণ্ডিত হইয়া সঙ্গীতের আকারে তাহা পরিবেষিত হইতেছে। ধর্মের তত্ত্ব কিংবা দর্শন জীবনকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়, সাহিত্যেও জীবনেরই প্রকাশ; সুতরাং যেখানে ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সূত্রের পথ পরিত্যাগ করিয়া রসাশ্রিত হইয়া সঙ্গীতের রূপে আত্ম-প্রকাশ করে, সেখানে তাহা নিঃসন্দেহে সাহিত্য পদবাচ্য হইবার যোগ্য। হাজার বছরের পুরাণো বৌদ্ধগানগুলি যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও সাধন ভজনের কথাই আছে; সাধন ভজনের নিগূঢ় রহস্য আজ ইহাদের মধ্য হইতে কিছুই উদ্ধার করা যায় না; তথাপি ইহারা সরস সঙ্গীতের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া ইহাদের সাহিত্যিক আবেদন এই সুদীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বাংলার বাউল গানের ভিতরও যে সুগভীর তত্ত্ব এবং দর্শনের কথা আছে, তাহা বাদ দিলেও ইহার নৃত্য এবং সঙ্গীত জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাঙ্গালীর মনে যে রস-আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তাহাতেই ইহার সাহিত্যিক পরিচয় সার্থকভাবে প্রকাশ পায়। বাংলার বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শীদ্যার গানে যে তত্ত্বকথাই থাকুক, তাহা বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের নিতান্ত পরিচিত গণ্ডীর মধ্য দিয়াই রূপায়িত হইয়া থাকে। সুতরাং বাউলের তত্ত্ব না বুঝিয়াও বাউলের সঙ্গীতের মধ্য হইতে রসাস্বাদন করিতে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় না।

বিশেষত বাংলার ধর্মসঙ্গীতের ভিতর দিয়া যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও বাঙ্গালীর জীবন-চেতনা হইতে জাত। উচ্চতর ধর্ম, যথা

হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান ধর্মের অন্তরালেও বাঙ্গালীর একটি নিজস্ব ধর্মবোধ আছে, এখানে প্রায় সকল বাঙ্গালীই একাকার হইয়া বাস করে। সেই সূত্রে ইহার ভিতর দিয়া বাঙ্গালী মাত্রই এক অখণ্ড ঐক্য অনুভব করিয়া থাকে। যে ধর্মচেতনা ভিত্তি করিয়া বাংলার পল্লীর ধর্ম সঙ্গীতগুলি প্রধানত রচিত হইয়াছে, তাহা বাংলাদেশের জলবায়ুতেই পুষ্টিলাভ করিয়াছে; সুতরাং এই সূত্রেই ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় রসচেতনার সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই গুণে বাংলার ধর্মসঙ্গীতগুলি যেমন জাতীয় চেতনার বাহন, তেমনি সাহিত্যিক মর্যাদা লাভেরও অধিকারী। ইহাদের রচনার মধ্য দিয়া তত্ত্বকথা কিংবা দার্শনিক চিন্তা প্রকাশ করিবার নীরস রীতি অনুসরণ করা হয় না, বাংলা সঙ্গীত রচনার যাহা বৈশিষ্ট্য, আনুপূর্বিক তাহাই ইহাদের রচনার ভিতর দিয়াও প্রকাশ পায়।

কিন্তু একটি বিষয়ে সাধারণ লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। ক্রমপরিবর্তনের ভিতর দিয়া বিকাশ লাভ করাই লোক-সঙ্গীতের ধর্ম। পরিবর্তনের ভিতর দিয়া ইহার প্রাণশক্তি রক্ষা পায়, কখনও ইহা নির্জীব হইয়া পড়িবার অবকাশ পায় না। বিশেষত ইহাতে যুগোচিত পরিমার্জনা স্বীকৃত হয় বলিয়াই ইহা লোক-সমাজের নিকট কখনও প্রাচীন কিংবা অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু ধর্মসঙ্গীতগুলি লোক-সঙ্গীতের পরিবর্তনের এই নিয়ম স্বীকার করে না। ইহাদের একটি আচারগত (ritual) মূল্য থাকে বলিয়া ইহা কেহই পরিবর্তন করিতে পারে না। যে সকল ধর্মসঙ্গীতের কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহা প্রায় সকলই গুরুর নিকট হইতে শিষ্য শিক্ষা লাভ করে এবং কেবল মাত্র তাহা গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রচারিত হইয়া থাকে। গুরুর শিক্ষা শিষ্য সতর্ক হইয়া রক্ষা করে, কাজেই তাহা পরিবর্তিত কিংবা বিকৃত করিতে পারে না। সুতরাং লিখিত সাহিত্যের মত তাহা অচিরেই অপরিবর্তনীয় (rigid) হইয়া যায়। সেইজন্য লোক-সঙ্গীত ক্রমবিকাশ লাভ করিলেও ধর্মসঙ্গীত কদাচ ক্রমবিকাশ লাভ করে না, ইহার একটি অবিচল আদর্শ ভক্ত সম্প্রদায়ের নিকট স্থির হইয়া থাকে; ক্রমবিকাশ লাভ না করিবার ফলেই তাহা ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকসঙ্গীত ক্রমবিকাশের ধারায় যুক্ত হইয়া লোকসমাজের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হয়,

তারপর পল্লীর সমাজ-বন্ধন যখন শিথিল হইয়া যায়, তখন তাহার বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠে। কিন্তু যতদিন পল্লীসমাজের সংহতি বিনষ্ট না হয়, ততদিন লোক-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ অব্যাহত থাকে।

কিন্তু বাংলা ধর্মসঙ্গীতগুলিকেও দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—একটি আচারমূলক ধর্মসঙ্গীত, আর একটি লৌকিক ধর্মসঙ্গীত। কেবলমাত্র গুরুশিষ্য পরম্পরায় সে ধর্মসঙ্গীত নিজস্ব সাম্প্রদায়িক সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া প্রচারলাভ করে, তাহাই আচারমূলক ধর্মসঙ্গীত। কিন্তু আর এক শ্রেণীর ধর্মসঙ্গীত গুরুশিষ্য এবং সম্প্রদায় নিরপেক্ষ হইয়া লোক-সঙ্গীতের ধারায় স্বাধীনভাব বিকাশ লাভ করে। বাউল গানেও এই দুইটি বিভাগ আছে।

যাহা হউক, তথাপি এ' কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বাংলার ধর্মসঙ্গীত বাংলার লোক-মানসের (folk mind) একটি বিশেষ পরিচয় প্রকাশ করে। এমন কি, ইহা ক্রমপরিবর্তনের ধারার সঙ্গে যুক্ত না হইলেও ইহাদের বহিরঙ্গে যে রস-পরিচয় ব্যক্ত করে, তাহার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর সাধারণ লোক-জীবনের সংস্কার অস্পষ্ট হইয়া থাকে না। সুতরাং ইহাদিগকেও বিশেষ প্রকৃতির বাংলার লোক-সঙ্গীত বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারা যায়।

বাংলার লৌকিক ধর্ম-সঙ্গীতের মধ্যে বাউল সঙ্গীতই প্রধান। ধর্মীয় সাধনার বিশিষ্ট একটি প্রণালীর নাম বাউল। কালক্রমে বাউল সাধনা একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিণত হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক মানসের ক্রমবিকাশের একটি সূত্র ধরিয়াই ইহার উদ্ভব হইয়াছে। একদিক হইতে বৈদিক হিন্দুধর্ম এবং অপর দিক হইতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বাঙ্গালীর জন-জীবনে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া যে ভাবে তাহা ক্রমপরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহারই ধারায় মধ্য যুগে বাংলাদেশে বাউল ধর্মমতের বিকাশ হইয়াছে। ক্রমবিকাশের পথ ধরিয়া ইহা যতদিন অগ্রসর হইয়াছে, ততদিন ইহার মধ্যে মহাযান বৌদ্ধমত, সহজিয়া মত, নাথধর্মমত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ, সূফী মতবাদ ইত্যাদি হইতে বিভিন্ন উপকরণ আসিয়া ইহার মধ্যে সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে। তারপর মধ্যযুগের বিশেষ একটি সময়ের মধ্যে ইহার মতবাদ যখন একটী সুনির্দিষ্ট প্রণালীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন হইতেই ইহাতে বহিরাগত উপাদান সমূহ প্রবেশ করিবার পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা ক্রমবিকাশের ধারায় অন্ততঃ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী

পর্যন্ত বাংলার জন-জীবনের বিচিত্র আধ্যাত্মিক চিন্তার আশ্রয় হইয়াছিল। সেইজন্য ইহাকে একদিক দিয়া যেমন লৌকিক ধর্ম বলিয়াও উল্লেখ করা যায়, তেমনই অন্যদিকে এই ধর্ম আশ্রয় করিয়া যে সঙ্গীতগুলি রচিত হইয়াছে, তাহাও বাংলার লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়।

গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের সমসাময়িক কাল হইতে বাউল সাধনার বিভিন্ন উপকরণ বাংলার সাধারণ জন-মানসে বিকাশ লাভ করিতে আরম্ভ করিলেও, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের পূর্ব পর্যন্ত ইহা কোন সুসংবদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে নাই। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কালেও বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাউল কথাটির উল্লেখ পাওয়া গেলেও, বর্তমানে আমরা বাউল কিংবা বাউল সম্প্রদায় বলিতে যাহা বুঝি, তাহা দ্বারা তখন তাহা বুঝিতে পারা যাইত না।

বৌদ্ধধর্ম বাংলা দেশের অনতিদূরবর্তী স্থান মগধ বা উত্তর বিহার অঞ্চলে উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করিয়াছিল ; সুতরাং এই দেশের সাধারণ জনগণের উপর প্রথম হইতেই ইহার প্রভাব অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী হইয়াছিল। অতএব গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের সময় হিন্দুধর্মও যখন এদেশে প্রবেশ লাভ করিল, তখনও বৌদ্ধ প্রভাব হইতে ইহা সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া এই দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। যে জড়বাদ বা শূন্যবাদ বৌদ্ধধর্মের মূল কথা, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ দেশের জন-মানসে নিজের প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল, তারপর সমাজ-জীবনের ক্রমবিবর্তনের ধারায় পর্যায় ক্রমে ইহাতে এই জড়বাদের উপর নানা বিভিন্নমুখী ধর্মবোধ আসিয়া নিজের প্রভাব স্থাপন করিয়াছে, বাংলার বাউল সাধনার মধ্যে তাহাদেরই একটি মিশ্র পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য ইহা বিশ্লেষণ করিলে ইহার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সমাজ-জীবন হইতে আগত ধর্মচিন্তার বিচিত্র উপকরণের সন্ধান পাওয়া যাইবে। বৌদ্ধধর্মের নাস্তিকতা পরবর্তী সহজ সাধনার মধ্যে নিজের পরিচয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছিল ; হয়ত এ' কথাও সত্য যে; বৌদ্ধ নিরীশ্বরবাদ এবং সহজ-সাধনা স্বাধীন ভাবেই উদ্ভূত হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের যুগে আরও একটি নিরীশ্বরবাদী ধর্ম বাংলার লৌকিক ধর্মচেতনাকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—তাহা নাথধর্ম। ইহাদের পরস্পর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। কিন্তু কালক্রমে এই দেশের অধ্যাত্মচিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষত সাধারণ সমাজের মধ্যে

বলিষ্ঠ একেশ্বরবাদী ইস্‌লাম ধর্মের আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় লোকায়ত ধর্মচিন্তার মধ্যে যে মৌল নিরীশ্বরবাদের চেতনা ছিল, তাহা পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন ক্রমে ক্রমে বহির্মুখী আচারের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিলেও অন্তর্মুখী একটি বিশ্বাস সমাজের মনে স্থান পাইতে লাগিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এই কথাই প্রকাশ করিয়াছে,

বিদ্যা মান কুল ধনে কি করিতে পারে।
প্রেমধন আর্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে ॥

এখানে ঈশ্বর সত্য বলিয়া অনুভূত হইলেও আচার মিথ্যা বলিয়া গণ্য হইয়াছে, বাউলের সাধনার মধ্য দিয়াও এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়,

ওগো সাঁই,
তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।

হিন্দুধর্মের আচারও সত্য নহে, মুসলমান ধর্মের আচারও সত্য নহে, ধর্মের বহির্মুখী কোন আচারই সত্য নহে—একমাত্র স্বামিন্‌ সাঁই বা ভগবানই সত্য।

সহজ সাধনা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, সুফী সাধনা কিংবা বাউল সাধনার মুল বক্তব্য বিষয় যাহা, তাহার মধ্যে গুরুবাদ কোন দিক দিয়াই স্থান লাভ করিতে পারে না। কারণ, সহজ-সাধনা এইভাবে সকল আচারকে অস্বীকার করিয়াছে, যেমন—

কিংতো মন্তে কিংতো রে তন্তে,
কিংতো রে ঝান বাখানে।

মন্ত্রেই বা কি, তন্ত্রেই বা কি, ধ্যান-ব্যাখ্যানেই বা কি হইবে? সুতরাং গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইবার ধারা সহজিয়াগণ অস্বীকার করিবারই কথা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধনায় ভক্ত যে ভাবে অন্তরের মধ্যে কৃষ্ণের সান্নিধ্য অনুভব করিয়া থাকেন, তাহাতেও কোনও গুরুর মধ্যস্থতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না, হইবার কথাও নহে। পুরীতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য সন্ন্যাসী চৈতন্যকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। সুফী সাধকগণও কোন মুরশীদ বা গুরুর মাধ্যম ব্যতীতই সুনিবিড় ঈশ্বর-সান্নিধ্য অনুভব করিয়া থাকেন। বাউল সাধনার মধ্যেও একই কথা আছে। বাউল শব্দের কেহ কেহ এমন অর্থ করিয়া থাকেন যে, যে বায়ুর মত ঈশ্বরের সঙ্গে

মিশিয়া থাকে, সেই বাউল বায়ুর মত সুনিবিড় ভাবে যে কোন বস্তুর সঙ্গেই যে কোন বস্তু মিশিতে পারে, বাউল সাধক সেই ভাবেই ভগবানের সঙ্গে মিশিতে পারে, বাউল সাধক সেই ভাবেই ভগবানের সঙ্গে মিলিয়া যায়। তাহার সাধনার মধ্যেও ঈশ্বরের সঙ্গে সুনিবিড় ঐক্যানুভূতির আনন্দের কথা আছে। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, উক্ত প্রত্যেকটি মতবাদ অর্থাৎ সহজিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব, সূফী কিংবা বাউল প্রত্যেকের মধ্যেই গুরুবাদ একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বাংলাদেশের ধর্মমতগুলির উপর ইহা প্রবল গুরুবাদী নাথধর্মের প্রভাবের ফল বলিয়া অনুমান করা গেলেও, সূফী মতবাদের উপর গুরুবাদের প্রভাব স্বতন্ত্র কোন ক্ষেত্র হইতেও আসিতে পারে ; তথাপি বাংলা দেশের লোক সমাজের ধর্মসাধনায় গুরুবাদ বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া সূফী মতবাদ এ' দেশে আসিয়া অনুকূল পরিবেশ লাভ করিয়া সহজেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যদিও বাউল সাধনার মূল তত্ত্বে গুরুবাদের স্থান নাই, তথাপি সাধারণের স্তরে এই ধর্মমত প্রচার লাভ করিয়া সাধারণের ধর্মচিন্তার উপকরণে ইহা অভিনব পরিচয় লাভ করিয়াছে ; অনেক সময় ইহার মৌলিক আদর্শের সঙ্গে ইহার আচার-জীবনের সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অনেক ধর্মমত সম্পর্কেই এই কথা সত্য।

সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই বাউলের তত্ত্বকথা প্রকাশিত হইয়াছে, বাউল সঙ্গীতই বাউলের শাস্ত্র। সহজ হৃদয়ানুভূতির উপর বাউল সাধনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া বাউলের সঙ্গীতগুলি তত্ত্বমূলক হইলেও ইহাদের মধ্যে গূঢ় কথা কিছু মাত্র নাই, সঙ্গীতের ধর্ম রক্ষা করিয়া নিতান্ত সহজ ভাবেই তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। বাউল সঙ্গীতগুলি বিশ্লেষণ করিলে সাধারণ ভাবে ইহার ধর্মমত সম্পর্কে এই কথাগুলি জানিতে পারা যায়।

প্রথমত বাউল-সাধনা আচার (ritual) ধর্মকে অস্বীকার করিয়া থাকে। হিন্দুর পক্ষে বেদাচার কিংবা মুসলমানের পক্ষে শরিয়তী আচার দুই-ই বাউল সাধনায় অর্থহীন বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর লৌকিক ভাব-সাধনার এই অনুভূতির মধ্যে নূতনত্ব কিছু মাত্র নাই। সহজিয়া ভাব-সাধনার মধ্যে এই চেতনা আছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের চেতনার মধ্যেও ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় ; এমন কি, অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধক রামপ্রসাদও এই ভাবে ইহারই অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, যেমন—

কাজ কি আমার গিয়ে কাশী।
ঘরে ব'সে পাব আমি গঙ্গা বারাণসী ॥

স্থতরাং বাংলার চিরন্তন ধর্ম-সাধনার মূল ভাব-বিন্দুই এই চেতনাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। বাংলার বাউল সাধনার মধ্যে বাঙ্গালীর এই জাতীয় ভাব-চেতনারই অভিব্যক্তি দেখা যায় মাত্র।

গুরুবাদ বাউল-সাধনার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব—সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। একদিক দিয়া যদিও বাউল সম্প্রদায় ধর্মের আনুষ্ঠানিক আচারকে অস্বীকার করিয়াছে, তথাপি গুরুর সঙ্গে সম্পর্কের ভিতর দিয়া শেষ পর্যন্ত সেই আচার-ধর্মকেই যে অনেকখানি স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। বাঙ্গালীর লৌকিক ধর্মচেতনার প্রভাবকে স্বীকার করিয়াই যে বাউল সাধনার মধ্যে গুরুবাদ প্রবেশ লাভ করিরাছে, তাহাও স্বীকার করা যায়। কারণ, বাংলার নাথধর্ম এবং তান্ত্রিক ধর্ম উভয়ই বলিষ্ঠ গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে যোগসাধনা নাথধর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তাহা গুরুমুখী বিদ্যা এবং তাহাই বাউল সাধনার মধ্যে গিয়াও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। শারীর (Physical) কিংবা ঐন্দ্রজালিক (magic) ক্রিয়া যে ধর্মসাধনার আচারের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে, তাহাতে গুরুবাদ স্বভাবতই প্রবেশ করিয়া থাকে ; কারণ, গুরুর নিকট হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাদের প্রণালী শিক্ষালাভ করিতে হয়। সেইজন্য তান্ত্রিক সাধনা কিংবা যোগ-সাধনার মধ্যে গুরুবাদ এত উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু দেশাচারের এই প্রভাব এ'দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এত সক্রিয় ছিল যে, তাহা প্রায় সকল ধর্ম চেতনাকেই স্পর্শ করিয়াছে। এইভাবে বাঙ্গালীর হিন্দুধর্মের মধ্যেও ক্রমে গুরুবাদ প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিতে পারা যায় নাই। সেইজন্য বাঙ্গালী দ্বিজের একবার আচার্য গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের পরও কুলগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আচার্য গুরু বৈদিক মতে দীক্ষা দান করিলেও কুলগুরু তান্ত্রিক মতে দীক্ষা দান করিয়া থাকেন। অথচ হিন্দুধর্মের মৌলিক আদর্শের মধ্যে গুরুবাদের কোন স্থান ছিল না। বাউল সাধনারও মূল আদর্শের সঙ্গে গুরুবাদের কোন সম্পর্ক ছিল না, থাকিবার কথাও নহে ; কারণ, সকল প্রকার আচারকে অস্বীকার করিয়াই বাউল সাধনার সার্থকতা, যেখানে মক্কা মদিনা কিংবা গয়া কাশীকে স্বীকার করা হয় না, বরং সহজ ভাবে একমাত্র

ভগবানের সঙ্গে সুনিবিড় সান্নিধ্য অনুভূতির কথাই প্রকাশ পায়, যেখানে মন্দির মসজিদ ভগবানকে লাভ করিবার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া মনে করা হয়, সেখানে গুরু কিংবা মুর্শীদ ভগবানকে লাভ করিবার পক্ষে কি ভাবে সহায়ক হইতে পারে বলিয়া বিবেচিত হয়? সুতরাং বাউল সাধনার মৌলিক প্রেরণার উপর গুরুবাদও বহির্মুখী আচার রূপেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, বাউল সাধনায় ইহার শক্তি অত্যন্ত প্রবল; গুরু কিংবা মুর্শীদ ব্যতীত যে এই সাধনায় সিদ্ধি অসম্ভব, বিভিন্ন বাউল সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তাহারই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, ক্রমে গুরু বা মুর্শীদই ভগবানের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং গুরুর সেবার মধ্যেই ভগবৎ সেবা বিরাম লাভ করিয়াছে।

সূক্ষ্ম ভাব-চৈতন্য দ্বারা ভগবানের অপার্থিব শক্তির অনুভূতি করা সত্ত্বেও বাউল সাধনায় স্থূল শারীর দেহই একমাত্র সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। দেহধারী মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয়ই পরম সত্য, ইহাই সকল সাধন-ভজনেরও ভিত্তি স্বরূপ; ইহা অতিক্রম করিয়া কোন জীবনও যেমন নাই, তেমনই কোনও জগৎও নাই। এমন কি, যে সূক্ষ্ম ভগবৎ চৈতন্য বাউল সাধনার লক্ষ্য, তাহারও অধিষ্ঠান দেহকে অতিক্রম করিয়া নহে, বরং দেহকে আশ্রয় করিয়াই সম্ভব হইয়া থাকে। বাউল সাধনায় অনুভব করা হয় যে, মানব দেহের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান রহিয়াছে, মানব-দেহকে বাদ দিয়া ভগবানের অধিষ্ঠান নাই, মানব-দেহকে বাদ দিয়া ভগবান বৈকুণ্ঠে স্বর্গে কিংবা অন্য কোন কল্পলোকে বাস করিতে পারেন না। দেহের মধ্যে আত্মা রূপে ভগবান্ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন, মানবাত্মাই ভগবান, আত্মাকে অতিক্রম করিয়া আর কোন শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা ভ্রম মাত্র; সুতরাং ভগবানের পূর্ণ শক্তিই মানবাত্মার মধ্যে বিধৃত আছে। দেহের মধ্যস্থিত সেই আত্মাকে অস্বীকার করিয়া দূর পর্বতে অরণ্যে তীর্থে মন্দিরে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা বৃথা। প্রত্যক্ষ মানব-জীবন ? স্থূল দেহের মধ্য হইতেই কেবল মাত্র সুগভীর অনুভূতি দ্বারা ঈশ্বরের ঢ়তম সান্নিধ্য অনুভব করিতে পারে।

রামপ্রসাদ সেনের সুপরিচিত এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া বাউল সাধনারই তত্ত্বটি প্রকাশ পাইয়াছে, যেমন—

> মন, তুমি কৃষি- কাজ জান না,
> এমন, মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।

জীবনের আবাদ করিয়াই সোনার ফসল, জীবনকে অস্বীকার করিয়া নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষ মানব-জীবন এবং মানব-দেহই যে বাউল সাধনার একমাত্র অবলম্বন, এই ভাবটির মধ্যে বাঙ্গালী জাতির অধ্যাত্ম অনুভূতির সুনিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। বাংলার সহজিয়া সাধনার সূত্র ধরিয়াই এই ভাবটি বিকাশ লাভ করিয়াছে, এ কথা সত্য ; তথাপি সহজ-সাধনার মধ্যে মানব-দেহ সম্পর্কিত যে কতকটা নির্লিপ্ততার ভাব প্রকাশ পায়, বাউল সাধনার মধ্যে তাহা পায় না। বাউল মানব-দেহকেই তাহার সমস্ত সাধন-ভজনের পীঠস্থান করিয়া লইয়াছে বলিয়া ইহার সম্পর্কে তাহার যে সচেতনতা প্রকাশ পাইয়াছে, সহজিয়ায় তাহা ততটা প্রকাশ পায় নাই। তথাপি এ কথা সত্য, সহজিয়াদিগের দেহবাদী সাধনার সূত্র ধরিয়াই বাউল সাধনায় এই চিন্তার বিকাশ হইয়াছে, সহজিয়াগণ যে চিৎশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল না, বাউল সাধনায় তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা হইয়াছে। যদিও বাউলের এই চৈতন্য একান্ত দেহাশ্রয়ী এবং দেহনিরপেক্ষ কিছুমাত্র নহে, তথাপি ইহার অনুভূতির মধ্যে যে সূক্ষ্মতা আছে, তাহাতেই স্থূল দেহবাদী সহজিয়াগণের সঙ্গে বাউল সাধকদিগের একটি বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি এই চৈতন্য যে এ'দেশের জাতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নহে, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

দেহের মধ্যে যখন পূর্ণ শক্তিধর আত্মারূপী ভগবানের অধিষ্ঠান, তখন দেহই বাউল সাধকদিগের নিকট ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ ; এই দেহের মধ্যেই আকাশ আছে, সমুদ্র পর্বত নদনদী অরণ্য কান্তার সকলই আছে, দেহের মধ্য হইতেই জাগতিক সকল বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইবে। বাংলার আদি কবি চণ্ডীদাসই এই সুরের আদি উদ্গাতা। তাঁহার এই বাণী 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এই উপলব্ধিই বাউল সাধনার এই তত্ত্বকথার প্রেরণা দান করিয়াছে। বেদান্ত দর্শন যেমন বলিয়াছে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; বাউল সাধকগণ তাহার পরিবর্তে বলিয়াছে, মানুষ সত্য, তাহা ব্যতীত আর সকল কিছুই মিথ্যা। দেহের কামনা দেহাশ্রিত সহজ সত্য যে আত্মা, তাহারই কামনা ; সুতরাং ইহার চরিতার্থতাতেই সকল সাধনায় সিদ্ধি। এই অনুভূতির মধ্যে মানুষ ও তাহার পার্থিব জীবনের প্রতি যে বিশ্বাসই প্রকাশ পাক না কেন, ইহারই পথ অনুসরণ করিয়া ইহাতে স্থূল ইন্দ্রিয় ভোগ-বাসনা চরিতার্থতার বিষয় আধ্যাত্মিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে ; তাহার ফলেই ইহাতে এই লক্ষ্য হইল যে, 'তরবি

যদি ভবনদী নারীসঙ্গ কর।' নাথধর্মের যে যোগ, সাধনা সুকঠিন ব্রহ্মচর্য পালনের ভিতর দিয়া সিদ্ধি লাভ করিত, তাহা হইতে প্রেরণা লাভ করা সত্ত্বেও, পরবর্তী বাউল সাধনা তাহার এই সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী আদর্শটিকে জীবনে গ্রহণ করিল। তাহাতে ইহা ক্রমে সমাজের নিম্নস্তরে বিস্তার লাভ করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগের নব বেদান্ত রচনা করিল—এক সমুচ্চ নৈতিক শক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কালক্রমে ইহা গতিশক্তি হীন হইয়া পড়িল। ক্রমে সর্ব শক্তিধর দেহের মধ্য হইতে আত্মারূপী ঈশ্বরের সূক্ষ্ম উপলব্ধির পরিবর্তে ইহার মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্তির কথা আসিয়া পড়িল। এইখানে অধঃপতিত তন্ত্রসাধনার সঙ্গে বাউল সাধনা অনেকটা একাকার হইয়া গেল। সুফী মতের সাধনার মধ্য দিয়াও মানব দেহকেই সকল সাধনার একমাত্র অবলম্বন রূপে গ্রহণ হইয়া থাকে, কিন্তু তান্ত্রিক সাধনার পথ দিয়া বাউল সাধনার মধ্যে কালক্রমে দেহভোগের যে নিরঙ্কুশ অধিকার স্থাপন করা হইয়াছে, সুফী সাধনার মধ্যে তাহা প্রবেশ করিতে পারে নাই। বাউল সাধনা বাঙ্গালীর বিচিত্র আধ্যাত্মিক সাধনার উপকরণকে যে ভাবে নিজের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছে, সুফী সাধনা তাহা ততটা করিতে পারে নাই।

মানব-দেহের মধ্যে আত্মারূপী ভগবানের উপলব্ধি এবং তাহার নিয়ত সান্নিধ্য সুখের অনুভূতিই বাউল সাধকদিগের লক্ষ্য। আত্মারূপী এই ভগবানকে সহজ কথায় 'মনের মানুষ' এই আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। সেইজন্য বাউল সঙ্গীতে 'মনের মানুষ' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যমূলক। বাউলের নিকট মানুষ তুচ্ছ নহে। সেইজন্য নিত্য সত্যস্বরূপ ভগবান্ বা আত্মাকেও সে মানুষ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকে। 'মনের মানুষে'র উপলব্ধিতেই বাউলের উল্লাস, সেই উল্লাস বাউলের নৃত্য এবং সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সর্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকে—তাহা অন্তরের মধ্যে কোনও নির্বিকল্প ভাব-চেতনার মধ্যে স্তম্ভিত করিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু মনের মানুষ প্রত্যেকের মনের মধ্যেই অবস্থান করে বলিয়াই তাহাকে যে সহজে ধরা ছোঁয়া বা অনুভব করা যায়, তাহা নহে; কেবল মাত্র সুগভীর অনুভূতির ভিতর দিয়া জীবনের কোনও পরম মুহূর্তে তাহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সেইজন্য বাউল গায়—

দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা

তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে ধরা দেয় না।

ভিতরের মানুষটিই বাহিরের দেহ-গৃহটি নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতেছেন ; তিনি একাধারে যেমন ভোগ্য, তেমনিই ভোগী, শাসক এবং শাসিত। বাউলের গীতি-ভাষায়,

আপনি ঘর সে আপনি ঘরী

আপনি করে রসের চুরি ঘরে ঘরে,

ও সে আপনি করে মাজিস্টারি,

আবার, আপনি বেড়ায় বেড়ি প'রে।

বাহিরের দেহ ও ইহার ভিতরের 'মানুষ'টি সম্পর্কে বাউল সাধনায় একটি তত্ত্ব কথা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব বলিয়া পরিচিত। বাউল সাধনায় 'রূপ' কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে ; প্রকৃতির প্রত্যক্ষ রূপ-বৈচিত্র্যের পরিবর্তে বাউল সাধনায় 'রূপ' কথাটি কেবল মাত্র দেহকে বুঝায়। রবীন্দ্রনাথ 'রূপ' অর্থে বৃহত্তর জড় জগৎকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বাউলের সাধনায় রূপ কেবল মাত্র মানব-দেহের বহির্মুখী পরিচয় ; ইহার অন্তর্মুখী পরিচয়ের নাম 'স্বরূপ'। এই অন্তর্মুখী পরিচয়ের স্বাধীন কোন সত্তা নাই. ইহা সর্বতোভাবে রূপ বা দেহের অধীন। রূপের ভিতর দিয়া স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়া অর্থাৎ রূপের আস্বাদনের ভিতর দিয়া রূপাতীতের আস্বাদনের প্রয়াস। ইহাতে স্থূল দেহকে যেমন সমগ্র ভাবে স্বীকার করা হয়, তেমনই স্থূল দেহই যে কেবল মাত্র সর্বস্ব নয়, তাহারও উপলব্ধির কথা প্রকাশ পায়—রূপের ভিতর দিয়া অরূপের পথে অভিসারই বাউলের একমাত্র সাধ্য সাধন, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। বাউলের সঙ্গীতের ভিতর দিয়া এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে ; যেমন,

রূপের দেহে স্বরূপের স্থিতি,

স্বরূপেতে রসের মানুষ করেন বসতি।

রসের মানুষ ধরবি যদি

রাগের পথে কর গমন।

রাগের পথ বলিতে এখানে পার্থিব প্রেম ও মিলনের পথ বুঝাইয়াছে।

বাউলদিগের মৌলিক সাধন-পদ্ধতির মধ্যে সমস্ত বাংলা দেশ ব্যাপিয়া ঐক্য

থাকিলেও, ইহাদের বহির্মুখী জীবনাচারের কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক কিংবা সাম্প্রদায়িক পার্থক্যও দেখা যায়। সেই অনুসারে এই সম্প্রদায়কে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে; যেমন, প্রথমত মুসলমান বাউল। দ্বিতীয়ত বৈষ্ণব বাউল। বৈষ্ণব বাউলকে আবার কেহ কেহ দুইটি শাখায় ভাগ করিয়াছেন; যেমন, নবদ্বীপী ও রাঢ়ীয় শাখা। ইহাদের প্রত্যেকটি বিভাগই চৈতন্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইলেও মুসলমান বাউল বা ফকির সম্প্রদায় অপেক্ষা বৈষ্ণব বাউল শাখাই যে ইহার প্রভাব সর্বাধিক পরিমাণে স্বাঙ্গীকরণ করিয়া লইয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়া কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও বাউল সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, তথাপি ইহাদের মধ্যে কোন কোন শাখা নৃত্যকে অনিবার্য রূপে গ্রহণ করে নাই, কিংবা সঙ্গীতের প্রয়োগরীতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু এ কথা সত্য, বাউল সাধনার আদর্শের মধ্যে সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য অপরিহার্য। নৃত্য যেখানে অপরিহার্য, সেখানে সঙ্গীতের সুরেও একটি বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়, যে-কোন সুরেই বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করা যাইতে পারে না। সেই জন্য বাউল সঙ্গীতের সুরে একটি বিশেষ শক্তি প্রকাশ পায়, ইহাই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বাউল সঙ্গীতের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন পূর্ববঙ্গে তাঁহার জমিদারী দেখা শোনার কার্যে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন, তখনই সেখানকার বাউল সাধকদিকের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় স্থাপিত হইল, ইহাদের সুর ও সাধনার আদর্শে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব একটি সুর ও ভাবের যেন সঙ্গতি অনুভব করিলেন। তারপর হইতে বাউল সঙ্গীতের সুর ও সাধনা কতদিক দিয়া যে তাঁহার চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা আমরা জানি।

রামপ্রসাদ যেমন শ্যামাসঙ্গীতের বিশিষ্ট একটি সুর, যথা রামপ্রসাদী সুরের প্রবর্তক, তেমনই ফিকির চাঁদ বাউল বাউল সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট সুরের প্রবর্তক, তাহা 'ফিকির চাঁদি' সুর নামে পরিচিত। রামপ্রসাদের গানেও অন্যান্য সুর আছে. তবে শ্যামাসঙ্গীতেয় ক্ষেত্রে যেমন রামপ্রসাদই একমাত্র সুর নয়, অন্যান্য সাধকের রচিত শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত অন্যান্য রাগ রাগিণীতেও গীত হয়, তেমনই বাউল সঙ্গীতও ফিকিরচাঁদি ব্যতীত অন্যান্য

সুরেও গীত হয়, কিন্তু প্রধানত ইহার সুরের মধ্যে একটি ঐক্য আছে। বাউল গান নৃত্যের সঙ্গে অপরিহার্য রূপে সংযুক্ত; সেই জন্য সাধারণ বৈঠকী সঙ্গীতের সুর-বিচার ইহার উপর আরোপ করা যায় না। বিশেষত বাউলের নাচে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তালেও বৈচিত্র্য অর্থাৎ 'তাল ফেরতা' আছে। সুতরাং বাউলের সঙ্গীত তাহার নৃত্য রূপের উপর নির্ভরশীল।

তবে এ' কথা সত্য, বাউলের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের মধ্যে নৃত্য সংযুক্ত থাকিলেও অনেক সময় পুর্ব বাংলায় ভাটিয়ালী সুরেও বাউল এবং দেহতত্ত্বের গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে নৃত্য সংযুক্ত থাকে না। এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আনুষ্ঠানিক বাউল সঙ্গীত নৃত্য সম্বলিত হইলেও ইহা সর্বদাই একক (Solo) নৃত্য সঙ্গীত, সমবেত নৃত্য সঙ্গীত নহে। সুতরাং একক বৈঠকী সঙ্গীত রূপে ইহাদের পরিবেশনের পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভাটিয়ালী (পরে দ্রষ্টব্য) সুরে গীত বাউল সঙ্গীতের ভিতর দিয়া বাউলের সেই চিত্তোল্লাস প্রকাশ পাইতে পারে না—নৈরাশ্যব্যঞ্জক বিচ্ছেদ-জাত বেদনার সুরই তাহাতে শুনিতে পাওয়া যায়। পুর্ব বাংলার বিশেষ এক গীত-রীতির ব্যাপক প্রভাব বশত বাউল সঙ্গীতে ভাটিয়ালীর সুর প্রবেশ করিলেও ইহাতে বাউল সাধনার মুল ভাবটি যে যথাযথ প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহা সত্য। তবে বাউল সাধনার যে অংশ বিচ্ছেদের বেদনা-নিষিক্ত তাহার অভিব্যক্তি ভাটিয়ালীর সুরে কখনও ব্যর্থ হয় না। তথাপি এ'কথাও সত্য যে, এক হিসাবে 'বাউল গান শুধু কানে শোনবার নয়, চোখে দেখবারও বস্তু। বাউলের একতারা, নৃত্যের ভঙ্গী, ভাবের উচ্ছ্বাস, সবাই সাম্‌নে থেকে দেখে শুনে বুঝ্‌তে হয়।'

পুর্ব বাংলার প্রসিদ্ধ বাউল সাধক লালন ফকিরের নাম সর্বত্র পরিচিত। বাংলার সাধন ভজনের ক্ষেত্রে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত প্রামাণ্য ভাবে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না; যতটুকু জানা যায়, তাহা সকলই কিংবদন্তীমুলক। এই সকল কিংবদন্তী হইতেই তাঁহার জীবনের প্রকৃত তথ্যের সন্ধান করা হইয়াছে। এই বিষয়ে যতদূর জানা যায় তাহা এই যে, নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত ভাঁড়ারা গ্রামে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে লালন ফকিরের জন্ম হয়। তিনি এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কৌলিক উপাধি ছিল কর, কাহারও

কাহারও মতে দাস। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন এবং অল্প বয়সেই তিনি বিবাহ করেন। যৌবন কালেই তিনি একবার তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন; তাঁহার স্বগ্রামস্থ সঙ্গীদিগের সঙ্গে যখন তিনি পুরী তীর্থের পথে অগ্রসর হইতে ছিলেন, তখন পথিমধ্যে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গিগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আবার কেহ কেহ বলেন, রোগভরে তিনি যখন অজ্ঞান হইয়া মৃতকল্প হইয়া যান, তখন সঙ্গীরা তাহার মুখাগ্নি করিয়া গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু তিনি ক্রমে জ্ঞানলাভ করিয়া নদীতীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন; যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন দেখিতে পাইলেন, নদীর ঘাটে এক মুসলমান রমণী জল লইতে আসিতেছে। তিনি তাঁহার নিকট হইতে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল চাহিলেন। তাঁহার অসহায় অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া মুসলমান দম্পতি তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন, তদবধি তাঁহাদের সন্তান রূপে তাঁহাদেরই গৃহে তিনি প্রতিপালিত হইতে থাকেন। বসন্ত রোগে তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমে তিনি সিরাজ সাঁই নামক একজন ফকিরের নিকট বাউল সাধনায় দীক্ষালাভ করেন। তাঁহার রচিত অনেক সঙ্গীতেই তিনি তাঁহার গুরু সিরাজ সাঁইর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

লালন ফাকরের গুরু সিরাজ সাঁই সম্পর্কেও নানা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মনে করেন, সিরাজ সাঁই নদীয়া জেলার হরিনারায়ণপুরের একজন পাল্কীবাহক ছিলেন। আবার কাহারও মতে সিরাজ সাঁই ফরিদপুর জেলার গ্রামের অধিবাসী; আবার কেহ কেহ মনে করেন, সিরাজ সাঁই যশোহর জিলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের আধিবাসী। তিনি বাউল ধর্ম গ্রহণ করিয়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, শিষ্য লালনও সর্বদাই তাঁহার সঙ্গী থাকিতেন।

গুরুর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘ কাল ভ্রমণ করিয়া লালন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তিনি মুসলমান ফকিরী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। গ্রামের মধ্যে ইতিপুর্বে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল, পরিবারস্থ সকলে তাহাকে মৃত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। সুতরাং কোন ভাবেই তাঁহারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। লালন তখন সংসারের মায়া সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং গুরুর সঙ্গে পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইলেন। গুরুর মৃত্যুর

পর লালন কুষ্টিয়ার গোরাই নদীর তীরে সেঁউড়িয়া গ্রামে আসিয়া আখড়া স্থাপন করিলেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তখন তাঁহার শিষ্য ছড়াইয়া পড়িল, তিনি আখড়ায় স্থায়িভাবে বাস না করিয়া মধ্যে মধ্যে শিষ্যদিগের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং স্বরচিত সঙ্গীতের ভিতর দিয়া বাউল সাধনার কথা প্রচার করিতেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১১৬ বৎসর বয়সে লালনের মৃত্যু হয়।

দীন বাউল পাবনা জিলার অধিবাসী ছিলেন, ইঁহার প্রকৃত নাম গোলোক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদার যেমন 'কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদে'র ভণিতায় তাঁহার পদগুলি রচনা করিতেন, গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'দীন বাউল' এই ভণিতায় তাঁহার পদ রচনা করিয়াছেন।

গুরুশিষ্য পরম্পরায় বাউল গান রচনা ও প্রচারের যে সুনির্দিষ্ট ধারা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সমান্তরাল ভাবেই বাউল গানের একটি লৌকিক ধারারও সৃষ্টি হইয়াছিল। বাউল সাধনার শাস্ত্রীয় কোন ধারা স্বীকার করিয়া ইহা রচিত হয় নাই, অন্যান্য লোক-সঙ্গীতের মতই ইহাদের মধ্যে সাধারণত কোন বাউল গুরু কিংবা শিষ্যের ভণিতাও ব্যবহৃত হয় নাই। লৌকিক পদাবলীর মত ইহাদিগকে লৌকিক বাউল গান বলা যায়। বিশুদ্ধ বাউল গানের প্রভাবে ইহারা রচিত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত বাউল সাধন ভজনের কথার পরিবর্তে ইহাদের মধ্যে সাধারণ বৈরাগ্যের কথাই শুনিতে পাওয়া যায়।

১

আমার মন-মীন সুখে কর খেলা ভবক্ষেত্র জলে,
নইলে শুকনা ডাঙ্গায় প্রাণ হারাবি
　　　　হঠাৎ জল শুখিলে।
আমার মন-মীন মানব জমিন সুখের বর্ষা রে
　　　　জল যাচ্ছে উছুলে।
সেথা পাবি রে তুই সুখশান্তি জল উর্ধরেতে গেলে।
নীচদিকে তার মরুভূমি রে জল যাচ্ছে পাতালে।
তোর যত কিছু আছে পড়বে পিছুলে
　　　　কাল ধীবরের জালে।
করে খাঁটি শুদ্ধ মাটি রে ঘা মুপে দে তুলে।
নইলে সাতমদ্দি জল, তুলা কঠিন বেদাগমে বলে।

এমনি সুযোগ প্রেমরস ভোগ মিলে যার কপালে।
জগৎ তার চরণে মনপ্রাণে বিকায় বিনামূলে ॥ —বাঁকুড়া

জগৎ নামে কোন বাউলের ভণিতা ইহাতে শুনিতে পাওয়া গেল।

২

বেশ লুক লুকানি খেলতে শিখেছ, বাঁকা নন্দলাল,
অধরা মন অমন দ্বারে ধড়া যে পড়েছ।
তোমার চাতুরালি আর চলে না, অচেনায় বেশ গেল চেনা,
এতদিনে গেল জানা, তুমি অরূপ রূপে আছ
দ্বি দলক কমল পরে, আজ্ঞাচক্রে মনের ঘরে,
রতন বেদীর পরে প্রকাশ রয়েছে।
জগৎ নাড়ীর নাশা, তার ভিতরে তোমার বাসা,
আমায় দিয়ে দশম দশা দশমে বসেছ।
তাই দশম-ঘাট আশ্রয় করে
বসে আছি তোমার তরে
তুমি একাদশে পাগলিনী চোখের কাছে নাচ। —ঐ

পাগলিনী ভণিতায় বাঁকুড়া জিলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে বহু সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের নানা বিষয়; উদ্ধৃত গানটিতে বাউলের ভাবটি সুস্পষ্ট।

৩

হরি, এবার আসা যাওয়া সার,
সর্ব সুখ চাষে, চাষ করিতে এলাম আমি মনের উল্লাসে,
আসমান ছাড়া জমি বীজের নাই গোড়া
ভাঙ্গা কাঁটায় উগাল হল না ॥
লাগালাম দমকল সে হল বিকল, ভাঙ্গা নলে কুঁয়ার জল উঠে না।
গোঁসাই একদিন ডেকে বলে, আবাদ কেটে কুঁয়ার জল লও তুলে
ভাঙ্গা নলে কুঁয়ার জল উঠে না। —মুর্শিদাবাদ

৪

দিল দরিয়ার মাঝে ডুবে দেখ রে আজব কারখানা,
যে ডুবেছে সেই মজেছে আর মজেছে রসনা।

এই না দেহে নদী আছে, মাঝে মাঝে জাহাজ গেছে,
ছ'জনা তার মাঝি আছে, হাল ধরে কালসোনা ॥
এই না দেহে বাগান আছে, নানা জাতির ফুল ফুটেছে,
সৌরভে আকুল মেতেছে খ্যাপা কেন মাতলি না ॥
দিল দরিয়ার মাঝে ডুবে দেখরে আজব কারখানা। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত দুইটি গান সাধারণ বৈরাগ্যমূলক।

মলুয়ারে মলুয়া, মিছে মর ভব-জলে ডুবিয়া
এ ভব সংসার যাবে ছাড়িয়া
মিছে মর জলে ডুবিয়া ॥
ধন ধর তনু মার পঁচিশটি প্রকৃতি মার
ব্রজ বলে এই নিবেদনুয়া, রে মলুয়া,
মিছে মর ভব-জলে ডুবিয়া।
অমৃতকে করিলে হেলা, বিষ কৈলে রসগোল্লা,
ঐ বিষে তনু নিল জারিয়া রে মলুয়া,
মিছে মর ভব-জলে ডুবিয়া।
বিষেতে ঘেরিল অঙ্গ, যম রাজায় দেখে রঙ্গ,
ছাড় বিষকে রাম নাম জপিয়া, রে মলুয়া,
মিছে মর ভব-জলে ডুবিয়া।
এ ভব সংসার যাবে ছাড়িয়া ॥ —ঐ

হরি নাম সুধারস পিয় রে মলুয়া, এ সংসার তোর ঝুটো।
বাল্যকাল হাসিতে খেলিতে যুবাকাল গেল প্রেমে,
বৃদ্ধকাল গেল ভাবিতে গণিতে আর কবে নাম নিবি রে, মলুয়া—
এ সংসার তোর ঝুটো।
ছোড়দে ছোড়দে কাজী জীবনকো আশা,
প্রেম নগরমে বসতি বনায়ে বৃন্দাবনকো বাসা, রে মলুয়া,

রাম নামকো ধনু বনায়ে কৃষ্ণ নামকো বাঁশী
রাধা নামকো অসি বনায়ে কাট্‌বি মায়া ফাঁসি, রে মলুয়া,
এ সংসার তোর ঝুটো।
হরি নাম সুধারস পিয় রে মলুয়া, এ সংসার তোর ঝুটো। —ঐ

৭

হরি বল, মন-পাখী রে, হরি বল মন-পাখী।
রাধে বল কৃষ্ণ বল যদি যমকে দিবি ফাঁকি॥
সোনা দিয়ে ঠোঁট মুড়াবো রূপার দিব আঁখি।
রাধা নামের পাখা দিব একবার নাচ না নাচাও দেখি,
পরের জন্য কেঁদে কেঁদে ঘোর করেছ আঁখি.
(এখন) আপনার কাঁদনা কেউ কাঁদে না
আর কটা দিন বাকি. হরি বল মন-পাখী। —ঐ

৮

হরি, দুঃখ দাও যে জনারে,
ও তার কেউ দেখে না মুখ, ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ,
দুখের উপর সুখ নাই ত্রিসংসারে।
হরি, দুঃখ দাও যে জনারে।
তার ঘরে এসে ঢোকে নানা রোগ ব্যাধি,
আগে মরে তার পুত্র প্রপৌত্রাদি.
ও তার পিতামাতার দেহান্তর থাকে যদি তার,
পোষ্য পুত্র নিলেও মরে, হরি, দুঃখ দাও যে জনারে।
বাণিজ্য করিতে গেলাম দূর দেশে,
খাঁটি সোনা রূপা কিনলাম মেজে ঘসে।
ভাগ্যগুণে হলো তামা দস্তা শিষে
হীরের দরে কিনলাম জিরে।
হরি, দুঃখ দাও যে জনারে।
জলে বাস করি জলে জলে আগুন,
পুড়ে কোঠাবাড়ি ছুটে কলিচুণ,
হরি যখন যার কপালে লাগায় রে আগুন,

লোহার কড়িতে চুণ ধরে
হরি, দুঃখ দাও যে জনারে। —বেলপাহাড়ী

৯

যইবনের গরব কত দিন গো,
যইবনের গরব কত দিন।
যইবন রবে না চিরদিন,
দেখতে দেখতে মলিন হবে,
মলিন হবে বদন গো,
আছ নবীন নবীন ভাবে,
মরিস না নরকে ডুবে।
যইবন রবে না চিরদিন,
আয়না খুলে চাইয়ে দেখ,
যেমন যইবন রবে চিরদিন,
যইবনের গরব কতদিন। —ঐ

১০

খ্যাপা, তুই মইলে তোর সঙ্গে যাবে কে রে,
রইল রে তোর সাধের দোকানদারি।
কেহ কাটে ঝাড়ের বাঁশ কেহ পাকায় দড়ি।
চার জনায় রে কান্ধে লয়ে দিবে হরি ধ্বনিরে।
যে মুখে খাইছে, খ্যাপা, ফল বাতাসা চিনি,
সেই মুখে দিবেরে, খ্যাপা, জলন্ত আগুনি রে। —ঐ

১১

দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখানা।
দেহের মাঝে বাড়ী আছে,
সেই বাড়ীতে চোর লেগেছে
তারা ছয় জনাতে সিঁদ কাটিছে, চুরি করে একজনা।
দেহের মাঝে বাগান আছে
নানান জাতি ফুল ফুটেছে
তার সৌরভে জগৎ মেতেছে, লালনের প্রাণ মাতল না।

এখানে লালন বা লালন ফকিরের ভণিতা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে সত্য, তথাপি ইহা লালনের রচনা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, অনেক লৌকিক বাউল গানেও সুপরিচিত কোন না কোন বাউল সাধকের ভণিতা যোগ করিয়া গানের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস দেখা যায়। ইহার সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত ৪নং গানটি তুলনীয়।

১২

গুরু ভজলিনারে মন আমার
একদিন ভবে দেখবি রে ঘোর অন্ধকার।
মন, তুই কয় বার আইলি কয়বার গেলি,
ভবে আসা যাওয়া হল সার।
মন তোর কোথায় রবে বসত বাড়ী
কোথায় রবে তোর সুন্দরী নারী
কোথায় রবে তোর সুন্দরের বাহার,
যখন শমন এসে, বান্ধবে রে কেশে,
তখন কে বলবে জমিদার কে বলবে তালুকদার।
কোথায় রে তোর হাতী ঘোড়া,
কোথায় রে তোর জামা জোড়া,
কোথায় রবে এ ঘোড়সোয়ার,
একবার হরি হরি বল মুখে
নইলে যমে কি ছাড়িবে আর। —ঐ

১৩

দেহ-জমিন আবাদ হইল না।
চৌদ্দ পোয়া জমিন ছিল, ভুইকম্পে তা ভেঙ্গে নিল,
নকসাবন্দী কিছুই রইল না।
আমার সদর খাজনা ফাজিল গেল চেক দাখিলা পাইলাম না।
মনে মনে যুক্তি কইরে আপিল করলাম কাছারীতে
বিচার আচার কিছুই হইল না,
আমায় ঠেইলা নিল জ্যাল খানাতে
জ্যালে মুক্তি পাইলাম না। —ঐ

১৪

ওরে, মানুষে মানুষে করো না হীন।
হীন হবার তোর আছেরে দিন।
হীন বারত নাচেরে দীন।
কানা খোঁড়া বোবা তারই সৃষ্টি করা
প্রাণ ছেড়ে গেলে রাজাও হয় যে মরা
নরকে ডুবাবে আগুনে পোড়াবে
ঘুচাবে তোর গায়ের চিন।
সব্ব ঘটে হরি করিছে বিরাজ
পাপেরি সঞ্চার নিজ অহঙ্কার
মনেরি গৌরবে এ নব যৌবনে
নয়ন ভরিয়ে মানুষ চিন।
অধম তরণী বুঝরে মন, জীবের তুল্য নাই ভারতে ধন,
চান্দ সুরুজ তারা গমনে গমন
জীবের জন্য রাত্রিদিন। —বেলপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

১৫

তোমায় দিবানিশি ডাকি তাই তোমারে হরি,
দাও দাও দরশন যাতনা জানাই।
চির সুখের তরে সংসারে সঁপিনু মন
কত দুখ দাও, হরি, তোমারে জানাই।
মনোবেদনা জানাই, হরি, যাতনা জানাই,
সংসার সাগরে পড়ি তোমারে ভুলেছি, হরি,
কেমনে পার হব, হরি, এ ভব সংসার।
তুমি, হরি, হীনবন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
নিজগুণে কৃপা করে তরাও হে আমায়।
অধম গিরি কাতর প্রাণে ডাকে হে তোমায়। —ঐ

১৫

হরিমন পয়সা রে, পয়সা নাই যার বৃথা জনম সংসারে,
পয়সার হস্ত নাস্তি পদ নাস্তি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে,

সংসারে সায়ের কোম্পানী, পয়সা গড়ন করছে তারা
সিকি আধুলি
আবার কাগজেতে মোহর দিয়ে দাগা করে সেইজনে
পয়সা এমনি বস্তু ধন, আদর করে সকলেতে বসতে দেয় আসন,
ওরে পয়সা নাই যার আদর নাই তার এ ভব সংসারে।
পয়সা থাকে যার ঘরে দেশ বিদেশে তীর্থপর্যটন করে সে,
ওরে, পয়সা কাছে থাকলে পরে আদর করে সর্বজনে
ওরে অধম গিরি কয় শুনরে পাগল মন,
ওরে হরিবিনে কে তরাবে এ ভব সংসারে। —ঐ

ইহাতে বাউল গানের ভাবগত কোন বৈশিষ্ট্য নাই। ইহা সাধারণ বৈরাগ্যমূলক গান, বৈরাগ্যমূলক গানকেও সাধারণ ভাবে বাউল গান বলে। সেইজন্য বাউল গান বলিয়াই ইহারা সংগৃহীত হইয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত গান দুইটিতেও লালন ফকিরের ভণিতা আছে, অথচ ইহা যে লালন ফকিরের রচনা কিংবা আদৌ বাউল গানই নহে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহারা সাধারণ ভক্তিমূলক গান।

১৬

আয় হে, গৌর, আয় আমার হৃদ মাঝারি,
নট সেজে নৃত্য কর তায় গৌর আয়ো হে।
লয়ে এসো সাঙ্গ পাঙ্গ, ভূষণে সাজিয়ে অঙ্গ,
ওরে, দেখব আমি গৌর অঙ্গ ঐ শীতল করিব গো
আয়ো হে সুধার মুণ্ড করে লয়ে সুধার ভাণ্ড
ওরে যে চাইল ভবকাণ্ড ঐ চায় গো রাঙা পায়।
আয়ো হে, গৌর, হৃদকমলে, এসো প্রভু বাহু তুলে,
ওরে নাচব আমি গৌর বলে ডাকিছে এ আশায়,
লালনে কয় এইত আশা শেষ হইল আমার দশা॥ —ঐ

১৭

হরি বল রসনা পুরাও মনের বাসনা
রসনা বিফলে জনম গেল, কামিনীকাঞ্চনের ফাঁদে যেন ভুল না।

অসৎ সঙ্গে বসো না অসৎ ক্রীড়া খেলো না
রসনা, বিফলে জনম গেল তা ভাবলি না।
করি মানা শুন না শেষে পাবি যাতনা
লালন বলে প্রাণে জ্বালা দিওনা
কামিনী-কাঞ্চনের ফাঁদে আর যেন ভুলোনা॥ —ঐ

১৮

হরি হরি বল রসনা আর বাঁচবি ক'দিন
দিনে দিনে দিন ফুরাল উ তনু হ'ল ক্ষীণ।
সময় এলে যাবে না ছেড়ে অমনিরে লয়ে যাবে,
সেদিন ঘাড়ে ধরে ওরে পার পাবি না পায়ে পড়ে।
এমনি কঠিন আর বাঁচবি ক'দিন,
ভাই বন্ধু সুত দারা, মনরে সুখের সময় সবাই তারা।
মরলে সে বলবে মড়া ছুঁবে না সেদিন।
আর বাঁচবে কদিন।
জুয়ারের জল ধন আর যৌবন তার কি গরব করে রে মন,
ওরে খ্যাপা বলে, মিলিয়ে নয়ন মানুষকে চিন॥ —ঐ

বাউলের আর এক নাম ক্ষ্যাপা, এখানে কেবলমাত্র ক্ষ্যাপা কথাটি বাউলের ভাষা হইতে আসিয়াছে, অন্যত্র তাহার আর কোন চিহ্ন নাই।

১৯

ও ডুবে দেখরে আজব কারখানা দিল-দরিয়ার মাঝে
ওরে যে ডুবেছে সেই মরেছে আর মজেছে রসনা।
দিল দরিয়ার মাঝে দেখ, এই না দেহে নদী আছে,
মাঝে মাঝে জাহাজ গেছে, ওরে, ছ'জনে তার মাঝি আছে।
হালধরে কালসোনা দিল্ দরিয়ার মাঝে।
এই না দেহে কলের গাড়ী, হরি নামে বোঝাই করে।
ওরে ও গাড়ীতে চাপলে পরে পারের কড়ি লাগবে না।
এই না দেহে বাগান আছে, নানা জাতের ফুল ফুটেছে,
ওরে সৌরভে মন মেতেছে খ্যাপা কেন মাতল না॥ —ঐ

২০

এমন ভবের নদীতে, সই রে, ডুব দিলুম না।
ডুবি ডুবি মনে করি আমি মরণ ভয়ে ডুবলুম না।
কেন ডুব দিলুম না।
ওরে জল মধ্যে স্থল পদ্ম, তাতে কত আছে মধু,
কাল ভ্রমর জানে ঐ ফুলের মধু, ঐ গোবর পোকায় জানে না।
ওরে নিত্য গঙ্গায় স্নান করি, কূলে বসে ঐ রূপ হেরি,
ওরে নদীর ধারে ধারে বুলি আমি, পাই না ঘরের ঠিকানা
এ লালন গোঁসাই গো কেঁদে বলে, ফুল ফুটেছে নিগম ডালে,
ওরে রসিক জানে ফুলের সন্ধান অরসিকে জানে না॥ —ঐ

২১

ওরে বাঁশীর স্বরে ডাকছে গোঁসাই শ্যাম,
আমি কেমনে যাব বলো ছাড়ি একা।
ওরে কিশোরী আয়, হাঁকিছে বাঁশরী,
ঐ শ্রবণে ফুকারে আমার নাম।
ওরে আমি যদি যাই পাই কি না পাই
আর হেরিবারে কালামোহন, ভাই,
ওরে যাক্‌না গোকুল, আর থাকুক্ না গোকুল,
আমি ঐ কুলেতে রহিলাম, ও বাঁশী মজাইল ডুবাইল।
নিল গো তোর কুল শ্যাম, ওরে জটিলা প্রহরী।
আর কুটিলার জারী এই গঞ্জনাতে সদাই জলে গো প্রাণ
ওরে দাস জ্যোতি গায়, ও রাঙা পায়।
আমি জনমে জনমে বিকাইলাম প্রাণ॥ -ঐ

২২

কালা কালারে, এখন ঘরে থাকা বড় জ্বালা,
ভেঙ্গে গেছে ন দরজা অসংখ্য জানালা।
কালা কালারে, এখন ঘরে থাকা বড় জ্বালা,
ইঁদুরে কুড়েছে মাটি বাতাসে উড়ায়ে গো,
সময় পালে মারে লাথি চামচিকা ঝাঁটি শালা।

কালারে কালা, এমন ঘরে থাকা বড় জ্বালা।
ছিঁড়ে গেছে দড়ি দড়া, শেষ হয় না জল পড়া,
উই চিংড়া কেঁচা কেন্নই মাঝাই করে খেলা,
এঘরে তিনটি খুঁটি লড়ে গেছে মধুমাটি
পোদায় লেগেছে ঘুন পড়বে কোন বেলা ॥ —বাঁশপাহাড়ী

২৩

সব যে যাতৌ তেসা রে মন সবযে যাতৌ তেসা,
কভু জুটে খাসা অন্ন ব্যঞ্জন বাইশা।
কভু নুন অন্ন জুটে না, তাতে কাঁকর বালি মেশা।
কভু শয়ন খাট-পালঙ্কে শয়নে বালিশ খাসা,
কভু ছেঁড়া খাটে ঘুম ধরে না তাড়াতে হয় মশা।
এ যৌবন আর থাকবে না পুরুষের দশ দশা,
নীলকণ্ঠ বলে, ভবে এসে আমার মিটল না মনের আশা ॥ —ঐ

২৪

আশানদীর তীরে এসে কেন বসে আছ মন,
তরঙ্গ হয়েছে ভারী পার হবি রে কখন।
একি রে তোর দুষ্টমতি, কৃষ্ণপদে হলো না মতি,
কর কৃষ্ণে রতি, কৃষ্ণে মতি, করবে সাধন।
আসা যাওয়া ভাবনা কিরে, আসা যাওয়া ঘুরে ফিরে,
আবার বুঝি কর্ম ফেরে হারাবে জীবন।
যে আশাতে ভবে আসা, মিটিল না মনের আশা,
খ্যেপা বলে, করবে আশা ঐ যুগল চরণ ॥ —পুরুলিয়া

২৫

যেমন চকিতে বাঁটুল বাজিল পাখীরে,
আমার সুখেরি স্বপন যায় গো ভাসিয়ে।
জলেতে সে রূপ হারালাম হারাইলাম সেরূপ
কি রূপে রাধা বাঁচিয়ে ॥ —ঐ

২৬

খেপা মন, যাবি কী ভ্রমণে কৃষ্ণ-অনুরাগের বাগানে ॥ (ধুং)
সে বাগানের দু'জনা মালি, একজন উড়ে একজন বাঙ্গালী,
ওরা নিড়ায় মাটি হয়েছে খাঁটি, নয়ন জলসিঞ্চনে ॥
কর ক্ষেতে একীন মনে দেহ জমিন হব কি না কে জানে,
ছয়টা বলদ ঘরে, বাঁধ তারে প্রেমডোরে,
ছয়টা বলদে চালাও একীনে কোটিতে একজন চাষা,
লগন সাঁইএর মিছে আশা মিছে তোর ধিক্ ধিক্ জীবনে ॥ —ঐ

লগন সাঁই একজন বাউল সাধকের নাম ; কিন্তু গানটি তাঁহার রচনা কি না সন্দেহ আছে।

২৭

যেন মিথ্যা করে প্রেমিক হয়ে মজনু সেজনা,
তুমি কি জান প্রেমের ঠিকানা।
আলখাল্লা গায়ে পরে, পীর হয়ে মুরীদ করে,
বলে কমলিয়াত, হায়, বেজায় পৌছনা,
তরাজু দিলে পরে ভেকের করে বলে হয়েছে কানা ॥
পীর করে আনাগানা খায় ফিরে সহিখানা
বাসনায় মত্ত করে বিয়ের ঠিকানা।
ভতুয়া দেয় যে বিয়ের প্রেমিকের ভাব দেখ না ॥ —মুর্শিদাবাদ

২৮

মনের মানুষ খুঁজে আমি পেলাম না,
কোথায় গেলে পাব আমি কে দিবে তার ঠিকানা।
গুরুর দ্বারে গেলাম যদি, বলে সাধন কর নিরবধি,
হুকুম করেন কারে গুরু তামিল করে কোন জনা।
সাগর পারে বোঝাই তরী, মাঝি মাল্লা এর কোথায় সারি,
এর মহাজন কে, সোনা দানার কে করে বেচাকিনা ॥ —ঐ

২৯

দয়া করে বল আমায়, ওগো দয়াময়,
হায়, আত্মার আত্মা জীবন কর্তা আমাতে কে রয়।

কোথায় থেকে করে খেলা, নিত্য নূতন সৃষ্টির খেলা,
রোজ দু'বেলা ভাবে আমার মন,
তুমি জীবের জীবন আত্মা, পঞ্চভূতের তুমিই সঙ্গ,
তুমি চালাও, হায়, পালন কর্তা গো,
তবে আমার কেন চলাত হয় সংশয়।
কুলে চাকি মুলে চাকি, রূপে করে ঝিকিমিকি,
নাইক বাকি হেরি সংসারে,
ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুত ব্যোম,
কে আসন করে ইন্দ্রিয় ধামে
কে হয় ষড়দলে মত্ত কামে গো।
হেরিতে জীবনে জীবন সৃষ্টি জগতময়।
বলে প্রতির ক্রিয়া সাধুগণে
সেরূপ নির্ণয় হয় না নিষ্ঠা জ্ঞানে।
দেখ স্বপ্নে নয় চেতনে বেহুঁস গো,
তাই কর্মারম্ভে ভগবান কয়॥ —ঐ

৩০

আর বেলা নাই এই বেলা, ভাই, হরি বলে প্রাণ জুড়াই।
নিতাই চাঁদের পারের ঘাটে অবিলম্বে সবাই যাই॥
নিতাই তোমার হলাম বলে—যে ডাকে দুই বাহু তুলে।
অমনি এসে নেয় গো কোলে যা কর দয়াল নিতাই॥
দয়াল নিতাই দয়া করে প্রেমের ভাণ্ড করে ধরে,
বিলাচ্ছে প্রেম যারে তারে তার জাত বিজাতের বিচার নাই।
চৈতন্য-প্রেমবন্যা এসে শ্রীনবদ্বীপ যায়া গো ভেসে,
পাষণ্ডগণ পালায় ত্রাসে বলে মোদের উপায় নাই॥
শ্রীরাম হলেন প্রেমের গুরু গদাধর হয় প্রেমের গুরু,
নিতাই গৌর কল্পতরু দ্বিজ গোকুল চাঁদের চেতন নাই॥ —নদীয়া

৩১

সময় থাকতে করলি না, মন, ভক্তিবীজের গাছ রোপণ।
যাবার সময় পাবার কথা মিছে কর আকিঞ্চন॥

সে গাছে দিলি না বেড়া, ঢুকে ছাগল আর ভেড়া,
লতাপাতা খেয়ে গাছের করেছে ন্যাড়া।
জল বিনে শুকালো গোড়া. করলে না শ্রদ্ধা-জলেতে সিঞ্চন॥
গুরুদত্ত বীজ যাহা, অঙ্কুর হয়ে যায় শুকায়ে তাহা,
প্রেমশূন্য শুষ্ক হিয়া হারাইলে নিজের ধন॥
রাঘব বলে কাঁদছিতো ভয়ে হ'য়ে কুঞ্চিত
শেষের দিনে বিপদ মনে মনে জানছি তো,
হ'লো না অর্থ সঞ্চিত জনম গেল অকারণ॥ —মুর্শিদাবাদ

৩২

ও-রে, মন কেন আজ আমার এমন হলো,
ঐ যাহার লেগে মন মজেছে
এমন রূপের কিরণ খুলে বল॥
সুবুদ্ধির কুবুদ্ধি হলো, কাকের স্বভাব মনে এলো,
নিয়ে মৃত্যু ভয়, কেন মাকাল ফলে মন মজিল॥
আর ভবে আমার ছিল আশা।
ভেঙ্গে গেল এখন আশার বাসা॥
কে ঘটাইল এ দুর্দশা,
কেন ঠাকুর গড়তে বানর হলো॥
চিনল না গুরু কেমন, করলাম না সে তা সাধন,
নাচার হালে কইছে লালন
ও আমার যকের ঘি কুত্তায় খেলো॥ —নদীয়া

৩৩

প্রেম-রতন তাই বুঝাই কারে, সাজিয়েছে স্তরে স্তরে,
এই ভাব-সাগরে দিয়েছে ছেড়ে।
সে কারিগর চতুর বড়, গড়েছে অতি সুন্দর,
রাগে বসে অতি প্রখর।
কহে রাজ্যেশ্বরী ইচ্ছা হয় যে বিকায় শ্রীচরণে॥ —ঐ

এখানে রাজ্যেশ্বরী নামে কোন মহিলা বাউল সাধিকার ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

৩৪

কি জুতে বেঁধেছে বাঁধন. ব্রহ্মা বিষ্ণু আর ত্রিলোচন,
বাঁধনেতে পরে তিন জন করেছে ইষ্ট সাধন ॥
গোকুল চাঁদের মন ভ্রান্ত, বিষয়েতে নয় সে ক্ষান্ত,
আমি জানালাম না বিশেষ তদন্ত
রাখাল চাঁদকে ভজলাম না। —ঐ

৩৫

ঢল নেমেছে কালা পাহাড় ঘেমে।
শান্তিপুরটা ভেসে গেল হড়কা জোয়ার নেমে ॥
নেমেছে জল আলতাগুলা, যে দেখে সে হয় আলাভোলা।
কৈলাসে সে নেংটা ভোলা পেলে ভাগ্য ক্রমে ॥
যখন এসে নামলো মর্তে ত্রিবেণীর ঐ মহাতীর্থে (ভাইরে),
বেদব্যাসে শরণ নিল বদরিকাশ্রমে (ভাইরে)।
তিনি শুষেছিলেন সকল পানি সাধনানুক্রমে।
গোঁসাই গোকুল চাঁদের কপাল মন্দ
ঘুচলো না মনের সন্দেহ
ভাইরে, এমন সুধাসিন্ধু ক্ষেপা চিনলে নাকো ভ্রমে। —ঐ

৩৬

গুরু বিনে বন্ধু নাইরে আর,
নিদানের কাণ্ডারী গুরু ভবপারের কর্ণধার।
গুরুপদে মেঘ সাজায়ে থাক রে, মন, চাতক হয়ে,
দয়াল গুরু যদি দয়া করে ঘুচবে মনের অন্ধকার ॥
গুরু-অনুরাগী যে জন, কাজ কি রে তার অন্য সাধন,
রূপসাগরে দিয়ে আসন বাস করে সে নিরন্তর ॥
গুরু ধর সাধন কর নির্বিকারী করণ কর,
এবার মরে যদি বাঁচতে পার, গুরু-সেবায় হবা অধিকার ॥
লোচন বলে ভক্তি বিনে, গুরুর দয়া হবে কেনে,
এবার জগদানন্দ কায় মনেতে গোপীকান্তের সাধন কর ॥ —যশোহর

৩৭

সাধুর সঙ্গেতে প্রাণ জুড়ায় রে, শীতল হয় রে তাপিত অঙ্গ।
শীতল হয় রে তাপিত অঙ্গ রে, ক্ষণ কাল হলে সঙ্গ॥
সাধুর গুণ কি যায় রে বলা, শুদ্ধ চিত্ত অন্তর খোলা।
সাধুর দর্শনে যায় মনের ময়লা রে, পরশে হয় প্রেম-তরঙ্গ॥
সাধু সঙ্গ হলে পরে, অমনি আত্মায় আত্মা হরণ করে,
সাধুর হৃদয়-মাঝারে বিরাজ রে করেন শ্রীগৌরাঙ্গ॥
সাধু যদি মনে করেন, চাঁদ গৌর দিলেও দিতে পারেন।
আপন রং ধরাইতে পারে রে তাইরে বলি অন্তরঙ্গ॥
গোঁসাই গোলোক চাঁদে বলে, তারক রে তুই রইলি ভুলে।
সাধু সঙ্গ করব বলে রে মাতলো না তোর মন-মাতঙ্গ॥ —ফরিদপুর

৩৮

মনের কোণে বাসা বাঁধে শত্রু ছয় জনায়।
এরা সবাই মিলে বাঁধালো গোল কেমন করে প্রাণ বাঁচায়॥
এদের হাত হতে নাই রে রেহাই শ্রীকৃষ্ণের ঐ চরণ বিনায়।
এরা নিত্য করে আনাগোনা মনেরই ঐ কিনারায়॥
তাই বলি, মন, ভজরে চরণ চাস্ যদি পেতে রেহাই। —মুর্শিদাবাদ

৩৯

ভোলা মন আমার, কেন তুমি অচেতন,
ও তোমার মনের কোণে সন্দেহ যে অকারণ॥
কেবা আল্লা কেবা হরি ভাব তুমি অকারণ।
সেই দীননাথ ভবের কাণ্ডারী,
ও মন, যারে ভজ তারেই পাবে মিলবে তোমার অরূপ ধন॥ —ঐ

৪০

ছোটখাট ঘর আমার, সাড়ে তিন হাত সীমানা,
কারিগরের বাহাদুরী দেখ না॥
ঘরের মালিক অনেক জনাই সবার উপর থাকে যে জন,
সবাই মানে তার নিশানা, কিন্তু আসল মালিক যে জন,
কেউ পায় না তার নিশানা॥ —ঐ

৪১

ছয়টা ইঁদুর বাসা বাঁধে বুকেরই এই গর্তে,
তাদের জ্বালায় টেকা যে দায় হয়েছে এই মর্ত্যে ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ তিনটে ছানা,
ভাঁড়ার ঘরে দেয় যে হানা।
বাকীগুলোও হার মানে না
হাজার রকম সর্তে ॥ —হেতমপুর (বীরভূম)

৪২

সময় থাকতে করলি না, মন, ভক্তিবীজের গাছ রোপণ,
যাবার সময় পাবার কথা মিছে কর আকিঞ্চন।
সে গাছে দিলি না বেড়া ঢুকে ছাগল আর ভেড়া।
লতা পাতা খেয়ে গাছের করেছে নেড়া।
জল বিনে শুখাল গোড়া, করলে না শ্রদ্ধা-জলেতে সিঞ্চন ॥
গুরুদত্ত বীজ যাহা, অঙ্কুর হয়ে যায় শুখায়ে দেখ না তাহা,
প্রেমশূন্য শুষ্ক হিয়া হারাইলি নিজের ধন ॥
রাঘব বলে কাঁদছিতো, ভয়ে হয়ে কুঞ্চিত,
শেষের দিনে মনে মনে বিপদ জানছিত।
হলো না অর্থ সঞ্চিত জনম গেল অকারণ ॥ —মুর্শিদাবাদ

৪৩

জান না, ভাই, সেদিন কবে হবে,
যেদিন ছেঁড়া তালাই চট জড়িয়ে শ্মশান ঘাটে যাবে।
ভাই বন্ধু পুত্র দারা, তিন দিন মাত্র কাঁদবে তারা,
বিষয় পেয়ে মত্ত হয়ে তোমায় ভুলে যাবে ॥
সে হা কমের হুকুম খাড়া, লয়ে যাবে খাড়া খাড়া
হাতী ঘোড়া টাকার তোড়া সবই পড়ে রইবে। —মুর্শিদাবাদ

ইহা সাধারণ বৈরাগ্যমূলক গান, বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই ; বরং বাউল এই প্রকার দুঃখবাদী জীবন-দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। বাউল সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য আশাবাদ। তবে সাধারণ বিশ্বাসে বাউলের সঙ্গে বৈরাগ্যের

কথা মিশিয়া যায় বলিয়া সাধারণ বৈরাগ্যমূলক গানও বাউল গান বলিয়া ভুল করা হয়।

৪৪

মন, না বুঝে কাঁদছিস্ বসে, শেষে যে হবি রে কানা,
চোখের জলে বুক ভাসালে মিলবে না রে কেলে সোনা ॥
তোর কাঁদাটা কেবা শুনে, বুঝলি না মনে আপন জ্ঞানে,
ঐ দেখ সাধনার ধন ঘরের কোণে, সে দিকে তোর চোখ গেল না ॥
কাঁদলে যদি কৃষ্ণ মিলে, লোক জানায়ে চীৎকার দিলে,
পাবি না ধন কোন কালে, কেবল যোগে পাবি—কর্ সাধনা ॥
কাঁদ্‌লে হবে নয়ন অন্ধ, পাবি না তুই প্রেমানন্দ,
মিল্‌বে না সে প্রাণগোবিন্দ, অন্ধ চোখে তোর মিল্‌বে না ॥
হরানন্দ ভেবে বলে, সূক্ষ্ম নিষ্ঠা না জন্মিলে,
এ চলেনা কুট কৌশলে, কর না, মন, বিবেচনা ॥ —ঐ

৪৫

আর কত খেল্‌বিরে মন, ঐ দেখ বেলা যায়রে চলে।
ভবের খেলায় নেমেরে, মন, ভাবের খেলা গেলি ভুলে ॥
হাতে তো বিন্তি এল না, বসে করছি তাই ভাবনা,
পাঞ্জা হবে গেল জানা, ভেঙে খেলা নে তাস তুলে ॥
চৌদ্দ গোলাম টেক্কা যত, ঘুসে পড়ে সব বেহাত,
বিপক্ষ তার ইচ্ছা মত, সাত্তা মেরে নেয় সব তুলে ॥
হরানন্দ তোরে বলি, না শিখে কেনে খেল্‌তে গেলি,
হাতের পাঁচ তুই নাহি পেলি, গেলি না রে কোন কূলে ॥ —ঐ

৪৬

এক ব্রহ্ম, দুই মাতাপিতা, তিন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
স্থূল প্রবৃত্তি সাধক সিদ্ধি পঞ্চ আত্মা হয় সঞ্চার
ছয় রিপু ছয়টি ফোঁটা, সপ্ত ধাতু দেহ আঁটা,
অষ্টপাশে দেহ মোটা, নবগ্রহ নয় প্রকার ॥
দশ ইন্দ্রিয় সহ মিলনে, মহাভূত অহঙ্কার জ্ঞানে,
মানব দেহ ভাগ্যগুণে, মিলন হয় এই ভবের পর ॥

বাহির তত্ত্ব আর অন্তর তত্ত্ব, দুই প্রকারে জনম তত্ত্ব
যে জেনেছে সার মহত্ত্ব, কৃতার্থ সে সব প্রকার ॥
হরারে তুই অনুমানে, এ-সব সন্ধান পাবি কেনে,
যদি থাকৃতিস সে সন্ধানে মিলত রে আনন্দ বাজার ॥ —ঐ

৪৭

তোর মনের মানুষ বিরাজ করে রে, ও তোর দ্বিদলপুরে।
রত্ন বেদী উজান নদী নীচে রয় তার তিন ধারে।
ও তার তীক্ষ্ণ ধারে হংস চরে ব্যক্ত আছে চরাচরে।
তার ছয় মহল্লা ষোল তালা ছয়টী গালিম সদা ফিরে।
নাই সে দিবা নাই সে নিশি. ফাঁক পাইলেই ডাকাতি করে।
যদি কেউ সাহস করে, যাইতে পারে গুরুর চরণ স্মরণ করে,
সাহসে মিলিবে রতন মনের মতন রূপমাধুরী প্রেমসাগরে।

—মৈমনসিংহ

৪৮

আমায় পাগল করে' দিলি,
আমার ভরম, শরম, ধরম করম, সকলি ডুবালি।
আমি আসি ভবে ভববাণী আনন্দে উথুলি,
তোর লীলামাধুরী হেরি আমি যাই, মা, আপন ভুলি।
চিদাংশে সম্বিত জ্ঞান আমায় চেনাইলি,
শুদ্ধ কৃষ্ণ, গতি কর্ম, মর্ম বলে দিলি।
যোগমায়া চির শক্তি, ভক্তি-স্বরূপ দেখাইলি,
সত্যং পরং ধী মহী, সম্বন্ধ জানাইলি।
আমার বন্ধুর রূপে কেনা পাগল মা তোরা পাগলা পাগলী,
মাগো, তোদের যুগল স্বরূপ হেরে প্রেমানন্দ নাচে গোরা পাগলী।
(আমায় পাগল করে দিলি) —বাঁকুড়া

বাউল সাধনায় নারীও যে ক্রমে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা কয়েকজন ক্ষ্যাপী বা বাউল সন্ন্যাসিনীর রচিত গান হইতে জানা যায়। গোরা পাগলী তাহাদের অন্যতম। বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে তাহার গান প্রচলিত আছে।

৪৯

এ ভব-নদীয়ার মাঝে দু'রঙ্গের জল আছে,
বুঝা যায় না অন্ধকারে সাধু সঙ্গ বিনে।
অন্যে কেবা জানে, এমন না হেরি সংসারে,
আমার সারাটি জনম গেল মায়ারি ফেরে।
সে জল তরঙ্গ হেরি, মনে হয় ডুবে মরি,
হরি, রাখহে এবারে দিয়ে চরণ তরী।
রাখ, বংশীধারী, নইলে মরিলাম এবারে।
আমার সারাটি জনম গেল মায়ারি ফেরে।
পঞ্চ কাষ্ঠের জীর্ণ তরী, নব ছিদ্রে ঢুকছে বারি,
একা মোর সেচিতে না পারি
আছে ছয় জন দ্বারী।
তারা সব আনাড়ি, পাছে ডুবাইয়া মারে,
ধনে জনে দিয়ে ভরা, কুলমান বহিছে সারা,
তরী হাবুডুবু করে,
একে ষোলমন, শুন সাধুজন, তরী লাগাহ কিনারে।
গুরু পদ'র আশা করি বসে আছি নদীর ধারে।
গুরু, পার কর আমারে, তুমি রাখ যারে,
তারে কেবা মারে বলে মূঢ় রামেশ্বরে,
সারাটি জনম গেল মায়ারি ফেরে। —ঐ

৫০

আমার এই ভাঙ্গাঘরে প্রাণকান্ত কি আর আসবে ফিরে?
অমন সুকৃতি কি লিখেছেন বঁধু আমার ললাটে?
সপ্ত প্রবন্ধ ঘাটে, চির আঁটা কালকপাটে,
হৃদয়-গ্রন্থি যাহার টুটে, বন্ধু তার রয় নিকটে।
অষ্টমে নাদ বন্দিলে, ঘরকে ফিরে ঘরের ছেলে,
নব ভক্তি মায়ের কোলে, গোরা পাগলী কে বটে? —ঐ

৫১

ভালবেসে ভুলাইলে কৈ দেখা দিলে না,
তুমি ভালবাসতে ভালোবাসো
দেখা দিতে ভালোবাস না।
ভেবেছিলাম সাধন বলে,
দেখব তোমায় হৃদ্‌-কমলে,
দেখা দিতে হবে বলে তাতেও কর ছলনা।
আমি মাত্র এই চাই
এখন দেখা না দিলে ক্ষতি নাই।
কিন্তু শেষের সেদিন দিও দেখা
যেন ভুলে থেকো না।

—বেলপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

৫২

ডুব দিও না, পার পাবে না কাম নদীতে আর।
সে যে অকূল নদীর তুফান ভারি—কূল কিনারা নাই তাহার॥
ডুব দিও না পারে থেকো, না জোয়ার ভাঁটার খবর রেখো,
বিবেক হলদি গায়ে মেখো কুম্ভীরে ছোঁবে না আর॥
কিবা সাধ্য আছে তোমার, পাড়ি দিতে চাও হে সাঁতার,
কিন্তু পাড়ি দিতে পারে, গুরু যদি দেয় কিনার॥
পঞ্চ-রসের রসিক যারা, জোয়ার ভাঁটা চেনে তারা,
তাদের তরী যায় না মারা, বেয়ে যায় সে প্রেমের দাঁড়॥
দুধ আর মিলায়ে জলে,—জল চলে সে উর্দ্ধনলে,
দ্বিজ কৈলাশ চন্দ্র বলে রাজহংসে দেয় সাঁতার॥ —মুর্শিদাবাদ

৫৩

শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী যে জন হয়;
মুখে কথা ক'ক বা না ক'ক, তার নয়ন দেখলে চেনা যায়॥
মণিহারা ফণি যেমন প্রেমরসিকের দুটি নয়ন,
কি দেখে, কি করে সে'জন কে তাহার অন্ত পায়॥

রূপে নয়ন ঝুরে খাঁটি, ভুলে যায় সে নাম মন্ত্রটি,
চিত্রগুপ্ত তার পাপপুণ্য—কিরূপে লেখে খাতায়॥
সাঁইজী কয় বারে বারে শোন্ রে, লালন, বলি তোরে—
তুমি, মদন রসে বেড়াও ঘুরে, সে প্রেম মনে কই দাঁড়াও॥ —ঐ

৫৪

সে কেমন কে তা জানে,
মানুষ কি জানয়ার সেটা পাই না বেদ-পুরাণে।
সে কেমন তা কে জানে।
কেউ বা মৎস, কেউ বা কাছিম কেউ বলে শূয়ার,
কেউ বলে সে অর্ধেক পশু অর্ধেক নরাকার।
কেউ বলে সে নন্দের বেটা থাকে বৃন্দাবনে।
সে কেমন তা কে জানে।
মাথায় জটা তিলক মালা, নামাবলি গায়ে,
কুমণ্ডল হাতে লয়ে ঘুরছে দেশে দেশে।
সে কেমন কে তা জানে।
কেউ বলে সে লক্ষ্মীছাড়া, কেউ বলে বোম্বেটে।
কাঁধে কোদাল রেখে চাষি ঘুরছে মাঠে মাঠে।
সে কেমন কে তা জানে। —হুগলী

৫৫

রসনা, দিন গেল দীনবন্ধু বলে ডাকলি না।
তোমার আত্মানারাণ ছেড়ে যাবে, কেউ সঙ্গে যাবে না।
দিন গেল দীনবন্ধু বলে ডাকলি না।
প্রথম কালে মায়ের গর্ভেতে ছিলে।
তিলে তিলে ত্রিভঙ্গরূপ দেখিতে ছিলে।
দ্বিতীয় কালে তুমি ভূমিষ্ঠ হলে,
দুগ্ধপান কর তুমি জননীর কোলে।
তৃতীয় কালে তুমি বিবাহ করিলে,
সেই দিনেতে মায়া জালে বদ্ধ হইলে।

তুমি প্রেমরসে মত্ত হয়ে করতেছ বাবুয়ানা।
রসনা, দিন গেল দীনবন্ধু বলে ডাকলি না।
চতুর্থকালে তুমি বৃদ্ধ হইলে
গায়ের মাংস উলু থুলু ধরতে হয় তুলে।
তুমি ভবসিন্ধু যাবে দীনবন্ধু বল না।
রসনা, দিন গেল দীনবন্ধু বলে ডাকলি না। —ঐ

৫৬

হরি নাম বল রে চেতন করে হরি নাম বল নেচে,
সবাই বলে খ্যাপার কথায় বিষ্ণু খেপেছে।
না ক্ষেপিলে চলবে কেন খ্যাপা হরের ধনরে।
চেতন করে হরি নাম বল রে।
হরি নাম অমূল্য রতন,
শিব ত্রিশূলে রেখেছে কাশী দেখরে নয়নে।
বুড়ো বিষ খেয়ে আজ বেঁচে গেল মরণ হল নাই রে।
চেতন করে হরি নাম বলরে। —ঐ

৫৭

মিছে তুই করিস গুমার তোর ভাঙ্গা ঘরে।
তোর নয় দরজায় হাওয়া ঢুকে দিলে ফাঁক করে।
মিছে ··· ··· ··· ··· ঘরে।
তো আট কোটা ঘরের পাতনামা
সবাই তো সমান থাকে না।
ও তুই পাড় কোনাচকে বশ রাখ না, দেখ মনে ভেবে।
মিছে ··· ··· ·· ··· ঘরে।
মাখনলাল বাউলে বলে
ও তুই ঘরের গুমার করিস কিরে,
তোকে ভাসিয়ে দেব হড়কা বাণে মরবি সাঁতুরে।
মিছে ··· ··· ··· ··· ঘরে। —মুর্শিদাবাদ

৫৮

ধরবি যদি মনের মানুষ রসে ডুবে থাক।
সে যে অনর্পিত সহজ-সলিলে, তিন রঙের ফুল একই মৃণালে,
সে যে পরম উজ্জ্বল পদভাসে শুধু মধুর হিল্লোলে!
মন রে, সেই কমলে ভৃঙ্গ হয়ে ঢুকে খাও মধুর চাক,
ও রসের সাগরে ধারা বহে তিনধারে।
তিনধারে তিনবর্ণ জল সদা উজান ধরে॥
সে যে নদী সুরধনী অত্যন্ত গভীর পানি
বিরাজ করে কালসাপিনী কখন খায় কারে॥
উজান নদীর নাবিক যারা পাল খাটিয়ে দিচ্ছে তারা—
লোভী কামি যাচ্ছে মারা পড়ে নদীর রাগ-জোয়ারে।
দশমী পঞ্চমী তিথি গঙ্গা যমুনা সরস্বতী হ'য়ে বেগবতী সহস্রধারে॥
সুরসের রসিক যেজন, প্রেমরসে মন হয় উচাটন,
ঠিক যুইতে রেখে দুই নয়ন সে পাড়ি ধরে
এমন প্রেমের বাতাস ছুটে, ভাবের তরঙ্গ উঠে
কত রস চুয়াইয়া পড়ে॥ —ঐ

৫৯

তোরে বলি, ওরে মন, আগে রসের মহাজন কররে ভজন।
বর্ত্তমানে রেখে তারে রসাশ্রয়ে গ্রহণ করে রে
ভাবার্থিক সাত্ত্বিক বিকারে দেহপ্রাণ কর অর্পণ।
আছে দেহের পুর্বধারে ঈশান কোণের চক বাজারে রে
রতন বেদীর উপররে কুসুম-শয্যায় শয়ন।
তখন সে রূপে রূপ মিলায়ে যাবে ব্রহ্মাণ্ড খসিয়ে যাবে রে।
অমাতে পূর্ণিমা হবে চিৎশক্তি জীবের জীবন।
সে অপরূপ রূপের জ্যোতি চৌদ্দ ভুবন আলো তাতে।
বন্ধ রেখে প্রেম কেঠোতে সাক্ষাৎ রূপ কর দর্শন॥
শোন, মন, বলি তোরে ত্রিগুণাত্মিক দেহ ধরে কে বিরাজে শুন বিবরণ,
তিন দিবসের তিনটি খেলা মহারাজের গুপ্ত মেলা-মিলে আনন্দ বাজার,
শ্রীগোপালের হাটে রসামৃত সমান বাঁটে প্রাপ্তি হবে ভাব নিলে মক্কর॥

শুন প্রথম দিবসের খেলা অদ্বৈত অদ্বিতীয় মেলা মিলে মেলা আনন্দবাজার।
দ্বিতীয় দিনের প্রবন্ধ এই যে প্রভু নিত্যানন্দ কারুণ্যাদি করে বিতরণ॥
তৃতীয় দিবসের মেলা অতি চমৎকার মেলা-মিলে মেলা আনন্দ বাজার॥
আমার আশ্রয় গুরুর কৃপা হইলে দেখবে চাঁদ চকোর খেলা করে॥ —ঐ

৬০

তুমি জগৎগুরু বাঞ্ছা কল্পতরু পতিত জানিয়ে কৃপাং কুরু মোরে কৃপা কর।
আমি দেখিলাম জগতে কেহ নহে তোমাতে তুমি সর্বভুতে।
পতিত-তারিতে পতিতপাবন নামটি ধর॥
পরমহংসরূপে মিশিয়ে আত্মারূপে আছে তত্ত্ব অন্বেষণে—
তুমি বিনে ভবে কে তরাবে জীবে মম সমান পতিত নাইরে ভুবনে॥
সর্বজীবে তোমার সম দয়াল জানে এই ভরসা করি মনে।
গুরু, তুমি বিনে অকৈতব প্রেমে কে বিরাজে নিত্য বৃন্দাবনে॥
তুমি চেতন চৈতন্যরূপে দেহে আছ আত্মারূপে জ্ঞানস্বরূপে দিতেছ শিক্ষা।
তুমি গুরু বর্তমানে কি কাজ বিদেশ-ভ্রমণে স্থানে স্থানে দেখাইলে মোরে
যে দেখাইলে ঠাঁই-ঠাঁই তুমি বিনে কেহ নাই তুমি পুজিব কারে,
আশ্রয় গুরুর কৃপা হইলে দেখবি চাঁদ চকোরে খেলা করে॥ —ঐ

৬১

এই না দেহের মাঝে আছে রে গোলোক বৃন্দাবন।
তারা জ্বালিয়ে একখান জ্ঞানের বাতিরে, ঐ দেখ, রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন॥
দাতাকর্ণ পদ্মাবতী গুরুর পদে আছে মতিরে।
তারা আপন পুত্রের মুণ্ড কেটে ব্রাহ্মণকে করায় ভোজন॥
এই দেহ করিয়ে শুচি, বৈষ্ণব হ'ল রুইদাস মুচি পেয়ে কৃষ্ণধন।
তারা পঞ্চপাণ্ডব যোগ হইয়ারে রুইদাসকে করায় ভোজন॥ —ঐ

৬২

কৃষ্ণের কথা আর ভুলো না, মন, আমার হীরা মন তোতা।
সাধের দিন ত যায়রে বৃথায় দিন গেলে আর দিন পাবা না॥
কৃষ্ণ নামটি বেদের শ্রেষ্ঠ মিষ্ট অতি সুমধুর,
বিষয় মায়া ভুলে রইল, ওরে মন, তুই নেশাখোর॥
একেতে অন্ধকার রাত্রি তাতে নাহি মোর জ্ঞানের বাত্তি

প্রাণ থাকিতে ত, দুর্মতি, হরেকৃষ্ণ নাম ভুল না॥
যোগিঋষি যোগ-সন্ন্যাসী, যোগে বসে করে ধ্যান।
সে সময়ে কালের হাতে পাবিরে তুই পরিত্রাণ॥
মুখে হরেকৃষ্ণ হরির নাম, লইতে দিও না বিরাম॥
ভবের ব্যারাম হবে আরাম যম-যাতনা আর রবে না।
আমি যারে বলি আপন আপন, সেতো আমার আপন নয়,
দুই দিন পরে ঘরের লোকে মুখে দিবে অনল ছাই।
এই দেহ প্রাণ-অন্তিম কালে, নিয়ে যায় যমুনার কুলে,
তোমার মুখে দেবে অনল জ্বেলে আপন বলতে কেহ রবে না॥ —ঐ

৬৩

মন রে, তোর পায়ের ধরি এমন হরিনাম আর ভুল না;
মন, তুই বললে হরি বদন ভরি পারের ভয় তোর আর রবে না।
গুরুর চরণ ভজলিরে মন শমন জ্বালা এড়াবি,
অসময়ে নিদানের কালে গুরু হবে কাণ্ডারী।
মুখে বলিলে হরি, পারের আর লাগবে না কড়ি।
জয় রাধার নাম গান গাইবি, জীর্ণ তরি আর ডুবে না।
করাল দিয়ে ভবে এলি, তুই কি ধন পেয়ে ভুলিলি,
বিষয়-বিষে মত্ত হয়ে সত্য করাল কি করিলি?
ভাই বল বন্ধু বল, চক্ষু মুদলে কে তোর বল,
দিন থাকিতে হরি বল সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না।
এ সংসার বিষানলে মায়াজালে ডুবিলি
আমার আমার ধরমার বলে গণার দিন ত ফুরালি॥
শচীন্দ্র অধম অতি, বৈষ্ণব পদে না হয় মতি,
যে দিন কাল শমনে মারবে ঝাঁকি ফাঁকি ঝুঁকি আর খাটবে না। —ঐ

সাধারণ বৈরাগ্যমূলক গানের মধ্যে এখানে গুরুবাদের ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে; বিশেষ ভাবে বাউল গানের কথা কিছু নাই। কিন্তু পল্লীর জনসাধারণ ইহাদিগকেও বাউল গান বলিয়া জানে।

৬৪

দেহ লাগল না রে মধুর প্রেম সেবায়।
দিন চলে যায় প্রেমের বাতাস লাগল নারে গায়॥
মজিয়ে কাম কাঞ্চনে, ছাড়িয়া সেই প্রেমধনে
ডুবিয়াছেন মায়া-নদীয়ায়॥
এমন ভজন যোগ্য দেহ পেয়ে আসক্তিতে মন মজায়েরে,
এমন সাধের জনম বৃথা চলে যায়॥
পঞ্চরসের রসিক যারা রসে তত্ত্বে হৃদয় ভরা
সদায় মুখে হরিগুণ গায়।
মন রে—
দেহের ছয় রিপুকে কইরে রাজী, তারা করে প্রেমের পুঁজি রে
তাগো সাধের জনম লাগায় প্রেম সেবায়॥
নিত্যঘরে রসিক জনে রসে তত্ত্ব ভক্তির জ্ঞানে
অনুরাগের বসন পরা গায়।
নাম কর মাখামাখি, ভাব রে প্রেমের মুরতিরে,
মন তোর চিন্ময় রূপে উঠিবে হিয়ায়॥
ভেবে অধীন শচীন বলে, রসতত্ত্ব না জানিলে,
কুণ্ডলিনী চেতন করা দায়॥
কুণ্ডলিনী হলে চেতন, মিলবে রে তোর সাধনের ধন রে।
ও তুই সে ধন বিনে রসিক হওয়া দায়॥ —ঐ

৬৫

কি সুন্দর রঙ্গিলা ঘর
তুমি এমন ঘরের না নিলা খবর মনুয্যা রে।
এমন রঙ্গিলা ঘরে, অন্ধকারে রৈলি পড়ে,
গুরুর চরণ না করলি শরণ।
গুরুর কৃপা হলে পরে, ঐ জ্ঞানের বাত্তি জলবে ঘরে রে,
শেষে দেখতে পাবি যুগল কিশোর।
মানুষ ধর, মানুষ ভজ, ঐ মানুষের সঙ্গ কর
ঘরে বসে গুরু ভজন কর।

ঘরের মানুষ ছেড়ে গেল, শুধু ঘর তোর রবে পড়ে রে,
শেষে কে করবে তোর এই ঘরের আদর ॥
সংসার মায়াতে পড়ে, পরকে আপন বানায়ে
আপন মানুষ করিয়া লও পর—মন রে।
শচীন্দ্র কয় শোনরে মনা, ঘরের মানুষ তালাশ করে নে রে,
শেষে থাকবে না তোর কাল-শমনের ভয় ॥ —ঐ

ঘরের মানুষ বলিতে এখানে আত্মাকে মনে করা হইয়াছে।

৬৬

পাষাণ মনরে, মন তোমারে বুঝাই বারে বার।
গুরু ভজবি বলে এসেছিলি, সেই কাজের বা কি করিলি রে।
এখন সেই কথা তোর মনে নাইরে আর ॥
ঊর্ধ্বপদে নতশিরে ছিলি জননী জঠরে
গুরুর নাম করবি সার, মন রে।
ও তুই পড়িয়ে কাম-কাঞ্চনে, হারা হলি লাভে মলিরে
ভবে আসা যাওয়া সার হ'ল না ॥
পড়িয়ে শঠের সনে, হারা হলি পিতৃধনে
কামনদীতে তরী মারা যায়, মন রে।
ছয় বোম্বাইটা নাগুল পাইয়া রে, মালামাল সব নিল হৈরা রে
ও তোর ভেঙ্গে দিল চাঁদেরই বাজার ॥
বলে শচীন্দ্র বিনয় করে, মনরে তোর পায়ে ধরি,
সময় থাকতে ডাকলি না একবার।
অসময়ে কাঁদবি বসে, না জানি কোন উদ্দেশ্যেরে,
ও তুই চক্ষে দেখবি ঘোর অন্ধকার ॥ —মুর্শিদাবাদ

নিম্নোদ্ধৃত গান দুইটিকে উল্টা বাউল (পূর্বে দেখ) গানও বলা যাইতে পারে

৬৭

এমন উল্টো দেশ গো, গুরু, কোন জায়গায় আছে।
সে যে হেট্ট মুণ্ডু ঊর্ধ্ব পদে, সেই না দেশে বাস ক'র্‌তেছে।

সেই না দেশে যত লোকের বাস, মুখে আহার করে না,—
তারা নাকে লয় নিঃশ্বাস, তারা মলমূত্র ত্যাগ করে না—
আহার করে জীবন বাঁচে।
এমন উল্টো দেশ গো, গুরু, কোন জায়গায় আছে।
সেই না দেশে যত নদ-নদী, উর্দ্ধ বেগে জলের স্রোত বয় নিরবধি,
সে যে জলের নিচে আকাশ বায়ু অবিরত বহিতেছে।
এমন উল্টো দেশ গো, গুরু, কোন জায়গায় আছে। —মুর্শিদাবাদ

৬৮

আমি তায় দেখবার আশে, দিবানিশি আছি বসে।
একজনার নামে মণি, কানে শুনি, জলেতে করে তপস্যে,
সে জনা খাবার কালে, ক্ষিদে পেলে আপনার হাড় ভাই—
আপনি চুষে।
একজনার মন অনলে, গঙ্গার জলে আফর জ্বেলে আছে বসে।
আফরে নাইক অঙ্গার, কানা কামার চোখ দুটো তার গেছে খসে॥
দড়িয়ার হুহুঙ্কার হরিণ চরে ঘুরে ফিরে তার আশে পাশে
হরিণে খায়না আহার পায় না কিনার—
কি হবে তার অবশেষে। —ঐ

৬৯

ওরে মানব-দেহ কল্‌কাতা কেতা চমৎকার,
ও ভাই, লালদীঘির পানি বড় মিঠা যে শুনি,
কেও বা বলে লুনছা লাগে ধর্মের হয় হানি।
ও পানি যে খেয়েছে সেই মজেছে সেই হ'য়েছে ভবপার—
কেতা চমৎকার॥
তুমি কল্‌কাতার বাজবাজারে রও
ও, ভাই, কতই কাম বাজাও।
হরিনামের মুণ্ডা এনে ঠাণ্ডা হয়ে খাও।
যেদিন বাগবাজারে পড়বি ফেরে সে দিন প্রাণ বাঁচান হবে ভার,
কেতা চমৎকার॥

কল্‌কাতার বায়ান্ন বাজার ও তার তেপান্ন গলি,
হাত ধরে ঘাড় মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে দেয় নরবলি।
ও নামে সোনাগাছি মাণিকতলা জোড়াসাঁকো আচ্ছা বাহার
কেতা চমৎকার ॥
তোমার গঙ্গার ধারে ঘর—কাঁপে থর থর—
তার ভিতর দেখতে পাবে আজব রং খেয়াল,
যাদুবিন্দু বোকা হয়ে ধুকা, ভাই, উলোড় বনে দেয় সাঁতার,
কেতা চমৎকার ॥ —মুর্শিদাবাদ

কলিকাতা শহরকে মানবদেহের রূপক অর্থে এখানে ব্যবহার করা হইয়াছে।

৭০

যার পাখী তার কাছেতে গেছে, বৃন্দে সখী গো—
কমলিনীর পোষা পাখী বল কেবা ধরেছে।
কাল আসিব বলে গেল, কোথায় গিয়ে ভুলে রইল,
বৃন্দাবন সব আঁধার হইল চাতকী চেয়ে আছে।
এমন ধনি কোন শহরে, আমার পাখী রাখল ধরে,
চোরকে চুরি করতে পারে এমন সাধ্য কার আছে।
বৃন্দে লো, তোর করে ধরি, এনে দে মোর প্রাণের হরি,
নইলে আমি প্রাণে মরি, তুমি বই আমার কে আছে।
খুঁজে এলাম দেশ বিদেশে সন্ধান পাইলাম শেষে
দেখে এলাম মথুরাতে কুব্জা ধরে রেখেছে।
হয়েছে কি দেখার দেখা পাখীর মাথায় পাখীর পাখা
ভৃগুমুনির পদচিহ্ন পাখীর বক্ষে রয়েছে। —ঐ

ইহা সাধারণ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ঝুমুর গান, বাউলের ভাব কিছু মাত্র ইহাতে প্রকাশ পায় নাই। রাঢ় অঞ্চল হইতে সংগৃহীত একটি কৃষ্ণলীলা ঝুমুরের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আছে।

৭১

দিনে দিনে হল আমার এ দিন আখরি।
ছিলাম কোথা এলাম হেথা,
আবার যাব কোথা তাই ভেবে মরি।

বাল্যকাল ধূলা খেলাতে গেল,
যৌবন কালে কলঙ্ক এলো
বৃদ্ধকালে শমন এলো,
যম দূতের হলাম অধিকারী।
আমি বসত করি দিবারাতি,
ষোলজন বোম্বেটের সাথে,
তারা যেতে দেয় না সরল পথে,
কাজে কাজে করে দাগাদাগি।
যে আশাতে ভবে আসা
আশায় পেলো ভগ্ন দশা
ভেবে ভোলানাথ চলে উজন খেতে
ভেটিয়ে পালা তরি। —ঐ

৭২

গুরু গো, আমার পূর্বের কথা মনে নাই,
জানতে এলাম তাই।
পূর্বের কথা মনে হলে ভাসি দু নয়নের জলে,
আর কি আছে কপালে দিবানিশি ভাবি তাই॥
নাক থাকতে নিশ্বাস বন্ধ, মুখ থাকতে বাক্য বন্ধ
(ও গৌর) চোক থাকতে হলেম অন্ধ
মনে মনে ভাবি তাই॥ —ঐ

৭৩

ও ভাবি, মাঝিরে, ভবপারের খেয়ার কড়ি বাঁচাও ;
শুনলেম তোমরা দু ভাই বড় দয়াল
কাঙ্গাল গরীবে লয়ে যাও॥
আমার সমান কাঙ্গাল নাই ভবে,
আমার প্রতি গৌর নিতাই দয়া কি হবে,
আমার নাইক পয়সা তোমার ভরসা
আমার যা আছে সকলি নাও॥

ক্রমে বাউল সম্প্রদায় চৈতন্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইবার ফলে চৈতন্যদেবকে আদর্শ বাউল রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তখন হইতে প্রত্যেক বাউল গানেই সাঁই বা স্বামিন্-এর পরিবর্তে চৈতন্যদেবকেই লক্ষ্য করিয়া গান রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে নিতাইর নামও বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। নিত্যানন্দ অবধূতও বাউল বলিয়াই গৃহীত হইয়াছিলেন।

৭৪

বল, রসনা, তোর বাসনা কি আছে আর।
মজাবি কি আমায় ওরে, হয়ে আমার ॥
ঘুরে ঘুরে ভূমণ্ডল, তোরে যোগাই নিত্য মধুর ফল
তাই কিরে এই প্রতিফল, দেও অনিবার ॥
কৃষ্ণ নাম বলি বলে, তোরে তুষ্ট করি মিষ্ট ফলে
তাই কিরে আমার ফেলাস চোখের জলে ॥
(এখন) পুষ্ট হয়ে দুষ্ট হলে, ও দুরাচার
কাঙ্গালের এই মিনতি রসনা কর না গতি
বলা কৃষ্ণ দিবারাতি কর্ণে আমার ॥ —ঐ

৭৫

ও আমায় পাগল মন হয়েছে বেশ বেহুঁস।
ছাড় সব কুটি নাটি মালা মাটি হও রূপ চাঁদ যেমন।
চক্রাকারে বলদের প্রায়, ও মন, চক্ষে ঠুল দিবানিশি,
পাক মেরে বেড়াও কেবল ঘাড় ঘুরাও
আর শিং নেড়ে কর ফুস ফুস।
ও খানায় পড়ে দাড়ি নেড়ে খাও খোল মাখা
বিচালি হয়ে সব তাতে বেহুঁস ॥ —ঐ

৭৬

তীর্থ যাত্রা করবি যদি, মন,
(ওরে) নিতাই চরণ লওরে শরণ ;
অন্যে নাই তোর প্রয়োজন।

বৈষ্ণবেরি পদরজ পাথেয় কর আয়োজন
সে যে অল্পভারি, বলিহারি,
গয়া গঙ্গা বারাণসী মিলবে ঘরে বৃন্দাবন
ও তোর ঘুচবে জ্বালা,
চিকন কালার পাবি শ্রীরূপ দরশন।
কাঙ্গাল গৌর দাস বলে ঘরে বসে মিলবে ধন
এদিক ওদিক সেদিক করে
বল না কি তোর প্রয়োজন॥ —ঐ

বাউল গানে বহির্মুখী হিন্দু কিংবা মুসলমান ধর্মের আচারকে স্বীকার করা হয় না। সেই সূত্রে একদিন ইহার মধ্যে নিজস্ব কোন আচারও ছিল না। গানটির মধ্য দিয়া এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাধক কবি রামপ্রসাদও এই সর্ব সংস্কার মুক্তির জয়গান গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'কাজ কি আমার গিয়ে কাশী, ঘরে বসেই পাব আমি গঙ্গা বারাণসী।'

৭৭

ও মন-মাঝিরে, তুই আমারে ভবপারে নিয়ে চল।
ভবের দেখি রঙ্গ কাঁপে অঙ্গ
আমি হারিয়েছি সব বুদ্ধিবল।
সেই হয় জীর্ণ তরী প্রায়, বারি চারিদিকে চুয়ায়
বন্ধ হয় না, জল থামে না, গাব দিলে তার গায়।
বারি কানায় কানায় ছাপিয়ে ওঠে,
ও যেন নেমেছে পাহাড়ে জল॥ —ঐ

৭৮

নামালি তুই নোনা গাঙ্গে সোনার বজরা খান।
তরী জীর্ণ হবে কে সামলাবে আসবে যে দিন হড়কা বান॥
এখনই তাই বলছি কথা শোন,
ভাটায় হতে ঘুরিয়ে নৌকা ধর না রে উজান॥
সাধের তরী যাবে রে মারা,
মহাজনের পুঁজি এনে তুই ডুবালি ভারা,

তোর লাভের গুড় পিঁপড়েই খাবে
দেনার দায়ে বাঁচবে কি প্রাণ ॥
রাধার বেপারি যদি হও,
রাধা নামে বাদাম তুলে নামের সারি গাও।
ও চাঁদ সুদিন বলে, বস গা হালে
উড়িয়ে গুরুর নাম নিশান ॥ —ঐ

বাউল গানে রাধাতত্ত্ব কালক্রমে একটি বিশেষ তত্ত্বরূপে স্থান লাভ করিয়াছিল। লৌকিক বাউল গানে সেই তত্ত্বটি সুস্পষ্ট হইতে পারে নাই, আভাস মাত্র প্রকাশ করিয়াছে। এখানেও তাহাই হইয়াছে।

৭৯

মম সমুচয় যে দিনে উদয়।
হবে গো, জননী, জানি সমুদয় ॥
এ ভব সংসার সকলি অসার।
হবে নৈরাকার জলে জলময় ॥
দিবা ভাবে রাত্র, রাত্র ভাবে দিন
জলাভাবে নষ্ট হবে সমুদ্রের মীন
আদ্যাশক্তি ভবে হবে শক্তিহীন
পশ্চিমে হবে ভানুর উদয় ॥
পবনেরই যে দিন গতিরোধ হবে
পতঙ্গেতে সেই দিন মাতঙ্গ নাশিবে
ভুজঙ্গেতে সেই দিন গরুড় দংশিবে
সিংহেরি হবে শৃগালেরই ভয় ॥
সরস্বতী যে দিন হবে বেদে অবিচার
কমলারি হবে অভক্ষ্য আহার
অনাদির হবে সেই দিন জীবন সংহার
যুধিষ্ঠির হবে পাপেরি সঞ্চয় ॥
সূর্য যে দিন হবে অসিত বরণ, ব্রহ্মার হবে অনলে মরণ,
বরুণে ত্যজিবে বরুণে জীবন
দয়াময়ী হবে পাষাণ-হৃদয় ॥

ভূমিকম্প হবে যে দিন কাশীধামে
সাধু রুষ্ট হবে রাধাকৃষ্ণ নামে,
যদি রাজা হই, হই সেই দিনে
দীনহীন দ্বিজ নরেশচন্দ্র কয় ॥ —ঐ

৮০

মরম-সখা, ও বিশাখা, থাকিতে জীবন পেলাম না রে ॥
নয়নের আড়ে যমুনার ধারে রয়েছে নাগর এলো না রে ॥
কাল আসবে বলে গিয়াছে সে চলি
গোকুল আঁধার করে সাধের বনমালী
কতকাল গেল সে কাল নাহি এলো
নয়ন গেল আসা পথ হেরে ॥
আজ কাল করে গেল কত কাল
দিন গুণে গুণে নখর হলো ক্ষীণ
পাগলিনীর প্রাণ হেরে মথুরায় পরাণ ধৈর্য নাহি ধরে ॥
আর এক কথা তোদের কাছে বলি
মরিলে এই দেহ যতনে রেখো তুলি
তামালের ডালে গোপিকা সকলে
শ্যাম তলায় রেখো বন্ধন করে ॥
গোকুল চাঁদ এলে গোকুল নগরে
যৌতুক দিও তারে এই দেহ পেড়ে
দ্বিজ গোকুলের বাসনা যত ব্রজঙ্গনা
পুড়াইও রাখাল এলে পরে ॥ —নদীয়া

সাধারণ গায়কের বাউল গান সম্পর্কে ধারণা খুবই অস্পষ্ট বলিয়া কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু গানও লৌকিক বাউল গানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহার আর একটি কারণ, কোন কোন অঞ্চলে বাউল গান ভাটিয়ালী সুরে গাওয়া হয়। সেইজন্য ভাটিয়ালী সুরে সামান্য বৈরাগ্য এবং বিরহ বিষয়ক গান গীত হইলেই তাহাকে বাউল গান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। এখানেও তাহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

৮১

মন, চল যাই ভ্রমণে কৃষ্ণ-অনুরাগের বাগানে ॥
সেথা ঠাণ্ডা হবি প্রাণ জুড়াবি আনন্দ সমীরণে ॥
সে বাগানে তিন জন মালি,
একজন উড়ে একজন খোট্টা একজন বাঙ্গালী।
বাগান চষে খোঁড়ে নাড়ে চাড়ে গাছ বাড়ে অতি যতনে ॥
সে বাগানে আছে চৌদিকে বেড়া
আসমানে ঘেরা তার মেলে না গোড়া,
সেথায় শিব ব্রহ্মা আছেন যারা প্রবেশ করে সন্ধানে ॥
সে বাগানে নিত্য ফোটে চার রকমের ফুল,
আনন্দে মন মুগ্ধ করে সৌরভে আকুল।
হলো আত্মারামের আত্মা ব্যাকুল হলো ফুলের সুঘ্রাণে ॥
সে বাগানে ধরে মেওয়া ফল,
সে ফল যে খেয়েছে সেই মজেছে হয়েছে পাগল।
যার কর্ম সফল জন্ম সফল ফলের মর্ম সেই জানে ॥
সে বাগানের আছে মধ্যে শরণি,
জল পূর্ণ রাশি শতদলে বিরাজ করে রাজহংস-হংসী
আমার কোটি জন্মের পিপাসা যায় একবিন্দু জল পানে ॥
অনন্ত তাই ভাবছে বসে অন্তরে
বাগান আছে কোটি জন্মের পথের অন্তরে।
তুই যাবি যদি সকাম নদী পার হবি তুই কেমনে ॥ —নদীয়া

৮২

চমৎকার গৌর প্রেমের সরভাজা।
খেলে পরে ক্ষুধা যাবে প্রাণ জুড়াবে বাঁকা মন হবে সোজা ॥
সে জিনিস যে খেয়েছে, মনে কি তার ময়লা আছে,
প্রেমরসে মেতে গ্যাছে নাইকো রে বৈদিক বোঝা ॥
আবার রসে মাখা মাখা তনু নয়ন দেখলে যায় বোঝা ॥
হলুইকর বলিহারী জিনিস তৈয়ারী করি
রেখেছে সব সারি সারি মণ্ডা মিঠাই খাসা গজা ॥

সুরসিক যারা কেনে তারা, ওগো, পেয়েছে রসের মজা ॥
গোঁসাই কুবিরের বাণী, ছালায় পোড়া আছে চিনি,
যাদু বিন্দু দিন রজনী বদল হয়ে বইছে বোঝা।
আবার কপাল গুণে কাল চুনো খায়,
আমার যেমন কর্ম তেমনি সাজা ॥ —ঐ

৮৩

গুরু সত্য মিথ্যা কথা নয় লঘু কে বা হয় ॥
পিতামাতা স্থূল গুরু দুজন, শিক্ষা, দীক্ষা বহু জন
অতীত পতিত সেও গুরু গুরু অগণন।
গুরু গুণতে গুণতে দিন ফুরাল ঠিক মানে না বিষম দায় ॥
জাতি কুল মান জ্ঞান আছে, গুরু জ্ঞান কই হয়েছে,
হিংসা নিন্দা তম তিনে ভুল হয়ে গ্যাছে,
সে যে বীজ ত্যেজে বীজমন্ত্র যাজন
ধ্যান করে কি পাওয়া যায় ॥
গোঁসাই গৌর কয়রে, ভাই, আমার গুরুভক্তি নাই,
শুচি আচার জানি না, ভাই, ক্ষুধা হলে খাই,
হয় না একাদশী যাই আর আসি মম দেখি অনুপায় ॥ —ঐ

৮৪

গুপ্তিপাড়া শান্তিপুর এই নামগুলি এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। রূপকের ব্যবহারই গানটিকে বাউলের লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছে।

আগে গুপ্তিপাড়া ছাড়বে, মন, তবে শান্তিপুর যাবি।
সদা আনন্দে রবি ॥
আছে শান্তিপুর নদে, কথা নয় সিদে,
তেঘরি নদীয়ার মাঝে বিষম গোল বাঁধে,
তোমায় করি বারণ, তেঘরি যেয়ো না মন,
মজা দেখাবে সে রাজার সমন
শেষ কালে কোবলাতে ভ্যেবলা হবি ॥

সেই গুপ্তিপাড়া গোপন বৃন্দাবনে চন্দ্র যেমন
গোপনে রয়েছে করে আসন
সাধকের কাছে তার সন্ধি পাবি ॥
আছে অম্বিকে কালনা চেপে ধরে তোর কল্লা
সামলাতে পারে না জীবে যাবি রে গোল্লায়
শান্তিপুর রয় বহুদূর
কালনাতে খাটবে না ফাকুর ফুকুর
কালের ঘা মেরে শেষে খাবি খাবি ॥
গোঁসাই কুবির চাঁদ রটে ঐ নদের নিকটে
স্বরূপগঞ্জে বাস করিলে সন্দ যায় মিটে,
শোন, যাদুবিন্দু, বলি, চিনিনে নদের গলি,
তবে তো শান্তিপুর যাবি চলি।
নিতান্ত হস না গোবরের ঢাবি ॥ —ঐ

৮৫

আমি আশা করে এসেছিলাম এই ভবের হাটে।
আমি পড়েছি সঙ্কটে ॥
আছে অমূল্য রতনো নিধি পাকালাম আসল চাঁদি
বিবাদী ষোলজন ঘরের ভেদী
তারা সব জোর করে নিল লুটে ॥
ছিল পিতৃদাতা ধন, আমায় করলে সচেতন
আর মদনা বেটা নাদনা মেরে করলে সব হরণ ॥
কি ক্ষণে ভবে এলাম, বোকারাম হয়ে গেলাম,
আপনা দোষে আপ্‌নি মলাম
দেখে যাই ভূত বাজার বেগাড় খেটে ॥
হলাম পুঁজিপাটায় হীন ভেবে তনু হলো ক্ষীণ
আর নব্য কড়া চুলুয় পলো উল্টে হল ঋণ।
হোল না বেচা কেনা, দেনার দায়ে প্রাণ বাঁচে না,
মহাজন প্রবোধ কথা শোনে না,
কি জানি কপালে কি ঘটে ॥

সাধুর কথা শুনলাম না, ভাল জিনিষ চিনলাম না,
কাঁসা পিতল বদল নিয়ে দিতেছি সোনা।
এই যাতুবিন্দু তুয়ে একেবারে গ্যাছে বয়ে।
বেড়ায় সে বেগারের বোঝা বয়ে
এই কথা গোঁসাই কুবির চাঁদ রটে॥ —ঐ

রূপক ব্যবহার বাউল গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যদিও উপরে উদ্ধৃত গানটি ভাবের দিক হইতে প্রকৃত বাউল গান নহে, তথাপি রূপকের ব্যবহার ইহাকে বাউলধর্মী করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বাউল গান নিজস্ব সকল বৈশিষ্ট্য হারাইয়া সাধারণ বৈষ্ণবভাব মুলক গানের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়াছিল। চৈতন্যধর্মের সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলেই ইহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

৮৬

এমন মানব তুর্লভ জনম পেয়ে
হরি না ভজিলাম, অসারে মজিলাম,
যাহা বলে এলাম ভবে গেলাম ভুলিয়ে॥
নবদ্বীপ হতে যে পুঁজি এনেছিলাম
দেবগ্রামে তোলা দিতে আসলে হারালাম।
আছে বিক্রমপুরের হাট, কি দিয়ে করি আর
দিবানিশি তাই আমি মলাম ভাবিয়ে॥
ঢাকা হতে আমি করেছিলাম আশা
ভজব হরি বলে কর খোলসা
আছে রংপুরের তামাসা, তা দেখে হলো নেশা,
সেই হতে তুর্দশায় নিল ঘিরিয়ে॥
সয়দা বাজারে সয়দা হবে কি, ছয়জনা গাঁট কাটা খেলছে ফাঁকি,
সেই ফাঁকিতে হলাম ফাঁকি
আখেরিগঞ্জের বাজার গেল রে বয়ে॥
গৌর গোঁসাই কয় শোন রে, পাপ মতি,
স্বভাবকে সলা করে ঘটেছে তুর্গতি,
শোন, রে অবোধ মন, বিনয় বচন,
স্বভাব ছেড়ে গুরুর চরণ ধর জড়ায়ে॥

৮৭

মনে করি, ওগো বৃন্দে, আমি হেরিব না তারে
কাল নয় কুৎসিত পাখী কটাক্ষেতে মনোহরে ॥
ঘুনিয়ে শ্যাম কাছে বসে অমনি চক্ষে লাগায় দিশে
আমি পড়ে যাই ফাঁসে।
সে যে কথা কয় শ্যাম হেসে হেসে,
অমনি নেয় গো মনোহরে ॥
কি করিলাম কি হইল কোথায় প্রাণবঁধু গেল
এখন উপায় কি বল।
আমার জাত কুল মান সব গেলে
থাকব না আর পাপ ঘরে। —ঐ

৮৮

দীনহীন এসেছি, দয়াল, আমি তোমার নাম শুনে।
তুমি অকূলের কুল নিধনের ধন জানিলাম এত দিনে ॥
পাপীকে পার করাতে, ব্রহ্মার কুমণ্ডল হতে,
সুরধনী আনলে সে নাম, নবদ্বীপ হতে, সুরধনী বেদমোহিনী
হরি—হরি সংকীর্তনে ॥
তোমায় কে চিনতে পারে এই ভব-সংসারে।
তরাও তরী নাম রেখেছ, জগত জুড়ে তুমি দাও হে হরি,
চরণ-তরী, তোমার নাম রবে ত্রিভুবনে ॥
জগাই মাধাই পাপী যে ছিল, প্রভুর নামে তরিল,
আমি হলাম মহাপাপী—উপায় কি বল,
গগন নিজে অন্ধ ভগবান চন্দ্র, অন্ধ ঘুচাও নয়নে ॥ —নদীয়া

৮৯

আমি কার জন্যে করিব ভজন আমার ঠিক হল না নিরূপণ ॥
যা করাও তাই করছি আমি, যা বলাও তাই বলছি আমি,
তুমি আপন কর্ম আপনি করাও, কর্ম জয় হোক ফল রোপণ ॥
সৃজন করিলে তুমি, ওহে পালন করিলে তুমি,
সংসার করিলে তুমি, তোমার নাম হরণ-পূরণ ॥

শুনি শিশু বিন্দুর বাণী, তোমার সিন্ধুর মধ্যে ছিলাম আমি।
তোমার বিন্দুতে সৃজন আমি, তোমার নাম হরণ-পুরণ ॥ —ঐ

৯০

আমায় দয়া করগো, দয়াল চাঁদগো, সাঁই।
আমি এই দরখাস্ত দিয়ে যাই ॥
চোদ্দ পোয়া জমি খানি, নলেতে নাই বেশি কমি,
ভূঁইকম্পতে দিল ভাঙ্গি, এই অধীনের আশা নাই ॥
পতিত পাবন নাম ধরেছ, তুমি জিবে কি আহদান দিয়েছ,
যেমন অগ্নি হতে প্রহ্লাদ বাঁচলো, এই অধীনের আশা নাই ॥
বিলাত গিয়ে করবো আপীল, দয়াল, তুমি হও হাইকোর্টের উকিল,
আমি জেলখানায় বসিয়ে কাঁদি, আমি আপীলে যেন খালাস পাই ॥
গোপাল চাঁদ দরবেশে বলে, দয়াল, তোমার কিঞ্চিৎ কৃপা হলে,
আমার মনের ধাঁধাঁ দূরে যায়, ওগো আমারে ফেল না তাই ॥ —ঐ

৯১

মন, আমার অহর্নিশি চায় যাহারে,
বলগো আমায় খুলে কোন সাধনে পাব তারে ॥
দান প্রস্তর যোগ্য যত, তাহাতে, সাঁই, হয় না রত,
শুনি সাধুর শাস্ত্রে কয় সুসত্য, আমি কোনটা জানি সত্য করে ॥
পঞ্চ প্রকার মুক্তি বিধি, অষ্টাদশ প্রকারে সিদ্ধি,
যে সকল হয় এ ভক্তি, কেন ঠিক না আনে সাঁইজি মোরে ॥
ঠিক পড়ে না প্রবৃত্তি ঘর, সাধন সিদ্ধ হয় কি প্রকার,
সিরাজ বলে লালনরে তাই, তোর নজর রয় না কলির ঘোরে ॥

এখানে লালন ফকিরের গুরু সিরাজে সাঁইর নাম শুনিতে পাওয়া গেলেও পদটি সিরাজ সাঁই রচিত বলিয়া মনে করা ভুল হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, রচনার মূল্য বাড়াইবার জন্য অজ্ঞাতনামা বহু সাধক কবি তাঁহাদের রচিত পদের মধ্যে সুপরিচিত বাউল সাধকদিগের নাম যোগ করিয়া থাকে। সেই সূত্রে সিরাজ সাঁইর নাম এখানে আসিয়াছে। কিংবা অনেক সময় কোন কোন প্রসিদ্ধ বাউল সাধকের রচিত পদও নিরক্ষর সমাজের মুখে গীত হইয়া বিকৃত এবং পরিবর্তিত হইতে পারে।

৭২

আমি কি অপরাধ করেছি, সাঁই, তোমারি দরবারে।
আমায় হাল ছেড়ে বেহাল পথের কাঙ্গাল করিলে একবারে॥
আমি যদি পাপ না করি, কে ডাকিবে তোরে,
নিরোগীরে বৈদ্য বড়ী খাওয়াইতে নারে॥
তেলা মাথায় ঢালছো গো তেল, জটে উখু ধরে,
তোমার অধীন ভক্ত ডাকছে মোদাম, চাইলে না গো ফিরে॥
অধীন পঞ্চু ভেবে বলে, আমি দাঁড়াই সাধুর দ্বারে,
বাউল চাঁদ মোর দয়ার সাগর, লও গো আমায় ধরে॥

৭৩

যে ভাবেতে রাখেন গো, সাঁই, আমি সেই ভাবে থাকি।
অধিক আর বলব কি॥
কখনও দুগ্ধ চিনি, ক্ষীর ছানা মাখন ননী,
কখনও নুন আমানী, কখনও আলবুলো শাক ভুকি॥
কুল আলম তোমারি ওহে কুদরুত নিহারী,
তুমি কালী, তুমি কৃষ্ণ, তুমি হক বারী,
তুমি দাও, তুমি দেলাও, তুমি খাও তুমি খেলাও,
তৈয়ারী ঘর ছেড়ে তুমি পালাও, আমারে ঘুরাচ্ছ দিয়ে ফাঁকি॥
তুমি সর্ব ঘটে রও, তুমি সর্ব রূপ হও,
ভাল কথা মন্দ কথা, সকল তুমি কও।
তুমি হও রোগীর ব্যাধি, তুমি বৈদ্যের ওষধী
তুমি গো সকল জীবের বল বুদ্ধি, তোমার ভাব বুঝা বাঁকা ঠক ঠকী।
ভবে দুঃখ দিতে তুমি, ভবে সুখ দিতে তুমি,
মান অপমান তোমার হাতে, সুনাম বদনামী।
কয়ছে বিন্দু যাদু, দয়াল, তুমি চোর তুমি সাধু,
দয়াল গো, তুমি মুসলমান হিন্দু, আমি সে কুবির চাঁদ বলে ডাকি॥

—ঐ

'তৈয়ারী ঘর ছেড়ে তুমি পালাও' হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে এখানে আত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া গানটি রচিত হইয়াছে। তৈয়ারী ঘর শব্দের

অর্থ দেহ। আত্মা যে সর্ব কর্মের নায়ক, জীবনের সকল শুভাশুভ কর্মের কারক, তাহা এখানে প্রকাশ করা হইয়াছে।

৯৪

তুমি হে জগতেরি সার, তোমা বিনে ত্রিজগতে
সকল দেখি আমি এই অন্ধকার ॥
তুমি আত্মা, তুমি কর্তা, তুমি হে জগতের পিতা,
তোমা বিনে নাই ক্ষমতা, এই অধীনে দিওগো নিস্তার ॥
তুমি তো সাধনের গোড়া, করো না আর নড়া চড়া,
দিও আমায় চরণ জোড়া, যাহাতে পাই গো উদ্ধার ॥
তুমি হে জগতের গতি, তোমা বিনে নাইক গতি,
দিও আমায় রতি মতি, গতি হয় সে পথের উপর ॥
উসমান বলে ভবে এসে, পড়লাম তুনের মায়ার ফাঁসে,—
মহাম্মদির হয় না গতি, কিসে পাব নিস্তার ॥ —ঐ

এখানেও আত্মার শক্তির কথা আছে।

৯৫

চরণ দিতে হে মনে ভয় করো না,
এই করো হে নিদানকালে যেন আমারে ফেলো না ॥
আমি শুনেছি রাম অবতারে, তুমি যেতে মুনির সে রূপ ধরে,
কাষ্ঠতরী করেছ সোনা ॥
অহল্যারে সদয় হয়ে, মানব কল্লে চরণ দিয়ে,
তাহার পাপ নিরখিয়ে করেছ মার্জনা ॥
তুমি প্রহলাদেরি দিয়ে চরণ, রক্ষা করেছিলে জীবন,
ত্রি-জগতে নামেরি ঘোষণা।
তুমি দয়াল দীনবন্ধু, পার কর ভবসিন্ধু ;
দিওহে চরণবিন্দু, পুরাও গো বাসনা ॥
তুমি জগাই মাধাই উদ্ধারিয়ে, তাদের রেখেছ ভক্তির আশ্রয়ে,
মূর্খ পাপীকে কর না ঘৃণা।
দীনহীন কুবিরে বলে, আমায় চরণ দিও অন্তিম কালে,
ছুঁতে পারবে না শমনে, দেখে সেই নিশানা ॥ —ঐ

৯৬

আমি গৌর লীলার বাজারে অবাক যাই হেরে
ছুঁচের ছিদ্র মহাযন্ত্র পার করে গজবরে
একটি সাদনার গাছেতে দুটো আম ধরে আছে,
আমের ভিতর জামের চারা জন্ম ধরে তাথে।
তা দেখে এক মরা হাঁসে হা গোবিন্দ রব করে।
একটি সাপে নেউলে আর ইঁদুর বিড়ালে,
চার জনে বসতি করে একই মিশালে,
তার নীচে এক মায়া নদী হেম নদীতে প্রেম ঝরে।—মুশিদাবাদ

ইহাকে উল্টা বাউলও বলা যাইতে পাছে। পরের গানটিও তাহাই।

৯৭

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কি।
ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম তাঁরে তোমরা বল কি।
ঘর আছে তার দুয়ার নাই মানুষ আছে বাক্য নাই।
কে তাহাদের আহার দেয় কেবা দেয় সন্ধ্যা বাতি।
ছ মাসে হয় জীবের স্থিতি ন মাসে হয় গর্ভবতী।
হয় এগারো মাসে তিনটি সন্তান কোনটি করবে ফকিরি।
বত্রিশ বাহু ষোল মাথা গর্ভে ছেলে কয়গো কথা।
কে বা তাহার মাতাপিতা এই কথাটি জিজ্ঞাসি।
বলে মদন সা ফকিরে মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে।
এই চার কথার অর্থ বললে তারই হবে ফকিরি॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি গানের মধ্যে বাউল সাধনায় মনের উপর যে কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মানুষের মনই সাধনার প্রধান অবলম্বন, মনের মধ্যেই সাধনা। মনই সাধ্য এবং মনই সাধন। মনের মধ্য হইতে সমস্ত ক্লেদ দূর করিয়া দিতে পারিলেই তাহাতে সাধন-তত্ত্ব সহজে প্রতিভাত হয়, সাধন সত্য লাভ করা সম্ভব হয়। সেইজন্য মনকে সকল ক্লেদমুক্ত করা বাউল সাধনার মূল কথা। দেহকে নানা অসত্য আশ্রয় করে, কিন্তু মন যদি সজাগ থাকে, তবে তাহা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। এই বিষয়ক বিশেষ এক শ্রেণীর গানকে মন শিক্ষার গান (পরে দেখ) বলে।

৯৮

মন, যদি তুই মানুষ হবি মন ভাল কর আগে।
তোর সুখদুঃখ ভালমন্দ ঘটে কর্মযোগে।
ইহকালে সুখের লেগেরে তুই পরকাল হারালি,
আর আপ্ত সুখে মত্ত হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলি।
তোর একুল গেল সেকুল গেল তোরে ঘিরল নানা রোগে।
গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণব এসে রে মন্ত্র দিল তোরে।
আর পাপতাপ জন্ম মরণ গেল বারণ করে।
তোর গুরুতে নাই নিষ্ঠারতি সেই অপরাধের যোগে।
রাধারাণী প্রেমের গুরু রে প্রেম বিস্তারিয়া,
এ দেহ নবদ্বীপ কইল নবদ্বীপ দেখাইয়া।
আবার কালী এসে কাল হারালো
এমন শুভযোগে। —মুর্শিদাবাদ

৯৯

গুরু, আমায় উপায় বল না,
ভবে জনমদুখী কপালপোড়া আমি একজনা।
আমার দুখে দুখে জনম গেল
দুখ বিনা সুখ হল না।
শিশুকালে মারা গেছে মা,
গর্ভ রেখে মল পিতা,
তাদের সঙ্গে দেখা হল না।
আমার কে করিবে লালন পালন কেবা দিবে সান্ত্বনা।
এসে গুরু ভবের বাজারে,
ছ জন চোরে করলে চুরি বাঁধিলে আমারে।
তারা চুরি করে খালাস পেলে
আমায় দিলে জেলখানা।
দীন শরৎ কয় অনাচারে
এসে, গুরু, ভবের বাজারে আমি সদাই মরি ঘুরে ঘুরে,
ঘোর তুফান তো গেল না। —মুর্শিদাবাদ

১০০

মনের কথা বল খুলে মনেরি মতন।
দেহতত্ত্ব কথা শুনে জুড়াল জীবন ॥
মথনে ননী উঠিল, তার মথনদণ্ড কেবা হোল।
কোন ডুরিতে কোরেছিল বল্ না মন্থন ॥
যখন ছিলি পিতার শিরে।
পরে এলি মার উদরে।
কেবা ছিল, মাতার শিরে
বল্ না এখন ॥
দেহের গঠন কেবা করে,
থাকে সে কোন পদ্ম পরে,
ভেঙ্গে বল, ভাই, আমারে
জিজ্ঞাসি কারণ ॥ —মুর্শিদাবাদ

১০১

মন, মিছে ভাব না, তুমি আপ্নার দেহের ঠিক জান না ॥
প্রেমরতি তোর হবে কিসে ওরে জীবরতি তোর ষোল আনা ॥
সাধু সঙ্গ উয়ের মাদা, হয় মাদা নয় জন্ম কাঁদা ;
এ বড় দায়. যেমন ফণীর মুখে, বর্ষে মণি সাধু হোই দিলে না,—
ধরলে ফনা ॥
হরিবলে পদ্মলোচন, কাটলে গাছ ফেললে মরণ ;
কে বাঁচায় এখন।
যেমন ছড়ালে বীজ গাছ উপজে,
ঐ দেখ, রবির তাতে ধান সেজে না ॥ —ঐ

১০২

ও মন পাগলারে, তোর দেহের মধ্যে কত রং দেখবে চেয়ে।
এই যে দেহেতে আছে তারা পঞ্চ ভাই (আছে তারা পঞ্চ ভাই)
ওরা হিন্দু কিংবা মুসলমান পরিচয় ও নাই।
এই যে দেহেতে আছে নব নব নারী (আছে নব নব নারী)
দিন থাকিতে চিনে লও, মন, কার কোন বাড়ী।

এই যে দেহেতে আছে গয়া গঙ্গা কাশী (আছে গয়া গঙ্গা কাশী)
বৃন্দাবনে কানাইয়া রাজার মোহন বাঁশী। —ঐ

১০৩

মন-মাঝি, তোর ভাঙ্গা তরী বাইয়া যাও কোন দেশে,
ঝুমকা হাওয়ায় লাগুড় পাইলে গো অ তোর তরী ডুবে যাবে।
যেবা দেশে যাওরে, মাঝি, সেবা দেশে যাবে,
অ তোর মানব তরী বোঝাই ভারি রে সাবধানে চালাই ও রে......
তরী করে টলমল (৩ বার) বাইন চুখাইয়া উঠে জল রে,
গুরুর নাম স্মরণ রেখো, নইলে তরী ডুবে যাবে॥ —মুর্শিদাবাদ

১০৪

চেতন মানুষের সঙ্গ না নিলে।
শুধু কথায় অন্ত কি মিলে॥
নৈরাকারে সাঁই ভাসে একেলা,
ওরে সাধ কৈরে করেছেন পয়দা
নবী আদম ছকি ভেদ্ কেবা জানে
তারা সৃষ্টি করে তিনজনে॥
চেতন মানুষ ধর্‌লে পরে অন্ত সহজে মিলে।
শুধু কথায় অন্ত কি মিলে॥ —রাজসাহী

১০৫

বাউল সাধনায় যে কোন জাতির বিচার নাই—সাঁই বা স্বামিনের চক্ষে হিন্দু এবং মুসলমান যে এক—বাউল সাধনার এই মর্মকথাটি এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। কবীরের নাম উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায়, মধ্যযুগের সাধক কবীরের ধর্মীয় আদর্শ দ্বারাও বাউল সমাজ প্রভাবিত হইয়াছিল। কবীরের নাম এবং তাহার সাধনার কথা এ দেশের সাধারণ লোকের সমাজেও অপরিচিত ছিল না।

ভক্তের প্রেমে, ওগো, বাঁধা আছে সাঁই
হিন্দু কি মুসলমান বল্যা
তার জাতের বিচার নাই।

ভক্ত ছিল কবীর জোলা ও যে পাইয়াছে ব্রজের কালা
ও তার সাধন জোরে পায়।
দেশে রামদাস মুচি ছিল সাধনে তার বুদ্ধি সিদ্ধি হৈল
ও আমি শুনি গুরুর ঠাঁই ॥ —ঐ

১০৬

আলেক দুনিয়ার বীজে আলেক সাঁই বিরাজে
আলেক খবর নেয় আলেকে কয় কথা।
আলেক গাছে ফুল ফুটেছে যার সৌরভে জগৎ মেতেছে।
আলেক হয় গাছের গোড়া ডাল ছাড়া গাছে তার পাতা।
আলেক মানুষের রসে সনাতন সদা ভাসে।
সাঁই তোর লাগল দিশা যাইতে নারবি সেথা।
তুমি সদা বেড়াও রিপুর ঘোরে, মানুষ চিন্‌বি কেমন কৈরে।
যেদিন ধর্‌বে তোরে মুগুর দিয়ে ছিঁচ্‌বে মাথা ॥ —ঐ

১০৭

সহজ মানুষ আলেক লতা।
আলেকে বিরাজ করে, বাইরে খুঁজ্‌লে পাবি কোথা ॥
আলেকের প্রেমের কোলে।
পেতেছে বাঁকা নলে ত্রিবেণীর জল উজান চালে বহিছে সর্বদা ॥
আপনি চলে নলের পথে, সে নল নারে চিন্তে।
জগতে করে চিন্তা চিন্তামণি চিন্তাদাতা ॥ —ঐ

১০৮

নিম্নোদ্ধৃত গানটি উল্টা বাউল (পূর্বে দেখ)—

আজব সাঁই দরবেশের কথা বল্‌ব কারে
কথার মধ্যে ব্যথা ব্যাঙ্‌এ ছিনা খায়।
মায়ের বিয়া না হৈতে তার ঝি
বন্যা আইল ধান শুকাইল ভাগ্‌না ভাসিল স্রোতে।
গঙ্গা মৈল জল পিপাসায় ব্রহ্মা মৈল শীতে ॥
রাজার বাড়ী চুরি রে, ভাই, পুকুর পাড়ে সিঁধ্‌।
গাছের উপর বিছানা কেঁথা জলে পাড়ে নিন্দ ॥

আকচা দেখলাম বর্ষা দেখলাম দেখলাম তিরূপিনীর ঘাটে
মরা মান্‌সা আহার করে জিন্দা মানবের পেটে ॥
ফাল থাক্‌ল কামারের বাড়ী বলদ থাক্‌ল গাভীর পেটে।
কিরৃষাণের জনম না হৈতে তার পাস্তা গেল মাঠে ॥ —ঐ

১০৭

নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচনায় পাঁচালীর লক্ষণাক্রান্ত—

এ করম ক্ষেত্রে জনম লভিয়া।
কর্মস্রোতে আমি যাই রে ভাসিয়া ॥
অবিদ্যা কুহকে মহা ঘূর্ণীপাকে।
ভেসে ভেসে, হায়. পড়েছি বিপাকে ॥
কাল সিন্ধু জল বহিছে নিয়ত
তাহে ডুবি ভাসি উঠি অবিরত
ক্ষয়স্রোত মাঝে বুদ্বুদের মত।
জনম মরণ লভি শত শত ॥
পেয়েছি যে কর কর রে ধারণ
বদ্ধপরিকরে শ্রীগুরু চরণ ॥
পেয়েছি রে নাসা ওরে কর্মনাশা
অজপা নামের করবে ভরসা
মূলাধারে আছে কুল কুণ্ডলিনী
সহস্র ধারে আছে হংস-স্বরূপিনী ॥
কমলে কমলা বড় পদ্মমালা।
ভক্তহৃদে থাকে আনন্দে বিহ্বলা ॥
সাধুগণ গণে শক্তি-আহ্লাদিনী।
নির্বাণের পথে চৈতন্য-রূপিণী ॥
অমৃতের ধারা অমৃতদায়িনী।
পাষণ্ডের হৃদে নিদ্রিত নাগিনী ॥
রবি শশীতারা সব ঘুচে যাবে।
মহাশূণ্য মাঝে সকলি মিশাবে ॥
একা গুরু রবে আবার খুঁজিবে।

আদি অন্ত গত সমস্ত গঠিবে ॥
কৃষ্ণানন্দ কাঁদি হয়েছে আকুল।
কৃপা কুণ্ডলিনী তারে দিও কুল ॥ —ঐ

বাউল সাধনার সঙ্গে যোগ-সাধনাও যে একাকার হইয়া গিয়াছিল, এই গানটি তাহার প্রমাণ।

১১০

থানায় বৈসে খবর নেয় যেমন তারে।
অমনি বাঁকা নলে খবর বৈসে স্বরূপ দ্বারে ॥
স্বরূপ বিনা শ্রীরূপ দ্বারে সাধ্য কি রে যাইতে পারে।
নতুবা পড়বি ফেরে ভবনদীর ধারে ॥
প্রাগুপ্ত সাধন সিদ্ধি তিনটি রাস্তা চিনে খবর লও হে রাত্রিদিন।
প্রাগুপ্তেতে হয় রে গঠন।
সাধনে হয় ভাব নিরূপণ।
সিদ্ধি সে রাগের কারণ ॥ —ঐ

১১১

কোথায় রৈলেন, হে ওগো, দীন দরদী নাম।
আমি কোরাণে পুরাণে শুনি তুমি সর্ব গুণের ধাম ॥
ওগো, দীন দরদী নাম ॥
তুমি যাঁরে দয়া কর, সাঁই।
সঙ্কট উদ্ধার করে, দয়াল, তোমার নাম।
তুমি সকলকে তরাতে পার
কেন মোদের প্রতি হৈলেন বাম ॥ —ঐ

১১২

হৈল বিষম রাগের কারণ করা,
জেনে যোগমাহাত্ম্য রূপের তত্ত্ব
জানে কেবল রসিক যারা ॥
ফণী মুখে হস্ত দিয়ে, বৈসে আছ নির্ভয় হৈয়ে,
করি অমৃত পান গরল খেয়ে হৈয়ে আছ জীবন্তে মরা।
রূপেতে রূপ নেহার করি আছে রাগ দর্পণ ধরি।

হুতাশনকে শীতল করি অনলে রেখেছে পারা ॥
ও যে বাউল বলে, ডুবে থাক মন সিন্ধুজলে
যে জল পরশ না হৈলে শুকনায় ডুবাবি ভরা ॥ —ঐ

১১৩

আমার হৃদিপদ্মে অনাহতে অজপার প্রতিঘাতে
সে নামধ্বনি হয় দিন রাতে থাকি যেখানে যে প্রকারে।
তোমার নামেতে মাতিয়ে ঘুরে বেড়াই পাগল হৈয়ে
তেজময় রূপ ভাবিয়ে ডুবে থাকি আনন্দনীরে।
নামের প্রেমে যে পাগল হয়, তার থাকে না কোন ভয়
সে কালের হাতে তৈরে যায় তোমার নিত্য শান্তিময়পুরে।
সাধন-ভজন বিহীনে, নামে পাগল হয় কেমনে,
বাউল কাঁদে নিশিদিনে গুরু ডুবাইও না ও ভব সায়রে ॥ —ঐ

১১৪

ভালমন্দ নাই তার জ্ঞান বিষামৃতে সব সমান,
আপন গলায় লাগায় কৃপাণ এমন পাগল নাই বিশ্বভরে।
ধরিতে গেলে দেয় না ধরা অম্‌নি উর্ধ্বে দেয় উড়া,
কখন পাখী কখন ঘোড়া নিমেষে ব্রহ্মাণ্ড ফিরে ॥
কখন চোর কখন সাধু, কামিনী কাঞ্চন মধু,
পিয়ে মত্ত আছে শুধু খাট-পালঙ্কে ঘুমের ঘোরে ॥
ক্ষেপার সনে পাড়ি এবার, বোঝাই তরী ডুবে আমার,
বাউল বলে সামাল এবার গুরুর চরণ হাইল ধরে ॥ —ঐ

১১৫

মিছা দ্বন্দ্ব বাজে গো সাঁইজী—কার ভাবে বান্ধিয়াছ ঘর।
শিশুকাল গেল হাসিতে খেলিতে যৌবনকাল গেল রঙ্গে ॥
বৃদ্ধকাল সাম্‌নে আইল গুরু ভজ্‌বি কতদিনে।
হাড়ের ঘরখানি চামড়ার ছাওনি ছন্দোবদ্ধ জোড়া।
ঘরের মাঝে মোহন মুরারি কোন্‌দিন ছাড়িবে খেলা ॥ —ঐ

১১৬

চার পাখীর ওপরে এক পাখী বেড়ায়
সেই পাখীটা চুমুক মেলে চার পাখী উড়ে পালায় ॥
পাখী আচম্বিতে জোরের সাথে মানুষকে ধরে কষে,
বলবুদ্ধি কোনই সিদ্ধি থাকে না কোনই দিশে।
আর কি কব সে পাখীর কথা চোখ মুখ নাই কয় না কথা,
আচম্বিতে করে যাতা আতা মানে না আল্লার দোহাই ॥
পাখী আসমানে নাই জমিনে নাই নাইকো পাখী নীচেতে
সাগরে নাই পাহাড়ে নাই পাখী আছে নিজের মনেতে।
আর কি কব সে পাখীর কথা মানুষের ঐ মস্তকে চেপে
মানুষের ঐ মগজ খায় ॥ —কান্দি (মুর্শিদাবাদ)

বাউলিয়া মতে চার পাখী বলিতে—বায়ু, জল, মাটী, আগুন ইত্যাদি বোঝায়। এই চারটি পদার্থের দ্বারা মানুষের শরীর তৈরী। আর 'এক পাখী' বলিতে—আজরাইল (যমদূত)কে বুঝাইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী অঞ্চলে যে সমস্ত গৃহী বাউল ফকির সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এখনও টিকিয়া আছে, তাহাদের ভিতর নিজস্ব বাউল গান নাই—তাহা ইহারা স্বীকার করে। পূর্ববর্তী কোন অজানা বাউল ফকিরের গান অনেকে নিজের বলিয়া চালাইয়াও দেয়। —ঐ

১১৭

মন, যদি রূপনগরে যাবি অনুরাগের ঘরে মার গা চাবি।
সেই শহরে কেউ কেউ গিয়েছে, নানা রত্ন পেয়েছে,
কাহারও রফায় দফা হয়ে হেরেছে মালের ঘরের চাবি ॥
আবার উলোর বনে 'ভুলো' লেগে খুঁজলে কি তাই পাবি ॥
শোন রে ও, মন, তোরে বলি, তুই আমারে ডুবাইলি,
পরের ধনে লোভ করিলি এ ধন রে তুই ক'দিন খাবি ॥ —ঐ

১১৮

নিম্নোদ্ধৃত গানটিও উল্টা বাউল (পূর্বে দেখ)—

গুরু রেখেছে শূন্যভরে আজব এক মহল বানিয়েছে।
দরিয়ারই মাঝেরে ভাই সর্প ভাসিছে।

সর্পের উপর হাঁসের বয়জা হরিণ চরতেছে ॥
মাকড়সারই জালেরে ভাই হস্তী আট্‌কেছে।
আর লোহার পিঞ্জির কেটে ভাইরে মশা পালিয়েছে ॥ —ঐ

১১৯

কামরূপের ঘাটে তুমি যেওনা রে মন, আমার,
বগ চরে নীচে পানি নৈরাকার ॥
সেই যে কামরূপের ঘাটে জোয়ার এলে হয় সাঁতার,
ও তার প্রেম পাহাড়ে ধাক্কা লেগে মণিপুর পাথর চুঁয়ায়,
কত সাধু বহে যায়, ডুবে তারা খাপি খায়,
হাওয়াতে চালাছে তরী ধাক্‌কা লাগে মালের ঘর ॥
সেই যে কামরূপের ঘাটে বসতি ষোলজনা
ছ'জনা তারা দাঁড়িমাঝি দশজনা তার গুণ টানা।
আসা যাওয়া হচ্ছে যাতে, ভজন সাধন হয় গো তাতে,
আপনার আপনি তাহার হাতে আপনা আপনি দেয় মরণ ॥ —ঐ

১২০

এ হি দুনিয়ার ভিতরে।
আল্লা আলজিহ্বায় বসে মহম্মদ কলেমার জোরে ॥
আসমান জমিন দুটো যাঁতা, এটা নয় মিথ্যা কথা,
আল্লার নাম খুঁট্যা পুঁতা দেখ বিচার করে।
উহা খুঁট্যা ছাড়া হলে পরে
ও তুই পড়বি গো ছত্রিশের ফেরে ॥ —ঐ

১২১

খামেদ কলে ফিকির করে বানাইলে এক আজব রথ,
চার চিজে তার গর্জন সেরে, ভাইরে, ওজনে ঠিক সাড়ে তিন হাত ॥
এর হাড় বিচুরে করলে গুঁড়া রথ চলে না টান দিলে।
ঠ্যাং চাইতে ধড় হয় নড়বড়ে।
দেখরে, মনঝাঁপি, খুলে মৈথুনে নীল পড়িলে
বিধাতার এমনি লীলা, ভাইরে, আছে তা সব ঘরে ঘরে। —ঐ

১২২

এই গানটির ভিতর বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে। রোজ কেয়ামৎ অর্থাৎ পৃথিবীর মহা প্রলয়ের দিনের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

আত্ম তত্ত্ব জানরে, মন, কর নিরূপণ ॥
তুমি শিকা খুঁজ ফেল বিচে এক ঠোঁট আল্লার আরশে
এক ঠোঁট পাতালের নীচে কর নিরূপণ ॥
স্বরূপ নেজা ভরে দাঁড়াবে
বার মুখে জোর দিবে খাকি পুড়ে তামা হবে।
সে তাতে আহার উড়ে পাহাড় পুড়ে
উড়িবে শিমুলের তুলোর মতন ॥ —ঐ

১২৩

আজব সহর নহর বানাইলে কোন জন
হায় হায় আজব শহর।
সেই শহরে খোদাতালা সেই শহরকে দেখলি না।
ও তার কমিন দিয়ে চোর সাঁধায়ে
সেই সহরে দেয় হানা।
চোরে নিলে রত্নধন, কেউ ছিলি না সচেতন,
ও তার কমিন দিয়ে লয়ে গেল বস্তু ধন ॥
সেই শহরে রথ চালাছে দুজনা তার সারথি,
দুজনা তার সহকারী দুই ধারে জ্বালায় বাতি।
সেই শহরে আতাই নদী দুই ধারে দুই তিরপিনী
মধ্যে আছে গৌরাণী।
তলায় পড়ে খাচ্ছে খাবি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—এই তিন জন ॥ —ঐ

১২৪

কেন আমি ঘুমাইল্যাম ঘুমে অতি ভোলারে
চোরে চুরি করে লিলে গলার মতিমালারে ॥
সকল পুঁজি হারাইল্যাম খালি বাক্স পড়ে রইলো।
তালা ভাঙ্গা চাবিরে ॥ —ঐ

১২৫

ধরগা চেতন মুর্শিদ ঘুম্যাসনা, ও মন
ও তুই ঘুমের ঘোরে পড়বি ফেরে সকল যাবে অকারণ ॥
আমলনামা দিবে হাতে তুলাইবে কেয়ামতে
কি জবাব দিবি তখন ॥
তাহ'তে বলি ও, খেপার মন, দিনেতে হও পাঁচবার চেতন
তবেই পাবি অমূল্য ধন পাবিরে তুই 'উপারজন' ॥
তাইতে বলি, ও খেপার মন, বছরে হও দুবার চেতন,
তবেই পাবি অমূল্যধন পাবিরে তুই গুরুর বচন ॥
আর 'নাফ্‌সী' 'নাফসী' ফুকারিবে,
হায় নসিবে কিবা হবে মুসরাদি কয় বচন ॥ —ঐ

১২৬

ডরাও হে খোদাকে বান্দা ঘুনাহ্‌ কর না,
যদি করে থাক ঘুনাহ তোবা কর দিবে পানাহ
জীয়ন্তেতে কর তোবা ম'লে হবে না ॥
আগুনেরও পাহাড় হবে বেনামাজীর শেরে দিবে
ও তারা পাবে কিছু ঠিকানা ॥
আগুনেরও চাদর ধুতি আগুনেরই মাথার টুপি
আগুন হবে বিছানা ॥ —ঐ

এই গানটি ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী রচিত। ইহার শব্দগুলির অর্থ এই প্রকার : পাণাহ—মাফ্‌; ঘুণাহ—পাপ; তোবা—স্বীকারোক্তি (confession); নাফ্‌সী—হা প্রাণ; বেনামাজী—যে নামাজ পড়ে না, বিধর্মী।

১২৭

বাউল ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে তত্ত্ব কথা লইয়া গানের প্রতিযোগিতা হইত। এই গানটি প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সওয়াল জবাবের ভিতর দিয়া তাহারা তাহাদের নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করিত।

একবার দয়া করে ওগো, মুর্শিদ, বলে দাও মোরে ॥
কোরাণ মাঝে তিরিশ সে পারা
এর কোন কোন পাতে কয়েক সুরা বলে দাও তোমরা।

এর কোন সুরা কোন কাজে লাগে
কোন সুরাতে কি গুণ ধরে ॥
তোমরা জান যদি বল সবে মনের আঁধার যাক দূরে ॥
দেহের মধ্যে কয়টি দরিয়া
কোন দরিয়ায় কি রং পানি বল গো তোমরা,
সেই দরিয়া শুকায় গেলে বান্দার জান রবে না ধড়ে ॥
মুসারদ্দির মুখের এই বাণী, এ চার কথার মানে বলে দাও শুনি।
একটি কথা শুধাই গুরুজি—
হজরত রসুল পয়গম্বরের নানাজির নাম কি ॥ —ঐ

১২৮

ফকির চমৎকার শেখ এখনও জীবিত। সে গৃহী হইয়াও উদাসী বাউল। সংসার ধর্ম সবই পালন করে, অথচ কর্ম ব্যস্ততার ভিতর একটু অবকাশ পাইলেই দেশে দেশে গুরুর খোঁজে ছুটিয়া যায়। তাহার সঙ্গে আলাপ করিলে বোঝা যাইবে না—তাহার ভিতর একটা এমন 'খ্যাপা' আছে। ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। লেখাপড়া খুব কমই জানে।

ও মন, তুই কোন সাধনে যাবিরে
ও তোর সাহস দেখে বসে ভাবি ॥
সেই তোর তিরপিনির ঘাটে
জোয়ার আঁটা তিনটি কাটে,
ভাব জলয়ে আছে আঁটা রূপরসের কপাটে।
ও তুই পারে যেতে পারবি না, মন
বিষ খেয়ে তুই প্রাণ হারাবি ॥
বত্রিশ সুতো বলছে যাবে
তিরপিনির ঢেউ লাগলো ধারে,
সেই জোয়ারে মানুষ এসে এখন ফিরছে দ্বারে দ্বারে।
কত সাধু মাহান্ত গিয়াছে চলিয়া
ভাঁওতায় পড়ে খাচ্ছে খাবি ॥
দুই ধারে দুই বিষের নদী, বহে যাচ্ছে নিরবধি,
মধ্যে অমূল্য ধন সাধতে পার যদি,

ও তুই পারে যেতে পারবি না মন
বিষ খেয়ে তুই প্রাণ হারাবি ॥ —ঐ

১২৯

কোথায় আছ হে, দয়াল কাণ্ডারী।
এ ভব-তরঙ্গে আমায় কিনারে লাগাও তরী ॥
অধমকে বাঁচাবার কারণ, নাম ধরেছ পতিত পাবন,
সেই আশাতে আছি রে মন-চাতক যেন মেঘ নেহারি ॥
যতই করি অপরাধ, (গুরু) তুমি আমার প্রাণের নাথ,
মরিলে মরিলে মরি নিতান্ত দয়াল বাঁচালে বাঁচিতে পারি ॥
তুমি আমার হৃদের মাঝার, থাক যেমন সুধার ভাণ্ডার,
এই দেহতে তুমি কর কারবার,
তোমায় যাই বলিহারি……ওহে দয়াল… ॥ —ঐ

১৩০

আমি ঐ ঘাটে 'আনথাই' এক রূপ দেখিলাম
রূপ দেখিলাম গো দরদী ॥
সেই ঘাটের তুফান ভারী আমরা কি তাই যেতে পারি
যার আছে গুরু কাণ্ডারী,
সেই তো যাবে পারে গো দরদী ॥
সেই ঘাটে স্থলপদ্ম, রাধাকৃষ্ণ যুগল পদ,
সেই ঘাটে চিন্তামণি সদাই ধ্বজা ধরে গো দরদী ॥
সেই ঘাটের ঘেটেল যারা, নিত্য ব্যাপার করে তারা,
লোভে কামে দিয়ে ভাড়া
সদাই করে যাওয়া আসা, গো দরদী ॥ —ঐ

১৩১

গুরু, দোহাই তোমায়, মনকে আমার নেও গো সুপথে ॥
চেয়ে থাকি পথ পানে তোমার চরণ সাধবো কোনমতে ॥
জগাই মাধাই দস্যি ছিল তাদের প্রতি দয়া হলো
লালন পথে পড়ে রইলো তোমারই আশে ॥ —ঐ

১৩২

আমি বুঝলাম মেয়ের অধিকার
শুনেছি সেই চার মেয়ের হয়নি বিহে।
একটি সন্তান চার জনার ॥
এক মেয়ে শুয়ে আছে দিনে দিনে বৃদ্ধি তার
সেই মেয়ের ওপরে আছে ত্রিজগত সংসার ভার ॥
আর একমেয়ে নেচে কুঁদে ঢুকছে দেখ বাহির ঘর,
সেই মেয়েকে ধরতে পারে এমন সাধ্য আছে কার ॥
আর এক মেয়ে হুজুর চেয়ে নিলেরে সংসারের ভার,
সেই মেয়েকে ধরে এনে কর্‌ছে পদের বিচার।
আর এক মেয়ে অন্ধকারে ধন্দ হয়ে বসে রয়,
সেই মেয়েকে ধরে এনে কর হে পদের বিচার। —ঐ

চার মেয়ে অর্থ—মাটি, বায়ু, আগুন, জল। একটি সন্তান অর্থে মানুষকে বুঝাইতেছে।

১৩৩

সাধু মহাজন, কি দেখে তুই উচাটন হলি
অগাধ জলে মতি থুয়ে উল্যার বনে সাঁতরালি ॥
সে যে লাল মতি ধরা, কঠিন সে ট্যাংরা,
জাত-ডুবুরী না হলে কি অমূল্য ধন পাবে কিনারায়।
এখন প'ড়ে কানা বগের মতন
আজ কুথায় রে তুই ঠুকালি ॥
দেখাদেখি যে জন ডুবতে যায়
তার চুলকানি সার হয়
অগাধ জলে মতির গর্ভ যে জন ডুবেছে,
মহামহিম যোগের কথা ঠিক সে রেখেছে।
শর্মা সরা হয়ে কেন শুখ্‌নো ডাঙ্গায় ডোঁড়া টানালি ॥
কুমীরের মুখ বন্ধ করে উজান বেগে সাঁতার খেল্‌তেছে,
ছমির বলে বন্দ ছন্দ যে জন করেছে
তারে কুমীরে গিলেছে।

১৩১৩

ছোঁ মেরে ছোঁ উল্‌টে পড়লি
আগে তুই দিনকানা ছিলি ॥ —ঐ

১৩৪

দেহতরী মন কাণ্ডারী বসে আছে হাল ধরে।
কোন মিস্তিরী করলে তৈরী নয় দরজা খোলা,
বেলা গেলে সন্ধ্যা হলে আপনি লাগে তালা।
তারা মুখে কালা এক বারে ॥
একটি নদীর চারটি ধারা
চারিদিকে ধায় হ্যাঁকে হ্যাঁকে বাঁকে বাঁকে
এক জায়গায় মিশায়,
তারা মিশিতে ইচ্ছা করে ॥
ভবের হাটের বেচা-কেনা হচ্ছে কত শত,
দুই ধারে দুই গোমস্তাতে লিখছে অবিরত।
তারা হিসাব লিবে একবারে ॥
শরিয়তের তক্তা পেড়ে মারফতেরই বৈঠে
হকিকতের গজাল দিয়ে তক্তা লাগায় এঁটে।
তার মহামাস্তুল ওপরে ॥ —ঐ

অনেক সময় কবিওয়ালারাও বাউল গান রচনা করিয়া কবিগানের সভায় পরিবেশন করে। উদ্ধৃত গানটি জব্বর আলি নামক একজন কবিওয়ালার নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সে বাউল ফকির নহে, ব্যবসায়ী কবিওয়ালামাত্র। গানটি তাহার নিজের রচনা হওয়াও অসম্ভব নহে। তথাপি বাউল গানের আদর্শ অনুসরণ করিয়াই ইহা রচিত হইয়াছে।

১৩৫

অচল দেহ বানাও যদি প্রভুর নিজ গুণেতে
গেল আমার সুখের কাল, আর বাঁচিব কত কাল,
বিধি কর্যাছে অচল ॥
যমের ঘরে, পাষাণ মন, তুই হারালি রতন।
জিহ্বায় লয় যেন হরিগুণ-গান মরণ কালেতে।

ভজনেতে নাহি বল কাঁপে আঁখি থর থর বিধি কর‍্যাছে অচল ॥
অচল দেহ বানাও যদি প্রভুর নিজ গুণেতে ॥ —মৈমনসিং

১৩৬

অধর মানুষ ধরব কেমন করে।
সেই চিনেছে যেই রেখেছে হিয়ায় পুরে ॥
মানুষ কথা কয়না সাধন হয় না ফিরছে জীবের ঘরে ॥
ও মানুষ ধরব কেমন করে ॥
এ্যাদ্দিনের বাদে চান্দে বলে ষোল পোনে হারে,
ধরারে ধইরবে যে সে রয়েছে পারে।
ওরে, মানুষ ধইরবো কেমন করে ॥ —ঐ

১৩৭

অধরাকে ধর তোরা আমার মন সহজ মনচোরা।
ঠিক না বুলি জিলা ছলি শহর আছে দিল্লী।
লাছুদের উধ্ব´ বাঁকে দিছেন পহরা,
জীবনপুরে হাওয়ার বিচে, চউত্রিশ ইষ্টিশন আছে।
সহস্র পর্দার নিচে চলে হর-গৌরী।
জীবনপুরে হাওয়ার গোরা ছোঁয়ার হইল মন চোর।
ভাঁটা জোয়ার বন্ধ কইরা ধর যাইয়া তোরা ॥ —ঐ

১৩৮

আমি কি দিয়ে ভজিব তোমার রাঙ্গা পাও এসো, দয়াল ॥
আমি মন দিয়া ভজিব তোমারে,
সেও মন আগে ভুইলা যায়।
আমি দুগ্ধ দিয়া ভজিব তোমারে
সেও না দুগ্ধ আগে বাছুর খায় ॥
আমি চিনি দিয়া ভজিব তোমারে
সেও না চিনি আগে মাছিতে খায় ॥
আমি কলা দিয়া ভজিব তোমারে
সেও না কলা আগে বাদুড়ে খায় ॥ —ঐ
কি দিয়া ভজিব তোমার রাঙ্গা পাও ॥

১৩৯

আমার ঐ স্বর্ণভূমি মন চাষা চিন না তুমি।
আউশ আমন চিনা কাউন, কমলত্বায় সামান্ত জমি
সে জমিনের ফসল কাইটে ফকির হইল ছয় গোস্বামী॥
খাল কাইটে জল আনলাম ঘরে কালনদী সাগরের পানি।
মনরে বৈরান হইয়া ধার ছুটিল ভাইঙ্গা নিল ষোল আনি॥ —ঐ

কাউন একপ্রকার শস্ত। বৈরান শব্দের অর্থ বৈরী বা শত্রু।

১৪০

আর আমার কেউ নাই গুরু বিনে।
অকস্মাৎ ডুবলো তরী তরাও তরী, গৌরহরি, নিজ গুণে॥
এত সাধের তরী ছিল, তরী অযতনে বিনাশ হলো।
জল চোঁয়ায় তার রাত্রদিনে॥
গুরু চালান দিচ্ছে ষোল আনার ব্যাপার করি,
বেদনা কারবারের ভাবনা জেনে পাড়ি টানাটানি॥
চিনিবাস চতুর ব্যাপারী তার তাকিল গেল না চুরি,
জ্ঞান মন বাস্ক হেরে রংপুর কেন দোকান দিলি।
গোঁসাই রামানন্দ বলে, চোরে কি করিতে পারে
থাকিলে আপন হুঁসারি জাগিলে ঘরে চোর ঢোকে না রে॥ —ঐ

১৪১

আয়রে ও. মন, অধরকে ধর ঘুচবে তোর মনের ব্যথা।
মন সহজের খবর পাবি কোথা॥
আসমানেতে গাছের গোড়া জমিনে ডাল মেলেছে।
গাছে ফুল ধরে তার ফল না ধরে,
আছে ফুলের মধ্যে ফলেরি সাচা॥ —ঐ

১৪২

আমি বঁড়সী ফেলেছি, সাঁই, জলে,
যাওনা যাও ঠোক দিয়ে, যাও, বেঁধে যাবে গলে॥
ছিপ সুতো মনের মত যাওয়ার বেলায় এক গুঁতো মারে।
ছেঁড়া বঁড়শী ছেঁড়া সুতা তাই নিয়ে টানাটানি।

তুমি লেজ নাড়াও পানি ছিটাও পাতালে,
তুমি থাক গহিন জলে আমি সদাই থাকি নদীর কূলে।
তুমি লেজ নাড়াও পানি ছিটাও কথা কও পাতালে॥ —ঐ

১৪৩

অকুল সাগরে গুরু কাণ্ডারী,
গুরু কাণ্ডারী মন আমারি।
যখন নায়ের দাড়া পত্তন, সুতার আইল তিন জন ;
আর আইল ছয় জন মাঝি, আমায় দিচ্ছেন ব্যাপারী।
দশে ছয়ে ষোল জন মাঝি, নাও বায়ে যায় তাড়াতাড়ি।
কু-বাতাসে ঢেউ লাগিয়ে হাইল ভাইঙ্গে তরী ডুবায়॥
রসিক চান্দ কয়, শোন, বলি মন,
তোমায় দিচ্ছে মাল ভরাধন ;
নিক্তি দিয়া কর গা ওজন হইস না রে বেহিসাবী।
যদি হেলে নিক্তির কাঁটা, ধইরে নিবে পুলিশ বেটা,
ভাঙ্গিবে রে তোর বুকের পাটা জেলখানাতে দিয়ে বেড়ী॥ —ঐ

১৪৪

ধরি ধরি মনে করি ধরিতে আর পারি নে।
আমি মানুষ চিনব কেমনে॥
আমার সঙ্গে আছে ছয় জন রিপু ভোলায় আমারে।
আমি সাধন জানিনে আমি যাইনে সাধুর আখড়াতে।
মেহেরালী ছন্নছাড়া অনেক কষ্ট পেয়েছে।
আর সে অনেক কষ্টে গাওনা শিখেছে।
আরে ভাসা সুরীর গাওনা শিখে জগত মাতাইয়াছে॥ —ঐ

পর পৃষ্ঠার গানটিতে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্যের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, প্রকৃত বাউল সাধনার আদর্শের কথা কিছু নাই। অধ্যাত্মমূলক এবং প্রধানত বৈরাগ্যমূলক গান সাধারণভাবে বাউল গান বলিয়া পরিচিত ; এখানে বৈরাগ্যের কথা মুখ্যত না থাকিলেও আধ্যাত্মিক জীবনে সিদ্ধির কথা প্রকাশ পাইয়াছে। একমাত্র সাধুসঙ্গ ব্যতীত যে তাহা সম্ভব নহে, তাহাই ইহার বক্তব্য। প্রকৃত গুরুবাদ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা অবশ্য ইহাতে প্রকাশ পায় নাই।

১৪৫

আমার মন, সাধু সঙ্গ হইল কৈ।
যদি সাধুর সঙ্গ লইতাম, তবে সাধুর চরণ পাইতাম ॥
সাধুর সঙ্গে রঙ্গ মিশায়ে আমি ঐ রঙ্গে মাতিয়া রই ॥
সোনাতে সওয়াগা দিলে কঠিন সোনা যায় গো গইলে।
আল্লার নামের জোরে পাষাণ গলে
আমার মন-পাষাণ গলিল কই।
মুখে রইল হরি হরি, কাজের বেলায় জুয়াচুরি,
দেইখে শুইনে পাইলে পারি আমি ঐ রঙ্গে মাতিয়া রই।
আমার সাধুর সঙ্গ হইল কৈ ॥ —ঐ

১৪৬

আহা, প্রভু, তোমায় আমি পাব কেমন কইরে।
সে সন্ধান বলিয়া, নাথ, দেহ তুমি মোরে ॥
তব প্রেমের এমনি ধারা, হইতে হয় জীয়ন্তে মরা,
চক্ষু প্রাণ হারা হইয়ে ডাকিতেছি তারে ॥
ভক্তি-বেড়ি প্রেম ডুড়ি গাছি আছি আমি হাতে করি।
ধরিয়া করিব বন্দী হৃদয় কারাগারে ॥
সদ্‌ভাবে না দেখা দিলে দেখবো একবার বাহুবলে।
আমি পাই কি না পাই, প্রভু, হে তোমারে ॥ —ঐ

১৪৭

এই নিবেদন করি হে, গুরুধন, রাখিও চরণে।
তোমার চরণে নূপুর হইয়ারে সদাই বাজিব চরণে।
লইয়া আইলাম ষোল আনা
ব্যাপার করিতে দুনা, এই বাসনা মনে।
মায়া নদীর পাঁকে পইড়ারে,
আসল হারালাম সেইখানে ॥ —ঐ

১৪৮

এস, গুরু দীনবন্ধু, এ দাসেরে চরণ দাও।
পদে পদে অপরাধী কাঙ্গাল পানে ফিইরে চাও ॥

মছেরে দয়া করিলে সুরতে দেল্লা দেখাইলে
তুমি আমারে দেখাইয়া দিলে গয়া-গঙ্গা-যমুনা।
রুষই বলে আমার বা কি, আমি জমা খরচ নাহি রাখি,
কেবল ভরসা রাখি রাঙ্গা চাঁদের চরণে ॥ —ঐ

১৪৯

এবার প্রেম-গাছেতে বহুত মজার ফল,
মাঝখানে সে ধরে ফল।
খায় না সে ফল দেখতে মতি নাগ
বার মাসে রঙ্গের গাছে,
ফুলফোটে যেমন গঙ্গাজল
যেদিন করিবেন বিধাতায় খেয়াল।
দুইগাছে ধরিবেন একটি ফল
গাছটি যখন নড়বড়া কাল হয় সেদিন।
দয়া করবেন দয়াময়, দশমাস দশদিন গোপনেতে রয়।
নারী রূপ দিয়া পুরুষ যদি কোন সময়ে নারী ঋতু হয়।
কোন সময়ে বলে পুরুষ ঋতু হয় সেকথা বলেন মহাশয় ॥ —ঐ

১৫০

এস, গুরু, তুমি আমি যাই ভব-পারে,
ভবনদীর তরঙ্গ ভারি এখন যাইতে ভয় করি।
ভবঘাটের কর্তা ছয় জনা।
সঙ্গে গুরু না থাকিলে নৌকায় তোলে না ॥
নায়ের মাঝি বলে পার করাছে,
তারা ছয় জনা মাল্লা গেলে কার।
একা দেই সমানের সমান ॥
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে বানায় ফুল-বাগান।
সেই বাগানে ফুল ফুটাছে অধর চান্দ বিরাজ করে ॥ —ঐ

১৫১

ওরে যার মনের ভাব সেই জানে।
অন্তেরে না জানাইলে সে জানাইয়ব কেমনে ॥

যৌবনে আগুন দেয় সবায় দেখতে পায়,
ও যে আবার মনের আগুন জানে দু'একজনে ॥
ও যার মনের আগুন সেই জানে ॥
পদ্মের পাতায় জল করছে টল্‌মল্‌
বিনে বাতাস চলছে তুফান ভারি।
ও যার মনের ভাব সেই জানে ॥
যে জন বিনে বাঁচিনে একদিন, রসিক মইলো সেইজনে বিনে।
ও যার মনের ভাব সেই জানে ॥ —ঐ

১৫২

পাখী শব্দটি সর্বদাই আত্মার রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানেও তাহাই হইয়াছে। আত্মাকে দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়; সেই কথাই এখানে সুন্দর উপমার সাহায্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

ও মন, দেখরে চেয়ে আজব তামাসা,
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল জুড়ে এক পাখীর বাসা।
সকলে রয়েছে সে বাদায় বাসা দেখা যায় রে।
ধরতে গেলে ধরা নাহি যায় বাসায়।
মাঝে আছে কত ডিম আবার
ও তা গণতে পণ্ডিত হয়।
এক এক ডিমে কত কারখানা
ও তা গণা যায় না কেউ জানে না।
কত হয় ছানা এ পাখীতে সবার আধার যোগায় রে।
সব সমান তারে ভালবাসেরে।
আধার জোগায় পাখী সর্বক্ষণ।
কিন্তু কেউ কখন দেখে নাই রে পাখীটি কেমন।
পাখী আছে সদা বাসা পুরেরে
কিন্তু সেতো কার' নয় পোষারে ॥ —ঐ

১৫৩

ওরে চাঁদ-বদনে বল, ও গোঁসাই,
ও বান্দার এক দোমের ভরসা নাই।

আপন বাড়ী আপন বিষয়

সদাই রবে, দিন গেলরে আমার ॥

বিষয় বিষ খাবি যে দিন হারাবি

এখন কাঁইদলে কি আর পাবি ভাই ॥

চাঁদ বদনে বল ও গোঁসাই ॥

কিবা হেন্দু যুবনের চেলা

পথের পথিক চিনে ধর এই বেলা

পিছে কাল শমন ধইরবে তখন বিপদ ঘটিবে ভাই ॥

চাঁদ বদনে বল, ও গোঁসাই ॥ —ঐ

ইহা সাধারণ বৈরাগ্যমূলক গান, বাউল সাধনার কথা ইহাতে কিছুমাত্র নাই। লৌকিক বাউল গান যে অধিকাংশ সাধারণ বৈরাগ্যমূলক গান, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তবে ইহা যে বাউল সাধকের রচনা তাহা বুঝিতে পারা যায়।

১৫৪

কেমনে ধরবে তারে,

ও মন, মনের মানুষ বলিস যারে ॥

সে যে রয় ধরাময়, হায়রে, ধরা না যায়

অধরকে কে ধরতে পারে ॥

সে যে স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে জলে স্থলে সর্বধারে,

সে যে অন্তরে বাহিরে বিরাজ করে প্রান্তরে

কি ঘোর কান্তারে ॥

পাবি নে সিদ্ধাশ্রমে তীর্থাশ্রমে বৃন্দাবনে হরিদ্বারে।

মজলে অনল অনিলে, হায় রে, নাহি মিলে

পশ্চিমে অকুল পাথারে ॥

তার সর্ব জীবে সমভাবে আবির্ভাব নিরাকারে।

নাই তার জনম মরণ, হায় রে, রূপ কি বরণ,

করণ কারণ ত্রিসংসারে ॥

কাউকে সে দেয় না যেতে, হায় রে, আপন হতে যায়

জীবের করম অনুসারে ॥

আদি আদিভূত ব্রহ্মরূপ ব্রহ্মরূপী জীবাত্মারে।
ক্ষেপা রসিক বলে, হায় রে, তারে ধরতে হলে
ধর আগে জীবাত্মারে ॥ —ঐ

১৫৫

কি কইরলাম ভবে এসে সুখের এক পাখী পুষে,
দীন তাই ভাইবছে বসে চাল ছোলা দুধ কে খাবে ॥
তমাল চাঁদ ভেবে বলে, পাখী কোন সময় চলে।
মুখেতে হরিবলে তাহার সন্ধান কে পাবে,
থাকবে না সুখ বিধি বিমুখ সেদিন হবে ॥ —ঐ

১৫৬

কতজন ঘুইরেছে আশাতে সন্ধান পাইলাম না জগতে,
চাইর ফেরেস্তা দুইনের পারে শূন্যের উপর চলে।
ঠেক্‌তে হবে তাদের হাতে ॥
দাঁড়াবে যে জোনা হবে কথার উত্তর বইলা দিবে
তা হইলে পদাও মেলে স্বরূপ সভাতে।
কতজন ঘুইরেছে আশাতে সন্ধান পাইলাম না জগতে। —ঐ

১৫৭

গোঁসাইর কারণ বিষম যাজন যেজন করে সেই জানে
অন্যে তা জানবে কেনে ॥
কাম রতিতে যার বাসনা, তার হবে না উপাসনা।
ভবের কাম থাকিতে প্রেম হবে না (ও ভবের)
ব্রজগোপীর ভাব বিনে ॥
হা রে, ব্রজগোপীর ভাব বিনে ॥
পঞ্চরসে যে জন মাখা সেই পেইয়েছে মানুষ ধরা
মজিবি কামিনীর কুলে, ওরে, ব্রজগোপীর ভাব বিনে ॥
চণ্ডীদাস আর রজকিনী, তারাই প্রেমের শিরোমণি,
এক মরণে দুইজন মইলো ভবে এমন মরে আর কয় জনা ॥ —ঐ

এখানে বাউল সাধনার সঙ্গে সহজ সাধনার কথা একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বাউল সাধনার উৎপত্তির মূলে অন্যান্য বহু লৌকিক

ধর্ম সাধনার সঙ্গে বাংলার সহজিয়া সাধনার কথা আসিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে বাউল সাধনার কথা কিছুই প্রকাশ পায় নাই। ইহার সর্বস্বই সহজ সাধনার কথা।

১৫৮

গুরু কই যারে তারে
বাড়ালে সে কতই বাড়ে।
বাড়াইলে তার অন্ত নাই।
গুরু চিনাছেন শিব গোঁসাই॥
সে সোনার কাশী তের্থ করে
শ্মশানে মশানে বাস করে॥ —ঐ

১৫৯

গুরু ভজলি না রে, মন, আমার,
একদিন ভবে দেখবি রে ঘোর অন্ধকার॥
মন, তুই কয়বার আইলি, কয়বার গেলি,
ভবে আসা যাওয়া হলো সার॥
মন, তোর কোথায় রে তোর বসত বাড়ী
কোথায় রবে তোর সুন্দরী নারী
কোথায় রবে তোর যৌবনের বাহার॥
যখন শমন এসে বান্ধবে রে কসে
তখন কে বল্‌বে জমিদার, কে বল্‌বে তালুকদার॥
কোথায় রে তোর হাতি ঘোড়া
কোথায় রে তোর জামা জোড়া
কোথায় রবে এ ঘোড়সোয়ার॥
একবার হরি হরি বল মুখে
নইলে যমে কি ছাড়িবে আর॥ —ঐ

১৬০

গুরু, আমার পারের বেলা
চরণ-তরী দিবেন কি না।
এখনি না দিলে চরণ পারের বেলায়
বঞ্চিত আমায় আর কইর না।

ভাই বল, বন্ধু বল, মন, কেবা তোমার কে আপনার,
একা একা যাইতে হবে গুরুর চরণ বিনে
সঙ্গে আর কেউ যাবে না।
আমি লইয়ে আইলাম সালিয়ানা (হায়রে মন),
ব্যাপার করিব দুনা লাভে—মূলে সব হারাইলাম
আমার ভাগ্যে কিছুই তো রইল না॥ —ঐ

১৬১

গুরু আমার অপরাধ কি ক্ষমা হবে না।
যে পাপ কইরাছি আমি, সকলই তা জান তুমি,
চরণে জানাইয়া রাখি এই প্রার্থনা॥
আমার দেহতরী পাপে ভরা,
কখন জানি যায় গো মারা।
সে সময়ে, গুরু, চরণ ছাড়া, গুরু আমায় কইর না॥
ভাইবা দেখলাম মনে মনে, মুরশিদি চান্দের আলাপনে,
গুরু গোঁসাঞীর নাম কীর্তনে একদিন গেলাম না॥
কোনো গুরুর নাম লৈলাম না, গুরু কি ধন তাও চিনলাম না॥
সাক্ষাতে থাকিতে বইস্ত হইলাম দিন-কাণা॥
মনোমোহন কয় আমি পাপী গুরুপদে অপরাধী
চরণে জানাইয়া রাখি এই বাসনা॥
যখন আমার যায় হে জীবন, মাথে দিও যুগল চরণ,
তা না হলে যমের তারণ, গুরু, বারণ হবে না॥ —ঐ

১৬২

গুরু গো, না পাইলাম তোমার চরণ।
যে তোমারে চিন্তা করে, বিষয় দিয়া ভুলাও তারে,
তুমি থাক আড়ে আড়ে দেখা নাহি দেও আমারে॥
ছয় রিপু আছে সাথে না পারি দমন করিতে,
বারে বারে কয় আমারে যাইও নারে গুরুর কাছে।
গুরুর কাছে যাইতে হইলে আমার পায় দুইটি নাহি চলে,
নয়নের না জ্যোতি ধরে ঘুরে ফিরি অন্ধকারে॥ —ঐ

১৬৩

গুরু যে ধন দিয়াছে তারে চিনলে না তারে ॥
ঘরে যাইয়া দেখিলি না, মন, কত রতন আছে থরে থরে ॥
চাবি ত পরেরি হাতে খুঁজলে পরে মিলবে চাবি
যদি ডুবতে পার সাধুর দ্বারে ॥ —ঐ

১৬৪

গুরু, আমায় পারে লইয়ে চল,
মুরশিদ আমায় পারে লইয়ে চল।
মাঝি নাইরে কাজের কাজি মাল্লা দু'জন বড় পাজি
ভব সংসারের মাঝামাঝি কোন পাকের মোল্লায় কালাজী
গুরু এসে হও কাণ্ডারী, নইলে আমার প্রাণ গেল।
দয়াল এসে হয় কাণ্ডারী, নইলে আমার প্রাণ গেল ॥
ছ'টার সময় এলেম ঘাটে, আর ও ন'টা বাজলো পথে,
এ ভব-সংসারের মাঝামাঝি কোন পাকের মোল্লার কালাজী।
বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই নাই মোর নামটি মাত্র মোর সার।
গুরু আমায় পারে লইয়ে চল
মুরশিদ আমায় পারে লইয়ে চল ॥ —ঐ

এই গানটিকে মুশিদ্যা গানও বলা যাইতে পারে। মুশিদ্যা গান সুফী কবিদিগের রচনা এবং বাংলাদেশের গুরুবাদী সঙ্গীতের সঙ্গে ইহার নিকট সম্পর্ক আছে। মুর্শিদ শব্দের অর্থও গুরু। তবে গুরুবাদী সঙ্গীতে অনেক সময় যেমন গুরু এবং ভগবান একবার হইয়া যায়, মুশীদ্যা গানে তাহা হয় না।

১৬৫

চ্যাতন রাইখরে, গুরুধন, করব ভজন সাধনা।
আগে জন্মিলাম আমি পাছে জন্মে মা,
ভাবতে ভাবতে ভাই জন্মিল পিতার উদ্দেশ পালাম না ॥
ঝাঁপ দিলাম যমুনার গো জলে, গুরু, মরণ হইল না।
ঐ জলের কুমীরে ক্যানে, গুরু, আমায় ধইরা খাইল না।
ইচ্ছা সুখে গ্যালাম বনে, গুরু, মরণ হইল না।
ঐ জাগার ঐ বনের বাঘে, গুরু, আমায় ধইরা খাইল না ॥ —ঐ

১৬৬

ছিলেম বা কই এলেম বা কই যাব বা কই তাই ভাবি বা কই।
আমি যে কথা কই সে কথা কই আসলে সে কাজ করি বা কই।
কার বা বাড়ী কার বা ঘর কারে বল মন আমার আমার ?
আমার আমার ঘুচবে রে, মন, দুদিন পরেতে ॥
ঐহিকের সুখ কয়দিন বল, দেখতে দেখতে দিন ফুরালো
আমার আসা মাত্র সার হল, অন্তিমের কাজ করলেন বা কই॥ —ঐ

১৬৭

দয়াল গুরু বিনে এ সংসারে দয়াময় নাম কে ধরে।
ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরে ধ্যান করে নিরঞ্জনে
অনন্তে না পাইয়া মাপ জপে নিরালে ॥
তার নামের গুণে গহীন বনে শুক্‌না তরুফুল ধরে ॥
প্রভু, তুমি ডাল, তুমি মূল তুমি সকলে
তোমার রাঙ্গা চরণ অমূল্য ধন সকলে বাঞ্ছা করে ॥
দয়াময় নাম কে ধরে ॥ —ঐ

১৬৮

তুমি কে হে, তোমায় আমি চিন্তে পেলেম না।
তুমি হবে কার কুমারী শুনতে মনের বাসনা।
বক্ষে পয়োধর হেরি নবীন শিশু কোলে করি,
তুমি হবে কার কুমারী শুনতে মনের বাসনা ॥ —ঐ

১৬৯

দিন গেল গেল, হায়, দিন গেল,
ডুবিল ডুবিল তরী অকুলে ডুবিল ॥
ভবেরি বাণিজ্য আইসে, পুঁজি পাটা খাইনু বইসে,
কি লইয়ে যাইব দেশে বল, মন, বল ॥ —ঐ

১৭০

দেখ, ভাই, জলের বুদ্বুদ কিবা
অদ্ভুত দোনিয়ার যত আজব খেলা।
আজি কেউ বাদশা হয়ে দোস্ত লয়ে
রংমহলে করছে খেলা ॥

কাল আবার সব হারায়ে
ফকির হয়ে সার করিছে গাছের তলা।
আজ কেউ ধন-গরিমায় লোকের মাথায়
মারছে জুতারি তলা,
কাল আবার কপ্‌নী পরে
টুকনা ধরে কাঁধে ঝোলায় ভিক্ষার ঝোলা। —ঐ

১৭১

দীন হীন হইয়া আছ সময়েতে ডাক না,
তুমি মিছে ডাক অসময়।
ফেরেস্তা তোমার সঙ্গে আছে দেখনা রে কে কোথায়।
ঐ যে রোজ হাসরে হিসাব লয়ে ডাক্‌লে কি শুনবে তায়।
তুমি মিছে ডাক অসময়।
রোমজান বলে, কালাচান্দে ডাক তারে হয় সময়,
হারাণ তুমি ছাড় তারে চরাবি যদি সেই পাল্লায়।
তুমি মিছে ডাক অসময়॥ —ঐ

১৭২

দীনবন্ধু, দীনের কথা ভুইলে থেকো না,
তোমাকে যে জনা যে ভাবে ডাকে
তুমি তার বাসনা পূর্ণ কর॥
ভবে কয় বার এলাম কয় বার গেলাম,
গুরু, আমায় ভব-যাতনা আর দিও না।
চিরদাসের বাসনা মনে দুটো নয়নের কোণে
অন্তিম কালে যুগল চরণ হেরি নয়নে।
আমার শেষের সেদিন বড়ই কঠিন
গুরু, আমায় চরণ ছাড়া কইরো না॥ —ঐ

১৭৩

সহজ ভাষায় ব্যবহারিক জীবনের নানা উপমায় সাহায্য সুগভীর তত্ত্বকথা প্রকাশ করিবার অপূর্ব দক্ষতা বাংলার পল্লী কবিদিগের যে একদিন কি প্রকার আয়ত্ত ছিল, এই গানটি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। এইভাবে ঘরোয়া

উপমা দিয়া তত্ত্বকথা প্রকাশ করিবার রীতি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃতের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

দেহ-জমিন আবাদ হইল না, বিষয় চিন্তা গেল না।

চৌদ্দ পোয়া জমিন ছিল ভূইকম্পে তা ভাইঙ্গা নিল।

নক্সা বন্দী কিছুই রইল না।

আমার সদর খাজনা ফাজিল গেল চেক দাখিলা পাইলাম না।

মনে মনে যুক্ত কইরে আপীল করলাম কাছারীতে,

বিচার আচার কিছুই হইল না।

অরে, আমায় ঠেইলা নিল জ্যালখানাতে জ্যালে মুক্তি পাইলাম না॥—ঐ

১৭৪

ও কাম-কুম্ভীর আছে পথেতে

পারবি না তুই সাগর পার হ'তে।

গঙ্গাসাগর মুখের কথা নয়,

সেই মাটিতে হরিদাস মানুষ জ্যোতির্ময়।

নদীর ভাবনা জেনে সাঁতার দিও না,

রসিক বিনে বে-রসিক ডুবলে

ওঠে নারে, মন, ডুবলে উঠে না। —ঐ

১৭৫

বড় বাণ ডেকেছে সাগরে,

সামাল মাঝি এই পারাবারে॥

ও জেনে আয় সুবুদ্ধি সুজন,

অমূল্যধন দান করাছে গুরু মহাজন॥

ওরে, মন, যত্ন করে হেলায় রতন হারায় নারে,

লুটপাট করে নেয় না যেন বাটপাড়।

ছয় বাটপাড়ে জয় রাধার নামে বাদাম তুলে,

ভক্তি বৈঠা এঁটে ধরে যাও রসিক নেওয়া এ আনন্দে।

নদীর তুফান দেখে কুলের নৌকা ডুবাও না হে।

মহামায়ার সাধের তরী তল হইল একই বারে॥ —ঐ

১৭৬

পাগলের দলে এদলে কেউ যেও নারে, ভাই।
এদলে গেলে পরে জাইতের বিচার নাই।
ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল আর এক পাগল তার চেলা,
তিন পাগল যুক্তি করে বাঁধলো রসের খেলা॥
এক পাগল বৃন্দাবনে নন্দের কানাই,
আপনি কাঁদিল সে যে পাগল করলেন রাই।
আর পাগল উনির সাথে জগন্নাথ গো,
চণ্ডালে রাঁধিয়ে অন্ন ব্রাহ্মণে খায়।
ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল আর এক পাগল শিব,
তিন পাগলে যুক্তি করে বান্‌ছে নবদ্বীপ॥ —ঐ

১৭৭

প্রেমের গাছে রসের হাঁড়ী বান্দছে যে জনা।
ও তার নিত্য নূতন বার হয় যে রস খেলে রস আর ফুরায় না॥
হারে, একটা খাজুর গাছ পেয়ে বাঙ্গাল যত যায় ধেয়ে,
ভাব না জেনে গোড়া ছোলে রসের কারণে॥
ও তার অগ্রভাগে আছে সে রস গো,
রসিক ছাড়া কেউ জানে না।
ব্রজের শ্রীনন্দের নন্দন কিঞ্চিৎ মাত্র পেয়ে রস গো,
শ্রীরূপ-সনাতন তারা জগত ভরে।
বিলাছে প্রেম—কেউ পেইল কেউ পেল না রে॥ —ঐ

রসের অধিকারী সকলে হইতে পারে না। সকলেই সন্ধান করে সত্য, কিন্তু সকলের সন্ধান সার্থক হয় না। খেজুর গাছের আগায় রস, কিন্তু অধিকাংশই গোড়া কাটিয়া তাহা পাইবার আশায় বসিয়া থাকে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনার পথে তাহারা ভুল পথ ধরে।

১৭৮

ভবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।
জলের মধ্যে স্থল পদ্ম তাহার মধ্যে কতই মধু গো।
অরসিকে জানে না নদীর কুলে কুলে ঘুরে বেড়াই সই গো।

মরণ ভয়ে নামি না, নিত্য গঙ্গায় স্নান করি
ভবের নদীতে, সই, ডুব দিলাম না।
কূলে বৈসে ঐরূপ হেরি গো ॥ —ঐ

১৭৯

ভাবছি মনে গুরু বিনে কে দয়া করে।
আসমান জমি কারখানা গুরু কি ধন তাও চিনলাম না।
দাঁড়াব কার কাছে, গুরু আমার সকলের ধন
ঘুমের ঘোরে করায় চেতন অন্ধকার দূর করে কেমন
চন্দ্রসূর্য কাল মেঘেতে আছে ঘেরে ॥ —ঐ

১৮০

ভজব বলে গুরু চরণ বড় আশা ছিল।
আশা নদীর কূলে বসে রে আমার ভাবতে জনম গেল।
আশাবৃক্ষ রোপণ করে আশায় আশায় রইলাম বসে,
ফল না ধরিল বৃক্ষের মূল ভাঙ্গিয়া পৈল ॥
যেমন চাতক রইল মেঘের আশে,
মেঘ উড়ে যায় অন্য দেশে,
ও চাতকের প্রাণ বাঁচে কেমনে।
জল বিনে বা মৈল রে চাতকীর প্রাণ গেল ॥ —ঐ

১৮১

ভবে সামাল থেক, মন, ইজয় নদীর বিজয় তুফান।
সে ঘাটে নাই মানা, কখন সেই ঘাটে লোনা পানি।
কাম করে কাল কুম্ভিরিণী
ও তোর নাগাল পেলে করবে রে ক'খান ॥ —ঐ

১৮২

মন হলো না কথায় বাধ্য সাধন হয় কি সাধনে।
মন গেছে কামিনীর দেশে গুরু-ভজন হবে কিসে।
করে না কেউ তার ভাবনা—যাইতে হবে শমনে।
যে মানে কৃষ্ণ কথা বজ্র হে পড়ে মাথে।
যেখানে হয় রঙ্ তামাশা মন চলে যায় সেইখানে ॥ —ঐ

১৮৩

মন পক্ষী, তোর অন্ত পাইলাম না, রাধা কৃষ্ণ বল না ॥
যখন ছিলিরে পক্ষী মায়ের গর্ভে,
চক্ষু মেলে দেখরে, পাখী, ঝাঁক কোথায়।
আছে রে, পাখী, ঝাঁক কোথায় আছে।
উত্তর ঝাঁকের পাখী ঝাঁকে গেল রে সে গেল ঘোষণা ॥
যখন ছিলিরে পাখী তে ভালায়
বসে চক্ষু মেলে দেখরে পাখীর ঝাঁক
ওরে ঝাঁকের পাখী ঝাঁকে গেল
হরি বলা হল না, মনপাখী, তোর অন্ত পাইলাম না ॥ —ঐ

১৮৪

মন মাঝি, ঘাট চিনিয়া লাগাও তরী,
গেলে কুলে যাবি মারা।
এ পাত্রর ছয়জন মুলেতে কেউ না সুজন,
কুজনের চূড়ান্ত তারা ছয় জনে টানে।
ছয় গাছ গুণে কয় দিনে জান ডুবায় ভরা ॥
একে আমার জীর্ণ তরী বোঝাই ভারী
অন্যের কাছে দিসনে নৌকা ভরা।
রেখ বাঁকে বাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে হল ছায়া
যেন হোসনা হারা, শোন হে, মন-ব্যাপারী।
বলি তোমারি এবার ভবের ব্যাপার সারা ॥ —ঐ

১৮৫

মন যদি কথা রাখ চেতন থাক বসে দেখ মানুষ লীলা।
চাও যদি ভব পারে শীঘ্র করে কি মতন গোঁসাই তোর।
মন জানে প্রাণে জানে তিন দিন থাকে হাটে মেলা।
চাও যদি সেই নদীতে চান করিতে জুত যাতে করিস খেলা।
সে ঘাটে ডুবলে পরে মানুষ মরে চুপিসারে করিস্ খেলা।
অষ্টদল সময় হলে নিশা কালে মানুষ বলে দেখ,
পাবি না তলাতল, রসাতলে উল্টাধারে বিরাজ করে আজব লীলা।—ঐ

১৮৬

মন-চাষা, ক্ষেতে দিয়ে চাষ
নিশ্চিন্তেতে রইলি বসে, ফিরে আর না করলি তালাস ॥
কু কৃষি কু জন্মাইতে পাট ভূমিতে মায়াজালে
কর্মদোষে চতুষ্পার্শে উঠেছে পাপের ভাদালে।
ছয় জন কৃষক মৈল খেটে তাদের নাহি অবকাশ।
তারা আপনার কর্ম আপনি সারবে, ভোলা মন,
না ফেলায় ক্ষেতের ঘাস ॥
কু-কৃষিতে জমিন নষ্ট জানাই স্পষ্ট তুই জানিস না,
স্থান থাকিতে কিসের ভুলে জমিন আবাদ করলি না।
চিরদিন তুই আমার কথা করলি উপহাস ॥
কতদিন তোর জমিনেরে, ভোলা মন, হবে জ্ঞানাঙ্কুর প্রকাশ।
আপন কাছে বীজ থাকিতে বীজ বুনিতে না হলো মতি,
ঠেক্‌বে যখন জানবি তখন জমিনের কত হয় ক্ষতি।
সুদিনের ছোড় কুদিন এল, এল দারুণ শমন।
কাল জলে ঢেউ লাগিয়ে রে, ভোলা মন, জমিনের হবে সর্বনাশ ॥
সাড়ে তিন হাত জমিনের জোতদার তুমি,
মালিকানটির হাতক জমা দিতেছ প্রতিদিন
একদিন তাহা কম পড়িলে হইবিরে দীন।
এতদিনে রে, ভোলা মন, হবে নিলাম নিকাশ ॥ —ঐ

সাধারণ কৃষক কবিগণ কৃষি-জীবনের নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর হইতে উপমার সন্ধান করিয়া তাহা দ্বারাই সুগভীর তত্ত্বকথা প্রকাশ করে। বাংলার আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব।

১৮৭

মন-পাগলা, বঁড়শী ফেলা ॥
বঁড়শী খেয়ে কল ডুবালো বিনে কাস্তলা ॥
ছিপে সুতো বাইন্ধে করি খেলা,
মন পাগলা বঁড়শী ফেলা ॥
বছিরে সা ফকির বলে সে মাছ খাবে কি ভোলা ॥ —ঐ

১৮৮

মনরে, একবার চল যাই ফুল বাগানে।
আমি তুমি ফুল তুলিব,
বিনে সূতার হার গাঁথিব,
বিনে সূতায় হার গাঁথিয়ে
প্রাণনাথকে সাজাইব ॥ —ঐ

১৮৯

মনরে, ভবে যদি হবে পার গুরুর চরণ হৃদে কর সার ॥
হিংসা নিন্দা কতক ছাড় গুরুর নাম তরণী কর।
কাম নদীতে হবে যদি পার ॥
গুরুর সমান বাক্য
হৃদয়ে করিও ঐক্য
কাম-নদীতে হবে যদি পার ॥
যদি প্রেমের মরা মরতে পার রে মড়া ছুঁইবে না শমনে।
আর যদি উজান নদী বাইতে পার রে, মনা,
ঢেউ লাগ্‌বে না যমুনায় ॥ —ঐ

১৯০

মন, কররে বাদিয়ার সঙ্গ ভুজঙ্গধর সন্ধানে,
বাদীয়ার বউ সকলে তারা ফিরে নানা ছলে
কালসাপিনী গলে ধরে আনে।
ছুট করলে বিষ উজায় না রে
ও পাখিন মন, তারা গারড়ী জানে।
শ্রীগুরু পরম বাদিয়া তার চরণ ভক্তি সিদ্ধিয়া
মহামন্ত্র শিখ যতনে।
সাপে কোপ করে ছুট্ করলে পরে
ও পাষাণ মন, তুমি বাঁচবে না প্রাণে ॥ —ঐ

১৯১

মানুষ মানুষ বল কারে মানুষ ধইরলে মানুষ মিলে।
জীবন্তে মরা না হইলে সুমানুষের সঙ্গ না মিলে॥

ও জীয়স্ত মায়ায় ভুইলে থেইকো না অনুমানে।
বন্ধমানে এইরূপ হেরি নয়নে।
শম্ভুচাঁদ রসিকে বলে, এইরূপ হেরি নয়নে
অদিন মনে পারি বলে ও শাকান্ন দিয়ে জল খায় না।
স্থমানুষের সঙ্গ ছাড়া ও জীয়স্ত মায়ায় ভুইলে থেকোনা। —

১৯২

মানুষ ধরা মুখের কথা নয়।
কোন যোগে .কান ভোলা যোগী করিয়াছ সাধন ॥
অমাবইস্যা পুণিমাতে যোগ চলে উজান স্রোতে,
সেই স্রোতে রয়েছে যে মানুষ সেই জন
আত্মায় আত্মায় আছে গাঁথা,
সহজ মানুষটি পাবা কোথা।
মাইনষে মানুষ জোড়া গাথা সে মানুষ রতন ধন।
শুইনেছি সাধুর মুখে এ দেহতে মানুষ আছে,
হারাণ শা তাকায় গেছে এ দেহের গোড়া-আসলে ॥ —

১৯৩

মনের মানুষ যেখানে, কি সন্ধানে যাই সেখানে ॥
সত্যতল পাতালের নীচে, মন রইয়াছে সেইখানে ॥
দেশ বলে কৈলাশ জৈলা জল থলে মিশিয়ে
মনের মানুষ রূপরসায়ণে সাধুর ভরা যাছে মারা,
পেম নদীর ঘোর তুফানে ॥ —

১৯৪

যে জন প্রেমের ভাব জানে না,
তার সঙ্গে নাই লেনা দেনা ॥
কাঠুরিয়া মালেক পেয়ে
দোকানীরে দেয় কানাইয়া
মালিক মইলো অভিমানে
কাঠুরিয়া তা টের পেল না ॥

কানা চোরায় চুরি করে
ঘর ছাইড়া সিং দেয় পাগারে
মিছামিছি খাইটা মরে
কানার ভাগে ধন জোটে না ॥ —ঐ

১৯৫

যদি সতের সঙ্গে করতাম সঙ্গ রাখতো গুরু ভালো।
অসতেরি সঙ্গ ধরে, গুরু, আমার ভাবতে সময় গেল ॥
ছয়টা বলদ একটা লাঙ্গল জমি চাষ না হলো ভালো।
অচাষারে জমি দিয়া ভাবতে জনম গেল ॥ —ঐ

১৯৬

যার জন্যে হইলাম পাগল
তারে আমি পাইলাম বা কৈ।
পাও পাগল হাট বা চইলে
হাত পাগল ধরব বইলে।
চক্ষু পাগল দেখপ বইলে
জিহ্বা পাগল মিঠার লোভে।
মন পাগল স্তন পাগল
দেহের মধ্যে ছয়টি পাগল।
পাঁচ পাগল বুঝাইতে পারি
এক পাগল ডুবায় সকল ॥ —ঐ

১৯৭

স্বদেশে যেতে হবে, এ বিদেশে
চিরদিন ত কেউ রবে না।
ওরে, স্বদেশ তোমার নয় রে এ পার যাবে,
পার হইবে সে ভাবনা কেউ ভাবে না।
ওরে, ভাই, দিন ফুরালে আঁধার হলে
চোখে দেখতে কেউ পায় না।
বলি, ভাই, দিনের বেলা চোখ খুলে
ভাবের ভেলা দেখলে না ॥ —ঐ

১৯৮

নিম্নোদ্ধৃত গানটি প্রকৃত বাউল গান নহে, সাধারণ গুরুবাদী সঙ্গীত মাত্র। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, বাউল সাধনায় ক্রমে গুরুবাদ প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া সাধারণ গুরুবাদী সঙ্গীতকেও বাউল সঙ্গীত বলিয়া ভুল করা হইত। কারণ, অনেক সময় গুরু এবং সাঁই বা বাউলের ভগবান সম্পূর্ণ অভিন্ন হইয়াছে। সেই সকল ক্ষেত্রে গুরুবাদী গানকেও বাউল গান বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে তাহা হয় নাই।

সাধে কি আর কান্দি তোর জন্যে!
পতিত-পাবন গুরু জীবের জীবন
সাধে কি আর কান্দি তোর জন্যে?
স্বভাব চরিত্র নাহি জানি দয়া করো, গুরু, তুমি
বেহাগ রূপে ভজিতে না পারি,
সাধে কি আর কান্দি তোর জন্যে॥
গুরু দয়াল ভারি, আমি আছি আশা করি,
চেইয়ে আছি তোমার চরণ পানে।
সাধে কি আর কান্দি তোর জন্যে॥
চাতকিনীর পাণ গেল নব বারি বিনে
সাধে কি আর কান্দি তোর জন্যে॥
পদ্মে পদ্মের চারি, সামাইলেন এই দেহতরী,
লুকাইয়ে আছ কোন দেশে,
তুবার বলে, ওগো, গুরু খুঁজি কোন বনে,
সাধে কি আর কান্দি তোর জন্যে॥
পতিত-পাবন গুরু জীবের জীবন
সাধে কি আর কান্দি তোর জন্যে॥ —ঐ

১৯৯

সাধনের সাধ থাকে যদি
তুল প্রবৃত্তি ঠিক করিয়ে।
শেষে হয় সাধনের গতি॥

বৈদেশী এক সাধন আছে, তারে রাগ আগে পাছে,
তারপরে এক সাধন আছে, সেই সাধন হয় গো বেজাতি।
মন, তুমি করজোড়ে গুরুর পদে কর গো মিনতি।
পাষাণে ময়লা ধরে, তাতে সোনা ঘসলে পরে,
সোনার কি জিল্লা ধরে, শেষে হয় সোনার সুখ্যাতি॥
দেহের মাঝখানে জ্বালাইয়া দেখরে মন গিয়াসের এক বাতি॥ —ঐ

২০০

নিম্নোদ্ধৃত গানটি সাধারণ সঙ্কীর্তনের গান। কোন ক্রমে ইহা বাউল গানের সংগ্রহের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, সাধারণভাবে ভক্তি এবং বৈরাগ্যমূলক গানও বাউল গান বলিয়াই পল্লী অঞ্চলে পরিচিত। সাধারণ সংগ্রাহকেরা ইহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করিতে পারে না। গহুর শব্দের অর্থ গৌর বা গৌরাঙ্গ।

হায় গো, দিলাম হৃদয়-পদ্ম সিংহাসন, এস গহুর শ্রীশচীর নন্দন।
গহুর, আমি অতি মূঢ়মতি হে, না জানি ভজন স্তুতি,
এই আসরে না আসিলে শ্রীরাধার দোহাই লাগে।
ভকত বৃন্দ সঙ্গে কইরা হে এসে কর সংকীর্তন॥ —ঐ

২০১

হায়রে মন ভাবের তরী লাগল ঘাটেতে।
ভাল ঘাট দেখিয়া হাট বসালে
হাটের রসিক যারা জেনে কাজ করছে তারা
অনায়াসে রে পার করত্যাছে।
তারা প্রেম-রসেতে মগন হয়ে রসের মড়া হইয়াছে।
ও হাটে হরেক রঙের জিনিষ এইসাছে।
কত জন টের না পেয়ে বেড়ায় রঙের বাজারে
মালিক সব ঘৃণা করছে তারা আসলেতে
লোকসান দিয়া ফসল ধইরা টানতাছে॥ —ঐ

২০২

হরি বল মন নৌকা খোল সাধের জোয়ার বয়ে যায়।
তারা আগে আসে যায় ফিরে ফিরে চায়।

নেও না খেও না প্রেমতলায় ॥
পাছের মাঝি বড়ই পাজি, আগের মাঝি বড়ই ভালো,
ছয় জন মাল্লার এই মিনতি—
এক সময়ে বৈঠা বায়ো, নাও লাগাও না প্রেমতলায় ॥ —ঐ

২০৩

গুরু গোনার আজব কারখানা।
আসমানে তার আকরা বারি
সে বাড়ী কেউত জানে না ॥
আকায়াটি মেয়ে পরা তার উপরে বেহাল
পরা সে খানে বাউলের থানা
পাগল জনে সেই বাজারে বসে আছে
দেখলে যায় চেনা ॥ —ঐ

২০৪

নিম্নোদ্ধৃত গানটি শোক-সঙ্গীত (funeral song)। ইহার মধ্যে বাউল গানের কোন ভাব নাই। সাধারণ বৈরাগ্যমূলক গান রূপে ইহা বাউল বলিয়া বিবেচিত হয়।

খ্যাপা, তুই মইলে তোর সঙ্গে যাবে কে রে,
রইল রে তোর সাধের দোকানদারি।
কেহ কাটে ঝাড়ের বাঁশ কেহ পাকায় দড়ি,
চার জনায়রে কান্দে লয়ে দিবে হরি ধ্বনিরে ॥
যে মুখে খাইছে খ্যাপা ফল বাতাসা চিনি।
সেই মুখে দিবে খ্যাপা জ্বলন্ত আগুনি ॥ —ঐ

২০৫

বিধি যার কর্মে যা লিখেছে সে দুঃখ কান্দ্‌লে যায় না।
দুখী জনা দোকান করে, দুঃখের বোঝা মাথায় লয়ে
চলে গো ভবের হাটে।
সুখী জনা দর করে না, দর করে দুঃখী জনা,
কেহ থাকে গাছের তলে কেহ থাকে দালান কোঠায়।
সে দুঃখ কান্দলে ত পাশরে না, কান্দ্‌লে ত যায় না ॥ —ঐ

২০৬

পাখী বলিতে সর্বদাই আত্মা বুঝায়, এখানে তাহাই বুঝাইয়াছে। তবে এখানে রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর রূপক অবলম্বন করিয়া গানটি রচিত হইয়াছে, বাউল গানে সাধারণত রাধাকৃষ্ণের রূপক ব্যবহৃত হয় না। যদিও ক্রমে চৈতন্য ধর্মের প্রভাববশত চৈতন্যের নাম ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি রাধাকৃষ্ণের সাধারণ লীলাপ্রসঙ্গ বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা অনুসরণ করিয়া বাউল গানে স্থান লাভ করে নাই। ক্রমে রাধাতত্ত্ব ইহাতে একটি তত্ত্বরূপে স্থান লাভ করিয়াছিল, কিন্তু রাধার কাহিনী ইহাতে কোন গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

উড়াছে সাধের পাখী উড়াছে মনের পাখী।
তাইতে এলাম তোদের দেশে মথুরায় সাক্ষী॥
পাখীর নাম ছিল হীরা,
মনের অযতনে আইল পাখী এই না দেশে উইড়া।
মনে বলে, ওরে আত্মারাম আরাম বসে সদাই
ডাকে শ্রীরাধারি নাম॥
আমি ত ও পাইছি মধুপুরেতে, সে পাখী কুব্জা ধরিয়াছে।
আমার সেই পাখী যে ধইরা দিবে
আমি তার চরণেতে বাঁধা থাকি॥ —ঐ

২০৭

সোনার পাখী রূপের খাঁচায় কেমনে ছাইড়া যায়।
আড়ার উপরে বইসে পাখী, চারত দিকে ঘুরায় আঁখি,
ছিক্‌লি কাইটা উড়ে পাখী
কোন দেশে লুকায়, কোন দেশে পালায়।
সোনার পাখী রূপের খাঁচায় কেমনে ছাইড়া যায়॥
আগুণ পানি মাটির হাওয়া চাইর দিকে দেহ আঁটা,
এক কানি সে নরম পাইলে সেহান যায়।
অদিনের বন্ধু চাঁদ বলে, ও তুই পাখী ধরবি কোন কলে,
কামের মুরশিদ ধইরলে পরে পাখী ধরা যায়
পাখী চেনা যায় ভবে॥
সোনার পাখী রূপের খাঁচায় কেমনে ছাইড়া যায়॥ —ঐ

২০৮

অনুরাগের ঘরে মাররে চাবি যদি রূপনগরে যাবি।
শোনরে, মন, তোরে বলি, তুই আমাকে ডুবাইলি,
পরের ধনে মৌকা পালি সে ধন তুই আর কদিন খাবি।
অনুরাগের ঘরে মাররে চাবি যদি রূপনগরে যাবি॥
গাছ রইয়াছে অগাধ জলে শিকড়েতে ফুল ফুইটাছে,
ফুইলে ফলে ঢেউ খাইতেছে নজর কইরলে দেখতে পাবি।
অনুরাগের ঘরে মাররে চাবি যদি রূপনগরে যাবি॥

বাউল গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'ভাষার সরলতায় ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না। তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোক সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করিনে।'—হারামণি, ভূমিকা, পৃ. ২। এই গানগুলি তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

২০৯

আপন আপন বইলে
দিবানিশি পাগল হইলে।
চিনলি নারে পিতামাতা
চিনলিনা রে বিশ্বপিতা
আপন আপন বইলে দিবানিশি পাগল হইলে॥
মানব কুলে জন্ম নিয়ে কতই কীর্তি করিলি।
পাপের বোঝা বইতে বইতে সারা জীবন মরিলি।
আপন আপন বইলে দিবানিশি পাগল হইলি॥

২১০

পথে পথে মালা গাঁইথা বেড়াও হেসে খেলে॥ ধ্রু॥
খাইটবেনা তোর জারি জুরি ভারি ভুরি, ও মন,
ডিগ্রী এলে বেড়াও হেসে খেলে॥ ধ্রু॥
আহ্লাদে আটখানা হইলে
এখন গোলমালে গোল বাঁধাইলে
ভুলে যাও বুদ্ধিসুদ্ধি, ও মন, কুরসাতলে বেড়াও হেসেখেলে॥ ধ্রু॥

নবদ্বারে পইড়বে চাবি তিলে তিলে খাবি
পইড়ছে বাবুর ঘোড়ায় তুমি হারিয়ে যাবে ষোল আনা॥ —ঐ

এখানে ডিগ্রি শব্দের অর্থ মোকদ্দমার ডিক্রি (decree)। কাহারও বিরুদ্ধে মোকদ্দমা যদি ডিক্রি হইয়া যায়, তবে তাহার হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার কথা নহে। কি করিয়া ইহা খারিজ করা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু যে বাউল, বিষয়ের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ নাই। সুতরাং তাহার পক্ষে ডিক্রিও যাহা, ডিসমিসও তাহাই। বিষয়-চিন্তায় সর্বদা সমান উদাসীন।

২১১

না ছিল দিন রজনী তখন ভানু কোথায় ছিল,
কার রং কার মিশে ছিল, সাঁই, পইরে প্রকাশ হইল।
নেরে কারে তাম্বুর গোড়া মৈথুনে জুবান হইলো,
গোপীর ঘরে আসন কইরে নিরঞ্জন তারকাই সাজিল।
হাওয়ায় তিথি চন্দ্রামতী গোঞ্জিয়ে ফুলে বসিল
সাঁই উজ্জন বলে, শুনে মাদারে সেই ফুলে
ওজনে হইল সইরে প্রকাশ হইল। —ঐ

২১২

মায়া আবরণের ঐ পারে শ্রীগুরুগোষ্ঠের হাট লেগেছে।
গৌর গৌর সবে বলে, শুধু মুখের কথায় কি গৌর মিলে।
গৌর দেশে না গেলে॥
যত ধনী জ্ঞানী অনুমানি তারা হাটের খবর না জানে,
তারা খুঁজিয়ে বেড়ায় বাহিরে ভরা গৌর রঙ্গে।
অনুরাগী সর্বত্যাগী তারা ঐ হাটে সদায় ফেরে॥
দেখবি যদি তাদের খেলা, চল যাই নদীয়ার জেলা,
জানবি রাধারে চার যুগে যত খেলা একই হাটে আছে খোলা।
ও মেলা দেখতে হয় দূরবীণ ধরে
হাটের মূল মহাজন রাইকিশোরী গদিয়ান
গৌরাঙ্গ হরি জিনিষ দেয় যারে তারে॥
হাটের রাজা নিত্যানন্দ দপ্তর স্বরূপ রসগঞ্জ।

বিকায় বদলে নীতার হাটে নিক্তির কাঁটা দেয় সে।
পাঁচটা নেয় সে পাঁচটা সেই রোজনকার
রতি-মাশা কমি হলে সেই হাটে নাহি চলে
দাহিন মাল সব দেয় ফেলে॥
আন যদি মাল সাধিত করে
জাতি সাপের লেঙ্গুর ধরে অবোধ লোক মরে॥
প্রকৃতির সঙ্গ দোষে পথ হারালি শ্রীরূপ রসে
ও তুই ডুবলি শৈশব সাগরে॥
বলাই চাঁদের আজব কথা লোকে শুনি লাগে ধান্দা
মাথা যায় ঘুরে॥ —ঐ

২১৩

নিম্নোদ্ধৃত গানটি প্রকৃতপক্ষে শিবের গান। শিবকে বাউল বলিয়া মনে করা হয়; তথাপি শিবের গানের শিরোনামায় ইহা মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক ছিল—

সমুদ্দুরে ছিলেন শঙ্খ শঙ্খ আনলেন কে।
মহাদেব আইনাছে শঙ্খ জীব তরাইতে॥
সোনার বাটায় আগর চন্দন রূপার বাটায় তৈল।
হাসিতে খেলিতে গৌরীর চান করিবার বেল॥
চান করিবার উঠে গৌরী ধেন করিবার যায়।
গৌরী হতে অধিক রূপ শঙ্খ দেখা যায়॥
শঙ্খটি দেখিয়া গৌরীর মনেতে আহ্লাদ।
এই শঙ্খ চাব আমি শিবের সাক্ষাৎ॥
তোমায় বলি, ওহে শিব, বলি যে তোমারে।
রাম-লক্ষ্মণ দুটি শঙ্খ পরাও যে আমারে॥
চালে নাইরে ছোন বোন বাতাসে উড়ায় হাঁড়ি।
কি দিয়ে পরাবো শঙ্খ, গৌরী গো সুন্দরী॥
জানি জানি তোমার বাপে বড় ধনী।
খাইতে না দেয় ভাঙ্গের গুঁড়া, বসতে না দেয় পিঁড়ি॥
বাপের বাড়ী যাক হে গৌরী তাতে নাই হে মানা।

কার্তিক গণেশ দুটি পুত্র থুয়ে যাও হে বাধা ॥
জেনে এস, ওরে শিব, প্রতি ঘরে ঘরে।
কোলের ছেলে বাধা থুইয়া কেবা নাওর করে ॥
কাতিকে লইলো কালে গণেশকে লইলো হাতে।
ধীরে ধীরে চলে গৌরী নায়র করিবারে ॥
নারদ বলে, ওহে, মামা, বুদ্ধি নাহি তোর।
বয়স কাইলা মামী আমার পাঠাইলা নায়র ॥
যাবার দে রে, নারদ ভাগিন, উহার বাপের বাড়ী।
উহাকে ছাড়িয়া আমি আড় করিয়া থাকি ॥
এ যোতে নারদ মুনি বিবাদ নাহি পায়।
দুই হাতে দুই খড়ি লইয়া ঘটঘটি বাজায় ॥
এ যোতে নারদ মুনি বিবাদ নাহি পায়।
এক খেতের উরা লইয়া আর এক খেতে ফলায় ॥
ঠকঠকি বাজাইয়া নারদ করিল গমন।
দক্ষের ভবনে যাইয়া দিল দরশন ॥
দক্ষের মেয়া হও গো তুমি আমার হও মামী।
শিব মামার আরক্ বিয়ার ঘটকদার আমি ॥
কি বলিলি, নারদ ভাগ্না, আবার বল শুনি।
শুখনা কাঠেতে যেন জ্বালাইলি আগুনি ॥
কাতিক গণেশ দুইটি পুত্র মনের তনয়।
ইহা থুয়ে বুড়া শিব বিয়া করতে যায় ॥
এতেক বলিয়া গৌরী করিল গমন।
শঙ্খের দোকানে যাইয়ে দিল দরশন ॥
তোমাকে বলি শাখারুর ছেলে বলি যে তোমারে।
রামলক্ষ্মণ দুইটি শঙ্খ পরাও যে আমারে ॥
এতেক শুনিয়া শাখারুর ছেলে ভাবিতে লাগিল।
রামলক্ষ্মণ দুইখানি শঙ্খ মায়ের হাতে দিল ॥
শোনরে, শাখারুর ছেলে, বলি যে তোমারে।
শঙ্খের উচিত মুল্য বলে দেও আমারে ॥

মাগো, শঙ্খের উচিত মুল্য ঐ রাঙ্গা চরণ।
মলে যেন স্থান পাই কৈলাস ভুবন ॥
শঙ্খটি পরিয়া গৌরী করিল গমন।
কৈলাস ভুবনে যাইয়া দিল দরশন ॥
ধন্য লতা ধন্য পাতা ধন্য কৈলাস ভুবন।
এক যানে হরগৌরী করিল গমন ॥ —ঐ

২.৪

হবেরে বিষম কাণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড যেদিন তোমার ছাড়তে হবে।
তখন তোর রোজগারের ধন,
স্ত্রী পরিজন কেহ নাহি সঙ্গে যাবে।
লইয়ে নগদ রেস্ত সবাই ব্যস্ত তোমায় ফিরে না চাহিবে ॥
তোমার সব টাকা-কড়ি দৌড়াদৌড়ি
সামলে রেখে কাছে যাবে।
তখন বলবে স্পষ্ট, হায়, কি কষ্ট তখন এ প্রাণ বাহির হবে ॥
হলে তোর সময় খাঁটি প্রাণ-পাখীটি দেহ ছেড়ে উইড়ে যাবে ॥
এসে তোর জ্ঞাতিরা সব লয়ে তোর শব
সন্ন্যাসীর বেশ সাজাইবে ॥
মন রে, তোর হাতী ঘোড়া পাল্কী বজরা
সকল সম্পদ কেড়ে নেবে।
চড়াইয়ে বাঁশের খাটে শ্মশান ঘাটে
মন তোমায়, বিদায় দেবে ॥ —ঐ

বাইচের গান

নৌকা বাইচের গান (পুর্বে দেখ)কে পুববাংলায় সংক্ষেপে বাইচের গানও বলা হয়। বাইচ খেলার গান, সারি গান, নৌকা দৌড়ের গান ইত্যাদি বলিতেও নৌকা বাইচের গান বুঝায়। সারি গান (পরে দেখ) এবং নৌকা বাইচের গান (পুর্বে দেখ) সম্পর্কে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

বাঘনাচের গান

বাংলার কোন কোন পল্লী অঞ্চলের একটি লৌকিক উৎসব বাঘ নাচ। বাঘনাচ উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বাঘনাচের গান। নাচের গান বলিয়া ইহা যে তাল-প্রধান, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণত ইহারা মন্ত্র বা ছড়া জাতীয় হইয়া থাকে। বাঘে কামড়াইলে মন্ত্র বলিয়া যে ঝাড়িতে হয়, ইহা সাধারণত সেই মন্ত্র। বাঘের সাজে সজ্জিত হইয়া কোন কোন লৌকিক উৎসব পালন করা হইয়া থাকে, তাহাতে বাঘরূপী মানুষের মুখে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও বাঘ নাচের গান। বর্ধমান হইতে এই শ্রেণীর সুদীর্ঘ গীতি কাহিনীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ('বাংলার লোক-সাহিত্য', ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

১

ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি আতা,
নেড়ে চেড়ে দেখ্‌রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে মাথা।
ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি পান,
নেড়ে চেড়ে দেখ্‌রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে কান!
ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি মুড়ি,
নেড়ে চেড়ে দেখ্‌রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে ভুঁড়ি।
ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি কুক্‌ড়ো,
নেড়ে চেড়ে দেখ্‌রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে বুকড়োও। —বর্ধমান

ঝাড়াশে গান

মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে এক শ্রেণীর গান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাকে ঝাড়াশে গান বলা হইয়াছে। কেন যে ইহার এই নাম হইল, এই নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই যে কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বারমাসীগানের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। পূর্বে জালের বারশে গান নামে এক শ্রেণীর গানের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক আছে কিনা, জানা যায় না। গানের মধ্যে ভাবের কোন সঙ্গতি দেখা যায় না, সেইজন্য রচনারও কোন উৎকর্ষ নাই। একটি নিদর্শন এই—

১

রাম রাম বল সবেরে রাম কেমন জনা।
দুই হস্তে শ্রবণের বালা রামের গলায় সোনার মালা॥

মাঠে থাক ধেন চরাও তোমার রাখালের মতি।
তুমি কি রাখিতে পারিবা গোপন পিরীতি॥
সোনা বাঁধা রামের হুঁকা রূপো বাঁধা কলি।
আগুন আনার উছলৎ করি যেও আমার বাড়ী॥
এক দেউড়ী, দুইও দেউড়ী, রাম, তিন দেউড়ী হ'ল।
চার দেউড়ীর মধ্যস্থলে রামের হাতে দড়ি পড়লো।
সোনার গায়ে বেতের বাড়ি রাম সহিতে না পারি।
হাতের কঙ্কণ বাঁধা থুয়ে জামিন হব আমি।
শাড়ীর অঞ্চল চোখে দিয়ে কাঁদে রাজরাণী॥ —মুশিদাবাদ

বাঁধনা পরবের গান

রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিম সীমান্তবর্তী স্থানে কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে যে গো-পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা বাঁধনা পরব বলিয়া পরিচিত। ইহাতে অনুষ্ঠানিক ভাবে গো-পূজা উদ্‌যাপন করিয়া নৃত্য, সঙ্গীত ও বাদ্য সহযোগে নানাভাবে গো-মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ গরু বা মহিষ নাচানো। শক্ত খুঁটিতে একটি বলিষ্ঠ মহিষ কিংবা ষাঁড়কে বাঁধিয়া তাহাকে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া ক্ষিপ্ত করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। পূর্বে এই ভাবে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া ইহাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হইত। বর্তমানে কেবলমাত্র লাঠি দিয়া খুঁচাইয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে ইহাকে ঘিরিয়া যে নৃত্যগীত চলিতে থাকে, তাহাতেই বাঁধনা পরবের গান প্রধানত শুনিতে পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে কাঁড়া বা মহিষের জন্মকথা কীর্তন করা হয়—

১

শিকড় ভুঁইয়ে রে কাঁড়া তোরি জনমরে।
সাত ভুঁইয়ে লিল্‌হে গৃহবাস॥
গোলয় ভাছিঁ পালবে শুলিনে পুষিবে
বাগালে তো ডাকে ভোমরা নাম রে ওহিরে। —বাঁশপাহাড়ী

২

জাগ মা, ভগবতী, জাগ মা লক্ষ্মী,
জগতে আমবস্যা রাইত
জাগে কা পতিপদ (প্রতিপদ)
দেবে গা মাইলান
পাঁচ গুঁতা দশ ধেনু গাই আজিকার দিয়ে বরদা,
জাগি সতী লেবে, জাগোত আমবস্যা রাইত
সিংহে হে লিবে, বরদা ফুল হরি তেল
মুখেত লিঅ কাটা ঘাস।
আজি বরদা তোদেরই পরবরে।
দেহ দেহ দেহ লক্ষ্মী,
লাখ ভরি শিশরি বাড়ুক লাখে লাখে
আর যে আসিবে বন্দনা পরব রে। —ঐ

বান্দুটি গান

নীলের গাজন উপলক্ষে এক শ্রেণীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে কহ কেহ বান্দুটি গান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার এই নাম কি করিয়া হইল, এই নামের অর্থই বা কি, তাহা জানিতে পারা যায় না। এই গানের বিশেষত্ব এই যে, ইহা ধীর লয়ের গান। ইহা সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। রাধাকৃষ্ণ এবং রামায়ণের প্রসঙ্গ ইহারও বিষয়। সাধারণত ইহাতে করুণভাব প্রকাশ পায়—

১

ও ভাই, সত্য বল, না করো না ছলনা,
প্রাণের ভাই, লক্ষ্মণ, গুণমণিরে।
শূন্য রথ লয়ে আলি রে আলয়ে,
কোন বনে রেখে চন্দ্রমণিরে॥
মম মন্দ মতি পতি হয়ে সতী,
বিনা দোষে দিলাম বনবাস,
না ভাবিলাম ত্রাস, গর্ভ পঞ্চমাস,
করি গর্ভনাশ হৈল সর্বনাশ।

শুনিয়া কুজনার কুবচন, হিতাহিত চিতে না করিলাম মোচন,
তেজিলাম জনক-নন্দিনীরে ॥
সীতা নিরীক্ষণ না করে লক্ষ্মণ, প্রাণ যায় যায় না যায় লক্ষ্মণ,
ইচ্ছা হয় মন, গরল ভক্ষণ করি, মরি বিলক্ষণ।
পুন না করিব ঐ মুখ দর্শন, বিনা দোষে করিলাম উপক্ষণ,
বনে দিলাম এককিনী রে ॥ —মুর্শিদাবাদ

রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, হরগৌরী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক গানই এই উপলক্ষে গাওয়া হইতে পারে। কেবলমাত্র সুরগত বৈশিষ্ট্য দ্বারাই ইহার স্বকীয় পরিচয় প্রকাশ পায়। উনবিংশতি শতাব্দীর কবিওয়ালার গানের কিছু কিছু লক্ষণ ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে।

বারমাসী, বারমাস্যা

বাংলার বর্ণণামূলক প্রেম-সঙ্গীতের একটি অংশের নাম বারমাস্যা বা বারমাসী। ইহাতে নায়িকার বারমাসের সুখদুঃখের, প্রধানত দুঃখের কথা বর্ণিত হয়। বাংলা দেশের বাহিরেও লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনার সাক্ষাৎকর লাভ করা যায় (শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 'ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা' দ্রষ্টব্য)। চেকোশ্লোভিকিয়ার পণ্ডিত ডুসান জাবিতাল এই বিষয় লইয়া বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন (The Development of the Baromashi in the Bengali Literature, Arehiv Orientani 29, 1961, pp. 582-619). বিস্তৃততর আলোচনা ও উদ্ধৃতির জন্য, 'বাংলার লোক-সাহিত্য' তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৪৪-৮৪ দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধিকার বারমাস্যা

১

মাঘে মথুরায় গেছেন শ্রীমধুসূদন।
দশদিক শূন্য নেহারি নব বৃন্দাবন ॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ আগুন চিত্তে ওঠে রোল।
গোকুলে গোবিন্দ নাই মোর কে করিবে দোল ॥
কে করিবে রাসলীলা কে সাজাইবে দান।
কে আর বাজাবে বংশী কে ভাজিবে মান ॥

চৈত্রে কেকিল পাখী ডাকে কুহু কুহু।
নীলকণ্ঠে না দেখিয়ে নিকুঞ্জ কঠোর।
বৈশাখ মাসেতে কৃষ্ণ হলেন গুণমন্ত।
সেই অবধি শ্রীরাধিকার দুঃখের নাই অন্ত॥
জ্যৈষ্ঠেতে যমুনার জল খেলিতেন বনমালী।
শ্যাম অঙ্গে দিতাম জল অঞ্জলি অঞ্জলি॥
আষাঢ়ে কালিয়া মেঘ ভ্রমরে গুঞ্জরে,
কৃষ্ণ বরণ মেঘ দেখে প্রিয়া মনে পড়ে॥
শ্রাবণ মাসেতে সব সঙ্গের সঙ্গতি।
একত্তর হয়ে সবে গাঁথিতাম মালতী॥
ভাদ্রে ভরিল নদী অকুল পাথার,
কেমনে আসিবেন প্রভু না জানেন সাঁতার॥
আশ্বিনে অম্বিকা পুজা প্রতি ঘরে ঘরে।
অবশ্যই আসিবেন প্রভু অষ্টমীর ছলে॥
কাতিকে করিলেন কৃষ্ণ কালিয়দমন
সর্বসখি গাঁথি হার অঙ্গের ভূষণ।
অগ্রাণে শুনেছিলাম অপরূপ কথা
মথুরায় পেয়েছেন প্রভু নব ডাণ্ডার ছাতা।
পৌষে পাঠালাম পত্র প্রিয় সখির হাতে
না চিনে মথুরার পথ কে বা যাবে সাথে।
কেবা যাবে মোর সাথে কে বা আছে আর,
মথুরায় যেয়ে কৃষ্ণ ভুলেছে আমার॥ —ঝাড়গ্রাম

২

মাঘেতে মাধব কইলেন মথুরায় গমন।
দশদিক অন্ধকার আর বৃন্দাবন।
ফাগুনে দ্বিগুণ দুস্কো চিতে উঠে রোল,
গোকুলে গোবিন্দ নাই কে সাজাবে দেউল।
চৈতে চাতকীর খেলা নিকুঞ্জ মন্দিরে,
কুহু কুহু রব করে পরাণ বিদরে।

বৈশাখে রোদের তাপ অঙ্গ পুড়ে যায়,
তাহতে অধিক তাপ কৃষ্ণ ছেড়ে যায়।
জেষ্ঠেতে যমুনায় খেলতেন বনমালী,
শ্যাম অঙ্গে দিতেন জল অঞ্জলি অঞ্জলি।
আষাঢ়ে নূতন মেঘ ছাড় হে গজান,
দিনে দিনে বহে যায় নব যৈবন।
শ্রাবণে ঘন বরষা না শুকাইল চুল,
আমরা নারী বিরহিণী হয়েছি আকুল।
ভাদ্রেতে ভরায় নদী দুকুল পাথার,
আমরা নারী বিরহিণী না জানি সাঁতার।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা সর্বঘরে খুশি,
যার ঘরে স্বামী নাই ঝরে দিবানিশি।
কার্তিকে কালীয় দমন করেছিলেন হরি,
ফুটিল চম্পক লতা কি রূপ মাধুরী।
অগ্রাণে হিমের জনম তনু কাঁপে শীতে,
শয়ন বস্ত্র ভিজে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে।
পৌষে পাঠালে পত্র প্রিয় সখীর হাতে,
আসিবে কি না আসিবে দেখিব সাক্ষাতে। —মেদিনীপুর

৩

মাঘেতে মাধব কলি মথুরায় গমন
দশদিক শূন্য হেরি নব বৃন্দাবন।
ফাল্গুনে দ্বিগুণ দুঃখ চিত্তে ওঠে রোল,
চৈত্রেতে চাতক পাখী নিকুঞ্জ মজিয়ে
পিয় পিয় রবে ডাকে উচ্চৈস্বরে।
বৈশাখে বিদেশে গেছে গুণের গুণমণিরে
তা দেখিয়া শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ মনে পড়ে।
জ্যৈষ্ঠের যমুনা জলে খেলিতেন বনমালী
শ্যাম অঙ্গে জল দিতাম অঞ্জলি অঞ্জলি।
আষাঢ়ে নবীন মেঘ ভ্রমর গুঞ্জরী

তা দেখিয়া শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ মনে পড়ে।
শ্রাবণে সকলে মোরা লয়ে প্রিয় সাথী
বনে বনে ভ্রমি গাঁথিতাম মালতী
ভাদরে ভরায় নদী দুকুল পাথার
কেমনে হইব পার না জানি সাঁতার।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জনগণে,
অবশ্য আসিবে প্রিয় অষ্টমীর ক্ষণে
কার্তিকে করিল কৃষ্ণ কালীয় দমন,
অগ্রাণে শুনেছে সখী অপূর্ব কথন।
পৌষেতে পত্র লিখিছিলাম সখীর হাতে
কে যায় গো মথুরাতে লোক নাহি সাথে॥

—বেলপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

৪

মাঘেতে মাধব কইলেন মথুরায় গমন
দশদিক শূন্য হেরি মধুর বৃন্দাবন।
ফাগুনে দ্বিগুণ দুখ চিত্তে উঠে খেদ
কে করিবে রাসলীলা কে সাধিবে দাস।
কে বংশী বাজাবে রাধার কে ভাঙাবে মান
চৈত্রে চাতক পাখী নিকুঞ্জে কুহরে
কুহু কুহু রব করে ডাকে উচ্চস্বরে।
বৈশাখে রবির তাপ লাগে চাঁদ মুখে
অভাগিনী শ্রীরাধার শেল বাজে বুকে।
জ্যৈষ্ঠেতে যমুনার জলে খেলিতেন বনমালী।
শ্যাম অঙ্গে জল দিতাম অঞ্জলি অঞ্জলি।
আষাঢ়ে নবীন মেঘ ডাকে ঘনঘন।
অভাগিনী শ্রীরাধার ঝরে দুনয়ন॥
শ্রাবণে বর্ষাধারা ঝরে বিন্দু জল,
এমন সময় বন্ধু আমার রহিল কোথায়।

ভাদরে ভরিল নদী দুকুল পাথার,
কেমনে হৈব পার না জানি সাঁতার।
সে অবধি যাব না বধূ যায় না, সখি, মথুরা মাঝার,
আশ্বিনে অম্বিকা পুজা করেন জগজনে,
অবশ্য আসিবেন কৃষ্ণ অষ্টমীর ক্ষণে।
কার্তিকে লিখিলাম পত্র প্রিয় সখীর হাতে,
এমন কেহ সখি আছে পত্র নিয়ে যাবে।
অঘ্রাণে হেমন্ত ঋতু তবু কাঁপে শীতে।
ভিজিল পুষ্পের শয্যা কান্দিতে কান্দিতে।
পৌষেতে পরমানন্দ ঘরে পিঠালাঠা। (অসম্পূর্ণ)

—বাঁশপাহাড়ী (ঐ

৫

মাঘেতে মাধব কইলেন মথুরায় গমন
দশদিক শূন্য হেরি নব বৃন্দাবন।
ফাগুনে দ্বিগুণ দুঃখ চিত উতরোল
গোকুলে গোবিন্দ নাই কে করিবে দোল।
চৈত্রে চাতকী পক্ষী নিকুঞ্জ মন্দিরে
প্রিয়া প্রিয়া বলিয়া ডাকে উচ্চৈস্বরে।
বৈশাখে বিষম রৌদ্র প্রিয়া নাই সঙ্গে
কুসুম কস্তুরি চুয়া দিতাম শ্যাম অঙ্গে।
জ্যৈষ্ঠেতে যমুনার জল খেলেন বনমালী
শ্যাম অঙ্গে দিতাম জল অঞ্জলি অঞ্জলি।
আষাঢ়ে নবীন মেঘ করয়ে গর্জন
হেন কালে বয়ে যায় এ নব যৌবন।
শ্রাবণ মাসেতে সখী দুকুল পাথার
তদবধি যাই না মোরা যমুনার পাড়।
বার মাসেকের ফল ভাদ্রেতে কি আয়া,
হের যৌবন কালে ছেড়ে গেল প্রিয়া।

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা আনন্দিত মনে
অবশ্য আসিবেন কৃষ্ণ অষ্টমীর দিনে।
কার্তিকে কালিয়ার রূপ ধরেছিলেন হরি
আয়ানের ভয়ে কৃষ্ণ কালি পূজা করি।
অগ্রাণ মাসেতে সখী শরৎ সুসার
তদবধি যাই না মোরা যমুনার পার।
পৌষেতে পঞ্চম নদী বহত উজানী
এই বারমাস কথা শুন, দিনমণি॥ —ঐ

৬

নিম্নোদ্ধৃত বারমাসীটিকে কন্যার বারমাসী বলা যায়। স্বামিগৃহ হইতে পিতৃগৃহে যাইতে উৎসুক কন্যার বেদনা ইহার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে—

বোশেখে দেখ না, মাগো, খরা তালু পুড়া ;
বিল থাইক্যা পানি আনি কাঙ্কে লইয়া ঘড়া।
(তোমার) অভাগী কন্যারে মাগো, নাইওর নিলা না।
আম পাকে কাঁঠাল পাকে, জ্যৈঠ মাসের রোদে ;
সোনা ভাইরে থাইতে দিও, রস করা দুধে।
(তোমার) অভাগী কন্যারে মাগো, নাইওর নিলা না।
মাগো মা—আষাঢ়ে আইল মেঘ, কান্দি রাত্রিদিন,
নাও লইয়া সোনা ভাইর আইবার নাইকো চিন্।
(তোমার) অভাগী কন্যারে, মাগো, নাইওর নিলা না।
আশ্বিনেতে আইলা, মাগো, আইলা নিজের দেশে,
এই অভাগীর কপাল পোড়া, রইল পরবাসে !
(তোমার) অভাগী কন্যারে মাগো, নাইওর নিলা না।
(মাগো) কার্তিক মাসে কার্তিক পূজা কর কারে লইয়া ?
তোমার কন্যার দিন যে যায় কান্দিয়া কান্দিয়া।
(তোমার) অভাগী কন্যারে, মাগো, নাইওর নিলা না।
আঘন মাসে নতুন ধান মরাইএতে ভরে,
নতুন চাউলের পিঠা পুলি পৌষ মাসেতে করে।

(তোমার) অভাগী কন্যারে, মাগো, নাইওর নিলা না।
মাঘ মাসের জাড় মাগো, বুক ভাঙ্গিয়া যায়,
ফাল্গুন মাসের আগুন, মাগো, কুলায় না কাঁথায়,
(তোমার) অভাগী কন্যারে, মাগো, নাইওর নিলা না।
চৈত্ মাসের খরায় মাগো, পুড়্যা করল ছাই—
তোমার বুকে মাথা রাখ্যা, কেম্নে প্রাণ জুড়াই ?
(তোমার) অভাগী কন্যারে, মাগো, নাইওর নিলা না ! —কাছাড়

৭

ওগো আমি ভাবি মনে
কি করে কাল কাটাব, ভাই, তোমার সনে।
চৈত বৈশাখ মাসে সতত বসন্ত আসে।
কুহুস্বরে বিঁধে যে পরাণ।
আমি ভাবি মনে—
কি করে কাল কাটাব, ভাই, তোমার সনে।
জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে সতত বসন্ত আসে,
বল, ভরা যৌবন রাখিবা কেমনে
আমি ভাবি মনে
কি করে কাল কাটাব, ভাই, তোমার সনে।
আশ্বিন-কার্তিক মাসে
সতত থাকি তোমার আশে
তোমায় না দেখিলে প্রাণ থাকিবে কেমনে ?
কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে
সতত বসন্ত আসে
কোকিলার কুহুস্বর বিঁধে যে পরাণে।
আমি ভাবি মনে।
চিন্তামণি ভেবে বলে
পড়ে প্রভুর পদতলে
আশা করি এই দুইজনের পড়ি আমি শ্রীচরণে —মেদিনীপুর

৮

চৈতেতে মধু মিষ্টি বৈশাখেতে আম,
আহা জৈষ্ঠেতে আম মিষ্টি শোলমাছে আম ॥
তারামণি খেলতে মন সরে না, নীল সরোবরে খেলতে গো।
আষাঢ়ে কাঁঠাল মিষ্টি শ্রাবণে খৈ-দৈ,
ভাদরে পাকা তাল, গো তারামণি।
খেলিতে মন সরে না নীলসরোবরে ॥
আশ্বিনে গুড় মিষ্টি আর কাতিকে ওল গো,
তারামণি, খেলিতে মন সর না নীল সরোবরে খেলতে গো।
অগ্রাণেতে নতুনান্ন চ্যাং মাছের ঝোল গো,
তারামণি, খেলিতে মন সরে না নীল সরোবরে খেলতে গো।
পৌষেতে মূলা মুড়ি দুদ্ আউটা
কলাপাকা আরো বাঁকা পিঠা গো,
তারামণি, খেলিতে মন সরে না, নীল সরোবরে খেলতে গো।
মাঘেতে শিম মিষ্টি ফাল্গুনে দ্বিগুণ মিষ্টি,
বুড়া বেগুন নিম গো, তারামণি,
খেলিতে মন সরে না নীল সরোবরে ॥ —পচাপানি (ঝাড়গ্রাম)

চৈত্র মাসে চৈত সংক্রান্তি—রুই মাছ আম,
ওলো তারামণি—আর আমি খেলব না জলে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে আম জাম আষাঢ়েতে কাঁঠাল
শ্রাবণে পাকা তাল আর ভাদরেতে পাকা পান।
ওলো, তারামণি, আর আমি খেলব না জলে।
আশ্বিনেতে গুড় মিষ্টি
অগ্রাণেতে নবীন ধানের ভাত, চ্যাং মাছের ঝোল।
ওলো, তারামণি, আর আমি খেলব না জলে।
পৌষ মাসেতে মূলা মুড়ি, বাঁকা পিঠিয়া, কাল কাটি।
ওলো তারামণি, আর আমি খেলব না জলে। —ঐ

মাঘেতে মধু মিষ্টি,
ফাগুনে দ্বিগুন মিঠা বুড়া বেগুন আর সিম।
ওলো তারামণি আর আমি খেলব না জলে। —ঐ

বিভিন্ন বারমাসীর বিস্তৃততর উদ্ধৃতির জন্য 'বাংলার লোক সাহিত্য' ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৪৪-৫৮৪ দ্রষ্টব্য।

বাল-সঙ্গীত, বালক সঙ্গীত

পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চল হইতে সংগৃহীত কয়েকটি গানকে স্থানীয় লোক বাল-সঙ্গীত বা বালক-সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। কেন ইহাদের এই নাম, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। রাধাকৃষ্ণ বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন বিষয়ই ইহাতে গীত হয়। এমন কি, বালকেরা যে ইহা সর্বদা গায়, তাহাও নহে; বেলপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম) গ্রামের বলাবতী মণ্ডল, ঝর্ণা মণ্ডল, রাধারাণী মণ্ডল এই তিনটি বালিকা নিম্নোদ্ধৃত প্রথম দুইটি গান গাহিয়া শুনাইয়াছে, অথচ গান দুইটিকে বাল-সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। তৃতীয় গানটি লক্ষীকান্ত দাস নামক একটি বালক গাহিয়াছে। মনে হয়, কৃষ্ণযাত্রায় সাধারণ রাখাল বালক সাজিয়া এই গান গাওয়া হয় বলিয়া ইহাদিগকে বালক-সঙ্গীত বলা হয়। মূলত ইহাদের সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রার সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয়।

১

দ্বারী, আমায় দ্বার ছেড়ে দাও আমি যাব রাজার বাড়ী,
পাপী তাপী রইলেম বসে প্রেম দরিয়ায়।
ভিক্ষা দে রে নগর বাসী আমি ভিক্ষা মেগে খাই।
ফাল্গুনে পুর্ণিমা নিশি, উদয় হলেন গৌর শশী,
মান করিলে আদর বাড়ে ঘরে ঘরে মান কে না করে। —ঐ

২

ও করুণা, বেঁধনা তো মেঘবরণ চুল,
দোকানেতে ধরে নাচকা ঝুমকো লতার দুল,
বেশ করেছি তোমার কি তায়
তোমার জ্বালায় পরাণ আমার
একটু ও কি বাঁচে।
বেশ করেছি তোমার কি তায়॥ —বেলপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

পুরুষ হয়ে বলতে মুখেতে বাঁধে না ত ছি,
দূরে হারিয়ে যাব কোন দুঃখে!
হারিয়ে যাব কোন দুঃখে।
এ দুনিয়াতে তোমার কন্যে যখন আছে
ও কন্যে যখন আছে।
ও কন্যে করো না আর আড়ি,
এই দেখ না হাটের থেকে এনেছি লাল শাড়ী,
হারিয়ে যাব কোন দুঃখে, হারিয়ে যাব কোন দুঃখে,
তোমার মত কন্যে যখন আছে॥ —ঐ

৪

মোরা গানের সুরেতে আজি বহাব উজান।
প্রেমের তরণী নিয়ে আসিবে প্রিয়
বিরহের জ্বালা, সখি, হবে অবসান।
মোরা গানের সুরেতে আজি বহাব উজান।
সে সুরে ফুটিবে ফুল মেপে খাবে অলিকুল।
বাতাসে আজ করিবে মধু দান,
আকাশের চাঁদ করিবে আজি সুধা দান,
মোরা গানের সুরেতে আজ বহাব উজান॥ —ঐ

৫

অন্তরেতে রব আমি বাহিরেতে রবে তুমি
আমিতো দিলাম, প্রভু, নিদ্রা, তুমি কর যন্না যাত্রা
বল বল বংশীধারী বাছরি না বাছুরী
কাজল কাজল চোখে বনময়ুর, ওরে, নাচে
কলা সন্দেশ খাব বলে নাচিতে লাগিল।
এসেছেন গৌর রূপে নিমাই ঠাকুর এই নদীয়ায়।
পাপী তাপী রইলাম বসে প্রেম দরিয়ায়॥ —ঐ

এই গানটির গায়িকা ঝর্ণা মণ্ডল, বয়স ১২। প্রথম গানটির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়।

বালার্কি

মুর্শিদাবাবাদ জিলা হইতে কতকগুলি গান সংগৃহীত হইয়াছে, ইহারা বালার্কি সঙ্গীত বলিয়া পরিচিত। পৌরাণিক নানা বিষয়ই ইহাদের মধ্যে গীত হয়, বিষয়-বস্তু কেবলমাত্র বালক-বালিকার উপযোগী নহে; সুতরাং বালার্কি শব্দের সঙ্গে বালক-বালিকার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। গীত-পদ্ধতির যদি কোন বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীও গানের নাম হইয়া থাকে। বালার্কি বা বালার্খি কোন অধুনা-লুপ্ত প্রাচীন গীত-পদ্ধতি হইতে পারে।

১

সীতা অস্ত সতী ছিল, মনস্তাপে বনে গেল নিদয় হইল প্রভু রাম,
পঞ্চ মাসের গর্ভবতী বনে গেল সীতা সতী মুনির পায়ে হইল প্রণাম।
লব যখন ভূমে পল মুনি তার নিকটে ছিল নাড়ী ছেদন করলেন বসুমাতা,
লবের দিন পুজিত হল, ষষ্ঠী পুজা নিত হল পুজা করলেন নারায়ণ।
লবকে মুনিকে দিয়ে জল আনে যমুনার ঘাটে, ফেরৎ কালে হইল সাক্ষাৎ।
লবকে দেখিতে পায় কুশকে মারিতে যায়।
সীতা বলে মেরোনা গো হবে লবের ভাই,
লবের বল বুদ্ধি ছিল বাণ শিক্ষা শুনি দীন প্রণাম হইল মুনির পায়।
মাগো, সীতের সিন্দুর বর্তমান, লজ্জাতে বাঁচে না প্রাণ।
জন্মে আমরা পিতা দেখি নাই,
থাকতো যদি তোদের পিতা বনে দিত প্রিয় সীতা
এনে দেখতো তোদের চাঁদ মুখ।
দুই পুত্র কোলে নিয়ে কাঁদে সীতা অভিমানে নয়নের জলে ভাসে বুক।
আশীর্বাদ কর তুমি রণেতে যাইব আমি যাওয়া মাত্র রণে হবে জয়।

—মুর্শিদাবাদ

২

নারদ বলে, গিরিবর, শিব নিন্দা করোনা বারংবার,
শিব নিন্দা করিও না আর
রাণী যেয়ে ঘরের দ্বারে, দেখেন জামাই মহেশ্বরে এমন সুন্দর রসময়।
শিব দুর্গার বিয়ে হয় সর্বলোকে দেখতে পায়
জয় জয়াকার দিয়ে আসে জন।

—মুর্শিদাবাদ

৩

কালা লজ্জা দিবে মনে করে
দুই হস্ত জোড় করতে বলে
সূর্য্যদিকে প্রণাম করতে বলে
একে একে গোপিনী, কাছে এস বিনোদিনী,
বসন দিব লয়ে যাও সকলে,
রাধে বলে, বংশীধারী, করিলে হে বসন চুরি,
লজ্জা সরম নাহি গো তোমার,
তুমি ব্রজগোপীর ঘরে, ননী খেতে চুরি করে,
চোরের স্বভাব গেল না তোমার।
ননীচোরা নামটি ছিল, বসন চোরা নামটি হইল,
ভাঙ্গা নায়ের মাঝি হলে তুমি। —ঐ

৪

বৃন্দাবনে ওগো, রাধে, পড়িলাম আজ অপ্রবাদে,
কেমনে যাইব ব্রজের পথে।
রাধে বলে একি হল, কেবা বসন হরে নিল
চেয়ে দেখ ঐ কদম্ব ডালে।
করিয়া বসন চুরি, বসে আছেন বংশীধারী
সারি সারি ডালেতে রাখিয়া,
কোথা হতে এসে কালা, ঘটালো আজ বিষম জ্বালা,
কেমনে যাইব মোরা বাড়ী।
প্রতিদিন আমি ঘাটে স্নান করি যমুনা তটে
কোন পুরুষে বসন চুরি করে,
পায়ে ধরি বিনয় করি বসন দেও হে, বংশীধারী,
ওহে কালা লজ্জা দিও না।
লজ্জা নাইকো তোদের বটে তাইতে তোরা আসিস ঘাটে,
নেংটা হয়ে নামিস কেন জলে।
জল হইতে উঠ সবে, এসো হে আমার নিকটে,
দুই হস্ত উর্ধ্ব দিকে তুলে। —ঐ

৫

একদিন সব সখি মিলে, স্নান করে সব যমুনার জলে
হেলে দুলে যায় ব্রজের নারী।
আনন্দে যমুনার জলে, স্নান করে কুতুহলে
অষ্ট সখী জল খেলা করে।
সখীগণ সব নামল জলে, স্নান করে কতুহলে
মনের আনন্দে করে খেলা,
শাশুড়ী ননদীর ভয়, মনে কিছু নাহি হয়,
জল খেলাতে হইয়া মগন।
দূরে হতে দেখে হরি, কেলি করে ব্রজের নারী
চুপে চুপে যায় ধীরে ধীরে।
নন্দের ব্যাটা চিকন কালা, ঘটালো আজ বিষম জ্বালা,
যমুনার তীরে গিয়া হরি।
চুপে চুপে গিয়া হরি, করিল সব বসন চুরি,
লম্ফ দিয়া উঠে কদম্ব গাছে।
জল খেলা করিয়া দেখে, বসন নাই যমুনার তটে,
কোন চোরে বা বসন চুরি করে। —মুর্শিদাবাদ

রাধাকৃষ্ণ এবং রামসীতার প্রসঙ্গ লইয়াই বালাকি গান রচিত হইলেও পুর্বেই বলিয়াছি ইহার এই নামের যে বিশেষ কি তাৎপর্য, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে ইহাদের গীত-পদ্ধতি বা গাহিবার বিশেষ ভঙ্গি আছে; বোধ হয়, তাহা হইতেই ইহাদের এই নাম হইয়াছে। প্রসঙ্গ বা বিষয়-বস্তুর অভিন্নতা সত্ত্বেও কেবলমাত্র গাহিবার ভঙ্গির মধ্যে যদি বিভিন্নতা থাকে, তবে বিভিন্ন নামে লোক-সঙ্গীতের পরিচয় হইয়া থাকে। এখানে তাহাই হইয়া থাকিবে। কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জিলা হইতেই এই শ্রেণীর গান সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা আঞ্চলিক সঙ্গীতেরও অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইতে পারে।

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতেও শ্রীরাধার বস্ত্রহরণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে—

৬

এই তো সভার মাঝে যত সখীগণ,
শ্রীরাধিকার বসন চুরি শুন দিয়া মন।

ললিতা বিশাখা আরও অন্যদেরে,
ডেকে বলে, ও লো দিদি, কে কে যাবে ঘাটে,
রাই যাবে যমুনার পথে দাঁড়ালে রাজঘাটে,
কে কে যাবি জল আনিতে শ্রীরাধিকার সাথে।
নামিল যমুনার জলে বসন রেখে তটে,
হাসি হাসি কালশশী বসন চুরি করে।
বসন নিয়ে উঠলো কানাই কদম্বের ডালে,
চরণ দুলায়ে বাঁশী রাধা রাধা বলে।
ডালে বসে কহে নাগর সরস অন্তর,
মুখেতে মিষ্ট কথা সরল অন্তর।
কান্ধে কুম্ভ নিয়ে সবে যাই সারি সারি,
এইখানেতে ছিল বসন কে করিল চুরি।
গোকুলার মধ্যে বসে তাহে মনোচোর,
করেছে বসন চুরি—আর ওকি নাগর।
বাম হস্ত উদরে দিয়ে ডান হস্তে চায়,
বসনগুলি দাও হে ফেলে, বাঁকা শ্যামরায়।
বসন পরিতে ত্যজে বসন পরেছিলো,
সকলের গুরু বলে তারা প্রণাম করিল।
সব সখী পরিল বসন শুন দিয়া মন,
বসন পরা সাঙ্গ হলো শুন হে এখন।
কন্ধে কুম্ভ নিয়ে সবে যায় সারি সারি,—
রাধাকৃষ্ণের ভক্তগণে বল হরি হরি। —মুর্শিদাবাদ

শক্তিশেল হইতে লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের বৃত্তান্ত নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে শুনিতে পাওয়া যাইবে—

৫

শুন শুন, সর্বজন, আমার একটি নিবেদন,
সর্বদেবের বন্দিলাম চরণ,
রাবণ ছাড়িল বাণ লক্ষ্মণ হলো অজ্ঞান,
ভায়ের শোকে কাতর শ্রীরাম।

প্রাণ রাখিবার কার্য নয়, ক্ষীরোদ সাগরে যায়,
ভায়ের শোকেতে ত্যজিব জীবন।
কেন বা রাম জীবন ছাড়, বিশল্যকরণী আন,
তবে বাঁচে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ।
আর কেবা পারে যেতে হনুমানকে আন ডেকে—
যাবে হনু গন্ধর্ব পর্বতে।
হনুকে ডেকে কয়, শুন, হনু, মহাশয়,
বানরগণে রাখে আমার মান।
আজ্ঞা পেয়ে হনুমান, বাহু নাড়া দিয়ে যান,
লম্ফে চলে দুই মাসের পথ।
হনু যখন চলে গেল রাবণ তা জানতে পেল,
আর কোন বীর নাইক আমার হাতে।
কালনিমিকে ডেকে কয়, শুন, মামা, মহাশয়,
হনুমানকে বধ কর গা প্রাণে।
পর্বত নিয়ে চলে গেল রামের নিকটে দিল,
এই লেন প্রভু ঔষধ চিনিয়ে।
শুষেণ নামে বৈদ্য ছিল ঔষধ চিনিয়া নিল,
খাওয়াইল লক্ষ্মণকে তখন।
লক্ষ্মণ ঔষধ খেল কিছু পরে প্রাণ পেল,
শুন শুন যত সর্বজন।
রামলীলা কতশত আরও গাহিব কত,
বানরগণে দিচ্ছে রামের ধ্বনি।
এই পর্যন্ত এই সব কথা সাঙ্গ হয়ে গেল হেথা,
চাঁদ বদনে শিবদুর্গা বল ॥ —ঐ

তবে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-প্রসঙ্গই বালার্খি গানে প্রাধান্য লাভ করে।

৬

সুবর্ণ মঙ্গল, রাধে, বিনোদিনী রায়—
আজ বৃন্দাবনে বন্দী হলো ঠাকুর কানাই,
তখন বৃন্দাবনের কালো কানাই বানাই বাঁশী দিল শ্যাম,

সব সখী থাকিতে রাধার উঠিল পরাণ,
তখন কলসী কাঁখে সুন্দরী রাধে জল আনিতে যায়,
বৃন্দাবনের চিকনকালা পেছে পেছে ধায়।
পরের রমণী দেখে কানাই কেন ভুলো ;
নিজ সম্পত্তি বেচে দিয়ে বিবাহ কর।
বিবাহ তো করিব, রাধে, লিখেছে বিধাতা,
তোমার মত সুন্দর রাধা পাব কোথা,
আমার মত সুন্দর রাধে, কানাই, যদি চাও,
নেও কলসী কুশের দড়ি যমুনায় ঝাঁপ দাও।
কোথায় পাব কলসী, রাধে, কোথায় পাব দড়ি,
তোমার গলার হারগাছটি দাও পিতল বাঁধা দড়ি।
তুমি গঙ্গা, তুমি যমুনা, তুমি বারাণসী,
তুমি হও যমুনার জল তাইতে আমি ভাসি।
আচ্ছা ঘরে কালো নিমাই কথায় বড়ো আঁট,
বড় হয়ে ছোট নদীতে দিতে চাওরে ঝাঁপ।
কালো কালো কর, রাধে, কালো গোয়ালার ঝি,
বিধাতা করেছে কালো আমি করব কি ?
কাক কালো কোকিল কালো, কালো চিকুর কেশ,
কালো চুলের খোঁপা বেঁধে ভুলাইলে বেশ।
কালো হাঁড়িতে রান্না করে মুনিজনে খায়,
কালো মেঘে জল হইলে জগৎ জুড়ায়।
কানাইএর হাতের বাঁশী ভাই সর্প হয়ে যায় ;
সর্প হয়ে গিয়ে বাঁশী দংশায় রাধার পায়।
ডান পদ বাড়ান রাধার বাঁ পদে দংশিল,
উহু মরি শব্দ করি বাঁয়ে ঢলে পলো।
কি সর্পে দংশিল আমার এ সুন্দর গা,
সর্ব অঙ্গ বিষে আমার কালো হয়ে যায়,
আমার অঙ্গের বিষ যে ঝাড়িতে পারে,
এমন রূপ যৌবন আমি দান করিব তারে।

পেছে হেঁকে ছিদাম বলে মহামন্ত্র জানি,
দু'চার বার ঝাড়লে বিষ করতে পার পানি—
এমন সোনার যৌবন তারে করবো দান।
রাধার অঙ্গের বিষ কৃষ্ণ ঝেড়েছিলো,
এইখানে রাধাকৃষ্ণ মিলন হইল।
এই তো মশায় এসব কথা সাঙ্গ হয়ে গেল,
চাঁদ বদনে সকলেতে রাধাকৃষ্ণ বল। —মুর্শিদাবাদ

উদ্ধৃত গানগুলি হইতে বালাখি গানের বিষয়গত বৈশিষ্ট যে কি, তাহা বুঝিতে পারা গেল না; সুতরাং কেবলমাত্র গীত-রীতির বৈশিষ্ট্যই যে ইহাকে এই অঞ্চলের অন্যান্য লোক-সঙ্গীত হইতে পৃথক করিয়াছে, তাহাই সত্য বলিয়া মনে হইবে।

বালিকা সঙ্গীত

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার একটি অঞ্চল হইতে বালিকা-সঙ্গীত নামেও এক শ্রেণীর গান কয়েকটি সংগৃহীত হইয়াছে। গানগুলি অনেকটা মেয়েলী ছড়ার মত। বালিকারাই ইহা গাহিয়া থাকে। সেইজন্যই ইহাদের এই নাম কি না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কারণ, ইহা ছাড়াও বহু গান বালিকারা গাহিয়া থাকে; অথচ তাহাদিগকে বালিকা সঙ্গীত বলা হয় না। বালিকা-সঙ্গীত অর্থে সাধারণ ভাবে মেয়েলী গান বুঝাইতে পারে।

১

রাম ছেড়েছে যজ্ঞের ঘোড়া তবু বনের কানালে
লব কুশে বেঁধেছে ঘোড়া সীতায় বলে দে ছেড়ে
রাম কাদে বনে॥
ও রাম, সীতাকে হরণ তরে
ও রাম কাদে বনে॥ —বেলপাহাড়ী
লুলুক করে হুলুক বুলুক কোন পাদারে গড়েছে,
এমনি পাদার লুলুক গড়ে নাকে বড় লেগেছে।
দোল দে, ঝুলুক কানে কান পাতা
কত হিলাছেরে মাথায় খোসা। —

৩

ফাল্গুনে পুর্ণিমা নিশি, উদয় হইলেন শশী,
কলি জীব উদ্ধার করিতে গো। —ঐ

৪

আরে মহুয়া, মদের মাঝি মদের হাঁড়ি গড়াগড়ি যায়।
মহুয়া, মদের বোতল গড়াগড়া যায়।
মহুয়া, মদের নৌকা ডাঙ্গায় চলে
ছাগল গিলেছেন হাতী।
আর পুঁটি মাছে তানপুরা বাজায়
আর শুন, হে ভগবান, ছাগলে গিলেছেন হাতী
আর পুঁটি মাছে তানপুরা বাজায়॥ —ঐ

৫

কৃষ্ণ—অন্তরেতে রব আমি, বাহিরেতে রব আমি
রাধা বাহিরেতে রব আমি।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে বেড়াইব যমুনা, শুনিশ কথাগুলি মনে
কাটাব সারাটে বেলা॥ —ঐ

৬

যখন নিমাই জন্ম নিল নিমতরু তলে রে
ও বাপ আমারো নিমাই রে—
হয়ে কেন মরলি না, না তুলিতাম কোলে রে।
সাধ করে নিলাম বাপ ত বিনোদ পাটের ডুরিরে
ও বাপ আমার নিমাই রে। —ঐ

বাবাঠাকুরের গান

পশ্চিম বাংলার এক লৌকিক দেবতা পঞ্চানন ঠাকুর বা পঞ্চানন্দ ঠাকুরকে সাধারণ ভাবে বাবাঠাকুরও বলা হয়। তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক পাঁচালী শ্রেণীর গান বাবাঠাকুরের গান নামেও পরিচিত। ইহার আর এক নাম পাঁচু ঠাকুরের পাঁচালী। এই বিষয় লইয়া দুই একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি মঙ্গলকাব্যও রচিত হইয়াছিল। সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হইল—

১

রাজা বলে মহাপাত্র মনে বড় দুখ।
আজিও না দেখিলাম পুত্র কন্যার মুখ॥
রাজা বলে মহাপাত্র বলি তোমার ঠাঁই।
পালিলে পরের পুত্র আপন হবে নাই॥
যা আছে কপালে হবে তোমায় কিবা কব।
রাজরাণী সঙ্গে করি বনবাসে যাব।
পঞ্চদেব যদি আমার মানস পূর্ণ করে।
আবার পাইবে মোরে কহিলাম তোমারে॥ —২৪ পরগণা

বারাঠাকুরের গান

২৪ পরগণা জিলার দক্ষিণ অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড বলিয়া পরিচিত এক মুণ্ড দেবতা বারাঠাকুর নামেও পরিচিত। তাঁহার মাহাত্ম্য সূচক পাঁচালী জাতীয় গান বারাঠাকুরের গান নামে পরিচিত। মকর সংক্রান্তির সময় সারা রাত্রি জাগিয়া খোল করতাল সহযোগে এই গান গীত হয়। জনশ্রুতি এই, বড় গাজি খাঁর খাঁড়ার আঘাতে দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড ছিন্ন হইয়া গিয়া মাটিতে পড়িল, তদবধি সেই মুণ্ড পুজিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা গণেশের মুণ্ড। ইহার কাহিনী মূলক রচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। ইহা লইয়া মঙ্গল কাব্যও রচিত হইয়াছে, তাহা রায়মঙ্গল নামে পরিচিত।

বাঁশ খেলার গান

উত্তর বাংলার একটি লৌকিক অনুষ্ঠান বাঁশ খেলা। সেই উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই বাঁশ খেলার গান। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ ডাক্তার চারুচন্দ্র সান্যাল রচিত *The Rajbansi of North Bengal* (প্রাগুক্ত) গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

১

বাঁশ বাড়ি খান পার করিয়া দে
আবো গে হে হুত্তি গেলে মোর
দোসোরে আছে ওগে, সোগায় আছে
জোরে জোরে মুই নারী
এ্যাকেলায় গে হে আবো। —জলপাইগুড়ি

ছি গে আই না পারাইস গালি
ঘুগুরি চালেছে মোর মোন
নাই জুরিম মুই হোকোর কাম
খপার মতন। —জলপাইগুড়ি

বাসি বিবাহের গান

ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলের বিবাহের একটি আচারের নাম বাসিবিবাহ, ইহা কোন শাস্ত্রীয় আচার নহে, স্ত্রী-আচার মাত্র ; তবে কোন কোন অঞ্চলে শাস্ত্রীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। বাসি বিবাহ উপলক্ষে যে মেয়েলী গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই বাসি বিবাহের গান বা গীত। বিবাহের পরের দিন এই আচার অনুষ্ঠিত হয়।

১

শ্রীরামচন্দ্রের বাসি বিয়া মিথিলায়।
দেখতে রামের বিয়া স্বর্গপুরের বাসী যারা
গোপনে থেইকে চায়।
যেমন রাম সাজিল কমল আঁখি
তেমনই সীতা বিধুমুখী তরুতলে দাঁড়াইল।
ও তার জগতে রূপ মোহিল।
স্বর্গ থাইকে দেবগণ পুষ্প বরিষণ করে,
ঐ রূপ যে দেখিল নয়ন ভইরে,
তার জন্ম সফল হৈল। —ঢাকা

বাস্তু পুজার গান

বাস্তু এবং কৃষিভূমির অধিষ্ঠাতা দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য পৌষ মাসে (Post-harvest) বাস্তু দেবতার পুজা হয়। সেই উপলক্ষেও মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই বাস্তু পুজার গান—

১

স্বর্গের হাড়িয়া হাড়িয়া হাড়িয়া রে।
মঞ্চে লামিয়া খোলা চাঁচ্যা দে।

বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা খোলা চাচ্যা দে
স্বর্গের হাড়িয়া হাড়িয়া হাড়িয়া রে,
মঞ্চে লামিয়া ফুল তুল্যা দে।
বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা ফুল তুল্যা দে। -বরিশাল

বিচ্ছেদী গান

পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার বিচ্ছেদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপর বিচ্ছেদী গান রচিত হইয়া থাকে ; সেইজন্য ইহা মুখ্যত আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম অনুভূতিমূলক (mystic) গান। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলার রূপক অবলম্বন করিয়া এই গান রচিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাদিগকে অনেক সময় মাথুর বা বিরহ সঙ্গীত বলিয়া ভুল করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছেদী গানের উদ্দেশ্য তাহা নহে। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে,—Bischhed songs or songs of separation also fall within the mystical or religious category. Bischhed songs share certain qualites of the Murshidı (পরে দেখ), the difference being in the approach to life. While Murshidis want to establish direct communion with God, writers of Bischhed songs make use of the symbol of the relationship between Radha and Krisna. (Hai, M. A., *Traditional Culture in East Pakistan*, Dacca, 1963, pp. 17-18).

আমি বন্ধুর প্রেমাগুণে পোড়া সইগো,
আমি বন্ধুর প্রেমাগুণে পোড়া,
আমি মৈলে না পোড়াও, না ভাসাইও যমুনারি জলে
তমাল ডালে বেঁধে রাখিস তোরা।
সইগো সই, যেদিন বন্ধু আসবে দেশে
বলিস তোরা বন্ধুর কাছে,
তমালডালে আছে বাঁধা,
তোমার প্রেমের মড়া ঐ। —নদীয়া

২

তোরা বল গো, প্রাণ সই,
অভাগিনীর প্রাণবন্ধু গেলো কই ॥
আমার দিবানিশি চিত্ত মাঝে জ্বলছে অনল
সই, ধান দিলে ফুটে খই ॥ —ঐ

৩

সখি, দুঃখ বলবো কারে !
যে জ্বালা দিয়েছে কালা অবলার অন্তরে।
ওগো সখি, দুঃখ বলবো কারে ॥
শুইলে স্বপন দেখি রাত্রি নিশাকালে,
চমকি চমকি উঠে রাধে শয্যার পরে গো,
ওগো সখি, দুঃখ বলি কারে ॥ —ঐ

বিজয়া গান

বাংলার পল্লীতে শারদীয়া পুজার অবসানে বৈষ্ণব ভিখারী কিংবা ভাটদিগের মুখে মুখে যে এক শ্রেণীর গান শুনিতে পাওয়া যাইত, তাহাই বিজয়া গান। শারদীয়া পুজার প্রারম্ভে যে আগমনী গান (পুর্বে দেখ) হইত, ইহা তাহারই পরিপুরক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে কবিওয়ালাদিগের রচনায় এই গান নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। শারদীয়া দুর্গার অর্চনার শেষে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া উমার পতিগৃহে যাত্রার কাহিনীকে ক্ষীণ ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া এই গান রচিত হইত। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'শরৎ-সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি-বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারি-ঘরের অন্নপুর্ণা যখন স্বামিগৃহে ফিরিয়া যায়, তখন সমস্ত বাংলা দেশের চোখে জল ভরিয়া আসে (গ্রাম্য সাহিত্য)।' এই ভাবটি অবলম্বন করিয়াই বিজয়া গান রচিত হইয়াছে।

১

কেন নিশি পোহাইল ?
সুখ নবমী কেন রে এখনি শেষ হইল !
কেন এ নিশি চিরনিশি হয়ে না রহিল ॥

অস্তাচল শশি-সমান হইতেছে ম্লান, মায়ের সুধাংশু বয়ান রে।
দেখ মায়ের আঁখি ঝরে, কি ভাবে কি বিষাদ ভরে
হেরে তারে প্রাণ বিদরে ॥
কি করি একি হলো, কাল দশমী এলো
সুখ-শশী শোক মেঘে আবিরল।

লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্যের উপর ইহা রচিত হইলেও ইহাতে ব্যক্তি-প্রতিভার স্পর্শ সুস্পষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়। কবিওয়ালার রচিত বিজয়ার গানেও ব্যক্তি-প্রতিভায় স্বাক্ষর অনেক সময় সমুজ্জ্বল।

রবীন্দ্র-সংগ্রহেও ('গ্রাম্যসাহিত্য'—লোকসাহিত্য) বিজয়াগান বিস্তৃত স্থান পাইয়াছে, তাহাতে লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন আছে। আগমনী গানের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা অল্প। পশ্চিম বাংলার ভাদু এবং টুসুরও বিজয়া গান শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা যথাক্রমে ভাদ্র সংক্রান্তি এবং পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তিতে শুনিতে পাওয়া যায়।

বিবাহের গান

বিবাহের গান প্রত্যেক জাতিরই লোক-সঙ্গীতের সর্বাধিক মূল্যবান্ অংশ। বিশেষত সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ধারায় ইহা দ্রুত লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, তথাপি ইহাদের মধ্যে এখনও সমাজ-জীবনের প্রাচীন কতকগুলি রূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। যে সকল লোক-সঙ্গীত পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে বৎসরের যে কোন সময়ই গীত হইতে পারে, তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে ব্যবহারিক সঙ্গীত (functional song) বলা যাইতে পারে। বাংলাদেশের সর্বত্রই ইহাদের বিভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে, সেই সূত্রে ইহারা আঞ্চলিক সঙ্গীত হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদের সুনির্দিষ্ট একটি ব্যবহারিক প্রয়োজন (function) আছে, তাহা ব্যতীত ইহারা কদাচ গীত হয় না ; এমন কি, এই ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা যদি দীর্ঘকালের মধ্যে কোন দিন দেখা না দেয়, তথাপি ইহারা গীত হইবে না, ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বাহিরেও ইহারা কদাচ গীত হয় না। বিবাহ-সঙ্গীতই ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পারিবারিক জীবনে বিবাহের অনুষ্ঠান একাধিক হইতে পারে, সেই উপলক্ষে প্রত্যেক পরিবারেই বৎসরে একাধিক বার একই সঙ্গীত গীত হইতে পারে।

বিবাহ-সঙ্গীত ব্যবহারিক সঙ্গীতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক হইলেও, আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্যক্তিজীবনের বিবিধ সংস্কার, যেমন উপনয়ন ইত্যাদি পালন করিবার সময়ও এই শ্রেণীর সঙ্গীত গীত হয়।

বাংলা দেশের চতুঃসীমান্তবর্তী অঞ্চল ব্যতীত বিবাহের গান আজ প্রায় অন্যত্র লুপ্ত হইয়াছে। বিবাহ-সঙ্গীত সর্বত্রই মেয়েলী সঙ্গীত; সুতরাং গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিলুপ্তি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। এখনও সন্ধান করিলে ইহার যে নিদর্শন উদ্ধার করা যায়, অল্পদিনের ব্যবধানেই তাহার চিহ্নও লুপ্ত হইয়া যাইবে।

বিবাহের গানকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—যথা আয়োজন, অনুষ্ঠান এবং সমাপন। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবাহের আয়োজন চলিতে থাকে, এই দীর্ঘকাল যাবৎই মেয়েলী সঙ্গীত শুনা যায়। অনুষ্ঠানের সময় স্বভাবতই গানের সংখ্যা বাড়িয়া যায়, পরেও ইহার জের চলিতে থাকে।

আয়োজন

১

প্রথমেই পূর্বরাগের গান—

উচাঁ উচাঁ পিঁড়ে বাবা
গম্ভীর গম্ভীর খোঁটা গো,
তারি তলে ভোমরেরি বাসা।
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা, ভোমর, আমারি আঁচল গো,
বাবা দিলে হইব তুমার।
বাবাকে খুঁজে ভোমর
থল ভরি টাকা গো।
তবু ভোমর তুমার। —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

কোন যুবক কোন যুবতীকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে; কিন্তু যুবতী তাহার পিতার অনুমতি লইতে বলিতেছে। হে ভ্রমর (প্রেমিক), তুমি আমার আঁচল স্পর্শ করিও না, বাবা যদি দান করে, তবেই আমি তোমার হইব। বাবাকে খুঁজিয়া থলি ভরা টাকা দিয়া তাহাকে ভুলাও, তাহা সত্ত্বেও হে ভ্রমর, (প্রেমিক) আমি তোমারই।

পুরুলিয়া জিলার বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন আদিবাসী এবং হিন্দুসমাজের বিবাহে এই গান গাওয়া হয়। ইহাতে রূপকের ব্যবহার হইয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে কন্যার নিকটই সোজাসুজি ভাবে বর বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে—

২

উত্তরে পাতিয়া মেঘ, দক্ষিণে গঞ্জরে রে, ও রাম কানাইরে।
তুমি এমন সুন্দর গো শ্রীমতী, তোমার সিঁথি রয়েছে খালি।
হুকুম যদি করতা গো শ্রীমতী সিন্দুর পরাইতাম
আমি, হুকুম দারোগা।
আগে আছে পঞ্চসখি, রাই, কলসি চোরাইতে, চল যাই
যে না ঘাটে যাবা গো কলসি চোরাইতে,
সেই না ঘাটে নাইবের পানসি।
ঠেলিয়া যাও নাইবের পানসি, ভরিয়া আন কাঞ্চের
কলসি, ও রাম কানাই রে। —বরিশাল

তুমি আমি লেখি পড়ি একই গুরুর ঠাঁই।
পড়িয়া গেল হস্তের কলম,
তুলিয়া দেও মোর হাতে, মালঞ্চ কন্যা।
ওনা কথা থুইয়ারে, মাধব কুমার, আরও কথা কও।
আমার বাপ বরুণ রাজা, এনা কথা শুনলে
গরদান মারবে তোমার।
আমার বাপের চাকর হইছে তোমার বাপে উজির।
আমার বাপের তালুকে বান্ধে তোমার বাপে ঘোড়া।
আমার বাপের চাকরি করিয়ারে, মাধব কুমার,
খাইল তোমার বাপ ও দাদা চিরকাল।
ঐ সব থুইয়ারে মালঞ্চ কন্যা,
বিয়া করমু আমি তোমারে।
আমার বাপে এই কথা শুনলে, মাধব কুমার, তোমার মালামাল
সব নিবে সরকারে। —ঐ

পুরুলিয়া জিলার সাঁওতাল জাতির মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি বাংলা বিবাহের গানও এখানে উদ্ধৃত করা হইল। প্রথম গানটিতে অবিবাহিত কন্যার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে।

৪

সবার বিয়ে হলো আমার কেনে হইলো না বিয়ে
আমার কেনে হইলো না বিয়ে।
তুমি নাকি দূষী হে, আমি নাকি দূষী,
কিনি দে' হে কিনি দে হে, কানের সোনা কিনি দে,
ওরে আমার কুলের পুরুষ কানের সোনা কিনি দে।
লবজঃ— কেড়্ কেড়্ কে—ড়্—কেড়্
কেড়্ কে—ড়্—কেড়্ কেড় কে—ড়্
ওরে আমার কুলের পুরুষ
কুথক্কে লিব তুখেরে—
ওরে আমার কুলের পুরুষ। —সাঁওতাল পরগণা

লবজ শব্দের অর্থ আনন্দ সূচক অর্থহীন ধ্বনি (yell),

৫

আইব্যারীর মুখে নাই পান,
আইব্যারী ভাবিতে ভাবিতে যায়।
কাণ্টায় আছে বৈরের পাত্
আইব্যারী পান বুল্যা খায়॥
আইব্যারীর মুখে নাই চুণ,
আইব্যারী ভাবিতে ভাবিতে যাই।
কাণ্টায় আছে নৈখের গু;
আইব্যারী চুণ বৈল্যা খায়॥
আইব্যারীর মুখে নাই খর,
আইব্যারী ভাবিতে ভাবিতে যায়॥
কাণ্টায় আছে আঁইঠ্যাল মাটি,
আইব্যারী খের বৈল্যা খায়॥

আইব্যারীর মুখে নাই সুফারী,
আইব্যারী ভাবিতে ভাবিতে যায়।
গেল্‌তে আছে খেজুরের আঁঠি,
আইব্যারী সুফারী বৈল্যা খায়॥
আইব্যারীর মুখে নাই জদ্দা,
আইব্যারী ভাবিতে ভাবিতে যায়।
কাণ্টায় আছে গাব্ধিল্যার বিচি,
আইব্যারী জদ্দা বৈল্যা খায়॥ —রাজসাহী

আইব্যারী অর্থ ঘটক।

৬

কন্যার পিতা সম্বন্ধ করিতে আসিলে পর এই সঙ্গীত গীত হয়—

কন্যার বাবা আসিয়াছিল সম্বন্ধ জুড়িতে।
চারধারে.কাঁটার বেড়া মধ্যে বড়ো ঘর,
খুড়ার পিঠে খুঁজ ধনে কি কি সাজ দিবে গো।
খুড়ির পিঠে, মাগো, সুরধনি, কি কি গয়না সাজাব গো,
ঐ যে কি কি সাজ দিবে গো। —বাঁশপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

৭

কোনার বাবা আসেছিল, সম্বন্ধ জুড়িতে,
চারধার কাঁটার বেড়া মধ্যে খড় ঘর,
খুড়া বিনে কি কি সাজ দিবে গো,
খুড়ির বিনে খুঁজধনে কি কি গয়না সাজাবে গো।
ঐ যে কি কি সাজ দিবে গো॥ —ঐ

৮

বিবাহের পুর্বে পাত্রপাত্রীর যে আশীর্বাদ হয়, সেই সময় ছেলের বাড়ীতে এয়োরা এই গান করে—

আমি যাব সেই অশোকবনে, জানকীর অন্বেষণে,
ওই হলুদ লাগে বানিয়ার চন্দন লাগে,
পুরায় ওই হলুদ লাগে, বানিয়ার চন্দন লাগে,

জানকীরে আন্‌তে গেলে এই সব লাগে গো—
জানকীরে যাবো............লাগে গো। —ঐ

এইভাবে বেনের চন্দন, দীপের কাজল, তাঁতীর যন্ত্র, শিবের শঙ্খ, মালীর ফুল ইত্যাদির নাম করিতে হয়।

৯

দূরে বিবাহ স্থির হইবার জন্য কন্যার আক্ষেপ—

বাবাজী, এত নিদারুণ টাকা লইছুন অকারণ।
টাকা লইয়া বাপে দূরে দিছুইন বিয়ার কবুল।
বাপের দেশে কেহই নাই, শুয়া পক্ষী হইয়া
উড়িয়া পড়িয়া দেখি বাপের চন্দ্রমুখ।
আন, বাবাজী, আন কটরা ভরিয়া গরল বিষ
খাইয়া মরি আমি আচম্বিত।
মরিয়া যাই গো আমি বাপের গলার জঞ্জাল।
বাবাজী, আমার এত নিদারুণ।
জেওর লইয়া চাচা দূরে দিছুইন বিয়ার কবুল।
চাচাজীর দেশে কেহই নাই , শুয়া পক্ষী হইয়া উড়িয়া যাই।
ভাই এত নিদারুণ, কাবিল লইছুন অকারণ।
কাবিল লইয়া, ভাইরে, দূরে দিছুইন বিয়ার কবুল।
ভাই ছাহেবের দেশে কেহই নাই,
শুয়া পক্ষী হইয়া উড়িয়া যাই।
উড়িয়া গিয়া দেখি ভাইয়ের চন্দ্রমুখ।
আন ভাই, আন, কটরা ভরা গরল বিষ
মরিয়া যাই ভাইয়ের গলার জঞ্জাল। —মৈমনসিং

১০

কন্যা দেখিয়া অপছন্দ হওয়া প্রসঙ্গে এই সঙ্গীত শুনা যায়—

আরে কি হইল, ভাই, যন্তনা।
কালা মেয়ের বিয়া হইব না।
ভাইরে, বিয়ার ভাবনা আগে পাছে,
অলংকার তো জুটে না।

শুন জামাই এর বাগানা
যেন চাইলতার বাগানখানা।
রূপের পরিসীমানা—
সেতো হোচা মুখ্যা খান্দা গাই লো,
কালা বিয়া করব না।
ভাইরে, কালা মেয়ের বিয়া হইব না —সেরপুর (মৈমনসিং

১১

বিবাহের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান পানখিল, তাহার মেয়েলী সঙ্গীত—

এ শুভ উৎসবে সাজি, আয় লো তোরা এয়োগণে।
চিরশুভঙ্করী তোরা শুভ তোদের সম্মিলনে ॥
কোলের শিশু কোলে কর সীমন্তে সিন্দুর পর
কুলবালার এই তো ভূষণ, কাজ কি অন্য আভরণে ॥
সাজাও সবে ফুলডালা, জবা দলে গাঁথব মালা,
পুজিব সর্বমঙ্গলা সকলে তাঁর কৃপাগুণে ॥
তাঁহার প্রসাদ বলি লব সবে কোলে তুলি,
হেইরব মহিমা তাঁরি বর-বধূর সম্মিলনে ॥ —ত্রিপুরা

১২

চল সব, নাগরী, মিলি শুভদিনে শুভক্ষণে করি গিয়া পানখিলি।
উত্তম সাইলের চাউলে পিটালি বাটিয়া
বিচিত্র আলিপন দিব উঠান ভরিয়া ॥ —মৈমনসিংহ

১৩

কাসেতে করতাল বাজে, ধলা ঘোড়া সাজে,
রামচন্দ্র চলিলেন সীতার বাসরে।
যদি রে সুন্দর রামরে, সীতা কর বিয়া,
কনক বাঁশের ধনু গুণ চড়াও গিয়া।
একে তো সুন্দর রাম, ক্ষীণ মাঝের তনু,
কেমনে চরাইব রামে কনক বাঁশের ধনু।
যদি রে সুন্দর রাম, সীতা কর বিয়া,
বাটা ভরা অলঙ্কার লইয়া আস গিয়া।

রামেত লইল জিনিষ বাটায় ভরিয়া,
লক্ষণে লইল নোলক কডরায় ভরিয়া।
তব মায় যে কইছিল গো কন্যা নির্ধন্যা বলিয়া,
পর গো, পর গো, কন্যা, এছিয়া বাছিয়া।
ঘুমেতে চঞ্চল সীতা, ক্ষিদায় কাতর,
জিনিষ ফালাইয়া দিল পালঙ্কের উপর।
একে তো সুন্দর রাম বুদ্ধির সাগর,
জিনিষ টুকাইয়া লইল পালঙ্কের উপর। —ত্রিপুরা

অনুষ্ঠান

১

বৃদ্ধিকার্যের সময় গীত—

ওগো রাণী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে।
বিচিত্র সায়ভানার নীচে, বৃদ্ধি করেন দশরথে ॥
ওগো, বৃদ্ধিকার্যে কি কি লাগে, ষোল মন চাউল লাগে।
ওগো, ষোল মন মুগ লাগে গো, ওগো শুভ বৃদ্ধি করেন দশরথে ॥
ওগো, বৃদ্ধি কার্যে কি কি লাগে, ষোল ছড়া কলা লাগে,
ষোল রাইড় দই লাগে, ষোল রাইড় গুড় লাগে ;
ওগো, ষোলখানা সিন্দুর লাগে গো।
বিচিত্র সায়ভানার নীচে ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে ॥
ওগো রাণী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে।
বৃদ্ধি কার্যে কি কি লাগে, ষোলখানা কাপড় লাগে,
ওগো রাণী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে,
বৃদ্ধির কার্যে কি কি লাগে, ষোল খানা গামছা লাগে,
ওগো রাণী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে,
বৃদ্ধির কার্যে কি কি লাগে, ষোল বিড়া পান লাগে,
ওগো রাণী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে ॥
বৃদ্ধির কার্যে কি কি লাগে, ষোল ছড়া সুপারী লাগে
বিচিত্র সায়ভানার নীচে, বৃদ্ধি করেন দশরথে ॥

বটপাতা গোটা গোটা, সিন্দুরের দিয়া ফোঁটা।
বৃদ্ধি করলে কি কি ফল, পিতৃপুরুষে পাবে জল॥ —ঢাকা (বিক্রমপুর)

২

বৃদ্ধির বাড়া অনুষ্ঠান উপলক্ষে—

কি শুনালি, ওহে ভরত, কি শুনালি কর্ণে ;
এমন মধুর বাণী না শুইনেছি কখনে।
ভরতকে পাঠাইলেন দুর্গার মন্দিরে।
দুর্গা, তোমার যাইতে হবে শ্রীরামের উচ্ছবে॥
দেবকুলের আইয়ো আমরা আসিতে না পারি।
বিধুমুখীর পুত্রের উচ্ছব আশীর্বাদ করি॥
কি শুনালি, ওহে ভরত, কি শুনালি কর্ণে।
এমন মধুর বাণী না শুইনেছি কখনে। —ঐ

৩

আমসরা জলের ঘট গো শিয়রে বসাইয়া,
তাহার মধ্যে বান্ধেন রাণী রামের বৃদ্ধের বাড়া।
এলের ঢেকি বেলের মোহিনী করুল বাশের কুলাখানি।
তাহার মধ্যে বাঁধি আমরা রামের বৃদ্ধের বাড়াখানি॥ —ঐ

মোহিনী—ঢেঁকির অংশবিশেষ
করুল—কচি

বৃদ্ধির বাড়া বলিতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের জন্য ধান হইতে চাউল করিয়া লইবার অনুষ্ঠানকে বুঝায়।

৪

পুরোহিত নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করাইতে যেই বসিলেন, অমনি মেয়েরা গীত ধরিলেন,—

"বাছাই নান্দীমুখ করে,—শুভ কার্য করে", ইত্যাদি। এই গীতটি গাহিয়াই ধরিলেন বামুনকে,—

"উন্দ্‌রা বান্দ্‌রা বামুন রে, কত কলা লাগে রে,
যত কলা লাগে রে, দিব জামাইর মায়ে রে"। ইত্যাদি—মৈমনসিংহ

৫

সখি, দেখ দেখ একি অপরূপ দেখ,
নান্দী মুখে বসিয়াছেন রাজা দশরথ।
পূর্বদিনে মহারাজা করিয়া সংযম,
নানা ইতি দ্রব্য রাজা করি আয়োজন।
কুশ হাতে লইয়া রাজা বসলেন কুশাসন।
মাতাসহ পিতামহ মাতামহী আদি
পিণ্ডদান করে রাজা বইস্যা দক্ষিণ মুখী।
পুরোহিত কয় মন্ত্র দশরথ স্থান
একে একে বইল্যাছিল চৌদ্দ পুর্ষের নাম।
নানা মত বাদ্য বাজে অযোধ্যা ভবনে
নান্দীমুখ করে রাজা হরষিত মনে। —ঐ

৬

অধিবাসের কাজ আরম্ভের পুর্বে গীত---
আকাশে উঠল তারা, অধিবাসের পড়ল সাড়া।
বল শুনি, ও রোহিণি, অধিবাসের আয়োজন।
ভরি ঘটে গঙ্গাজলে, সাজায়ে কদলী ফলে,
কর শীঘ্র অধিবাস, পুরইত রইছেন উপবাস। —ঢাকা

৭

বিবাহ উপলক্ষে যে ক্ষৌরকর্ম করা হয়, সেই উপলক্ষে মেয়েলী গীত—
আমার সোনার চাঁদকে কামাইতে, নবদ্বীপের নাপিত আইসাছে।
হাত ভালা কামাও, নাপিত, হাতের দশ নৌখ রে।
পাও ভালা কামাও, নাপিত, পায়ের দশ নৌখরে।
মুখ ভালা কামাও, নাপিত, পুর্ণমাসীর চান্দ রে।
মাথা ভালা কামাও, নাপিত, ডাব নারিকেল রে।
ভালা কইরা কামাইলে, পাইবে জমী বাড়ী রে।
ভালা না হইলে, নাপিত, খাইবে জুতার বাড়ি রে। —মৈমনসিংহ

বিবাহের মেয়েলী গীতে অনেক সময় গালাগালি দিতে শুনা যায়। ইহাতে তাহারই নিদর্শন দেখা যায়।

৮

সোনার নাপিতারে, আঁমার অ বাড়ী যাইবা,
সোনার নরইং রুপার বাটি সঙ্গি করি নিবা ;
ও সোনার নাপিতা রে,
ভালা করি কামা, নাপিত, বাপের দুর্লভ পুত রে।
চিক্কণ করি কামা, নাপিত,
সুন্নর তুলি কামা, নাপিত,
মায়ের দুর্লভ পুত রে। —চট্টগ্রাম

৯

ভাল করিয়া কামাও, নাপিত, চন্দ্রমুখীরে।
আমার সীতার চন্দ্র নখ কামাও ধীরে ধীরে।
বেলা করি বহুক্ষণ, আইলে নাপিত-নন্দন,
আন বস্ত্র ধর ছত্র জানকীর শিরে।
ভাল কইর‍্যা কামাও, নাপিত, চন্দ্রমুখীরে। —মৈমনসিংহ

১০

দেখ দেখ কি আনন্দ অযোধ্যা ভবনে
কামাও, নাপিত, কামাও রাম ধনে।
চাউল কড়ি ছত্র ধরি, নাপিতের ছেলে করে খেউরী,
বাম হাতে দর্পণ ধরি বইস্যাছে আসনে।
কামাও, নাপিত, কামাও রাম ধনে।
ধুবায় ছুঁয়াইল ক্ষার, যত ইতি ব্যবহার
একে একে করে নারীগণে,
কামাও, নাপিত, কামাও রাম ধনে।
খেউরীকর্ম হৈল সাঙ্গ, নারীগণ করে রঙ্গ
মুখচন্দ্রদৃষ্ট করি লজ্জা ইন্দ্র পায় মনে। —ঐ

১১

নাপিতের কামাইবার সময় যে গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনেক সময় বরের মাতার প্রতি পরিহাস বা আক্রমণ করা হয়; এখানে তাহার নাপিতের সঙ্গে বিবাহ হইবে বলিয়া উপহাস করা হইতেছে। যে সকল

প্রতিবেশিনী কিংবা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বরের মাতার হাসিঠাট্টা বা পরিহাস-রসিকতার সম্পর্ক আছে (joking relationship) আছে, কেবলমাত্র তাহারাই এই শ্রেণীর সঙ্গীতে যোগ দিয়া থাকে।

বাড়ীর পাশের নাপিত ওরে, বাড়ীৎ যা সকালে,
এমন সুন্দর নাপিতানীরে তোর লইয়া গেল চোরে।
যাউক যাউক নাপিতানী মোর আমার বালাই লইয়া
জামাইর মায়েরে নিবাম আমি বখশিস্ বলিয়া,
এরে শুইন্যা জামাইর মা দৌড়ে চুত্ড়া গড়ে,
পাছে পাছে নাপিত বেটা চুলে গিয়া ধরে। —ঐ

১২

এমন সুন্দর নিমাই খেউরী কর্তে যায়,
মধুর নাপিত বইল্যা ভারতী ডাকিছে তাহায়।
খেউরী কর্তে মধুর নাপিত আসিল যখন
খেউরী কর্তে বসিলেন শচীর নন্দন।
ক্ষুর হাতে মধুর নাপিত মাথা কামাইতে যায়
গঙ্গা যমুনা তীর্থ নিমাইর মাথায় দেখা যায়।
ব্যস্ত হইয়া মধুর নাপিত মুখের দিকে চায়
তেত্রিশ কোটি দেবতা নিমাইর মুখে দেখা যায়।
দেখিয়া মধুর নাপিত করে হায় হায়,
কোন্ দেবতার মায়া ইহা বুঝা নাহি যায়।
ব্যস্ত হইয়া মধুর নাপিত বক্ষের দিকে চায়
ভৃগু মুনির পদচিহ্ন বক্ষে দেখা যায়।
আস্তে ব্যস্তে মাপি পাও কামাইত চায়
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন পায় দেখা যায়।
ইহা দেখি মধুর নাপিত পড়ে নিমাইর পায়
দয়া করি নিমাই চাঁদ বৈকুণ্ঠে পাঠায়। —ঐ

১৩

মধুর নাপিতরে, ভালো কইর‍্যা কামাইয়া দে চন্দ্রকুমারে। (ধুয়া)
হাত ভালো কামাও, নাপিত, আকের টাইপের মত।

মুখ ভালো কামাও, নাপিত, শরৎ চান্দের মত।
পাও ভালা কামাও, নাপিত, আল্‌তার পাতের মত। ইত্যাদি—ঐ

১৪

আয়রে নাপিত ত্বরায় কইরে, দেখিবে রে রূপ নয়ন ভইরে।
বিয়ানে পাঠাইছে রে, নাপিত, বেলা গেল সন্ধ্যে হ'ল ॥
সোনা রূপের দুটি বাটী, নাপিত সঙ্গে কইরা লইও
ওহে, দেখিব তোরে নয়ন ভইরে।
পাওখানি কামাও, নাপিত রে, জুতে জুতে জুতে চাপে,
হাতখানি কামাও নাপিত রে আলেদার ক্ষুরে ॥
মুখখানি কামাও নাপিতরে যেন পুর্ণিমার চন্দ্র, ওহে,
আয় রে, নাপিত, ত্বরাই কইরে দেখিবে নয়ন ভইরে ॥ —বরিশাল

১৫

নখ কাটার সময় নাপিতকে উদ্দেশ্য করিয়া এই গান গাওয়া হয়—

নাউয়া চিতোর রে নাউয়া পাতোর রে
নাউয়ার মাইয়ার নগুল কাটির নাউয়া ভালো জানে
হাতের নগুল কাটির যায়া পাও ধরিয়া টানে।
এক এক বাড়ী কামায় নাউয়া হারায় এক এক ক্ষুর,
হাটিতে না পারে নাইয়া চরণে নেপুর।
ভাল করি কামান, মাও দুঃখ পাওরে যদি,
তোর মোচে বান্দি দিমু কাচাকলার কান্দি।
ভাল করি কামান যদি বিদায় পাবু ভালা
রসের নাউয়ানী তখন ধইরবে হাসি গলা। —গোয়ালপাড়া, আসাম

১৬

তৈল কাপড় উপলক্ষে মেয়েলী সঙ্গীত; এখানে রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

কৃষ্ণ বলে শুনগো, দূতি, করি নিবেদন।
রাধাকুঞ্জে গিয়া, দূতি, রাখ এ জীবন ॥
তুমিত চতুর, দূতি, শুনেছি শ্রবণে।
রাধা আমার প্রিয় পাত্র সর্বলোকে জানে ॥

একে রাধা ভাগ্যবতী ভৃগুমানের ঝি।
বচনে না আইসে রাধা কহিবাম কি ॥
বচনে না আইসে রাধা করিও স্তবন।
তবু যদি না আইসে রাধা ধরিও চরণ।
তবেও যদি না আইসে রাধা নেও আমার মালা।
রাধিকা জিজ্ঞাসা কর্‌লে কইও, দিছে চিকণ কালা ॥
শ্যাম অঙ্গের মালা লইয়া দূতীর গমন।
রাধিকার মন্দিরে গিয়া দিল দরশন ॥
তোমার লাগিয়া শ্যামে না খায় অন্নপানি।
তোমার লাগিয়া শ্যামে ত্যজিব পরাণি। —ঐ

১৭

তৈল কাপড় উপলক্ষে নিম্নোদ্ধৃত গানটিও শুনিতে পাওয়া যায়—

ভ্রমর, কইওরে কালিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রাণ যায় গো জ্বলিয়া।
সারা নিশি জাগিয়া থাকি পুষ্পের শয্যা লইয়া।
আজ আসবে কাল আসবে বলে গিয়াছিল বলিয়া।
কেন যে আসিল না কৃষ্ণ কি দোষ জানি না।
মথুরাতে কুব্জা পেয়ে রইয়াছে ভুলিয়া।
শ্রীরাধিকার মনের দুঃখ যায় কারে দেখিয়া। —ঐ

১৮

নিম্নোদ্ধৃত গানটি কন্যা সাজাইবার সময়ও শুনিতে পাওয়া যায়—

ধরহে রাজবালা এনেছি মালা,
স্থচিকন মালা পর গলে।
হায়, জুড়াক জীবন।
মালতী ফুলে গাঁথছি মালা, পরে কি না পরে কালার মন। —ঐ

১৯

বরপক্ষ হইতে তৈল কাপড় পাঠাইবার সময় এই গান—

রামের মা কৌশল্যা রাণী বুলে তোরা আয়,
তৈল কাপড় আস্রিবার শুভ সময় বইয়া যায়।

যাইতে ঐব মিথিলাতে জনক রাজার বাড়ী,
সেইখানে হইব বিয়া তাহার কুমারী।
পন্থে অছে বিঘ্ন ভয় চোর দস্যুর থানা,
সুরুয না বসিতে পাটে করুক রওয়ানা।
আভ্রিয়া পুছিয়া তোমরা কর আশীর্বাদ,
পুরুক মনের বাঞ্ছা কৌশল্যার সাধ।
আইলা সুমিত্রা রাণী মনে পাইয়া সুখ,
আইলা কৈকেয়ী রাণী মেলি পদ্মমুখ।
একে একে আইলেন আরো রাণীগণ,
নানা রত্ন অলঙ্কার অঙ্গের সাজন।
সর্বাঙ্গে সোনার সাজ চাইলে জ্যোতি ধরে
মণি চুণি মুকুতায় ঝকমক করে।
ধান্য দুর্বা যত রাণী হস্তে উঠাইয়া,
যত ইতি দ্রব্য ছিল দিলাইন আভ্রিয়া।
গন্ধ তৈল মাঝে রাম ছুঁয়াইলা চরণ
সুমঙ্গল বাদ্য বাজে অযোধ্যা ভবন। —ঐ

২০

তৈল কাপড় কন্যার বাড়ীতে আসিবা মাত্র গীত—

আনন্দে মাতিল সর্বপুরী।
চল রঙ্গ দেখি, সহচরী।
মৎস আইছে ভারে ভারে, জালুয়া সহকারে
ঝাঁকায় ঝাঁকায় পুর্ণ করি,
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ী।
দধি আইছে ভারে ভাবে, গোয়ালা সহকারে
ভাণ্ডে ভাণ্ডে আছে সারি সারি,
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ী॥
শঙ্খ আইছে ভারে ভারে, শঙ্খারু সহকারে
দেইখ্যা ভুলে ঝিয়ারী বহুরী,
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ী।

সিন্দুর আইছে ভারে ভারে. পসারু সহকারে
কাম সিন্দুর থানে থানে ভরি,
তৈল কাড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ী।
শাড়ী আইছে ভারে ভারে তাঁতিয়া সহকারে
প্রভাবতী লীলা কাস্তেশ্বরী,
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ী।
পান আইছে ভারে ভারে, বারুই সহকারে
বাংলা সাচি খাসিয়া পাহাড়ী,
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ী।
গুয়া আইছে ভারে ভারে, গাছুয়া সহকারে
দেখ কত রঙ্গের সুপারি,
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ী।
তৈল আইছে ভারে ভারে, কুলুয়া সহকারে
গন্ধ তৈলের বামুন বেপারী,
তৈল কাপড আইস্যাছে ঋষির বাড়ী। —ঐ

২১

১৩৩৮ সালে নিম্নোদ্ধৃত গানটি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মনে হয়, ইহা তাহার পূর্ববর্তী স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রচিত হইয়াছিল।

ওহে ভারতবাসী, দেখ দেখ আসি
আইজ মিথিলা নগরে,
মৎসের পসার সারি সারি, জালুয়ায় বেড়িল বাড়ী
সীতা দেবীর তৈল কাপড়ে।
আইল দধির ভাণ্ড, দেখ বইস্যা কি প্রকাণ্ড
পাঠায়াছে শঙ্খ সিন্দুরে,
সীতা দেবীর তৈল কাপড়ে।
পাঠাইয়াছে গুয়া পান, পরবত পরমাণ
পাঠাইয়াছে তৈল ভৃঙ্গারে,
সীতা দেবীর তৈল কাপড়ে।

পাঠাইছে স্বদেশী শাড়ী, খদ্দরের বটাদারী
বন্দেমাতরম্ লেখা পাইড়ে,
সীতা দেবীর তৈল কাপড়ে।
পাঠাইয়াছে চরকা তুলা—নাটাই টাকুয়া মেলা
ধনু দণ্ড সূতা ধুনিবারে,
সীতা দেবীর তৈল কাপড়ে।
বন্দেমাতরম্ বলি, আস্রিয়া পুছিয়া তুলি
সকলই রাখ নিয়া ঘরে,
সীতা দেবীর তৈল কাপড়ে। —ঐ

২২

বিবাহের পূর্বে বরকন্যার কল্যাণ কামনায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। ফরিদপুর জেলায় গঙ্গাপূজার রীতি আছে। সেই উপলক্ষে গান—

সখি, ত্মাখ ত্মাখ্ বেলা হল গগনে
সখি, চল যাই গঙ্গা বরণে।
আমি যাইব গঙ্গার কুল তুলব জবা ফুল
আমি তুলব ফুল, গাঁথব মালা, দিব মায়ের চরণে।
আমি তুলব কুসুম ফুল যাইয়ে-মায়ের কুল
আমি ভরব জল করব পূজা দিব চরণে
সখি, চল্ যাই গঙ্গা বরণে। —ফরিদপুর

২৩

বরণ কুলা নিয়া হস্তে রাণী চলেছেন গঙ্গার ঘাটে, ও মা তারিণী।
তোরা কে কে যাবি গঙ্গার ঘাটে, ও মা তারিণী॥
পঞ্চ আইয়ো লইয়ে রাণী চলেছেন গঙ্গার ঘাটে।
তরা কে কে যাবি আইক তোলাইতে গঙ্গার ঘাটে,
ও মা তারিণী॥—বিক্রমপুর, ঢাকা

২৪

সে তো বাদ্য বাজে ও কলসী গো সাজে।
সে তো কমলিনী রাই, ওগো সখী, চল যাই॥

যাব রস বৃন্দাবনে, ওগো সখী, চল যাই,
যাব মধুর বৃন্দাবনে, ওগো সখী, চল যাই। --ঐ

সে ত তৈল সিন্দুর, দিয়া গো রাণী
রাণী কলসী সাজাইল।
যাব মধুর বৃন্দাবনে, যাব রস বৃন্দাবনে, সখী চল যাই ॥
সে ত কলসী লবে, ও বৃন্দা গো দূতী,
সে ত ঘটী লবে কালো শশী গো চল যাই,
যাব মধুর বৃন্দাবনে গো সখী চল যাই ॥ —ঐ

সে ত যমুনারই ও ঘাটে
গো যেয়ে রাণী দিল দরশন।
ওগো সখী, চল যাই ॥
সে ত গঙ্গা গঙ্গা বলি সখী দিল তিন ডাক,
সে ত মকর-বাহনে গো গঙ্গা, গঙ্গা উঠিল জাগিয়া সখি, চল যাই ॥
সে ত কাটনে কাটিয়া গঙ্গা, গঙ্গায় তৈল সিন্দুর দিয়া
সে ত তৈল সিন্দুর দিয়া গো রাণী, রাণী গঙ্গা পূজা করে
সখি, কলসী ভরি যাই, সখি চল যাই ॥ —বরিশাল

২৫

বিবাহের নানা আচার পালন করিবার জন্য যখন বিভিন্ন উপকরণ যথা টোপর, ঘট, চালুন ইত্যাদি তৈরী হইয়া বাড়ীতে আনা হয়, তখন এই গান শুনিতে পাওয়া যায় --

কোন বা রসিয়া ডোমোনা এ চাইলন বানাইলো,
চাইলনে দেখিয়া তুলিছে বালির শিষের সেন্দুর
চাইলন দেখিয়া কইনার বইন হইয়া গেলো পাগোল,
থাউক বোল মোর বইনের বিয়াও, মুঞি যাওং ডোমোনার সঙ্গে।
কোন না রসিয়া কুমারে এ ঘট বানাইলো,
ঘটতে লেখিয়া তুলিচে হাঁস মৈরা মৈরী
ঘট দেখিয়া বরের ভাউজ হইয়া গেলো পাগোল,
থাউক বোল মোর দেওরার বিয়াও মুঞি যাওং কুমারের সঙ্গে ॥
—গোয়ালপাড়া, আসাম

২৬

বিবাহের গানের মধ্যে জলভরার গীত বা আনুষ্ঠানিকভাবে নদী কিংবা পুকুরের ঘাট হইতে জল ভরিয়া আনিবার গীতই সর্বাপেক্ষা অধিক শুনিতে পাওয়া যায়। নিম্নের গানগুলি তাহাই—

গৌররূপ লাগিল নয়নে,
আমি কুক্ষণে চাহিয়াছিলাম গো, গৌরচান্দের পানে॥
কলসীতে নাই রে পানী, আমি গিয়াছিলাম সুরধনী,
গৌর কেবা—না শুনি শ্রবণে।
একদিন জলের ঘাটে দেখে তারে মরেছি পরাণে॥
গৌর থাকে রাজপথে,—
তোমরা কেও যাইও না জল আনিতে গো,
দেখ্‌লে তারে মরিবে পরাণে,
শেষে আমার মত ঠেক্‌বে তোমরা,
গোপালচান্দে ভণে॥ —মৈমনসিং

২৭

তোমরা দেখ্‌ছনি সজনি সই জলে।
মদনমোহন, বংশীবদন, কদম্বেরি তলে॥ —ঐ

২৮

নিদ্রা কলসে জল ভরিবার সময় গীত—

চল চল সহচরী জল ভরিতে চল যাই।
যমুনার জল এনে রামেরে সান করাই॥
চল নাগরী নিয়ে ঘাঘরী যমুনায় জল আন্‌তে বারি।
সখীগণ সঙ্গে নিয়ে চলগো এখনে। —ঢাকা (১৩২৪)

২৯

রাজা অর্থাৎ বর বা কনের পিতা খড়্গ দিয়া জল কাটিয়া দিলে রানী অর্থাৎ বর কিংবা কনের মা কলসীতে জল ভরিবেন, নিদ্রাকলসে জল ভরিবার ইহাই রীতি। ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলে ইহা প্রচলিত।

রাজরাণী পরণ শাড়ি, কুম্ভ নেয় কাঁখে।
জল ভরিতে চলছেন রাণী ঐ গঙ্গার ঘাটে॥

রাজার হস্তে খাড়া আইয়োব হস্তে কুলা।
রাজা যাইবেন জল ভরিতে সঙ্গে যাইবেন কে ॥
সোয়া শ' বাজইনার ছেলে সঙ্গে চলেছে।
শত শত আইয়োগণ সঙ্গে চলেছে ॥
আইয়ো সবে চল, রাজায় দিবেন জল কাটিয়া।
রাণী ভরবেন জল ॥ —ঐ

৩০

সাধারণ জলভরার মেয়েলী গীত—

কৃষ্ণ প্রেমানলে অঙ্গ দহিল।
যাইতে যমুনার জলে, সে কালা কদম্ব তলে
আঁখির ঠারে মন গলিল।
প্রেম কইর‍্যা কলঙ্ক রটা, লোকে মোরে দেয়লো খুটা,
প্রাণসই লো, কালার প্রেমে কলঙ্ক রইল।
লোকে কইর‍্যা কানা কানি বলে কালা-কলঙ্কিনী,
প্রাণ সইলো—সে কই রইল, আমায় কই থুইল।
সই—কালার প্রেমে কলঙ্ক রইল!
চল গো সখি, ব্রজগোপী জল ভরার ত সময় যায়।
হায়, আমরা লাজে মরি, ঘটলো একি দায়।
পর্‌লো শাড়ী, রাজকুমারী, সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়,
নূপুরের শব্দ শুইন্যা হরষিত শ্যাম রায়।
রাস্তা আগুলিয়া খাড়া কেমনে জলে যাওয়া যায়?
পথ ছাড় পথ ছাড়, শ্যাম রায়!
নন্দের বেটা, রাখলো খুটা, শুনলে মাথা কাটা যায়।
পথ ছাড় পথ ছাড় শ্যাম রায়। —মৈমনসিং

৩১

যে যাবে সে যাও গো জলে, আমরা না যাব জলে,
যাইতে যমুনার জলে সে কালা কদম্ব তলে
আঁখিঠারে আমায় বলে, ধর মালা পর গলে। —ঐ

৩২

চোর পানি ভরিবার গীত—

একি অপরূপ হেরি, সজনী।
পুর্ণিমার চন্দ্র যেমন সাজিল জনক রাণী।
পুষ্করিণীর চারি পারে কুমার সারি সারি
সেইখান থাইক্যা লওগো, রাজা, জল ভরনের হাড়ী।
পুষ্করিণীর চারি পারে কামার সারি সারি,
সেইখান থাইক্যা লওগো, রাজা, জল কাটনের ছুরি।
পুষ্করিণীর চারি পারে তাঁতি সারি সারি,
সেইখান থাইক্যা লওগো, রাজা, জল ঢাকনের শাড়ী।
পুষ্করিণীর চারি পারে বারুই সারি সারি,
সেইখান থাইক্যা লওগো, রাজা, পঞ্চ পানের খিলি।
পুষ্করিণীর চারি পারে পসার সারি সারি,
সেইখান থাইকা লওগো, রাজা, পঞ্চ থান সিন্দুর।
চোর পানী ভইর্যা রাণী বাড়ীত চইল্যা যায়।
শুভ মঙ্গল জোকারে ঘট-পানি বসায়। —ঐ

৩৩

নিম্নোদ্ধৃত জলভরার গীতটির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের পুর্বরাগ—

ও প্রাণের সুবলরে, সুবল,
কার ঘরের রমণী জলে যায়।
সখি সঙ্গে রাধে জলে যায়, ও প্রাণের সুবলরে,
সুবল, কার ঘরের রমণী জলে যায়?
রাধিকা জলে রে যায়, সোনার নূপুর রাঙ্গা পায় রে,
ঝুমুর ঝুমুর শব্দ শুনা যায়, ও প্রাণের সুবলরে—
সুবল, কার ঘরের রমণী জলে যায়?
লিলুয়া দক্ষিণা বায়, চাঁদবদন শুকায়ে যায় রে,
চিকণ মাঞ্জা বাতাসে হেলায়, ও প্রাণের সুবলরে,
সুবল, কার ঘরের রমণী জলে যায়? —ঐ

৩৪

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় মেয়েলী জলভরার গীতেও স্বদেশীর কথা গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে স্বদেশী জলভরার গীত বলিত—

স্বদেশী পরিব, বারেন্দা লাগাব,
চল সবে জলে ছাড়িয়া কাজ।
জলের ছলে, কদম্বের মূলে,
দাঁড়ায়ে ডাকিছে গান্ধি মহারাজ।
কেউর পরণে দেশী, কেউর বানারসী,
কেইর পরণে খদ্দর আজ।
কেউর হাতে লোটা, কেউর হাতে ঝারি,
কেউর হাতে হীরার কলসী।
এত রাত্রি পরে, চরকা গুণ্ গুণ্ করে,
সূতা কাটে বুঝি কোন পরশী।
রাজার রাণী যত, বস্যা অবিরত
চরকা কাটিছে বিশ্রাম নাই।
চরকার গুন্ গুন্, শুইন্যা চল বোন্
আমরা সকলে জলেতে যাই।
কমলিনী বলে আমার চরকার সূতা মোটা,
চরকা কাটিয়া আমি দিব দালান কোঠা। —ঐ (১৩৩৭)

৩৫

সাধারণ জলভরার গীত—

সবে মিলি যাব মোরা, যমুনা পুলিনে ত্বরা
কাঁখে নিব হীরার কলসী,
শাড়ী পরব কিরণ শশী, জল ভরিয়া গৃহে আসি
স্নান করাব রাম ধনে।
দাঁড়াব কদম্ব তলা, বাঁশী বাজায় বসন চোরা
শুনিয়া বংশীধ্বনি, আমরা সবে পাগলিনী,
ধন্য হব নারীকুলে হরিগুণ গেয়ে মোরা।

যমুনা পুলিনে বাজিছে বাঁশরী, মন কেমন করে, শুন সহচরী,
এস ত্বরা করি, কক্ষেতে কলসী ধরি—
কদম্বের মূলে হেরি সেই নব মুরারি।
সুমধুর স্বরে বেণু বাজায়ে ডাকিছে কানু
কোথা বৃষভানু নন্দিনী কিশোরী॥ —ঐ

৩৬

কে যাবে গো জলে আয় সবে মিলে
কদম্বের তলে ডাকিতেছে শ্যাম,
যাহার কারণে, মধু বৃন্দাবনে
হইয়াছে শ্যাম-কলঙ্কিনী নাম।
শাশুড়ী ননদী, গুরুজন আদি
আছে নিরবধি হইয়া বাম।
আয় গো ললিতা আয় গো বিশাখা,
বাঁশী ঐ ডাকে রাধা রাধা নাম। —ঐ

৩৭

জলের ছলে কদম তলে দেখ্যা আসি শ্যাম রায়।
মেঘের বরণ কালশশী, হৃদয়ে জলে দিবানিশি।
চল দেইখে আসি, অদর্শনে প্রাণ যায়।
গিয়াছিলাম উদয় কালে, ঠেক্যা রইলাম নদীর কুলে,
চল শ্যামকে দেইখে আসি, অদর্শনে প্রাণ যায়। —ঐ

৩৮

বাঁশীর ধ্বনি কর্ণে শুনি গৃহে রইতে পারি না।
বঁধু বঁধু যায় শুনা বাঁশী তার করি মানা।
মন্দ কইব গুরুজনা॥
সখি, তোরা কর গো মানা, এ যন্ত্রণা আর সহে না,
পাগল বদন হেরি রাধের কল্পনা। —ঐ

৩৯

বাঁশী বাজেরে মুরলী ধ্বনি শুনা যায়,
কোন্ বা বনে বাজে বাঁশী জাইন্তা আয়।

জাইন্যা আয় শুইন্যা আয় কইর‍্যা আয় মানা,
অসময়ে সে যেন আর বাঁশী বাজায় না।
উহার বাঁশী শুইনে বৃন্দাবনে কুলবতীর কুল যায়,
বাঁশী বাজেরে মুরলী ধ্বনি শুনা যায়।
বাঁশী শুইন্যা মন উদাসী, কোন্ নাগরে বাজায় গো বাঁশী,
সে বা কোন্ দেশী ?
উহারে পাইলে বন্ধন কইর‍্যা ভাসাইতাম প্রেম-যমুনায়।
যখন আমি বইস্যা থাকি গুরুজনের মাঝে,
নাম ধরিয়া বাজে বাঁশী শুইন্যা মরি লাজে।
ওরে নিষেধ কর, প্রাণ-সজনী, আর যে বাঁশী না বাজায়। —ঐ

৪০

বাজে না বাজে না বাঁশী বাজে কেবল কালার গুণে,
চল, সখি, দেইখ্যা আসি বাজে বাঁশী কোন্ বিপিনে।
শুনিয়া বাঁশীর গান, অধৈর্য হইল প্রাণ, ধৈর্য না মানে আমার মনে,
চল, সখি, দেইখ্যা আসি বাঁশী বাজে কোন্ বিপিনে।
শুনিয়া কালার গান, কেমন কেমন করে প্রাণ,
চল যাই যমুনার পুলিনে ;
চল দেইখ্যা আসি বাজায় বাঁশী কোন বিপিনে। —ঐ

৪১

কে গো তুমি, বাঁকা সখা, দাঁড়ায়ে কদম্ব মূলে।
কালোরূপে মন ভুলায়ে কালী দেও কামিনীর কুলে।
কে গো তুমি, কালশশী, কদম্ব ডালেতে বসি
বাজাইও না মোহন বাঁশী কৌশলে আসিব জলে।
কদম্ব ডালেতে বসি, কালাচাঁদ বাজায় বাঁশী
বাঁশীর স্বরে মন উদাসী, চল যাই যমুনার কুলে। —ঐ

৪২

ও প্রাণ কানাইরে, তৈলের বাটি গামছা হাতে,
চল যাই যমুনার ঘাটে, কলসী ভাসাইয়া নিল সোতেরে,
ও প্রাণ কানাইয়া। —ঐ

৪৩

জলে কি অপরূপ দেখি।
জলের নীচে মেঘ লুকাইয়া রয়েছে, সখি।
সহচরী, নবীন মেঘের মাথায় চূড়া, করে মুরলি !
যে দেইখ্যাছি সেই চিত্রপটে,
সেই ছুটিয়াছে জল আনিতে যমুনার ঘাটে।
আমার ঘাটে পটে একই দশা গো—
এখন উপায় কি করি ?
ও সহচরী, নবীন মেঘের মাথায় চূড়া, করে মুরলি। —ঐ

৪৪

তারে দেখা গো আমারে।
যে নাগরে মনপ্রাণ হরে, তারে দেখা গো আমারে।
চল সখি, বিধুমুখী, যমুনার পারে, তারে দেখা গো আমারে।
মনের সাধে ডুব দিলাম সই, কৃষ্ণপ্রেম-সায়রে
শ্যাম প্রেম-সায়রে ;
শ্রীরাধিকার মনের বাঞ্ছা পুরে কি না পুরে,—
তারে দেখা গো আমারে। —ঐ

৪৫

দেখিয়া গোবিন্দরূপ লাইগ্যাছে নয়ানে,
সই, গিয়াছিলাম জলে।
কেউর পিন্ধনে লাল নীল, কেউর পিন্ধনে শাড়ী,
রাধিকার পিন্ধনের বসন গো, ওগো প্রাণ সই,
কাজলা নীলাম্বরী, সই, গিয়াছিলাম জলে।
ত্রিভঙ্গের ভঙ্গিমা কৃষ্ণ বাজাইয়াছেন মুরারি,
বায় রাধা বিনোদবালা গো, ওগো প্রাণ সই,
আছেন তারে ধরি, সই, গিয়াছিলাম জলে। —ঐ

৪৬

কে গো তুমি, বাঁকা শশী, দাঁড়ায়ে কদম্ব তলে।
কালো রূপে মন ভুলাইয়া কালি দেও কামিনীর কুলে।

কে গো তুমি, বাঁকা শশী, কদম্ব ডালেতে বসি,
বাজাইও না মোহন বাঁশী, কৌশলে আসিব জলে।
কদম্ব মূলেতে বসি, কালাচাঁদ বাজায় বাঁশী
বাঁশীর স্বরে মন উদাসী কেমনে রহিব ঘরে। —ঐ

৪৭

জল ভর, সুন্দরী রাধে রাধে গো, যমুনারি ঘাটে।
আঁখি ঠাইরে কওনা কথা কেউতো নাহি ঘাটে।
জল ভর, সুন্দরী রাধে।
কেহর পৈরন লাল নীলী কেহর পৈরন শাদা,
রাধিকা সুন্দরীর পৈরন কৃষ্ণ নামটি লেখা গো।
জল ভর, সুন্দরী রাধে।
রাধে গো, যমুনার ঘাটে ;
আঁখির ঠারে কও না কথা,
কেউতো নাহি ঘাটে গো।
কেহর হাতে ঘটি গাড়ু, কেহর হাতে ঝারি।
রাধিকা সুন্দরীর হাতে সুবর্ণের কলসী গো।
জল ভর, সুন্দরী রাধে॥ —সোনার গাঁ (ঢাকা)

৪৮

চল গো, সখি, চল জল ভরিতে চল।
প্রিয় না, সখি, চলো জল ভরিতে চল ;
তৈল সিন্দুর দিয়া, সখি, কল্‌সী সাজাইল,
জয়ের ধ্বনি দিয়া সখি জল ভরিতে চলে।
প্রাণসখি চলো, প্রিয় সখি চল গো, চল জল ভরিতে চল।
যমুনার জলে যাইতে, পিছল পিছল মাটি,
হস্কে গেল রাধার পদ ভাঙ্গিল কলসী,
কলসী ভাঙ্গিয়া রাধে কাঁদিতে লাগিল,
দুই হস্ত ধরিয়া কানাই বুঝাতে লাগিল।
না কান্দিও না কান্দিও রাধে তুমি,
ভেঙ্গেছে কাঁকের কলসী গইড়ে দেব আমি।

রূপার দেব কলসীখানি সোনার দেব কান্দা
কলসীর উপর লিখ্যা দিব কলঙ্কিনী রাধা।
সখি, চল জল ভরিতে চল ॥ —বরিশাল

৪৯

গায়ে হলুদ বিবাহাচারের একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। বাংলা দেশের সর্বত্র এমন কি আদিবাসীর বিবাহাচারেও এই রীতি প্রচলিত আছে। বিবাহানুষ্ঠানে প্রসাধন কর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, প্রসাধন প্রসঙ্গেই গায়ে হলুদ মাখিয়া স্নান করা হয়, বিবাহোপলক্ষে তাহা আনুষ্ঠানিক ভাবে পালন করা হয় মাত্র। নিম্নের গানগুলি হইতে বিবাহাচারে গায়ে হলুদ মাখিবার রীতি যে কত ব্যাপক, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

তেল হল থালা থালা হলুদ মালা গো,
ইহ হলুদ কোন দেশের হলুদ।
ছেঁচালে না ছেঁচায় মা গো
বাটালে না বাটায় গো।
ইহ হলুদ কোন দেশের হলুদ গো।
বাছার গায়ে দিওরে মাথায়ে
মাথাতে মাথাতে, মাগো, মাঝে সরোবর,
আন রে, সাত ভাইরা, সাত রঙের বেজনী (পাখা)।

—অযোধ্যা (পুরুলিয়া

৫০

ওই দলমার পাহাড়ে, ওগো বালি কালো পাতল ওরে।
বারো বছরের খইল বালা গো ঝইর‍্যা ঝইর‍্যা পড়ে।
বাবাকে যে বলেছিলি দুধের পুকুর দিতে।
ভাই আমার দুধের সর কত না ঝাট খাচ্ছে।
আরে ওরে শুইন্যা ছিলি বড় লোকের বিটি,
দুয়ারে আইস্যা দাঁড়াল গো, মা, পাতা চাটার ব্যাটা।
পান যে মা খাইলে থুক্ না ফ্যালালে
কয়কইট্যা বউয়ের লাগি, ভাই, রাত না ঘুমালে ॥

—বাঁশপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

৫১

বর তলকে যাইও না (২)
ওগো ধনি, গায়ে লাগে দুধো,
হাসা গড়ায় পিঠ দিয়েছে ওগো ধনি,
মন নাই ধনির থির।
আজ ধনিকে বাঁধব
শোন করি স্রোতে
কেবা ধনির হেতু আছে,
ওগো ধনি, বাঁধন খুলে দিতে। —ঐ

৫২

বিছায়ে দে, মা, বিছায়ে দে,
নানি নাসি পাতিয়া,
দেশ কটুম আসে বৈসো
তবে আমি বোসবো। —ঐ

বর বা কনে বলিতেছে, যে আসন পাতিয়া দাও, আগে দেশের কুটুমরা বসুক, তবে আমি গায় হলুদে বসিব।

৫৩

গায়ে হলুদ কাপড়ে হলুদ হলুদ বরণ মাইয়া,
তার তরে আইছে গো শ্যামকিশোরের নাইয়া।
ও হলুদ বরণ মাইয়া,
তুমি যাবা কাল শ্বশুরবাড়ী সকলে কাঁদায়া।
---কুইলাগাল (পুরুলিয়া)

৫৪

ফুল বাড়ীর ভিতরে কে ঘোড়া ছাড়িল রে,
এক কলি ভেঙ্গে গেলে তোমার বাপা যাবেন বাঁধা গো।
সাতদিন পরে, বাবা, তোমার বাবা ছাড়ায় আনে গো। —ঐ

৫৫

হাত মেল, ধনি, পাও মেল ধনি।
মেলিতে মেলিতে ধনি মগন পাতর॥ —ঐ

৫৬

মাখা গো সাধের ধনী দড় বাচা হলুদ,
মেলিতে মেলিতে ধনি মগন পাতর ॥ —লাইলমড়ি (পুরুলিয়া)

৫৭

একো শিলের হলুদ বাটা মা ভেনো ভেনো রাখ গো,
যখন জনম তখন লিখন, মা, এখন কেনো ভাবো গো।

—খিড়িয়াড়ি (পুরুলিয়া)

৫৮

ই-পার উ-পার কুসুমের আড়াল,
মধ্যে বেজোপাড়া গো সখি—
মধ্যে বেজোপাড়া।
এতো রাইতে বাজনা গো বাজে,
হলুদ বাঁটে কারা গো সখি—
হলুদ বাঁটে কারা ?
সাত ভায়ের বহিন লো যারা,
হলুদ বাঁটে তারা গো সখি—
হলুদ বাঁটে তারা ॥
মেন্‌দি তুলোনিক্ লিব রে মাথ্
কিও—দিমু রে হাত।
মেন্‌দি বাটানিক্ লিব রে মাথ্,
কিও—দিমু রে হাত।
সেরপুর সহরে মেন্‌দির গাছ,
কিও—দিমু রে হাত ॥
উত্তর পচ্ছিমে হলুদ লাগাইলাম,
ওহি হলুদ কিনাওবে।
মিঞা কা বেটা শহুরে শাহাজাদা,
ওহি হলুদ কিনাওবে।
মিঞা কা বেটি পরমা সুন্দরী,
ওহি হলুদ মাখাওবে ॥

পিঠের হলৈদ রে বাছা, গোটা আরো গোটা।
মুখের হলৈদ রে বাছা, সর্ব রঙের ফোঁটা॥
ছাইল্যা খ্যালাইতে রে গ্যালো, নানা-নানীর বাড়ি।
নানাতে গাইলো রে খায়ো—উলু খৈল্যা ছাইল্যা।
নানীতে নিষেধো রে করে—না দিও গাইলো।
কাইলি বিহানে রে হামি, সোনার্যা ডাকবো,
গড়িয়্যা দিব রে হামি জোড় হাতের বালা॥ —রাজসাহী

উপরি উদ্ধৃত গান মুসলমান সমাজে প্রচলিত, নিম্নোদ্ধৃত গানটিও তাহাই—

৫৯

হলৈদ্, তোমার জরম্ কুন্ খানে হে,
হলৈদ, তোমার জরম্ কুন্‌খানে হে?
হামার জরম্ রাজার বাগানে হে।
হলৈদ্, তুমি কি কি কামে লাগো হে?
হামি লাগি ন'শা আরশের মুখে হে?
মেহেদি তোমার জরম্ কুন্ খানে হে?
হামার জরম্ মাইল্যানীর বাগানে হে।
হামি লাগি ন'শা আরশের হাতে হে।
সুর্‌মা, তোমার জরম্ কুন্‌খানে হে?
হামার জরম্ মক্কার শহরে হে।
হামি লাগি ন'শা আরশের চোখে হে॥ —ঐ

৬০

ভুঙ্গুরী কা উপরে কেহ কাটে চন্দনেরই গাছ।
মাথ বালা চুয়া রে চন্দন।
শাশুড়ী পাঠিয়েছে, নানা রংয়ের হলুদি,
মাথ বালা চুয়া রে চন্দন॥ —বাঁশপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

৬১

মাথায় তো ঝারি ঝম্পা, কপালে মৃত্তিকা লেখা,
ইহ বিধি কে হরে লিখিল, বিধি সে লেখ।
উচ্চ কপালে বাকুলিল।
রাধা কৃষ্ণয় যুগল মিলন॥

৬২

প্রশ্নোত্তর ছলে বর বা কনের গায়ে হলুদের সময় এই গানটি গাওয়া হয়—

প্রশ্ন— হলদি হলদি তুই বড় হলদি রে,
বাছারে, হলদি পাইলেন কোন্‌খানে ?

উত্তর— মোর পিসিকে বান্দা থুইয়া, হলদি আনচি যায়া।

তার পর একসঙ্গে ব্যঙ্গচ্ছলে গাওয়া হয়—

ওকি বাছারে, সেই হলদিং হইলেন কি দগমগ রে।
কাঁও দেয় রে হাতে, কাঁও দেয় রে পায়ে,
ওকি বাছারে, মায় দেয় রে চাঁদ বদনে রে।

—গোয়ালপাড়া (আসাম

৬৩

তিনজন কুমারী মিলিয়া বর বা কনেকে গায় হলুদ দিবার আগে এই গান গাইবে।

শিশাই নদীর বিলে, মাগো,
কাঁসাই নদীর সোড়াঁ
থেঁতালে না থ্যাতা যায়—
বাঁটালে না বাঁটা যায়,
এ হলুদ গায় পুর ধবলি ॥ —বাঁশপাহাড়ী (ঐ

৬৪

গায়ে-হলুদের পর বরের বাড়ীতে গীত—

জোগারে মঙ্গল ধ্বনি,
আইস আইস ওরে বাছা নীলমণি।
ঘরের থনে জিজ্ঞাসেন মায়ে,
"কি কি শোভে আমার রামের গায়ে ?"
হস্তে শোভে হস্ত জ্যোতি
গলায় শোভে রামের গজমতি।
রৌদ্রে ঘাইমাছে বাছা,
ক্ষুধায় ঘাইমাছে বাছা
কি চন্দ্রবদন, ওগো রামের মা।

"কই গেলা রামের দাসী!
গামছা আন রামের বদন মুছি।"
অঞ্চলে বাঁধিয়া কড়ি,
যান ওগো রামের মা বাইনা বাড়ী,
"হাদেরে বাইনা ছেইলা,
কত লইবা রে তোমার সিন্দুর তোলা?"
"আমার সিন্দুরের মূল্য সোনার পাঁচ কড়া,
ওগো রামের মা।" —ফরিদপুর

৬৫

স্নানের সময় মহিলাদের সঙ্গীত—

অষ্টগাছি রামকলা, ষোল ঝাড়ি জল।
তাহার মধ্যে স্নান করেন রূপের বিদ্যাধর॥
ঘরের থনে বাহির হইলেন রাজ-মহারাণী।
ডাইন হস্তে কুলহরিদ্রা, বাম হস্তে ঝাড়ি॥
সভার মধ্যে গিয়া রাণী চতুর্দিকে চায়।
কারো ধরেন হস্তে রাণী, কারো ধরেন পায়॥
সীতার মায় মিনতি করে, শুন আইয়োগণ।
শুস্তে শুস্তে মাখ হলুদ অতি দুঃখের ধন॥
নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া সীতার অঙ্গ করিলেন শুচি।
বাম পায়ে ভাঙ্গেন সীতা কুমারের মুছি॥ —বিক্রমপুর (ঢাকা)

৬৬

তোরা আয় গো সকালে,
আমার রামসীতাকে স্নান করাব সুশীতল জলে।
স্বর্ণ কুম্ভ ভরিয়া আন গঙ্গা জল, ঢাল গো রামের শিরে।
বাদ্যকর ডেকে আনরে, ধোপার ছেলে ডেকে আন,
ছুতারের পিঁড়ি আন, নব গঙ্গার জল আন।
তোরা আয় গো সকালে,
আমার রামসীতাকে স্নান করাব মনের আনন্দে। —ঐ

৬৭

অধিবাসের দিন বরকে স্নান করানোর সময় মেয়েলী সঙ্গীত—

জয় জয় রবে চল, সখি, সবে,
আজ রামের গন্ধ অধিবাস।
বসাইয়া রামেরে—ডাক দাও শীলেরে,
কামাইতে রামের হাতে।
বসাইয়া রামেরে ডাক তার মায়েরে
হরিদ্রা দিতে রামের গায়েতে,
বসাইয়া রামেরে আন তার ভগ্নীরে,
গামছা দিতে তাহার কান্দেতে। —মৈমনসিং

৬৮

জইড় আগে রে, ভাই, শঙ্খ চিলের বাসা।
শুয়া মাইরা নিয়া গেলরে, ভাই, গায়ের গামছা।
জলে যাব না লো, সই, জলঘাটে মরিব। —বাঁশপাহাড়ী

৬৯

বরকে স্নান করাইবার গীত—

তোরা আয়লো সকলে
আমার সীতানাথকে স্নান করাইবাম সুশীতল জলে।
ঘিলা আর হরিদ্রা বাটি, শীঘ্র কইর‍্যা আন সখি,
আমার রামের অঙ্গে মাখি সকলে মিলে।
আম্র পল্লব দিয়া, ভৃঙ্গার ভরিয়া
রাখিয়া দিয়াছি, সখি, ঐ ছায়াতলে।
কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া, কর্পূর তাতে ছুঁয়া
গন্ধ জলে ধুয়াইব আমার রামকমলে।
চিকন গামছা দিয়া, দিব অঙ্গ মুছাইয়া
ফুটিবে চম্পক কলি হাতে পায়ে আঙুলে।
আমার সীতানাথকে স্নান করাইবাম সুশীতল জলে।
—মৈমনসিং

৭০

আমার মলিন আইলো কৃষ্ণধন, স্নান করাও গো যত সখিগণ,
জল ভর্তে অইয়াছে বেলা, বাটিয়া হরিদ্রা ঘিলা
আন, সখি, ত্বরা করি অঙ্গেতে কর লেপন।
কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া, ভাল মতে মিলাইয়া,
সুবাসিত জল দিয়া কর লো অঙ্গ মার্জন।
অল্প কইর‍্যা ঢাল পানি, শুন শুন ও সজনী,
আমি কত না দেবদুর্গা মাইন্যা পাইয়াছি কালিয়া ধন।
ডাইক্যা যাদুমণি, দণ্ডে দণ্ডে খাওয়াই ননী,
আমি সর্বদা চাহিয়া দেখি কাইলা সোনার চাঁদ বদন।
স্নান করাও গো যত সখিগণ! —ঐ

৭১

স্নান করে চান্দের নন্দন।
সুবর্ণের চৌকিতে বসে, বাদ্য বাজে চারি পাশে
গীত গায় যত নারীগণ।
গাইটু ঘিলা আমলকী, হরিদ্রা সহিতে বাটি
ইহারে করিল তিন গুণ।
দাসদাসী নফরে, শরীর মার্জন করে
পুন্নিমার শশীটী যেমন।
সুবর্ণের কলসী ভরি, রাখিয়াছে সারি সারি
তীর্থ জল করিয়া সাজন।
গন্ধ তৈল মাখাইয়া, সামাইল গামছা দিয়া
অঙ্গ তার করিল মার্জন।
অগুরু চন্দন সঙ্গে, মিশাইয়া মনোরঙ্গে
করে নিয়া অঙ্গেতে লেপন।
ময়ূর মুকুট শিরে, নানা রত্ন অলঙ্কারে
সাজাইল করিয়া যতন।
স্নান করে চান্দের নন্দন। —ঐ

৭২

সবে মিলি যাব মোরা, যমুনা পুলিনে ত্বরা
কাঁখে নেব হীরার কলসী,
শাড়ী পরব কিরণশশী, জল ভরিয়া গৃহে আসি
স্নান করাব রামধনে। —ঢাকা

৭৩

চল, দুর্গা, গো চল নিমন্ত্রণে, ত্বরাই করে নিশীথ প্রভাতে।
রামচন্দ্র রাজা হবে, যাইতে হবে তোমার,
তোমার যাইতে হবে অতি সকালে ॥

৭৪

চল দুর্গা গো চল নিমন্ত্রণে, ত্বরাই করে নিশীথ প্রভাতে।
রামচন্দ্র রাজা হবে যাইতে হবে তোমার,
তোমার যাইতে হবে অতি সকালে ॥
পদ্মা, চল গো চল নিমন্ত্রণে, ত্বরাই করে নিশীথ প্রভাতে,
রামচন্দ্র রাজা হবে যাইতে হবে তোমার,
তোমার যাইতে হবে অতি সকালে ॥
গঙ্গা, চল গো চল নিমন্ত্রণে, ত্বরাই করে নিশীথ প্রভাতে,
রামচন্দ্র রাজা হবে যাইতে হবে তোমার,
তোমার যাইতে হবে অতি সকালে। —বরিশাল

৭৫

যাইতে হবে, ওগো, পদ্মার শ্রীরামের বিবাহে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, চক্ষের সাফল্য হবে শ্রীরাম দরশনে।
দুই হস্ত বাহিরে মুখেতে বিনয় করে কহিছে পদ্মারে,
যাইতে হবে ওগো পদ্মার শ্রীরামের বিবাহে।
যাইতে হবে শ্রীরামের সিনানে।
যাইতে হবে, ওগো, লক্ষ্মীর শ্রীরামের বরণে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, চক্ষের সাফল্য হবে শ্রীরামের দরশনে।
যাইতে হবে, ওগো, পদ্মার শ্রীরামের বিবাহে। —ঐ

৭৬

সে ত রামের মা কৈকেয়ী রাণী, র'ল ঘুমেতে।
গা তোলো নন্দরাণী গো, নিশি প্রভাত হইল পরভাতে ॥
তোমার রামের অধিবাসের, রাণী, সময় গেল।
গা তোলো, নন্দরাণী গো, নিশি প্রভাত হইল ॥
তোরা, সখি, আন গো গঙ্গা, আন গো গঙ্গা সবে।
আমার রামেরে সেনান করাও, অতি সকালে ॥
তোমরা, সখি, আন গো গিলা, আন গো গিলা সকালে।
আমার রামেরে সেনান করাও অতি সকালে ॥
তোমরা, সখি, আন গো হলুদ, আন গো হলুদ সকালে।
আমার রামেরে সেনান করাও অতি সকালে ॥
তোমরা, সখি, আন গো মেতি, আন গো, সখি, সবে।
আমার রামেরে সেনান করাও অতি সকালে ॥
আমার সীতারে সেনান করাও অতি সকালে ॥
আমার রাম যে ঘুমে কাতর হেইলে ঢুইলে পড়ে।
আমার রাম খিদেয় কাতর, হেইলে হেইলে ঢুইলে পড়ে।
আমার রামেরে সেনান করাও অতি সকালে ॥ —ঐ

৭৭

নিশি না প্রভাত কালে ও, দশরথ কৌশল্যারে ডাইকা বলে।
তোমরা জয়ের ধ্বনি বল সকলে, শ্রীরাম রাজা হবে সকালে ॥
নিশি না প্রভাত কালে, কৈকেয়ীরে ডাইকা বলে,
তোমরা শুভধ্বনি বল সকলে, শ্রীরাম রাজা হবে ভাল দিনে ॥
তোমরা জয়ধ্বনি বল সকলে শ্রীরাম রাজা হবে শুভদিনে,
রাজা হবে রাজ্য পাবে, রাজসিংহাসনে বসে।
তোমরা জয়ের ধ্বনি বল সকলে, ভালদিনে শ্রীরাম রাজা হবে ॥
নিশি না প্রভাত কালে, সুমিত্রারে ডেকে বলে,
তোমরা জয়ের ধ্বনি বল সকলে, শ্রীরাম রাজা হবে ভাল দিনে।
তোমরা শুভধ্বনি বল সকলে, শ্রীরাম রাজা হবে শুভদিনে।
রাজা হবে রাজ্য পাবে, সতীলক্ষ্মী বামে বসে।

তোমার জরম সাফল্য হবে, শ্রীরাম দরশনে।

সখি গো, তোমার জনম সাফল্য হবে শ্রীরামের দরশনে॥ —ঐ

৭৮

ঢোল ও বাজে মৃদুল বাজে রামের পুরীর মাঝে,

সিংহনাদ পাঠাইলাম গো তবে॥

হোলইরোল দিয়া (=হলুদগিলা)

চল তোমার যাইতে হবে গো॥

হোলইতে (হলুদ মাখিতে) যাইতে গো হবে।

রামের স্নানে গো রামের ও গোছলে গো

মার ওয়ায় ঘিরিলরে (=পুকুর ঘিরিয়া বসিলে)

চল তোমার যাইতে গো হবে॥

সাবান দিতে যাইতে গো হবে,

পুকুরের ধারে যাইতে গো হবে,

রামের ও স্নানে গো রামের ও গোছলে গো

মার ওয়ার ঘিরিলরে॥ —ঐ

৭৯

বরযাত্রীদের কনের বাড়ীর দিকে যাত্রা—

ঘোড়ার সোয়ার হয়্যা ন'শারে—

ন'শা যাইছে শ্বশুর বাড়ি আরে কে।

এ্যাক্ চাবুক মারে ন'শারে—

ন'শা ডাহিনে বাঁয়ে আরে কে।

আর এ্যাক্ চাবুক মাইর‍্যা ন'শারে—

ন'শা দাঁড়ায় বকুলতলে আরে কে।

ঐ ফুল ঝরিয়্যা পৈলো ন'শারে—

ন'শার ম্যাহারার ওপর আরে কে।

ঐ ফুল কুড়িয়্যা ন'শারে—

ন'শা পাঠায় আরশের আরশের বাসর-ঘরে আরে কে,

ঐ ফুল দেখিয়্যা আরশরে—

আরশ হাসে মনে মনে আরে কে।

ঐ ফুল দেখিয়্যা আরশরে—
আরশ কান্দে মনে মনে আরে কে।
কোন্ বা আশ্‌রাফের ব্যাটা
আমার যৈবন লুটিতে আসে নারে কে।
কোন্ বা মৈয়দের ব্যাটা
হামার যৈবন লুটিতে আসে আরে কে ॥
ঐ ফুল দেখিয়্যা আরশ রে—
আরশ হাঁসে মনে মনে আরে কে।
ঐ ফুল দেখিয়্যা আরশ রে
আরশ কাঁদে মনে মনে আরে কে ॥ —রাজসাহী

৮০

উজান নৈক্যা আইলোরে বোহ্যা ভাটি বোহ্যা যায়,
ধর ধর ধররে নৈক্যা ধরা নাহি যায়।
আজকার দিনে কাজ-কাম সাইর্‌য়া ন'শা বিহ্যা করিতে যায়,
ব্যাণ্ট-বাজনা লিয়্যারে ন'শা বিহ্যা করিতে যায়।
যতুই দলদলির লোকজন দু'ধারে খাড়া হয়।
ব্যাণ্টের বাজনা শুইন্যা রে লোকজন মুখে হাঁসি পায়।
ব্যাণ্টের বাজনা শুইন্যারে লোকজন হাতে তালি দ্যায়।
মা-মাসি দয়ারে রাখি তারাই দুয়া দ্যায়।
জলের কুম্ভীর বনের হরিণ তারাই সাঁথী হয় ॥ —ঐ

৮১

ঘাড়ের চাদর দিয়্যা বহিন, ডোলা ঘাজাল্‌ছি—
ও বহিন ডোল্লাতে চড়রে!
ভাইয়্যা, ডোলায় চড়া ভাগ্নীকে শোভে রে—
ও ভাইয়্যা, না যাব ডোল্লাতে।
মাল্‌দা যাইব্যা আইন্যাছি জুতা,
ও বহিন, ডোল্লাতে চড়রে!
সেই জুতা ভানীর পায়ে মানায় রে,
ও ভাইয়্যা, না যাব ডোলাতে।

ল'বগঞ্জ থাইক্যা আইন্যাছি আলতা,
ও বহিন, ডোল্লাতে চড়রে।
সেই আল্‌তা ভানীর পাঁয়ে শোভে রে,
ও ভাইয়্যা, না যাব ডোলাতে।
শিবগঞ্জের বাজারে রে হামি চুড়ি কিন্যা দিব রে;
ও বহিন, ডোল্লাতে চড় রে।
হাসি তেবে ডোল্লায় চোঢ়্যা যাব রে—
ও ভাইয়্যা, ডোলায় চঢ়িয়্যা ছাও। —ঐ

৮২

বিবাহের প্রারম্ভে বর যাত্রা করিবার সময়কার—
দেখ দেখ আরে সখি হিমালয় ভবন
চণ্ডিরে করিতে বিয়া শিবের আগমন
বাহার বসে যত দেবগণ
চান্দুয়ার মধ্যে শিব কমললোচন
পুরন্দরে ছত্র ধরে শিবের উপর
নারদ বাতাস করে লইয়া চামর
সখি গিয়া বার্ত্তা লইল মেনকার কাছে
মেনকার রঙ্গ হইল জামাই দেখিবারে
ডাইন হাতে ধান্য দুর্ব্বা বাতী বাম হাতে
স্বস্তি বলিয়া দুর্ব্বা দিল তাহার মাথে। —মৈমনসিংহ

৮৩

(নদীরে) সাজ শীঘ্র করি যাইতে হইবে গিরিরাজ ভবনে
আন বাঘাম্বর দেও সত্বর পরনে
আন সিদ্ধের ঝুলি ভস্ম ঝুলি মাখিব বদনে।
(নন্দীরে) শুইনে লোকের মুখে দেখব তাকে বাঞ্ছা হইল মনে
শ্বশুরবাড়ী স্বর্গপুরী বলে সর্ব্বলোকে
আমি কি দেখাব শ্বশুর দেশে ভাঙ্গ ধুতুরা বিনে
যাইতে হইবে গিরিরাজ ভবনে। —ঐ

৮৪

পাত্রপক্ষীয়ের বাড়ীর নিকট বর ও বরযাত্রী উপস্থিত হইলে এই গীত শুনিতে পাওয়া যায়—

সখি, ঐ যায় দেখা, রামের প্রাণসখা,
বিশাখা, ঐ যায় দেখা, কিবা শোভা কইরাছে।
রথের উপর রতনমণি, কিবা শোভা করে,
ঐ যায় দেখা, রামের প্রাণসখা ॥ —ঐ

৮৫

বরযাত্রীসহ বর আসিয়া পৌছিবার পর মেয়েলী গীত—

নিমতলাতে চোর এসেছে চৌকিদার ঘুমায়ে গেছে,
কোঠা ঘরে শিং দিয়েছে সিংহাসন চুরি গেছে
মাণিক পাইকের ঘরে। —ঐ

৮৬

বরকে ব্যঙ্গ করিয়া গীত—

কোথাকার বর, হে তুমি, কোথায় তোমার ধাত্তি,
কোন্ পুকুরে চান করিলে কোথায় তোমার ধুতি,
ও কুটুম, এস বস খাটে, পা ধোয়াব পুকুর ঘাটে
পিঠ ভাঙ্গবো চিলকোটে ॥ —বাঁশপাহাড়ী

৮৭

এসেছে বসেছে ভাবিছ কেনে, কোন রসবতী পড়েছে মনে,
রসবতী যদি পড়েছে মনে রসবতী ছাড়য়ো এসেছ কেনে?
রসবতী তুমি মনের মতন আমার দিদি কি নয় হে রতন? —ঐ

৮৮

জয় জয় পড়ে, জয় জয় পড়ে রে,
জয় জয় পড়ে শুভক্ষণে রে।
আগিনা আটো, মাজিয়া খাটো,
মুঞি ভাবো কতয় সৈন্য আইসে রে।
কোন বা ভাগ্যবতী রে, বেটিরে উচ্ছব রে,
কি বাছারে নাইয়রী না ধরে বাসরে রে। —গোয়ালপাড়া, আসাম

৮৯

বরকে কেন্দ্র করিয়া পাত্রীপক্ষের আক্রমণাত্মক সঙ্গীত এই প্রকার—

এতো রাতি ক্যানে রে, শুয়র চরার বেটা রে—
আমার বালি ভোকে দুঃখ পাইলো রে,
আমার বালি নিন্দে হইরান হইলো রে,
শুয়র চরেয়া, কিবা গওঁয়াইলেন এই দিন রে।

জাঁকজমক করিয়া বিবাহ করিতে আসা হইয়াছে, কিন্তু কন্যার জন্য আনীত গয়না ত্রুটিপূর্ণ—

বরু, তোর নাম বড়রে, বরু, তোর শব্‌দ বড় রে,
বালির কানের সোনা কই আইন্‌চেন রে ?
বরু, তোর নাম বড় রে, বরু তোর শব্‌দ বড় রে,
বালির কমরের শাড়ী কই আইনচেন রে ?

বর যেন লজ্জিত হইয়া উত্তর দেয়—

বালি না কন রে, বালি না কন রে,
ধাগ্‌ড়ী ভাউজের আমার মনে নাই রে,
চট্‌কামারী বইনের আমার মনে নাই রে।

কন্যার বাড়ীর লোকজনদেরও লক্ষ্য করিয়া গালি দেওয়া হয়—

গুয়া মঙ্গা, পান মঙ্গা, মঙ্গা রে সুপারী,
কুত্তি গেইচে কইনার বইনী ডোমোনা পেয়ারী,
আমাক্‌ গুয়া না দেয় রে, আমাক্‌ পান না দেয় রে।
চিরিকিটি গুয়া রে, বিরনীর গাছের পান,
কুত্তি গেইচে কইনার ভাইয়া টিকিত্‌ ধরি আন্‌।
আমাক গুয়া না দেয় রে, আমাক পান না দেয় রে।   —ঐ

৯০

বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে কন্যার উদ্দেশ্য গীত সঙ্গীত—

ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া তোতা বুনায় ফুলের সাজি,
ঝোপের বেত কাটিয়া তোতা বুনায় ফুলের সাজি।
ফুলের সাজি লইয়াছে তোতা ফুল তুলিতে যায়।
এ ফুল তোলে ও ফুল তোলে তোতা বাছিয়া চাম্পা ফুল।
বিনা সূতে গাঁথেরে মালা পতি পাবার আশে।   —বরিশাল

৯১

পাত্রের বাড়ীতে বিবাহের পূর্বদিন পাত্রকে সাজাইয়া যাত্রা করিয়া দেওয়া হয়, সেই সময় পাত্র সাজানো উপলক্ষে গাওয়া হয়—

সখি, চল চল চল সখি, অযোধ্যার ঐ ভুবনে।
আমরা সাজাব রাম ঐ গুণগ্রাম চল যাই সকালে।
আমি আগে যাইয়ে সাজাইব ঐ রাম বিজয়বসন্তরে।
আমি এই চলিলাম চন্দন আনতে বান্যের দোকানে। —ফরিদপুর

এইভাবে বস্ত্র, বলয়, কাজল, নূপুর, মুকুট ইত্যাদি দিয়া সাজাইয়া দিবার কথা গানে গাওয়া হয়।

৯২

দশরথের বেরধ নারী বরণ কুলা সাজন করি
অই যে সাজায় কুলায় হীরামণ মাণিক রাম রঘুনাথে,
দশরথের মনের সাধ, রাজা হবে রঘুনাথ
দশরথের নারী, অর্ঘ্যসরা সাজন করি
সাজায় কুলায় হীরামণ মাণিক রঘুনাথ। —বরিশাল

৯৩

তোমরা রাম সাজাইতে জান না, রামের সাজ ভাল দেখায় না,
ওরে সাজ ঘরে নিয়ে খুইল্লা ফেলে, ফিরে রাম সাজাওগে,
তোমার তাঁতিয়ার জোড় দিয়া রাম সাজাইতে জান না।
রামের সাজ ভাল দেখায় না॥
তোমরা ঘরে গিয়ে খুইল্লা ফেলে ফিরে রাম সাজাওগে,
ওগো, তোমরা সোনার গয়না দিয়ে রাম সাজাইতে জান না,
রামের সাজ ভাল দেখায় না॥
ও সাজ ঘরে নিয়ে খুইল্লা ফেলে, আবার রাম সাজাওগে,
তোমরা পুষ্প মাথে দিয়া তোমরা রাম সাজাইতে জান না,
তোমরা মালীয়ার পুষ্প দিয়া, রাম সাজাইতে জান না,
রামের সাজ ভাল দেখায় না॥ —মৈমনসিং

৯৪

সাজাইয়া রূপ ও মায়ে দেখে,
ঐ যে দেখে রূপ নেহার করিয়া
আমার প্রাণের গোপাল ॥
সাজাইয়া রূপ ও বুইনাই দেখে, ঐ যে রূপ দেখে
রূপ নেহার কইরা।
আমার জীবন কানাই ॥
সাজাইয়া রূপ ও ভাইর বৌ দেখে, ঐ যে
দেখে রূপ নেহার কইরা।
আমার প্রাণের কানাই ॥ —ঐ

৯৫

আমার প্রাণের গোপাল বিনে, আমি আর সাজাব কারে ॥
আমি আনিয়া সোনার গয়না রে, রেখে দেই গোপনে।
আমি সাজাইলে সাজাইতে পারি, আমি ভয় করিব কারে ॥
প্রাণের গোপাল বিনে আমি আর সাজাব কারে ॥
আমি সাজাইলে সাজাতে পারি, আমি ভয় করিব কারে,
আমি আনিয়া মালিয়ার পুষ্প, রেইখা দি গোপনে
আমি আর সাজাব কারে। —ঐ

৯৬

আমার একে রামও সুন্দর অঙ্গ, ঐ যে তাইতে শুভে কড়ি গয়না,
আমার জীবন কানাই ॥
আমার একে রামের সরল গলা, ঐ তাইতে শুভে সোনার দানা,
আমার জীবন কানাই ॥
আমার একে রামের সুন্দর হস্ত, ঐ যে তাইতে শুভে সোনার অঙ্গুট,
আমার জীবন কানাই ॥
একে রামের ছাঁটা বাবরী, ঐ যে তাইতে শুভে মালীর পুষ্প,
আমার জীবন কানাই ॥ —ঐ

৯৭

কনে সাজানোর গীত—

আইওগণ মিলে আয় তোরা চলে,
সাজাইতে হবে সীতারে গলায় মোহন মালা।
হাতে কঙ্কণ বালা, চল যাই, চল যাই সখী,
রাম সীতারে সাজাইতে।
একে রামের সুন্দর আঁখি, তাতে শোভে কাজল রেখি,
আহা, কাজল দিয়ে সাজায়েছ, আর কি বাকী রেখেছ।
একে রামের সুন্দর মাজা, তাতে শোভে চেলির কোচা,
আহা, চেলি দিয়ে সাজায়েছ,
আর কি বাকী রেখেছ। —বরিশাল

৯৮

একে রামের চিকণ মাঞ্জা, তাইতে শোভা করে তাঁতীর জোড়ে।
আমার রামের রূপে আলো করে,
আমার সীতার রূপে আলো করে,
দেখ না, সখী, তোমরা হে নেহার কইরে।
একে রামের সাদা অঙ্গ, তাইতে শোভা করে শাখ কড়ির গয়না,
আমার রামের রূপে আলো করে,
আমার সীতার রূপে আলো করে,
দেখ না, সখি, তোমরা নেহার কইরে॥
আমার একে রামের ছাঁটা বাবরী, তাইতে ঐ শোভা
করে গো, সখি, মালীর পুষ্প।
আমার রামের রূপে আলো করে, আমার সীতার রূপে আলো করে,
সাজাইয়া দেও না, সখী, তোমরা বিয়ার বেশে॥ —ঐ

৯৯

নিম্নোদ্ধৃত গানটি মুসলমান সমাজে প্রচলিত—

রামো সাজে, উনুমানেরে, কি দিয়া
সাজাবো বাবাজান আমারে
ঘরে তো আছে পাঁচ শত টাকার মুকুট রে,

তা দিয়া সাজাবো লক্ষ্মণ তোরে।
রামো সাজে, রামো সাজে, উনুমানেরে কি দিয়া
সাজাবো বাবাজান আমারে।
ঘরে তো আছে কলকাতারও শাড়ীরে, তা দিয়া
সাজাবো লক্ষ্মণ তোমারে।
রামো সাজে, রামো সাজে, উনুমানেরে কি দিয়া
সাজাবো বাবজান আমারে।
ঘরে তো আছে বাসেরও তৈল, তা দিয়া সাজাবো
লক্ষ্মণ তোমারে। —ফরিদপুর

১০০

ওরে রাইও, আচ্ছা কইরা শিঙরাইও রে,
ওরে রাইও, ভালা কইরা শিঙরাইও রে।
নারাণপুরের নারায়ণী ত্যাল
মাপ ঢালুয়া খোপা ভিড়িয়া বান্দিও রে।
রংপুরীয়া গন্ধ মরুয়ার বাস,
মাও তেপইতা সিতা কোনা ছকিও রে।
যদি খোপা নড়ে চড়ে রে,
ভরা সভার মাজে গাও লজ্যা পাইবে রে। —গোয়ালপাড়া, আসাম

১০১

পদ্মের পাতে জল যেমন রে, তেমন মিথিলা নগর রে,
রামচন্দ্র বিয়ায় সাজে রে।
রামের মাও ভাগ্যবতী রে, মাও রামক সাজন করে রে।
কমরে তুলিয়া দিলো রে মাও অগ্নিপাটের ধুতি রে,
গায়েতে তুলিয়া দিলো রে মাও উড়ানী চাদর রে,
মাথায় তুলিয়া দিলো রে মাও মণিরাজ-পাগিড়া রে,
পায়ে পউরাইয়া দিলো রে মাও বানতিয়া জুতা রে,
রামের মাও ভাগ্যবতী রে, মাও রামক সাজন করে রে,
রামচন্দ্র বিয়ায় সাজে রে। —ঐ

১০২

সোহাগ মাগার গীত —

চলগো চলগো, সখি, যাই হিমালয়,
শঙ্কর বরিবে গৌরী শুইন্যাছি নিশ্চয়।
সকল দেবের বালা একত্র হইয়া
মেনকার কাছে গেল পূর্ণ ডালা লইয়া।
দেখিয়া মেনকা রাণী হরষিত মন
বসিতে আসন দিলা করিল যতন।
শচী লক্ষ্মী সরস্বতী মেনকা সুন্দরী
রতি তিলোত্তমা রম্ভা রামা বিদ্যাধরী।
মোহন বেশেতে সাজে নারীগণ যত
সোহাগ মাগিতে চলে গাইয়া নানা গীত।
সিন্দুর কাজল লইল সোহাগের কারণ,
আদা হরিদ্রা জিরা খড়িকা লবণ।
সাবিত্রীর কাঁখে কলসী মেনকার মাথায় কুলা
সোহাগ মাগিতে রাণী দেবপুরে গেলা।
এইরূপে চইল্যা যায় কালীমার মন্দিরে,
সোহাগ দেও গো, কালীমা, সোহাগ দেও আমারে।
দোয়ারের মাটি তুলে নখে চিমুটিয়া,
সোহাগ দিলেন কালী কুলায় তুলিয়া।
এই মতে চইল্যা যায় প্রতি ঘর ঘর,
তারপর চইল্যা যায় আপনার বাসর।
মেনকার মুখের পান গৌরীরে দিয়া,
গ্রন্থি মোচন করলো কুলা নামাইয়া। —মৈমনসিং

১০৩

তোরা উলুধ্বনি দে,
ঠাকুর ঝির আইজ ফুল ফুটেছে সরোবরে।
উলুধ্বনি দেলো তোরা, শঙ্খের ধ্বনি দে,
সত্যবান আর সাবিত্রীর আজ হইবে বিয়া।

শুন বোন্ কাদম্বিনী, সৌদামিনী, মনমোহিনী,
দেগো তোরা উলুধ্বনি ঐ কুলাখান মাথায় নিয়া,
সত্যবান আর সাবিত্রীর আজ হইবে বিয়া।
তোরা উলুধ্বনি দে। —ঐ

১০৪

নিম্নোদ্ধৃত গানটি বিবাহের দিনে বরকর্তা কিংবা বরযাত্রীর গান বলিয়া মনে হয়, তবে মেয়েরাই ইহা গায়—

নডীহের গ কন্যা কাঁঠালডিয়ের বর লো।
এমন জানলে গো আমরা না আন্‌তাম ঘর লো॥ —বাঁশপাহাড়ী

১০৫

বরকে উদ্দেশ্য করিয়া গীত—

কোথা হতে এলে, তাঁতী, কোথায় তোমার ঘর,
পুর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ রে, তাঁতী, চাক্‌কুলাতে ঘর॥ —বেলপাহাড়ী

১০৬

বরকে ব্যঙ্গ করিয়া গীত—

আগে তুগুন কইছিলা, সদাগর গো, না করিবা বিয়া;
অথন তুগুন দেখি গো, সদাগর, নাপিতে তোমায় কামায় গো॥
আগে তুগুন কইছিলা, সদাগর গো, না করিবা বিয়া;
এখন তুগুন দেখি রে, সদাগর, বিয়ার সাজন সাজ রে॥
আগে তুগুন কইছিলা, সদাগর গো, না করিবা বিয়া,
এখন তুগুন দেখি গো, সদাগর, বিয়ার ধুতি পইরাও রে॥ —মৈমনসিং

১০৭

কন্যাকে বিবাহ সভায় উপস্থিত করিবার পর এই মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়—

শুভ ক্ষণে আনিল গৌরীরে ও কি ওরে,
ইন্দ্র ধরিল ছাতি, বেদ পড়ে প্রজাপতি,
নটেতে মঙ্গল ধ্বনি করে॥
ওকি ওরে, অন্তম্পট করি দূর, দশ বাহু করি যোড়,
প্রণাম যে করিল বিশেষে।

ওকি ওরে, তুলাতুলি সপ্তবার, জয়ধ্বনি জোকার,
মশাল জলিছে চাইরে পাশে ॥
ওকি ওরে, শিবের মুকুট মাথে ফুল ছিটায় বাম হাতে,
নামাইল ছায়ামণ্ডপ ঘরে।
ওকি ওরে, দেখিয়া গৌরীর মুখ, শিবের মনে কৌতুক,
পঞ্চমুখে হাসে মহেশ্বরে ॥
ওকি ওরে, তবে সাত পাক ফিরি পার্বতী আর ত্রিপুরারি,
রৈল পূর্ব পশ্চিম মুখে।
ওকি ওরে, জিনিয়া সে কোটি ভানু দোঁহার সুন্দর তনু,
হেন রূপ দেবগণে দেখে ॥ —ঐ

১০৮

গৌরীদান উপলক্ষে গীত—

চল রঙ্গ দেখি গিয়া, আট বছরের গৌরীরে শঙ্করে করে বিয়া।
পূবমুখে রইছেন শিব গো বাঘ ছাল পরিয়া,
পশ্চিম মুখী হিমালয় গো গৌরী কোলে লইয়া।
মাইয়া দান কইরা বাপে ফুরাইল দায়,
জ্বালাইয়া তুষের আগুন দিল মায়ের গায়। —মৈমনসিংহ

১১৯

কন্যাদানের সময় কন্যার মাতাপিতাকে লক্ষ্য করিয়া—

তেঁতুল তলে উঁচা পিঁড়া ঘিয়ে ঝলমল করে,
বাবু মোর বসে আছে গো বিটি দান করিতে, মাগো,
বিটি দান করিতে, বাবা, চউখে পড়ে লোর,
আনরে লাল গামছা পুঁছাইব লোর (বাবু)। —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

১১০

জনক নরপতি মন হরষিতে, রামচন্দ্র বরে দান করেন সীতা,
নানা আবরণে সুসাজন সাজাইয়ে,
লইয়া গেল সীতা রাজ-সভার মাঝে।
নানা বাদ্য বাজে তার মাঝে,
উলুধ্বনি দিল রমণী সমাজে। —মৈমনসিংহ

১১১

কন্যার মাতাকে ব্যঙ্গ করিয়া প্রতিবেশিগণের গীত—

আম পাতার চাতুর মুতুর কাডাল পাতার নাও।
ওই ঘাটে বাতাস, মাঝি, এই ঘাটে ভিড়াও নাও।
বিবির মায়ে রান্‌ছে সিন্নি একবার খাইয়া যাও।
বিবির মায়ে লাগছে বিছান একবার চাইয়া যাও।
বিবির মায়ে পরছে শাড়ী একবার দেইখ্যা যাও। —বরিশাল

শাশুড়ীকে ঠাট্টা করিবার জন্য অন্যান্য মেয়েরা শাশুড়ীকে আরো সজ্জিত করাইয়া গান করিতে থাকে।

১১২

পাত্রী সাজানো অনুষ্ঠানের গীত—

সখি, সাজাও সাজাও সাজাও যেয়ে বিজয় বসন্তেরে।
আমি এই চলিলাম বস্ত্র আন্‌তে কাপইড়ার দোকানে,
সখি, সাজাও, সাজাও, সাজাও।
আমি এই চলিলাম মটুক আন্‌তে মালীর বাড়ীতে,
সখি, সাজাও, সাজাও, সাজাও।
সখি, সাজাও সাজাও যেয়ে বিজয় বসন্তেরে ॥
আমি এই চলিলাম, আমি এই চলিলাম চন্দন আন্‌তে
বানিয়ার বাড়ীতে।
সখি, সাজাও সাজাও যেয়ে বিজয় বসন্তেরে ॥
আমি এই চলিলাম, কাজল আন্‌তে অযোধ্যা ভুবনে।
সখি, সাজাও সাজাও সাজাও যেয়ে বিজয় বসন্তেরে ॥
আমি এই চলিলাম বাজু আন্‌তে কামারের বাড়ীতে,
আমি এই চলিলাম ॥ —বিক্রমপুর (ঢাকা)

১১৩

নারাণপুরের লারা ও ডোরা ঘোরাণপুরের কাঁকই,
ও মোর পায়রা রে!
ভাল কৈর‍্যা ঘিংরায়ো পায়রাক্ রাখিও যতনে;
ও মোর পায়রা রে ॥

নারাণপুরের সিন্দুর ও বেশর, ঘোরাণপুরের মালা,
ও মোর পায়রা রে !
ভাল কর্‌য়া ঘিংরায়ো পায়রাক্, রাখিও যতনে
ও মোর পায়রা রে ॥
ইএ মহালে মেরা সিন্দুর বিকাই ।
শ্যামজোড়াজোড় বাংলা লালকো ভুলাই ॥
লালকে ভুলাই রে হাওলদারকো ভুলাই—
শ্যামজোড়াজোড় বাংলা লালকে ভুলাই ॥
ইএ মহালে মেরা বেশর বিকাই ।
শামজোড়াজোড় বাংলা লালকে ভুলাই ॥ —রাজসাহী

১১৪

কন্যা সাজানোর গান—

এসেছি এসেছি মোরা রাধাকে সাজাতে,
সাজাব নোতুন সাজে অগুরু চন্দনে ।
(গো অগুরু চন্দনে)
কপালে টিকিলি দিব, কানে কানপাশা,
হাতেতে অনন্ত দিব, নাকে নাকপাশা ।
চন্দন কাজল রাধার মুখেতে পরাব,
শ্রীকৃষ্ণেরই বামভাগে আদরে বসাব,
(গো আদরে বসাব)
রাধাকৃষ্ণের মিলন হবে সাক্ষী দেবতা,
সতী নারীর কথা যেন না হয় অন্যথা । —২৪ পরগণা

১১৫

বরকে দানের গভীর বন্ধন মুক্তির বা গোর্বচনের গীত—

চন্দ্র সূর্য দেবগণ, চিন্তাযুক্ত হৈল মন ।
না হইলে নাপিতের জন্ম, শুদ্ধ হয় না কোন কর্ম ।
বেদে আছে বিধি নাই, চল যাই ব্রহ্মার ঠাঁই ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সূর্যদেবে দিল বর ।
সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা যিনি, নাপিত সৃজিলেন তিনি ।

নাভিতে নাপিতের জন্ম হইল, শিলাতে নিয়া রাখিল।
অষ্ট অঙ্গ শুদ্ধ হইল, কুলশীল নাম থুইল।
গঙ্গাতে করিয়া স্নান, নাপিতেরে করিল দান।
কত মত কত নারী বৈসেছেন সারি সারি।
জামাতা দক্ষিণ স্থিত, বৈসছেন পুরোহিত।
চন্দ্র সূর্য কুলের নন্দন, বেদ নিয়া গাভীর বন্ধন।
বন্ধন গাভীর মোচন হয়, হরগৌরীর বিয়া হয়।
ডানে শঙ্কর বামে গৌরী, সর্বলোকে বল হরি।
অমুকে গৌরবচন কয়, পাঁচ টাকা তার দক্ষিণা হয়। —ঢাকা

১১৬

ব্রহ্মা ব্রহ্মা ব্রহ্মা অবতার চতুর্বেদে ব্রহ্মা বিধিতে সঞ্চার।
শাস্ত্রে ছিল বিয়ার বিধি তীর্থবাসী বারাণসী।
শিবের সম্বন্ধ করিতে চলিলেন গিয়া নারদ মহামুনি,
উত্তরিলেন গিয়া নারদ হিমইল রাজার বাড়ী।
হিমইল রাজা বসতে দিলেন স্বর্ণের সিংহাসন।
কোথার থনে আসছ, নারদ, কোথায় চইলা যাও॥
আস্ছি, হিমইল রাজা, তোমারই স্থানে।
একটি কথা কইতে বড় ভয় লাগে।
তোমার একটি কন্যা আছে নাম তার গৌরী।
শিবের সঙ্গে সম্বন্ধ কর যাইয়া।
কি কহিলা, নারদমুনি, এম্নি কথা কয়,
কোথাকার পাগলের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে।
পাগল নহে শিব জগৎ ঈশ্বর।
খনে খায় ভাঙ্গ ধুতুরা খনে মহেশ্বর।
ডাইনে শঙ্কর বাঁয়ে গৌরী।
হরগৌরীর বিয়া অইল বন্ধন গাভীর মোচন হইল,
নাপিতস্থ গরগরি
অমুকে কয়, পাঁচ টাকা দক্ষিণা হয়। —ঐ

১১৭

কনেকে পিঁড়াতে তুলিয়া বরকে যখন প্রদক্ষিণ করান হয়, তখনকার গীত—

চারি অরণ্যের মধ্যে, রে বন্ধু, চারি বাতি জ্বলে,
বন্ধুরে মাথারে উপুরা ঘুরাণী কইতর ঘোরে,
আঙ্খি তুলিয়া দ্যাখো রে, বন্ধু, কোন বা পাইরা ওড়ে।
নজর ঘুরিয়া দ্যাখো রে, বন্ধু, সুন্দর কালের দিকে
জোড়ের পাইরীক রাখেন রে, বন্ধু, পিঞ্জিরার খোপে।

—গোয়ালপাড়া, আসাম

১১৮

সম্প্রদানের সময় গীত—

কলির বাবার দুয়োরের আগে কশলি বৃক্ষের গাছ,
সেই না কশলি ছিঁড়িয়া রে, বাবা, কন্যা দান করে,
কন্যা দান করে বাবার দোনো রে আঙ্খি ঝোরে।

তখন যেন কন্যা বলিতেছে—

না কান্দেন না কান্দেন রে, বাবা, আমার দিগে চায়া,
যদি থাকে তোমার দয়া আসিমু ঘুরিয়া,
যদি থাকে তোমার মায়া আসিমু বাউরিয়া। —ঐ

১১৯

মাসীকে সান্ত্বনা দিয়া গান—

রামলক্ষণ জোড়কলা দুয়োরে গাড়িয়া,
হেরো আইসে তোমার জামাই ধওল ঘোড়ায় চড়িয়া।
দেখো দেগো রাইওগণ জামাইর ক্যামন রূপ।
চাঁদ সুরুজ দুই আঙ্খি হেঙ্গুল বরণ মুখ।
একে তো পণ্ডিত জামাই রাজহংস গলা,
গলায় ঢুলিয়া পড়ে সোনার কণ্ঠমালা,
গলায় ঢুলিয়া পড়ে গন্ধ পুষ্পের মালা। —ঐ

১২০

মালাবদল উপলক্ষে এয়োরা গায়—

তুমি সে সুন্দর রাম রে, সীতারে করবা বিয়া,
কি কি গয়না আনছ রাম রে, সীতার লাগিয়া?

এনেছি এনেছি গয়না পেটরাটি ভরিয়া,
ধর, সীতে, পর গয়না পেটরাটি খুলিয়া। —ফরিদপুর

১২১

শুভদৃষ্টি বা মুখচন্দ্রিকার সময় মেয়েলী গীত—

ধইরা তোল ধইরা তোল রামের সিংহাসন।
ধইরা তোল সীতারই আসন॥
রামের গলে শোলার মালা।
সীতার হস্তে সোনার বালা।
দুই মুখে চারি চোখে হইল দরশন॥
পুরোহিত আসিয়া বলে হইল শুভক্ষণ॥
রাজহংসের পঞ্চডিম্ব ভাঙ্গ গো নিছিয়া।
ধুতরার সহস্র প্রদীপ ধর গো তুলিয়া॥ —বিক্রমপুর (ঢাকা)

১২২

সাজিলা গহুর চন্দ্র বিনোদ রসিয়া।
কত কোটি চন্দ্র জিনি আসিল নদীয়া॥
বিষ্ণুপ্রিয়ায় লামাইল জোড় মন্দির ঘরে।
কোলে কইরা লইয়া গেল মিলন মন্দিরে॥
বিয়ার মণ্ডলে যখন নিল বিষ্ণুপ্রিয়া।
চন্দ্র আসিল যেমন মেঘ আগ্রা দিয়া।
এবে ত গহুর চন্দ্র রূপে মনোহর।
বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপে গহুর হইয়াছে পাগল।
নয়ানে নয়ানে যখন অইল দরশন।
কটাক্ষে হরিল গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার মন॥ —মৈমনসিংহ

১২৩

বাসরের গীত—

বধূ যদি আসবে গো কেনে কাঁদালে,
নিঠুর রাতিয়া তুমি কুথায় কাটালে।
আমি রাতি ভোর জাগিরে—
রাতি কুথায় কাটালে। —বাঁশপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

১২৪

বন্ধু বন্ধু করি বন্ধুর জন্য মরি বন্ধু না ফিরিয়ে চায় গো
আমি অভাগিনী যেন মধুকিনি নিকট মরণ হয় গো।
তেলের ভাঁড়ে তেল, বুকে রইলো শেল,
আম জিরি জিরি আম জিরি আজ কেন স্বামীর মন ভারী
কিসের কারণে দুটি ধরি চরণে তুমি নিত কর ফাঁকি,
আমি চুপ দিয়ে থাকি তুমি নিত কর ফাঁকি॥ —ঐ

১২৫

আনি পাখি সোনার পাখি সোনার বাসর ঘর।
বাসর ঘরে চাবি দিয়া যাব শ্বশুর ঘর।
কদম তলে বাজাল বাঁশি বাঁশি শুনতে পাইয়্যাছি।
আর বাইজো না প্রেমের বাঁশি শ্বশুর ঘরে যাইয়্যাচ্ছি।
টাড়ে টাড়ে ঘুট্যা কুড়ায় সে বরং ভাল—
শ্বশুর ঘরে হাঁড়ি মাইজ্যা গা হইল কালো॥ —ঐ

১২৬

ফুলের সারি সারি ফুলের বিছন,
বাসর সাজাব নানা ফুলে নলিতে।
চলো যাব বনে ফুল তুলিতে।
কুঞ্জে আসিবেন হরি, ফুল গাঁথ যত্ন করি,
ফুলের মালা পরাইব শ্যামের গলেতে॥
চলো চলো, সখি, ফুল তুলিতে॥ —ঐ

১২৭

শিবের মাথায় ঢাইল্যা মধু তবে পাবি সোনার যাদু—
বহুত কষ্টের ধনরে আমার নীলমণি।
মাল দিবে গড়িয়া দিবে দাও হে মনের খুশিতে।
ও কপট মন আর কইয়ো না,
বহুত কষ্টের ধনরে আমার নীলমণি॥ —ঐ

১২৮

উলু দেরে সই, তুলে নে বাসর ঘরে বর কনে ;
আহা মরে যাই রূপের ছটা,
বরের মাথায় মস্ত জটা,
ফোঁস করেছে সাপ দুটা ॥ —ঐ

১২৯

ছাইড়া দে গো, চন্দ্রাবলী, আমার অতি সাধের বংশীধারী গো ও ছাইড়া দে,
করিয়া পুষ্পের শয্যা আমি সগল রাত্র বইসা থাকি গো ও ছাইড়া দে,
ছাইড়া দে গো, রাইকিশোরী, আমার একা কুঞ্জে রৈল নীয়ারি গো,
ও ছাইড়া দে ॥
বানাইয়া পানের বিরি আমি সতে সাত মাথার কিরা গো, ছাইড়া দে,
জ্বালাইয়া মোমের বাতি আমি সগল রাত্র রইলাম বসি গো, ছাইড়া দে ॥
জল ভরিতে আইলাম সারি সারি রাই জলের বাকার কৈরে যাই গো ধনের
পঞ্চগটী অম্রপত্র দিয়া তাতে জল ভরিতে আইলাম সারি সারি।
—মৈমনসিং

১৩০

বাসরঘরে বৈশ্যা আরশ কান্দে ঝরে ঝর,
ভানা' যায়্যা পুছে ও ননদ, কান্দ কিসের লাগিয়্যা।
আমি কান্দি আমার যৈবনের লাগিয়্যা।
এত সুন্দর যৈবন আমার কিরে লিবে লুটিয়্যা—
ও ভানী, আমি কান্দি তারি লাগিয়্যা।
জগতের সকলেই যৈবনকে ল্যায় লুটিয়্যা—
ও ননদ, কান্দ কিসের লাগিয়্যা,
তার যে মতন তোমাকেও দিতে হৈবে লুটিয়্যা ॥ —রাজসাহী

১৩১

বরবধূর পাশা খেলার গীত—
আজ কি আনন্দ। ধ্রু
কি আনন্দ হৈল আজ রস-বৃন্দাবনে।
মদনমোহন খেলে পাশা, মনোমোহিনীর সনে। —মৈমনসিং

১৩২

পাশাখেলা সময় মহিলাদের গীত—

দেখ দেখি কি তামাসা, খেল্‌ছে পাশা, কন্যা বরে।
সীতায় যদি হারে পাশায় দাসী হয়ে মন যোগাবে ॥
রামে যদি হারে পাশায়, সর্বস্বধন পণ করিবে।
ঢাল পাশা সভার মাঝে দেখ্‌ব বলে সকল লোকে,
চপলা বীরজাবালা তারা জানে ডুবইন খেলা। —ঢাকা

১৩৩

বিনোদ মন্দিরে রাম বিনোদ বেশেতে
বিনোদ বিনোদিনী খেলা লাগিলেন খেলিতে।
খেলিতে বসিয়া সীতা ছাড়িলেন দান,
হাইর‍্যা গেলেন রামচন্দ্র লজ্জিত বয়ান।
পাশা খেলেন রামচন্দ্র ঘন ডাক ছাড়ি,
এইবার পঞ্জরী অইলে জয় কর্তে পারি।
দশ বার আঠার ডাকিয়া বারম্বার
মহারঙ্গে উঠে গুটি লাগে চমৎকার।
ছি ছি, ফিরিল সীতার গুটি আইলো আবার কাঁচা,
রামচন্দ্র বল্লেন, সীতা, এইবার নাই আর বাঁচা।
(আবার) খেলিতে বসিয়া সীতা ছাড়িলেন দান,
হাইর‍্যা গেলেন রামচন্দ্র লজ্জিত বয়ান !
ছি, ছি, নাগর হারলে !
পুরুষ অইয়া নারীর সঙ্গে খেলাতে না পারলে।
ছি, ছি, লাজে মরি !
খেলাতে হারিল রাম জিতিল জানকী।
যতই খেলিবে মোদের সীতার সনে,
ততই হারিবে প্রতি দানে দানে।
জনকের কন্যা নয় সে সামান্যা
জগৎ মাঝে ধন্য নাম তার জানকী।

কেমনে দেখাবে মুখ লোক সমাজে
শুইন্যা হাসি পায় মোরা মরিহে লাজে।
রটাইলে দুর্নাম রাম গুণধাম
বিধি বুঝি বাম অইয়াছেন তোমায়। —মৈমনসিং

১৩৭

নিশিতে কুঞ্জবনে, শ্যামের সনে বইস্যাছে রাই শ্যামের বামে।
যুগল রূপ দরশনে, সখিগণে মুগ্ধ প্রেম আলাপনে,
কৃষ্ণে কয় বিধুমুখী, আইস দেখি খেলাই পাশা দুইজনে।
রাইয়ে কয় খেলতে পারি, বংশীধারী কি দিবা পণ কর মনে
কৃষ্ণে কয় জিতলে তুমি, দিব আমি মোহন বাঁশী প্রথম দানে।
প্রথমে পাশা মারি, জিতলো প্যারী শ্যামের বাঁশী নিল টাইনে
কৃষ্ণে কয় আর বার মার, এই নেও ধর ধরা চূড়া দেই চরণে।
এইরূপে সপ্তদানে, কুঞ্জবনে জিতলো প্যারী শ্যামের সনে। —ঐ

১৩৮

তোরা দেখলো নয়নে, রাইকানু খেলায় পাশা রস-বৃন্দাবনে।
ধর ধর ধর, রাই গো, ধর একবার পণ,
তুমি হারিলে দিবে নেহালি যৌবন।
ঢাল ঢাল ঢাল, রাই গো, ঢাল পাশার সারি,
পবার আঠার ষোল আর সে পঞ্জরী।
ষোল সতর ছয়ত্রিশ তিন যদি পড়ে
শ্যামের সে পাকা গুটি রাইয়ে কিন্তু মারে।
তুমি যদি হার, শ্যামরে, আমায় দিবা বাঁশী
আমি হারিলে হইবাম শ্রীচরণের দাসী।
শেষ দানে জিতলো প্যারী কৃষ্ণের অইলো হার,
ধড়া চূড়া ধইর্যা টানে সখীরা তাহার।
কৃষ্ণে কয়, এই হারা জিতার অর্থ কিবা আছে,
আমি বিনা মূলে বিকায়েছি রাইকিশোরী কাছে। —

১৩৯

সোনার রূপার দুটী পাশা, ও পাশা খেলে ভগবান।
বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকা পাশায় করে মান॥

পাশায় হারিয়া সীতারে, সীতা কাঁদিতে লাগিল,
দুই হস্তে ধরিয়া রাম বুঝাইতে লাগিল রে, পাশা খেলেরে।
না কান্দিয়ো, ওগো সীতা, না কান্দিয়ো তুমি,
আমার কাছে আছে মা—ধন ঘরে, পালন করবে সে॥ —বরিশাল

১৪০

বাঁশের আগায় বাঁশ ওরে ফুল
নলের আগায় ফয়ারের বাসা।
ওঠ ওঠ, নাইওর ভাই, খেলাও পাশা।
ওঠ, ওঠ, সাত ও ভাই, খেলাও পাশা। —ঐ

১৪১

বিনোদিনী বিনোদিনী বিনোদিনী রাই,
শ্যামে দিয়াছে পান বৃন্দাবনে যাই
পাশা খেইলবে ভালা রে।
বৃন্দাবনে যায়া রাই শঙ্খে দিলো ধ্বনি,
শ্যামে জানিলো মনে আইলো বিনোদিনী
পাশা খেইলবে ভালা রে।
শ্যামে হারিলে দিবে মুরলী বাহন
রাইয়ে হারিলে দিবে ছুরতী যৈবন।
পাশা খেইলবে ভালা রে।
দশ দশ বলিয়া পাশা ঢালিল পাটিতে
শ্যামে হারিল পাশা রাইয়ের সাক্ষাতে।
পাশা খেলায় শ্যাম মায়ের দিকে চায়,
আমার মুরলী বাহন রাই লইয়া যায়,
পাশা খেলায় ভালা রে।
দশ দশ বলিয়া পাশা ঢালিলো পাটিতে
রাইয়ে হারিলো পাশা শ্যামের সাক্ষাতে।
পাশা খেলায় রাই বইনের দিকে চায়
আমার ছুরতী যৈবন শ্যাম লইতে চায়।
পাশা খেলায় ভালা রে।

শ্যামেও হারিলো পাশা রাইও হারিলো,
হারিয়া আনন্দ মনে মন্দিরে চলিলো,
পাশা খেইল্‌লো ভালা রে। (গোয়ালপাড়া)—আসাম

বিবাহের গানের মধ্যে কন্যা বিদায়ের গানই সর্বাপেক্ষা বাস্তব এবং মর্মস্পর্শী। ইহাদের দুইটি ভাগ—প্রথম ভাগে প্রতিবেশিনী কিংবা কন্যার আত্মীয়ারা কন্যার হইয়া গান গাহে, দ্বিতীয় ভাগে কন্যা নিজেই এই গান গাহিয়া থাকে। বাংলা দেশে প্রথম শ্রেণীর গানের সংখ্যা অধিক হইলেও পশ্চিম বাংলার যে অংশ উড়িষ্যার সংলগ্ন তাহাতে কন্যার নিজের গানই প্রচলিত। এই শ্রেণীর গানকে কাঁদনা গীত বলে। বিদায় কালীন গীত কন্যার নিজের গাওয়ার রীতিটি প্রাচীনতর, পুর্ব ও উত্তর বাংলায় তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া গেলেও দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা অর্থাৎ মেদিনীপুর এবং ময়ুরভঞ্জের সংযোগ স্থলে ইহার বহুল প্রচলন আছে। ইহা ওড়িয়া লোক-সংস্কৃতিরই প্রভাবের ফল বলিতে হইবে। প্রথমত প্রতিবেশিনীদের মাধ্যমে কন্যার গীত—

১৪২

মায়ো কাঁদে কাঁদে আগুরু তলে, বাপো কাঁদে কাঁদে ছামুর তলে
ভায়ো যে কাঁদিছে মন ছাতা ধরিয়ে
উঠো বহিন গো ধীরে চল। —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

১৪৩

দশমাস দশদিন আদরে রাখিলে, মাগো,
আলন লালন পালন, মাগো, আমারে বাড়ালে
আপন গোত্র ছাড়ে দিয়ে, মাগো, পরের গোত্রয় দিলে—
এমন নিঠুর, মাগো, পাষাণে বাঁধিলে মাগো (২)
(আমারে ত্যাজিলে)। —ঐ

১৪৪

কতদিন সে মানুষ কইলেন আমাকে কাঁচা দুধে ছালিয়ে;
আজ বালাকে লিয়ে গেল, মা, কাঁদিয়ে বালা যাইল খিলিয়ে।
বালার মাগো, ধূলায় ধূসর হইবে
বালার লাইগে বাহির কর
বালার মাগো, মোহ মোহতে। —বাঁশপাহাড়ী

১৪৫

হাতি চলে হাতি কাঁদে,
ঘোড়া চলে ঘোড়া, মাগো, কাঁদে।
আরও কাঁদে পুষা পাখী ॥
আরও কাঁদে টিয়া পাখী।
রাণী কাঁদে মুহলেরই ভিতরে ॥ —ঐ

১৪৬

মা কাঁদে বিটায় পড়ে।
বাবা কাঁদে মা জাগরে গো ॥
সাত ভাই কাঁদে গো ছাম্‌ড়া ধরে।
এবার ধনি পর হলো গো ॥ —ঐ

১৪৭

বাড়ির শোভা বাগ ওরে বাগিচা,
ঘরের শোভা বিটি—ও মাণিক রে ময়না রে !! [ধুয়া]
এক থালি ভাতের জন্যে রে বাপ-মা,
আমাক্ বে'চ্যা খালেন—কি ও মাণিক রে ময়না রে !!
এক মাথা ত্যালের জন্যে রে বাপ-মা,
আমাক্ বে'চ্যা খালেন—কি ও মাণিক রে ময়না রে !!
ও এক থালি ভাত দিয়া রে বাপ-মা,
কুটুম্ বিদায় করো—কি ও মাণিক রে ময়না রে !!
ও এক মাথা ত্যাল দিয়া রে বাপ-মা,
পড়শী বিদায় করো—কি ও মাণিক রে ময়না রে !!
ভাট্যাল সুরের ময়না আমার উদাসে উড়িলো রে,
উদাসে উড়িলো ময়না রে ॥ —রাজসাহী

১৪৮

মা, তোমার শ্বশুর আস্যাছে লিতে রে, মা,
বালাকাটা নংদানা ॥ [ধুয়া]
মা, আমি শ্বশুরের সঙ্গে যাব না রে, মা,
বালাকাটা নংদানা ॥

মা, তোমার ভাসুর আস্যাছে লিতে রে, মা,
বালাকাটা নংদানা ॥
মা, আমি ভাসুরের সঙ্গে যাব না রে, মা,
বালাকাটা নংদানা ॥
মা, তোমার পতি আস্যাছে লিতে রে, মা,
মা, আমি পতির সঙ্গে যাব রে, মা,
বালাকাটা নংদানা ॥ —ঐ

১৪৯

আগে চলে সীতা সতী পাছে চলে রাম ;
রামের বামে সীতা চলে সোনার গোলোকধাম।
যাত্রা করে সীতা সতী জনকেরি বালা,
রাম রাজার সাথে চলে হাতে ফুলের মালা।
কাঁদে সীতা, কাঁদে রাণী কাঁদে পুরনারী,
অঝোরে কাঁদিয়া ফেরে সীতার সহচরী।
কেঁদোনা, কেঁদোনা, মাগো, আবার আসিব,
মা বলে ডাকিয়া, মাগো, পরাণ জুড়াব। —ঐ

১৫০

বিবির বাবার ঘাটার আগে কুলপতি কলার পোল।
ছাড় ছাড়, দুধের বাছা, বাপ মায়ের কোল।
হাজাইয়া হাজাইয়া যাদু মুখের দিকে চায়।
কার বা লাইগ্যা হালছিলাম যাদু হরে লইয়া যায়। —নোয়াখালি

১৫১

মেয়ে বাপে বনাই দিল সোনার মন্দির গো,
তোদের ধনিকে একুশ টাকায়,
বিকি দিলে সোনার মন্দির, ভাঙ্গি গেল।
—বাঁশপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

১৫২

এক কোশ যায় গো দুই কোশ যায় গো,
যায় গো ধনি দূর দেশে যায়। —ঐ

১৫৩

বাবা কাঁদে ভিতর ঘরে মা কাঁদে মাঝ ঘরে,
কিসের কাঁদিছ, বাবা, আমারি করে গো
আমি তো যাব বাবা পরের দেশে যাব
কাঁদেলো কাঁদেলো, বাবা, পরের ঘরে যাচ্ছি গো
মা কাঁদে দুয়ারে কেন, মা, কাঁদিছে গো,
আমার উপর কিসের দয়া কিসের, মা, কাঁদ গো,
পরের ঘরের শাড়ি পেয়ে তুমি তোপরিলে গো। —ঐ

বিবাহে পাত্র পক্ষ হইতে পাত্রীর মাকে যে একখানি শাড়ী উপহার দিবার রীতি প্রচলিত আছে ; এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে।

১৫৪

বাবা আমার ভিক্ষা দিল বিয়ের কলসী,
মায়ে আমায় যোগান দিল বিয়ের কলসী। —ঐ

১৫৫

কুইলাপালের হাটেরে ভাই মইসা দুধ গেলাসে
সেই দেখে বালা বলে বিয়া দেগো আমারে।
কুইলাপালের লুরকি বাগান সেরে ধরে মন
সেই দেখে বরের বাপের চকে গেছে মন। —ঐ

১৫৬

আমতলা ঠাকুর জামাই জামুতলা চায়।
সেইয়া দেইখ্যা ডুফেল বিবি মায়েরে বোলায়॥
মাও তোমার দূর দেশে বাপও তোমার পর।
খোদাতালায় লেইখ্যা থুইছে তোমার আমার ঘর॥
এত যদি জানতাম, আল্লা, মাও হইবে পর।
দুয়ারেতে উঠাইয়া থুইতাম জল টুঙ্গির ঘর॥
জল টুঙ্গির ঘরের মাঝে আবের বান্ধন (বন্ধন)।
তাইয়ার মধ্যে ডুফেল বিবি জুড়িল কান্দন॥
কত কান্দন কানবা, গো বিবি, বেলা হইলে শেষ॥
দোলায় আসিয়া চল বিবি বিবি হাপন দেশ॥ —বরিশাল

১৫৭

সোনার খাঁচায় পালিলাম পায়রা,
রূপার খাঁচায় আঁধার রে।
কার বা লাগ্যা পালিলাম পায়রা,
কে বা লইয়া যায় রে।
উড়িল বৈদেশী পায়রা, চলিল বৈদেশী পায়রা।
পায়রার মায় তো কান্দন করে খেউরের হাসি লইয়া।
আগে যদি জানতাম, সোনার কোকিল পরে লইয়া যাবে
ফিকিয়া ফেলাইতাম ঐ না নদীর মাঝারে।
যাবার কালে না গেলা কোকিল মায়েরে বোলাইয়া।
যাবার কালে না গেলা কোকিল বাপেরে বোলাইয়া॥ —ঐ

১৫৮

নড় দিয়া ধর, ময়না, বাবাজির গলা।
কেমনে তোকে রাখব, ময়না, তোমারে লুকাইয়া,
ও সোনার ময়না গো।
তোমার জন্য লইছি টাকা পাটিতে গুণিয়া
লড় দিয়া ধরে রে ময়না চাচাজির গলা।
কেমনে রাখিব তোমারে লুকিয়া।
শেষে বলে যায়
আগে যদি জানতাম ময়না
কলসী বান্দিয়া জলেতে ডুবাইতাম।
কেমনে রাখিব তোমারে॥ —ঐ

১৫৯

আগের নায়ে ঝামুর ঝুমুর পিছের নায়ে ছুইয়া
যায় যায় মইরম ঐ সাধুর ডিঙ্গা বরতে।
কিবা বরণ বরমু, বাবাজান, আমার সিঁথি রইছে খালি
যায় যায় মইরম ঐ সাধুর ডিঙ্গা বরতে।
কিবা বরণ বরমু, বাবাজান, আমার হাত রইছে খালি
যায় যায় মইরম ঐ সাধুর ডিঙ্গা বরতে।

১৬০

উঠ, উঠ, উঠগো কন্যা, জলদি উঠ নায়,
বড় সুন্দর দাঁড়ি মাঝি শুইয়া ঘুম যায়।
এক ঘড়ি বিলম কর আপছায়ার তলে
মামাজি তো রন্ধন করে সিন্দুরালী ঘরে।
খাইয়াছি মামাজির দুধ পোলাইয়া আসি তারে না।
বাবাজি তো কোরান পড়ে দরজার মোজানে,
খাইয়াছি বাবাজির কামাই,
বোলাইয়া আসি তারে।
আরো ঘড়ি বিলম কর আপছায়ার তলে।
বাবাজিতো পুস্তক পড়ে দরজার মোজানে।
খাইয়াছি বাবাজীর কামাই,
বোলাইয়া আসি তারে না। -বরিশাল

১৬১

বাত্তি বাজে আমার আনন্দে বাত্তি বাজে আমার বিনন্দে,
বাত্তি বাজে আমার নবীন শশুর দেশে॥
সাথেরি গুরুয়া লোক পুছাবালা করে,
কতদূর কতদূর কইনার বাপের বাড়ি?
উরু যেন দেখা যায় বৈঠক সারি সারি
সেইখানে সেইখানে কইনার বাপের বাড়ি॥
সাথেরি গুরুয়া লোক পুছাবালা করে;
কতদূর কতদূর কইনার চাচার বাড়ি?
উরু যেন দেখা যায় দলান সারি সারি
সেইখানে সেইখানে কইনার চাচার বাড়ি॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত বিদায়-সঙ্গীতগুলি বধূ নিজে গাহিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ওড়িয়া ভাষার সংমিশ্রণ হইয়াছে। ইহাদিগকে কাঁদনা গীত বলে—

১৬২

লিখুয়া কুয়া কাকৈকেনে মাএ উঠিবু
নবড়ি গুড়ি গুড়ি বারি ছিটাবু

গেল রে নহাট দুয়ারে বাসন মাজিবু
একথা মোর মনে রাখিবু সাজেবাজিনে দর্প দিবু
গেলরে এই কথা মোর মনে রাখিউ

—ডোমজুড়ি (সিংভুম) (১৯৬৭)

১৬৩

মাগো গড়িয়া ভিতরে শতমন্দির, মাগো,
শত ঘরতর হইলা আন্ধারি মাগো
দেখা তাল গাছ হল টছাই মাগো
যেতে ফুটকলা মাঝি ভাই মাগো
বাবা শুইথিলে আন্ধার ঘরে মাগো
চিঠি পহুঁছিলে আধ রাত্রিরে মাগো
জেলে ঘর চিঠি পহুঁছি গেলে মাগো
তোর ঘর বাবা উঠিব মাগো
উচ পীড়ারে বাস বাসিলে মাগো
যাহ যাহ টাকা ধর দিছিলে
তাহ তাহ বাবা লোভ বসালে মাগো। —ঐ (১৯৬৭)

১৬৪

ঠাকুরা গা ধুইছে কাঁচা দুধরে
মো বাবা গা ধুইছে মহানদীরে
মহানদী পানিএরে স্বরতি, কাঁসা সঙ্গে বাবা লাগে পিরিতি,
আসিবে সোই বসিবে ঘরে, ভিরি নাই তব সিংহ-দুয়ারে
ভাইক দিয়ালা ছায়পত্র, মাগো, ভাই কি দিবে উত্তর মাগো,
তেঁতুরি পাতর স্বর গতরি মাগো, কসাই বসিথিবে খুলিবে মাগো,
আজি যাই করি কালি আসিব মাগো,
যমপুরী নিহি ছাড়ি আসিব যমের নিয়া শুনি আসিব।

—ঐ (১৯৬৭)

১৬৫

মাইঝু বাহারে নিল চকোর,
সোতে এড় দিল চৌদ্দ পতোর।

তাকু আরো দিল রাজার ঘর,
বারো মাস পাতর ঝরে তাহার।
এক মাস দণ্ড ঝরিবে মোর,
রূপাতেল ঘড়ি পিতল পোলা,
ভাই বলে টেসে মেয়েরু পোলা,
মুই বলে টেসে রঙ্গে বলেটে।
কো যমপুরো ছাড়িয়া আসো রে,
যমপুরো বাটো গলিকে রলি।
তার উপরে যে রাবণ থালি,
রাবণ থালি রে দুধ গেলাস।
মোতে কাটি গেলা খরতরোস,
তাকু কাটি গেলা অগ্নি তপেস।
অগ্নি তাপসরে মধ্যহ জলে,
সুবর্ণরেখা নদী মধ্যহ বুরে।
সুবর্ণ রেখা নদী সুবর্ণ বাতাস,
সীতা ঠাকুরাণী কাহারি মাতা।
সীতা যেত পারে বনকু গেলে,
লবকুশ পুত্র জনম হৈলে।
লবকুশ সে দুই ভাই,
খেলিতে দেইলা সোনা কুলাই।
পাছরিতে দিলা সরোদা বালি,
সরোদা বালিরে নোকে ছাপুছি।
শতে ভগবান মোতে দেখুছি। —ঐ (১৬৭)

১৬৬

ইলিশি মাছকি ছাই তোলিয়া
সঙ্গে হইতেলি খরা বেলিয়া
আঁকা বাঁকা নদী ষোল কোশ
বহুরে তুঠারি দেউছি দাদাপাশকু
দাদাতো আমার বুঝেতো নাই।

রাণী বুঝাইলে রাজা বুঝে
বহুরে তুমি বুঝহিনা দাদা বুঝে। —ঐ (১৯৬৭)

১৬৭

স্বর্গে উড়ি গেলা মুরগো পাখী, দিদিগো,
ছায়া পড়িয়া গেলা জল ভিতর, দিদিগো,
জল ভিতরে সাহেব কুঠির, দিদিগো,
পিতর কুচি যবে নড়িবে, দিদিগো,
দাদার মনে কি তবে পড়িবে, দিদিগো,
দাদা যদি মোর না যায় একা দিদিগো
ভগবান খুঁজে করিমু সাথা দিদিগো
ভগবান মোর সে দুই ভাই দিদিগো
কোন বিধি দেবে বনস্থে যাই দিদিগো
সে কোন পড়িবে রাজা দস্তরে
দস্তধুলি মুঠি কে মুঠি দিদিগো
মোর ভাই বনাইচে পাকারো কুঠির দিদিগো
পাকা চার পাশো বুলিয়া আইমু দিদিগো
অমৃত ভোজন করিব সিমু দিদিগো,
অমৃত ভোজন মস্তে যাবে, দিদিগো,
বিষ ভোজন মোর দিন যাবে দিদিগো। —ঐ

বধূঘরা বা বৌ ঘরা উৎসবের গীত। পাত্রের বাড়ীতে যখন বর নববধূ লইয়া আসিয়া উপস্থিত তখন তাহাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বরণ করিয়া লইবার নাম বৌ ঘরা।

১৬৮

মাগো, সীতা স্বর্ণলতা মায়ের কথা রাইখো মনে
যাইয়ে শ্বশুর ঘরে আপন ভাবিও সর্বজনে। —মৈমনসিং

১৬৯

এইখানে লামাওরে, কুমার, এইখানে লামাও পালকি।
এইখানে থাকিয়ারে কুমার মায়ের কান্দন শুনি॥ —ঐ

১৭০

বধূ ঘরা—উৎসবের পর বধূ-বরণের গীত—

আয় লো আয় ও আয়তি কুলবতী বর বধূকে বরণ কর
দেখে হেমাঙ্গিনী বধূরাণী মুখখানি তার তুলে ধর।
শুভ দিনের শুভ মিলন এই সুযোগ কি যায় গো হেলন,
এতদিন ছিল যেমন মেঘে ঢাকা শশধর।
আহা, কি রূপের আভা কনকে মুকতা শোভা,
সর্বজন মনোলোভা মরি মরি কি সুন্দর! —ঐ

১৭১

কালী তারা ধূমাবতী, চরণে চরণে চতুর অতি,
সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী মিথিলাতে আগমন।
বরণ করে বধূগণ, বরণ করে আইয়োগণ॥ —ঢাকা

১৭২

বর-বধূ বরণের মেয়েলী সঙ্গীত—

কি কর রামের মাগো গৃহেতে বসিয়া।
তোমার রামচন্দ্র আসে জানকী লইয়া।
আরবার বল আমি শুনিব শ্রবণে।
বাইর আইল কৌশল্যা গো ধান্য দূবা লইয়া।
ধান্য দূর্বা চিনি সন্দেশ লইল হাতে হাতে।
বর বধূরে ঘরে লইল দূর্বা লয়ে সাথে। —মৈমনসিং

১৭৩

চল রঙ্গ দেখি গিয়া,
রামচন্দ্র দেশে আইলাইন জানকীরে লইয়া।
দূত গিয়া বার্তা কইলো, কৌশল্যা গো রাণী,
তোমার রামচন্দ্র আইছে লইয়া জানকী।
দুয়ারে ফালাইয়া পিড়ি চাউল দিল মুটি
কড়ি দিল ষোল গণ্ডা ফল দিল পঞ্চটি।
বাইর আইলো রাজরাণী কুলা মাথায় দিয়া
ঘরে নিলো রামচন্দ্র সীতারে আম্ভিয়া।

রামের মাথায় ধান দূর্বা সীতার মুখে চিনি
দুয়ারে ফালাইয়া পিঁড়ি বসলাইন রাজরাণী।
বাৎসলের ভরে রাণীর গদ গদ তনু
কোলেতে বইস্যাছে রাম মেঘের বরণ ভানু।
রাণীগণে রঙ্গ ভরে দিলাইন উলুধ্বনি
এই মতে বধূ ঘরা সাঙ্গ করলেন রাণী। —ঐ

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আরও কয়েকটি গান এখানে উদ্ধৃত হইল—

ফুলশয্যার গান—

১

যাতি, যুথি, কুটরাজ, বেলা. গন্ধরাজ ফুল, কৃষ্ণকলি
নবকলি অর্ধ বিকশিত, তাতে বনমালী হরষিত।
তুমি যাও ও, নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে আছেন ঘুমে কাতর।
আমি এই আসিলাম বানের চন্দন গৃহেতে থুয়ে।
এখানেও দীপের কাজল, তাঁতীর বস্ত্র মালী মালা গৃহেতে রেখে,
তুমি যাও হে নাগর প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে আছেন ঘুমে কাতর।
—ফরিদপুর

২

মিলিল মিলিল মিলিল ভাল সুজনে সুজনে।
রসের সাগরে প্রেমের পাথরে ভাসিল দুজনে।
হের সহচরী, হের আঁখি ভরি,
আহা মরি মরি, কিরূপ মাধুরী ;
জীবন জুড়াল, নয়ন মোহিল, যুগল মিলনে। —মৈমনসিং

সখি, রাত্রি হইল ভোর
আসলনা রে চেঙ্গরা বন্ধু নিদও নিঠুর ॥
ফালাইয়া পানের শিরা বানাইছি ঢুক।
খাইল নারে চেঙ্গরা বন্ধু নিদয় নিঠুর ॥
যার কুঞ্জেতে গেছলা, বন্ধু, তার কুঞ্জেতে যাও।
আমার শয্যায় বন্ধু না বাড়াইও পাও। —মৈমনসিং

৪

মান করিও না, কমলিনী, মানের কার্য নাই।
অভিমানে ক্রুদ্ধ হয়ে বসিয়াছেন রাই॥
নানা মতে পুষ্প দিয়া সাজাইলাম বাসর।
পথপানে চাইয়া রইলাম না আস্‌ল নাগর॥ —ঐ

৫

বন্ধু, তুমি রজনী প্রভাতে কেন আইলে।
আমার কুসুম শয্যা হইল বাসি ফুলের মালা দেও ফেইলে।
তুমি তরু আমি লতা, আমায় ছেড়ে ছিলে কোথা,
আমি মন আগুনে দগ্ধ হয়ে ঝাঁপ দিব সেই অনলে। —ঐ

জল লইবার গীত—

চলরে মা বোনেরা জল লইতে যাব
পথে আছে কামরাঙা সব জনে খাব। —পুরুলিয়া

জড় গাছের আগে শাঁখ চিলের বাসা,
ছোঁও মেরে নিয়ে গেল গায়ের গামছা। —ঐ

বিবাহের পর বিদায় আসন্ন হইবার কালে গীত—

খেল ভাঙ্গ, সঙ্গতীরা, মায়ে আমায় গাল দিছে,
হাতের কড়ি ফিরিয়ে দাও, মা আমার কাঁদিছে।

ডালে বসিলে যুগা ডাল ঝাঁঝরা
পাতে বসিলে যুগা এসাকাড় বিঁঝির যুগারে
ডাল ভেঙ্গে যায় পড়ে। —ঐ

১০

পোস্ত গাছে চটি বসেছে এ চটিকে মেরোনা
মধু খেতে বসেছে পোস্ত গাছে চটি বসেছে। —ঐ

১১

বিলাতী বাজারে শ্বশুরবাড়ী বিলাতী খাবি যদি
পলালপাতে খেলাঘর বিলাতী বাজারে শ্বশুরবাড়ী —ঐ

১২

মা—

বালাকে যে মানুষ করলাম কাঁচা দুধের সরে গো
এবার বালা চলে যাবে যাবে পর দেশে গো
তুমি যে যাচ্ছ বালা দেশে বিদেশে গো
দিয়ে রাখ বালা দুধেরি ধার গো।

মেয়ে-

নাইযে শুধিব, মা, তোমারি ধার গো,
গয়ায় গঙ্গায় বসে করিব উদ্ধার গো। —ঐ

১৩

বরের বাড়ীতে বধূর মুখ-দর্শনের গীত—

এস এস, সখি, তোরা সবে মিলে এইস্থানে,
দাঁড়াইয়া নব বধূ অতিশয় প্রফুল্ল মনে।
আহা কিবা মুখশশী, যেন শরতের শশী
ভূতলে পড়েছে খসি এই ভ্রান্তি হয় মনে।
আহা কিবা দন্ত পাতি, মুকতা রেখেছে গাথি
আরক্তিম বিম্বাধর শোভিত চাঁদ বদনে।
সুকুন্তল সুগঠন বর্ণক চম্পক সম
লক্ষ্মী যেন হয় ভ্রম দেখা দিল জনগণে।
ফুলের মত রমণী হাতে নিয়া ক্ষীর চিনি
হ'য়ে সবে আহ্লাদিনী অর্পিছে বধূর বদনে।
পূর্ণ ঘট দধি পাত্র একটি মীন শুভ্র গাত্র
সকলি আছে একত্র সুমঙ্গল আচরণে। —মৈমনসিং

১৪

দধিমঙ্গল উৎসবের গীত—

রামে কর্‌লো দধিমঙ্গল দধি নাইরে ঘরে।
দধির লাইগা পাঠাইয়াছি গোয়াল নগরে।

চিড়ার লাইগা পাঠাইয়াছি চিরকুটী নগরে।
রামের মাগো, তুমি ওঠো গো সকালে।
গোপাল, গা তোল নিশি প্রভাত হইয়াছে।
তোমার শিয়রে পিতা নন্দ ডাকিতেছে।
তোমার শিয়রে দধির ভাণ্ড রইয়াছে।
তোমার শিয়রে মা যশোদায় ডাকতেছে। —ঢাকা

১৫

রাণী গো, গা তোল গা তোল, প্রভাত সময়,
চেয়ে দেখ সুখের নিশি প্রভাত হইয়া যায়।
খাটালে রাখিয়া পিঁড়ি বসাও আনিয়া নীলমণি
দধিমঙ্গলের সময় যায়। —বরিশাল

১৬

পুকুর ঘাটে স্নান করিবার পর কন্যাকে কলসীতে জল ভরিতে হয়। তখন এয়োরা পুকুরের তীরে দাঁড়াইয়া এই গান করেন—

জল ভর লো, বিরহিণী, জলে দিয়ে ঢেউ.
বদন তুলে কহ কথা ঘাটে নাই আর কেউ।
কেমন তোমার মাতাপিতা কেমন তোমার হিয়ে
একেলা এসেছ ঘাটে কলসী কাঁখে নিয়ে!
হেথা থেকে যাও রে, কিষ্ট, কে আনল ডাকিয়ে,
একলা এসেছি ঘাটে পাষাণ বুকে দিয়ে।
আপনারি ধন ছাপায়ে রেখেছি আপনি
তাইতে কেন হওলো বেজার রাধা বিনোদিনী?
বেজার কেন হব, কিষ্ট, বেজার কেন হব,
তুমি মন্দ হলে পরে কোথায় যাইয়া রব?
কড়ার কড়া পানের বিড়ে তাও না দিতে পার
নিকটে কদম্বের পুষ্প কোলে ফেলে মার।
নিজ ধন ভাঙ্গাইয়া কানাই বিয়েই বা কেন কর?
কেবল পরের রমণী দেইখা চোখ টাটায়ে মর।

বিয়ে ত করিব, রাধে, বিয়ে ত করিব,
তোমার মত সুন্দরী, রাধে, কোথায় যাইয়া পাব ?
আমার মত সুন্দরী, কিষ্ট, নাহি যদি পাও,
গলেতে কলসী বাইন্ধা জলে ডুবে যাও।
কোথায় পাব কলসী, রাধে, কোথায় পাব দড়ি।
তোমার হার গাছি দাও লোটন করে রাখি।
তুমি আমার গয়া, গঙ্গা, তুমি বারাণসী,
তুমি হও যমুনার জল,
তোমার অঙ্গে দিব সাঁতার, কি করিব কলসী। —ঢাকা

১৭

স্নানের পুর্বে হলুদ মেথি ইত্যাদি একত্র বাটিয়া পাত্রপাত্রীর গায়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে মাখান হয়। এই উদ্দেশে হলুদ মেথি বাটাকে কুরবাটা বলে। কুরবাটা উৎসবের কয়েকটি গীত নিম্নে পর পর উদ্ধৃত করা হইল।

চল চল গো রাই, রামের কুর বাটিতে যাই।
মুগ আর হরিদ্রা লাগে, পঞ্চজন আইয়ো লাগে,
সীতার কুরবাটিতে ॥ —বিক্রমপুর (ঢাকা)

১৮

রাজরাণী, ওগো আমার রামের কুর বাট পঞ্চ আইয়ো লইয়ে।
ওগো, আমার রামের কুর বাট বাদ্যভাণ্ড লইয়ে॥
ওগো, কুর বাট গো সকলে রামের মায় যে বিনয় করে গো,
ওগো, পঞ্চ আইয়োর কাছে। —ঐ

১৯

সখি, তোমরা নি গো কুরবাট, আইজ কুরবাটিব আমি,
কুরবাটিতে কি কি লাগে, সোন্ধা আর মেথি লাগে,
কাঁচি হরিদ্রা লাগে, কুরবাটে রাজরাণী।
আইজ কুর বাটিব আমি, তোমরা নি গো কুর বাট। —ঐ

২০

এগো রাজরাণী, রাজরাণী আসগো আসিয়ে।
হলুদের যে জন্ম হইল বাগানের মাঝে ॥

এগো রাজরাণী, রাজরাণী আসগো আসিয়ে।
কড়ির যে জন্ম হইল সমূদ্রের মাঝে ॥
এগো রাজরাণী, রাজরাণী আসগো আসিয়ে।
যুগের যে জন্ম হইল হালুয়ার মাঝে ॥
এগো রাজরাণী, রাজরাণী আসগো আসিয়ে।
দূর্বার তো জন্ম হইল পুষ্কনির পাড়ে ॥
এগো রাজরাণী, রাজরাণী আসগো আসিয়ে।
মাইজের যে জন্ম হইল কলার বাগানে ॥
এগো রাজরাণী, রাজরাণী আসগো আসিয়ে।

—ঐ

২১

বিবাহোপলক্ষে কতকগুলি কাহিনীমূলক সঙ্গীতও গাওয়া হয়। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিকে রুক্মিণীর বিবাহ-কাহিনী গীত হইতে শুনা যায়—

চলিল নারদ মুনি বীণাযন্ত্র লইয়া
ইন্দ্রের সভাতে যাইন কৃষ্ণগুণ গাইয়া।
আপনার গানে মুনি আপনি বিভোল
তুষ্ট অইয়া ইন্দ্র দিলাইন্ পারিজাত ফুল।
পারিজাত মালা লইয়া ভাবে মনে মন,
আমার যোগ্য মালা নয় পরবে কেমন জন ?
বৈদর্ভ নগরে কৃষ্ণ বইসাছেন আসনে
ঠাকুর কৃষ্ণে খেলাইন্ পাশা রুক্মিণীর সনে।
হেনকালে নারদ মুনি কোন্ কার্য করে,
মালা দিয়া চইল্যা যায় সত্যভামার ঘরে।
কি কর গো, সত্যভামা, নিশ্চিন্তে বসিয়া
ঠাকুর কৃষ্ণে খেলাইন্ পাশা রুক্মিণীরে লইয়া।
স্বর্গ অইতে পাইরা আইন্যা পারিজাত ফুল,
গাঁথাইছে মালা কৃষ্ণ গড়াইছে দুল।
কানেতে গুঞ্জিয়া দুল দিয়া নিজ হাতে
ঠাকুর কৃষ্ণে খেলাইন্ পাশা রুক্মিণীর সাথে।

কি কহিলা, নারদ মুনি, আরবার বল শুনি,
শুক্না কাষ্ঠের মাইধ্যে যেমন জ্বলিল অগিনী।
এই কথা শুনিয়া দেবী কি কার্য করিল,
পালঙ্ক ছাড়িয়া আসি ভূমিতে শুইল।
হেনকালে নারদ মুনি কি না কার্য করে,
সত্বরে চলিয়া যায় কৃষ্ণের গোচরে।
কি কর গো, ঠাকুর কৃষ্ণ, নিশ্চিন্তে বসিয়া
সত্যভামা শরীর ছাড়ছে দেখ গো আসিয়া।
এই কথা শুন্যা কৃষ্ণ হাসে আর কয়,
সেইখানে জানাইয়া আইছ তুমিই নিশ্চয়।
সর্বদা তোমার কর্ম বিবাদ লাগানি,
একখানের কথা নেও আরখানে টানি।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালীধারী
সত্যভামার কুঞ্জে যাইন বাজাইয়া মুরলী।
পঞ্চ সখী ডাক দিয়া কয় সুগন্ধ বাস পাই,
সত্যভামার কুঞ্জে বুঝি আইসাছে কানাই।
ধীরে ধীরে আইস্যা কৃষ্ণ মন্দিরেতে যায়
শিয়রে বসিয়া সত্যভামারে জাগায়।
উঠ উঠ, সত্যভামা, কত নিদ্রা যাও,
ঠাকুর কৃষ্ণে ডাকি তোমায় চক্ষু তুলি চাও।
জাগো জাগো, সত্যভামা, কত নিদ্রা যাও
এই জগতের পতি আমি নয়ন মেলি চাও।
যাও যাও, ঠাকুর কৃষ্ণ, যেখানে রুক্মিণী,
আমারে কইর‍্যাছ তুমি জনম-দুঃখিনী।
রুক্মিণী যুবতী নারী পড়ুক বজ্রাঘাত,
ঔষধে ভুলাইয়া রাখছে ঠাকুর জগন্নাথ।
স্বর্গেতে আছিলা পুষ্প নামে পারিজাত,
মর্ত্যেতে হইও তুমি কায়েলা মান্দার।
একটী পুষ্পের জন্য মনে পাইছ বেথা,
বৃক্ষ সহ পারিজাত আইন্যা দিয়াম হেথা।

—মৈমনসিং

২২

এখানে পারিজাত-হরণের বিষয়ক একটি গান শুনিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু পারিজাত হরণকারী এখানে লক্ষ্মণ। বলা বাহুল্য রামায়ণে লক্ষ্মণের এমন কোন অপবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না—

শুন, রাজা, ধর্ম কথা পাণ্ডুর নন্দন,
যেই মতে পারিজাত হরিল লক্ষ্মণ।
সীতা কয় উর্মিলারে হইয়া কাতর
তোমারে আমারে শিব বৃথা দিলাইন বর।
অনেক তপস্যার ফলে পাইলাম পতিবর
বিষ্ণু পতি না বরিয়া বরিলাম নর।
সীতা দেবী সত্য করে শরীর কইরা পণ,
পারিজাত বিনে আমি ত্যজিব জীবন।
উর্মিলায় সত্য করে শরীর কইরা পণ,
পুষ্প বিনে বৃথা গেল এ রূপ যৈবন।
একদিন জানকী আর উর্মিলা দুইজন,
সর্ব কথা স্মরণ কইরা জুড়িলা ক্রন্দন।
এই মতে কান্দে তারা লুটাইয়া ধরণী,
হেন কালে গৃহে আইলাইন রাম রঘুমণি।
কিসের লাইগ্যা চন্দ্রমুখী করিছ ক্রন্দন,
আমার কি অসাধ্য আছে এ তিন ভুবন।
লঙ্কার রাবণ যখন হরিল তোমারে,
অলঙ্ঘ্য সাগর আমি বান্ধিলাম পাথরে।
পারিজাত পুষ্প আছে কৈলাস ভবন,
পারিজাত বিনে আমি ত্যজিব জীবন।
চল চল আরে দূত চল শীঘ্র গতি,
শীঘ্র গিয়া লইয়া আইস লক্ষ্মণ সারথি।
বইস্যা আছেন যুবরাজ নববন্ধের সাজে,
পন্নাম করিয়া তারে জানায় গিয়া দূতে।

পারিজাত পুষ্পের লাইগা সীতা ত্যজে প্রাণ,
তোমারে আনিতে মোরে পাঠাইলা রাম।
কর জোড় কইয়া আইস্যা দাঁড়াইল লক্ষ্মণ,
কি কারণ ডাকছেন, প্রভু, কমললোচন ?
পারিজাত পুষ্প আছে কৈলাস ভবন,
পারিজাত বিনে সীতা ত্যজিবে জীবন।

আইস রে প্রাণের ভাই, বলিব তোমার ঠাঁই
মোর দুঃখ কই না অপরে,
পিতৃসত্য বনবাস মৃগ দেখি অভিলাস
পাঠাইল বধিতে আমারে।
তুমি দিলে রেখা দ্বারী ভাঙিল কুলটা নারী
ভিক্ষা দিতে হইল বাহির,
হরিয়া নিল রাবণ থইল অশোক বন
তাতে দুঃখ পাইলাম বড়।
নিলাজ রমণী আজ চাহিতেছে পারিজাত
কি করি বল না মোরে, ভাই,
বলে পারিজাত দেহ না আইলে ছাড়িব দেহ
সীঁতা তবে বাঁইচ্যা আর নাই,
শিব শিবা দুই জন সেখানে করে যাপন
রইয়াছে মানস-সরোবর।
আশুতোষে তুষ্ট কইরা পারিজাত আন হইর‍্যা
তুমি তার গুণের দেবর।
গুরুমন্ত্র জপ করি লক্ষ্মণ গুণমণি
উঠিলেন রথের উপরে,
ধনুকের গুণ টানি লক্ষ্মণ গুণমণি
বলে, যাই কৈলাস শিখরে।
ধনুকেতে গুণ টানি লক্ষ্মণ গুণমণি
কৈলাসেতে করেন গমন,
লক্ষ্মণ কুমারে দেখি শিব ঢুলু ঢুলু আঁখি
কহে, আইছ এইখানে কি কাম ?

যদি থাকে তোমার মনে   যুদ্ধ কর আমার সনে
লক্ষ্মণ ধানুকী আমার নাম।
তোমার মানস হৈতে   আইছি পারিজাত নিতে
পাঠাইছেন দাশরথি রাম।
শুনিয়া রামের নাম   শম্ভুর হরিল জ্ঞান
যুদ্ধ না হইল তার সাথে,
আইন্যা পুষ্প সমুদয়   লক্ষ্মণ দূতেরে কয়
দেও নিয়া জানকীর হাতে।   —মৈমনসিং

২৩

এখানে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রথম মিলনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে—

মৃগ অন্বেষণে রাজার রঙ্গ হইল মনে।
সরোবর স্নানে দেখা শকুন্তলার সনে॥
এক বর্ণের তিন কন্যা নামিয়াছে জলে।
কমলের পুষ্প যেন ফুটিয়াছে ডালে॥
চম্পকের কলি যেমন জলে ভাইস্যা যায়।
থির বিজলীর শোভা মনে সন্দ পায়॥
এক দৃষ্টে চায় রাজা রূপ নিরখিয়া।
পাগল হৈল রাজা বিয়ার লাগিয়া॥
ততক্ষণে শকুন্তলা করিল সুদৃষ্টি।
রথের উপর দেখে মদন মূরতি॥
সখী বুলে, শকুন্তলা, একি কুস্বভাব।
হাসাইয়া মুনির পুরী রাখিবা খেতাব॥
অবিবাহি কন্যা তুমি মুনির কুমারী।
পরপুরুষে দেখ্‌লা বল্যা লজ্জা নাই তোমারি॥
সখীর বচনে কন্যা লজ্জিত হৈল মনে।
চিকুরে ঢাকিয়া মুখ ডুব দিল জলে॥   —ঐ

২৪

বশীকরণের প্রক্রিয়া স্বরূপ 'হাত লেওয়া বাটা' অনুষ্ঠানের গীত—

আফুলা চালিতার মূল, কনক ধুতুরার ফুল,
যমক গুয়া যমক পান, মণি বেড়া সূতা আন্।

উগইর তলের আমন ধান, মণামণি কিন্যা আন।
রাজদুয়ারের মাটি, বেশ্যার দ্বারের আন চাটি,
অমাবস্যা মঙ্গলবারে মাকড়ে যে মাছি মারে।
ওলো সই, জো করতে কি কি লাগে।
কাল বিড়ালের লোম লাগে ॥
ওলো ওলো ওলো, সই, জোর কথা তরে কই,
এর থিকা অধিক জো না জানি ॥ —বিক্রমপুর (ঢাকা)

২৫

পাত্র-মিত্র লৈয়া সঙ্গে চলিলেন লক্ষ্মণ রঙ্গে
বসলেন লক্ষ্মণ সরোবরের তীরেরে—
হেনকালে চন্দ্রকলা সিনান করিতে গেলা
যায় কন্যা সরোবরের তীরেরে—যুবরাজ।
নামিয়া জলের মাঝ দেখিলাক যুবরাজ
তাইতে হরিয়া নিল প্রাণরে—যুবরাজ।
সিনান করিয়া চন্দ্রকলা বাড়ীতে চলিয়া গেলা
নাই কন্যার শয়ন-ভোজন।
কখন পালঙ্কে শোয় কখন ভূমিতে লুটোয়
চন্দ্রকলার চরিত্র চঞ্চল।
রাণী বলে মহামুনি সবতত্ত্ব জান তুমি
জিজ্ঞাসিয়া বোঝ কন্যার মন।
মুনি বলে, চন্দ্রকলা, তোমার বিরহ জ্বালা,
কোন্ দেব হৈল দরশন ॥
কণ্ঠে রত্ন দিব্য মালা সে ও পুরুষ ভালা
সেই দেব হৈল দরশন—মুনিবর!
মুনি বলে, চন্দ্রকলা, তোমার তপস্যা ভালা,
পতি হবে রামের ভাই লক্ষ্মণ।
কৌশল্যা শাশুড়ী পাইল্যা দশরথ শ্বশুর পাইল্যা
আর পাইল্যা অযোধ্যা নগর ॥ —ঢাকা

২৬

শুন শুন, প্রাণ ললিতে, আমার অন্তর বাথা
কৃষ্ণ মোরে কৈল অনাথিনী—গো—
কৃত্তিকার গর্ভে ছিলাম জন্ম নিলাম ভবার্ণবে
জন্মান্ধ করিল ভগবান্।
মাতাপিতা বন্ধুজনে অন্ধ দেখ্যা অযতনে
ভূমির শয্যা করাইল রাধারে—
তত্ত্ব পাইয়া নন্দরাণী হারাধন কোলে করি
চাইতা আইলা রাধার বদন।
ভুমিত্ নামিয়া হরি রাধার অঙ্গ স্পর্শ করি
দিব্য চক্ষু হৈল রাধার গো।
ছয় মাসের কানু ছিলেন তিন মাসের রাধা হৈলেন
শিশুকালে হৈল পীরিতি গো।— —ঐ

২৭

দক্ষের ঘরে ছাব্বিশ কন্যা ছাব্বিশ রূপসী
এক কন্যা জন্ম নিলেন নামে সত্যবতী।
ছাব্বিশ কন্যা বিয়্যা দিল ছাব্বিশ জামাইর কাছে—
সত্যবতী বিয়া দিলেন মহাদেবের কাছে গো!
পান-পাত্র নিমন্ত্রণ জামাতা সকলে—
দক্ষরাজার যজ্ঞ সময় আসিবা সকলে।
ছাব্বিশ জামাই আসিলেন যে যার বেশে।
মহাদেব আসিলেন তো বৃষভবাহনে।
ছাব্বিশ জামাই বসিলেন যাই যেই স্থানে—
মহাদেব বসিলেন রত্ন সিংহাসনে।
রঙ্গ তুলাল পুষ্প তুলিয়া বাছিয়া,
দুরন্ত ধুতুরা তুলি মহাদেবের লাগি গো। —ঐ

২৮

জয় জয় শব্দ শুনিগো অযোধ্যা নগর
আর জয় জয় শব্দ শুনি মিথিলা নগর।

এক সখী সাইজ্যা আইল নানা বেশ—
আর এক সখী সাইজ্যা আইল আঁচড়াইয়া মাথার কেশ।
এক সখীর বাটার পান গো আর এক সখী খায়—
আনন্দ করিয়া তারা বিয়ার উৎসব গায়। —ঐ

২৯

আজুগো স্বপ্নের কথা শুনগো, প্রিয়সখী,
চন্দ্রের উপরে চন্দ্র দেখি—প্রভু নাই দেখি সখী গো!
আজুগো স্বপনে দেইখ্যা গো ছিলাম নবকুঞ্জে শ্যাম,
কিবা গো ঠাকুর কৃষ্ণ কিবা বলরাম।
আজুগো স্বপনে দেইখ্যা গো ছিলাম সবকুঞ্জে কালা,
বিজলী ছটকে যেমন গো দেখি কৃষ্ণের গলার মালা।
আজুগা স্বপনে দেইখ্যা গো ছিলাম শিয়রে দাঁড়াইছে—
পৃষ্ঠ দিয়া রইলাম অভাগী রাধা মনের অপমানে।
তুমি আমার আমি তোমার গোরা যে জানে সর্বলোকে,
এখন ক্যানে অভিমান করো আমার সনে। —ঐ

৩০

ছুটো ছুটো ঘুরিয়া রে চাবুক মারিয়া রে—
যায় বুড়া মৃগ শিকারে,
মৃগের উদ্দেশ না পাইয়া গো—রৌদ্রের তরাসে—
সঙ্গের সঙ্গী লা ভাই ডাক গিয়া জিজ্ঞাস চাই
কার ঘরে ঠাণ্ডা জল আছে।
জলটুঙ্গি থাকিয়া গো উত্তর করে সুন্দরীর ভাই,
মোর ঘরে ঠাণ্ডা জল আছে।
সুন্দর পিতার ঘরে আকুমারী আছে।
ডাইন হস্তে জলের ঝারি বাম হস্তে পানের খিলি
যায় কন্যা শীতল চম্পার তলে।
জলের পিপাসায় গো সুন্দর বড়ুয়া গো
খায় বুড়া সুন্দরীর হাতের পান।

জল যে খাওয়াইলা অ কন্যা সুন্দরী গো—
বল, কন্যা, তোমার পিতার জাতি।
আমার যে পিতা এ ঘাটের খেওয়ালি
মা আমার ভুঁইমালির বেটি—
সেই কথা শুনিয়া সুন্দর নাগর রে—
কান্দে নাগর গামছা মুড়ি দিয়া।
সঙ্গের সঙ্গিলা ভাই, বল গিয়া মায়ের ঠাঁই—
জাতি দিলাম ভুঁইমালির ঘরে।
সে কথা শুনিয়া কন্যা সুন্দরী গো—
হাসে কন্যা নাগরের দিকে চায়্যা।
না কান্দিও সুন্দর বর গো, আমি দিব লক্ষ টাকার জাঁতি।
বাবা যে আমার এই রাজ্যের রাজা গো
মা আমার জমিদারের বেটি। —ঐ

বিজয়া

নিম্নোদ্ধৃত গানগুলি কন্যাবিদায়ের গান। বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের রসে এই সঙ্গীতগুলি যেমন বাস্তব, তেমনই মর্মস্পর্শী। পৃথিবীর সর্বত্র সকল শ্রেণীর সমাজের মধ্যেই এই শ্রেণীর গানের প্রচলন আছে। পূর্বে এই শ্রেণীর গান কিছু উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এখানে বাংলার পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের কিছু গান উদ্ধৃত করা হইল।

গৌরী বিদায় কর, মা, কেঁদ না,
কেঁদ না জননী ভেব না জননী,
গৌরী বিদায় কর, মা, কেঁদ না। —কুইলাপাল (পুরুলিয়া)

আমাকে মা বিয়া দিলে কাঁসাই নদীর পারে,
এতগুলো পরব ছেড়ে রাখলে পরের ঘরে। —ঐ

৩

উড়কি ধানের মুড়কি দোব রাণী পথে ছড়িয়ে দিতে,
আম কাঁঠালের বাগান দিব ছায়ায় তুমি যাবে। —ঐ

ছোট মোট পাল্‌কি তেঁতুলা যে লেখা গো,
যেমনি বাধা তেমনি রাণী বিধাতা লিখেছে গো। —ঐ

৫

শুন, মা, আমি বলি তোমায়,
শ্বশুর বাড়ী যেতে বল না আমায়।
বরং কাজ নাই আমার এ জীবনে গো,
আমি গলে লিব, জীবন ত্যজিব
এ পুরুষে আমার কাজ নাই।

চালে হেরো কুমড়া ফানলি চালে হেরো ফান্‌লি ;
মুখের গুণে হিলি থুবড়া ॥
—বাঁশপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

৭

রেলগাড়ী বোঝাই গাড়ী ল' মনের উপর ভারি,
দে ল ফানলি বোঝাই করে তোরই কান্‌লা যাবেন ব্যাপারে ॥ —ঐ

আখলো বাকুল ঘরে মইধ্যে জিলিপি পায়রা টং
বাকুল দেখে কাঁদিস্ না লো ফান্‌লি নাবিল,
রাখি দিব জোড়া কামিন। —ঐ

কুলিত কুলিত কাদা পায়ে তো পায়ে আলতা গো,
কুলহির কাদা কেলাই দেল ফান্‌লি শালি,
বার টাকার বেচারি দেব বারো টাকাও নাইলো ফান্‌লি
তের টাকাও নাইলো, ফান্‌লি, আধ পয়সায় দিল ধাসি ॥ —ঐ

১০

আঁকুটা বাকুটা লদিয়া পার হবি
ফান্‌লি লো কেমনে পার হলি—
ফান্‌লিকে লাড়িয়া ঘরে বন্ধক দিয়া
ফান্‌লি লো, কেমনে পার হবি। —ঐ

১১

আম গাছে আম রাশি নিম গাছে রাখ পাগড়ি,
আষাঢ় মাসে, ফান্‌লি, না যাইও কামিন,
দিদি যাবেক মাথার ঘোমটা। —ঐ

১২

মেদিনীপুরের ঢাকাই শাড়ী পুটলি রঙ্গে গাবাবো,
ইষ্টিশানের চা পাবো মদ বলে নামাইব,
ফানলির দেশে জল খাওয়াবো। —ঐ

১৩

হাট যাইয়ো বাজার যাইও না করিও বাসা,
হেলিয়া দরিয়া যাব ফান্‌লিলো ভাঙ্গিলো তোর বাসা।
বাসাটি ভাঙ্গিয়া গেলে ফান্‌লিলো ফুরায় মনের আশা॥ —ঐ

১৪

দাঁড়িয়ে আছে ডালিম গাছটি ডাল হৈল মেলাস্তি গো,
ফুল যে ফুটিল, ধনি, হলুদ বরণ গো,
বাসাতে তো জীবন উড়ে যায়। —ঐ

১৫

কংসাবতীর নদীর বান্ধনে
ও আমার যেতে হবে, রইল ভাই কোন বনে
কংসাবতী নদীর বান্ধনে,
ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র সাগর বেঁধে ছিল,
এক বানেতে দলান যে নিধন করেছিল। —ঐ

১৬

বাঁকুড়ার অ সরু চিড়া পুরুলার চিনি হে, বঁধু,
(হায় হায়) কলের জলে ভিজায় চিড়া,
চিপিরায় খাওয়ালি এই তোমায় জানি। —ঐ

১৭

হেদে হে, নাগর, ডালিম ডাগর, আমাদের পাড়া যেও,
কত ডাঁসা ডাঁসা ডালিম তুলিয়া রাখিব দুয়ারে বসিয়া খেও,

তোমরা যাচ্ছ বন্ধু কোথাকার,
দুয়ার গোড়ায় ঢেমনি রেখে দিচ্ছে কত গাল ॥ —ঐ

১৮

ও মিনতি পরম পতি রেখ আমার মান,
আপনারা ভাই সহরবাসী গান জানেন, ভাই, রাশি রাশি,
আমরা যে ভাই জংলা দেশের লোক
আমরা মাঠে ঘাটের ধান, আপনারা গাইতে জানেন গান ॥ —ঐ

১৯

বিজুবা গানের তলে বালা, মাগো, সরু মোটা বালি।
বালার মুখে রোদ পাশে বালার, মাগো, ধরে তোল ডালি। —ঐ

২০

ভাঙ্গা ঘরে ঘুমায় বালা কাউওয়ায় লেগে কান্দেরে,
কাইন্দ না কাইন্দ না, বালা, ধনি দিব দানরে। —ঐ

২১

চারকন্যা পথটি (বাঁধ), মা, ফুটিল শালুকের ফুল,
সেই ফুলে লাগল ধরায়, বাহিয়া গেল কন্যার মা,
লাগল চুমাতে শালুক ফুলে লাগল ধরায়। —ঐ

২২

অযোধ্যার কুলি মুড়া গুয়া নারকোল গাছ গো,
তার তলে হাতি চলি যায়—ডাল না ভাঙ্গে হাতি,
ফুল না তুল গো কন্যা, হাতি ফুলেরি শিঙ্গার (মাজ)।

অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

২৩

পুর্বদেশে কারগা বাবন (ব্রাহ্মণ) চলে আইলে,
হাতে পুঁথি কানে কলম পড় বাছার বাবন বেটা ॥ —ঐ

২৪

স্বর্গে টড়ে ঢলে চডুল (পাল্কী) ভুঁয়ে লোটে মাড় (মুকুট)
লোকে বলে হাঁকিয়া ধীরে চলো ॥ —ঐ

২৫

শ্বশুর গৃহের সমালোচনাত্মক গীত—

অতি অত্তি জবা, দিদি, কিয়া কিয়া ফুল গো,
সতীনদের বাব্ড়ি কাটা চুল গো ॥ —ঐ

২৬

দেশ ঘুরলে বিদেশ ঘুরলে আস পরভু পায়ে না ধুয়ো,
রাখ কন্যা পিঁড়া পানি রাখ কন্যা পালঙ্ক,
আজি কন্যার বদন মলিন। —ঐ

২৭

মা হ গো, বাছা, কুলের কামিনী আর বোন হল পরদেশ,
আমরা দুজনে গৃহবাস, কোন দোর কইচা হল বাটিছে হলুদ ॥ —ঐ

২৮

দৌড়া দৌড়ি আলি ধনি ঘামে সরবর (সরোবর),
বালা দুয়ারে হিংগুল ডালা জোড়া পাইয়ে চল।
জোড়া পালি চাষ করবি শিঘির উইঠ্যা যা,
আমাদের বালা জানতে পারলি দিবে ধাক্কা চার। —ঐ

২৯

আইজ বালাকে বান্ধন দেব বলি ফাঁচা পাটে জোটে
কে বালা হিতু আছে বালারে, মাগো, বাঁধন কসাতে। —ঐ

পুরুলিয়া জিলার সাঁওতাল জাতির মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি বাংলা বিবাহের গানও এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

৩০

হেতমপুরে রেণী দেইখে এইলোম, ভিরুড়া মাচুলি বার কোঠা,
এ মাচুলি রেণী কে গাড়রে—হেতমপুরের রেণী লীলামণি। —পুরুলিয়া

৩১

কি করিতে আলি তোরা কেবা ডাকাছ
আমাদের ধনির মতো বাউল সাজিছে। —ঐ

৩২

বাবুলার বাবুদের হাতে কেন ঘড়ি, হে বঁধু, হাতে কেন ঘড়ি,
হাতে শিশি ফুলাম তেল চিয়ারের উপরে আমার যইবুন বয়সে

৩৩

আজ বিয়া কাল বিয়া কবে ধনির বিয়ারে,
ধনির মামা ঘরে না পাইল গুয়া
হেইরকা দিলাম গুয়া দিলাম কিনে নিয়ে আইলে।
বর দেখার দিনে তোমরা নাই খুঁইজাছিলে।

৩৪

ধনির মারো যোগান ছিল বিয়ারো কলসী,
বাবা আমার বিইকা দিল বিয়ার কলসে। —ঐ

৩৫

বাপের ঘর এমনি সুখ মা ফাঁকে গর্যা চাল ভাজা।
শ্বশুর ঘরে এমনি দুখ, মা, লোক বুজাতে যায় বেলা। —ঐ

৩৬

অল্পবয়সের পুরোহিতকে লইয়া রসিকতা—
হরগৌরী পোজে রে বামোন টের চউকে চায়,
দুনীর কলা বামোন ছিলায় আর খায়।
বরণী ধানের বামোন উড়ানী খই।
তাতে ঢালিয়া নিচেন আরো টেঙ্গা দই।
মাখেন চাখেন বামোন না খান লাজে,
কোন সুন্দরী তুলিয়া দিবে ঐ মুখের মাজে।
রে মোর বামোন বামোন। —গোয়ালপাড়া, আসাম

৩৭

বার শ' হাড়ী রে, তের শ' কোদাল রে
সেই কোদালে ময়নার মাল্লি বান্দেরে,
মাল্লিরে কিনারে রে, যুতী মালতীর লতা রে
তারে তলে ময়নায় জুড়িচে খেলা রে।
সড়ক দিয়া যায় রে, সদাগরের বেটা রে
তায় দেখি গেইল্ ময়নাক' খেলা খেইলতে রে।
দই মাছের ভার রে, বাটায় গুয়া পান রে
কিবা সাজনে ময়নার জোরণ আইসে রে। —ঐ

জোরণ শব্দের অর্থ সম্বন্ধ।

৩৮

পিতার কাছে কন্যার দাবী—

মাটির কলসী নিব না, বাবা, পিতল কিনে দে,
একটি সাধের পিয়ারি তোমার আদর করে দেবে। —ঐ

৩৯

কন্যার মাকে পরিহাস পুর্বক গীত—

ঘর থাক্যা কন্যার মায় কমর দেখাইছে,
এরে দেখ্যা ঢুলী বেটায় গোট গড়াইছে ॥ ইত্যাদি —মৈমনসিং

৪০

কন্যার সখীদের গীত—

কি ও সখি রে !
রাস্তার শোভা গাছ গাছালি সড়কের শোভা গাড়ি।
বাড়ির শোভা ভাই-ভাতিজা ঘরের শোভা নারী ॥
লো সখি রে !
দুদ্ মিঠ্যা, ক্ষীর মিঠ্যা আরো মিঠ্যা চিনি।
তারো চ্যাহা আরো মিঠ্যা নারীর মুখের বাণী --
লো সখি রে !! —রাজসাহী

৪১

বরকে ব্যঙ্গ করিয়া কন্যার গীত—

কালো দেখে নামলাম জলে জল হলো, মা, একগলা।
ও প্রাণনাথ, ছেঁকে তোল রঙ্গ দেখিবার লয় বেলা ॥
—বাঁশপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

৪২

আমবাগানে কে তুমি ফুলবাগানে কে।
জরা গায়ে ঘাম পড়েছে পাখা আইন্যা দে ॥ —ঐ

৪৩

পরিবারের সকলে কন্যার হৃদয় জয় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে-

নীলমণের জোরণ আইল, নীল ঘোড়ায় চইড়া রে,
বান্দো ঘোড়া বাবার দুয়ারের আগে, রে নীলমণ।

সোনার বাটায় গুয়ারে, নীলমণ, রূপার বাটায় পান রে,
দেও নিয়া গুয়া নীলমণির বাবার আগে
রে নীলমণ।
গুয়া খায়া হাসিয়া জবান দেউক রে নীলমণ।

নীলমণ বলিতে কন্যা এবং বর উভয়কেই বুঝাইয়াছে।

বাবা যেন বলিতেছেন—

না খাই তোমার গুয়ারে, নীলমণ, না খাই তোমার পান রে,
না দিস না দিস নীলমণির জবান, রে নীলমণ।
ছেচিয়া ফেলাইস গুয়ারে, নীলমণ, ছেচিয়া ফেলাস্ পান রে,
ঘাটায় ছিটাইস যুগীর থলার চুণ,
রে নীলমণ। —গোয়াল পাড়া, আসাম

৪৪

দেশ বুল্যে আল্যে, প্রভু, নগর বুল্যে আল্যে গো,
এস, প্রভু, পা ধোয়াই দিব গো,
রাখ, কন্যা, ঝারির জল, রাখ, কন্যা, চন্দন পিঁড়া,
আজ কন্যার মুখ ত মলিন গো॥
মা তোমার রাঁধুনী, বহিন তোমার বাঁটুনি,
নিতি পতি পেটের চণ্ডালিনী॥
মা করিব দেশের বাহির, বহিন করিব দেশের বাহির,
তুমি, কন্যা, হবে পাটরাণী গো॥
সাঙ্গা করলেও পাবে, প্রভু, বিহা করলেও পাবে গো,
মা বহিন কোথায় বল পাবে গো॥ —ঐ

৪৫

হলুদ মাখিতে বাছার ঘাম ছুটিল গো,
আন রে ময়ুরের পাখা, ঢুলাঞ দে মোর বাছাকে॥ —পুরুলিয়া

৪৬

সম্ভবত হলুদ বাটিবার কালে নিম্নোদ্ধৃত গানটি গীত হয়।

দাদু আমার গিয়াছিল, নাগপুরের হাটেতে, আন্‌ছিল মঘয়া হলুদ।
ছেঁচিলে না ছেঁচা যায়, বাঁটিলে না বাটা যায় এ হলুদ কেমন হলুদ॥ —ঐ

৪৭

বাজনা বাজিছে সাজনা সাজিছে
বাজনা ধমকে ধনীকে ঘাম দিছে।
ও ধরার বাবা আসে,
ধুতির কোচায় ঘাম পুচিছে
ও ঘরের মা আসে পঙ্খা ডলাছে। -লাইলামডি (পুরুলিয়া)

৪৮

বীরভুম জেলার উত্তরাঞ্চলের মুসলমান সমাজের বিবাহে প্রচলিত মেয়েদের কয়েকটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উত্তর পশ্চিম জোড় দীঘি সাঁহাদ বাঁধা ঘাট হে,
সেই না ঘাটের পাশে লাগাব আনার ডালিমের গাছ হে,
ডালিম ধরে পেকে পড়ে, কাক লুটে খায় হে,
কোন দেশে চাকরি কর, দামাদ, ঠিকানা না পায় হে,
এবার ঠিকানা পেলে, দামাদ, সঙ্গে চলে যাব হে। —ঐ

৪৯

ছেলে লাল গেছে জোড়দীঘির গোসলে,
এল না কেন এল না জি।
তবে বুঝি আটক পড়েছে, কামিনীর মায়ের হাতে জি,
জোড়া মুণ্ডা রসগোল্লা জামাই নাস্তা করেছে জি,
আড়াই বছরের নারী হে তুমি ঝেড়ে বাঁধ কামিন জি।
হাতে কোরাণ বগলে দাবা, ঝেড়ে বাঁধবার কি জানি,
আড়াই বছরের নারী হে তুমি, কোলে কেন খোকা জি,
তোমার বাহানায় আমার পালঙ্কের নীচে ছিল জি,
তাহার নন্দায় আরবের খোকা আমার, তাতে তোমার ক্ষতি কি॥
—ঐ

৫০

বলি কোন কোন দেশের আয়া হে বরের ভাই,
সাদী এল তার দুয়ারে জি,
বলি কি কি জেওর নিবে, হে কন্যার মা, এহ কবুল কর জি।

বলি হার নিব বাজেমা নিব আর নিব মতিচুরের শাড়ি,
বলি আঙ্গন ভরা গেরাম নিব ভারে সাজা লগন জি।
বলি কোঠা ভরা বরাত নিব আমি ঘর ভরা বিবি জি,
বলি ঘর ভরা বিবি নিব আমি আলম ভরা জামাই,
বলি আড়াই মাপা টাকা নিব আমি ঝাড়াই মাপা সোনা নিব,
বলি এ সব দিয়ে দরকার নাই আমি বি. এ পাশ করাব। —ঐ

বিরহের গান

বাংলার প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে বিরহ বা বিচ্ছেদের স্থানই প্রধান। বিরহের বিষয় অবলম্বন করিয়া যে গান রচিত হইয়া থাকে, তাহাই বিরহের গান। রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের মধ্যে যেমন মাথুর, লৌকিক প্রেমসঙ্গীতেও বিরহ বাংলার করুণতম লোক-সঙ্গীত। বিচ্ছেদী গান (পুর্বে দেখ)-কেও ইহার একটি অং বলিয়া উল্লেখ করা যায়। তবে বিচ্ছেদী গানে ভগবানের সঙ্গে বিরহের আধ্যাত্মিক ভাব ব্যক্ত করা হয়। প্রেম-সঙ্গীত এবং বিচ্ছেদী সঙ্গীতের মধ্যেই বিরহের গান উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ভাওয়াইয়া গানও (পুর্বে দেখ) প্রধানত বিরহের গান।

বিরুয়া গান

জলপাইগুড়ির অরণ্য অঞ্চলে হাতি ধরিবার জন্য যে খেদা বাঁধা হয়, তাহাতে প্রহরারত ব্যক্তি কোন কোন সময় তাহার নিঃসঙ্গ অবসরে যে গান গাহে, তাহাকে সেই অঞ্চলে বিরুয়া গান বলে। ইহা সাধারণত প্রেম-সঙ্গীত।

১

উঠ উঠ, ভাবের বন্ধু, চেতন কর গাও,
রাতি পোহাইল রে—
কোংকিলায় ছাড়ে আও,
শ্বেত কাওয়ায় উঠিয়া কহে
রজনী পোহাও। —জলপাইগুড়ি

বিষরীর গান, বিষহরীর গান

সমগ্র শ্রাবণ মাস ব্যাপিয়া বিশেষত শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন মনসার মাহাত্ম্যসূচক যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই কুচবিহার অঞ্চলে বিষরীর গান বলে, পূর্ববঙ্গে তাহা বিষহরীর নাম বলিয়াও পরিচিত। ইহা চাঁদসদাগর ও বেহুলার কাহিনীমূলক রচনা। পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল বিষরীর গানের সাধু রূপ।

কুচবিহার অঞ্চলের বিষরির গান সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর এই বিবরণটি উল্লেখযোগ্য। 'বিষহরীর গানের দলেও মূল গায়েন এবং দোয়ারী থাকে। এই গানের কতকগুলি বিশিষ্টতা রয়েছে। যেমন মূলের হাতে থাকে চংড়ার অর্থাৎ চামর। এ ছাড়া থাকে দুজন খোলবাদক, দুজন খাপি বাদক, এবং দুজন বংশীবাদক। এই বংশী বা বাঁশী গানের শুরু থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক টানা সাপ খেলানো সুরের সংস্কার মনে করিয়ে দেয়, এমনভাবে বাজিয়ে চলে। এই গানে মনসার বিভিন্ন পালা গান গাওয়া হয়। দোতরা, কুষাণ এবং বিষহরা তিন প্রকার গানেই গান আরম্ভের পূর্ব মুহূর্তে চারদিক বন্দনা এবং সরস্বতী বন্দনার রীতি প্রচলিত আছে। যেমন সরস্বতীকে বন্দনা করা হয় এই বলে :

আইসেক মাও সোরে সরে, বা সতী রে
রথে করিয়া ভার।'

বিষোহোরার গান

জলপাইগুড়ি জেলায় বিষহরী বা বিষরীকেই বিষহোরা বলে, তাহার গান বিষোহরার গান—

ডাণ্টা ডাখালী তামান দিয়া ঢালি,
ম্যেনের তিকে বুড়া গেইল দূর তীরথে চলি।
বুঝায় অবুঝায় নাগাইল জের পেটা জের পেটি
কাঁহ মাথাত্ বান্ধিল মাইয়ার পাটানী।
কাঁহ ঘর ছারিল গারস্তি ছারিল
চড় চড়েয়া ফুটানিত্ বাইগন ভাজিল্।

কারো ঘরের মাইয়া ছারিল্ হাড়ি
কারো ভাতার হলেক নয়া ব্যাপারী।
কারো কাথা কাঁহ না শুনে, চৈতে উঠেল বান,
উচানীচা হেঠা উচল সব কোরিলেক্ সামান।
ঘরের সলেয়া হুয়া গেইল বেজার,
প্যায়া মনত্ যার বেজায় ধিক্কার।
আগপাছ না বুঝি নাচি ভাঙ্গে ঘর বিন্দাবনী,
তিনো চোখু নাল কোরি ত্যাখে ঠাকুর শূলপাণি। —জলপাইগুড়ি

বিষ্ণুপদ

মধ্যযুগে প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের কাহিনী বর্ণনায় প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের সূচনায় যে ধুয়া বা ধ্রুবপদ থাকিত, তাহা বৈষ্ণব প্রভাব বশত কোন কোন ক্ষেত্রে একটু দীর্ঘায়িত হইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া রচিত হইত। তাহাকেই বিষ্ণুপদ বলিত। ইহারা কীর্তনের লক্ষণাক্রান্ত এবং ভাঙ্গা কীর্তনের সুরে গীত হইত। সারদা-মঙ্গলের রচয়িতা দ্বিজ মাধবই এই শ্রেণীর বিষ্ণুপদ সর্বাধিক: ব্যবহার করিয়াছেন, তবে পাঁচালী গানের ধুয়া যেমন সর্বতোভাবে লোক-সঙ্গীতের লক্ষণাক্রান্ত, ইহারা সর্বদা তেমন নহে; কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষ বিষ্ণুপদরচনা করিয়াও তাঁহাদের কাব্য মধ্যে সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

১

সজনী, সই তুমি যাও আমার বদলে।
আমি গেলে জীব না প্রাণনাথ কানাইরে দেখিলে॥
সর্ব সখী সঙ্গে আমি বসিয়া খেলাই।
কানাইরে দেখিলে আমি উঠিয়ে পলাই॥
যমুনার জলেরে যাইতে সখীগণ মেলে।
ঠেকিছিলাম কানাইর হাতে বিধি রক্ষা কৈলে॥
নন্দের নন্দন কানাই বড়ই দুর্জন।
নাহি রাখে লাজ ভয়ে না রাখে ভরম॥

বুলবুলির লড়াইয়ের গান

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বিশেষত পুরুলিয়া জিলার কোন কোন স্থানে বুলবুলির লড়াই এক কালে বিশেষ জনপ্রিয় লৌকিক অনুষ্ঠান ছিল। সেই উপলক্ষে সাধারণত ব্যবসায়ী নর্তকী বা নাচনীরা যে বিশেষ এক শ্রেণীর গান গাহিত, তাহা বুলবুলির লড়াইয়ের গান বলিয়া পরিচিত। গানগুলি তাল-প্রধান এবং অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করিয়া যায়—

আমার দেশের মাইগমরারা মরে না কেনে।
কাপড় কিনে দে, কালাচাঁদ, দিবিনে কেনে।
কাপড় পরে দেখ্‌তে যাব অষ্টমীর দিনে।
দারকে পুঁটি পাথর-চাটা, রুই মাছে শুধুই কাঁটা,
আমার সনে বাদ করেছে ওই বাবা-ভাতারী।

—কুইলাপাল (পুরুলিয়া

২

ভালবাসব কেমনে, যা কিছু বায়না ছিল কই দিলে কিনে।
গয়না দিবার কথা ছিল, নাই কি তোর মনে (বন্ধু)।
হাতে শাঁখা পায়েতে মল, আর মাকড়ি কানে,
ফুলাম তেলে শিশিভরা কই দিলে কিনে (রং)।
ভালো তো দেখায় না মোকে মাথার জাল বিনে॥
বলেছিলে বাজারে যাব মোরা দুইজনে, (বন্ধু),
যাহা কিছু লিব দুই জনে দেখে শুনে।
শায়া শাড়ী ব্লাউজ যদি না দিলে পার্বণে।
কিন্তু নাগর লিবই লিব চৈত্র পার্বণে।
লজ্জা তো গেছে বুঝি, তোমার পরাণে। (বন্ধু)
দেখা হলে মাথা নীচু কর অপমানে,
ললিত কিশোর বলে, সবাই তোরে জানে,
হাতে নাই তোর নয়া পয়সা, 'টেম্পার' কর কেনে। —ঐ

ইংরেজি temper শব্দটি এখানে কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

হাত সরু কাঁকাল বাঁকা এই কি লো রূপের ছটা,
দেখ, নখ হাতে পায়ে হাজা।
(রং) ছি, ছি, বঁধু, ওই কি কুবুজা॥
পর্বত সমান কুঁজ, দিবানিশি পড়ে পুজ।
তার বামে হলে তুমি রাজা॥
ছি ছি, বঁধু, অধম পরেশ ভণে দুখ দিলে রাধার প্রাণে,
দেখ রাধা প্যারীর মন কেমন সোজা—ছি ছি, বঁধু॥ —ঐ

বেদের গান

সাপ খেলাইয়া যাহারা জীবিকা অর্জন করে তাহারা সাপ দেখাইবার সময় যে গান গাহে, তাহা বেদে-বেদেনীর গান। ইহা ব্যবসায়ীব গানের (professional song) অন্তর্গত। তাহাতেই ইহা বিস্তৃত উদ্ধৃত হইয়াছে।

১

দাঁড়াও দাঁড়াও ওহে বেদা,
আমি তোমার বদন হেরি,
যেছো যাও হে, ফিরে চাও হে,
লয়ে চলো, ওহে বেদা, সঙ্গে কোরে।
কাজ কি আমার গৃহবাসে, বেদা বিনা এ বয়সে,
তুমি যাবে পরবাসে, তুমি যাবে পরবাসে
কেমনে প্রাণ ধৈর্য ধরে। —মুর্শিদাবাদ

২

উবুর—হায় হায় লাজে মরি!
আমার মরণ কেনে হয় না হরি!
আমার পতির মরণ সাপের বিষে,
আমার মরণ কি সে গ।
মদন পোড়া চিতের ছাইয়ে
কে দেবে হায় দিশে গ।
রঙ্গ মেখ্যা সেই পোড়া ছাই,
ধৈরয মুই ধরি গ, ধৈরয মুই ধরি গ। —বীরভূম

বৈঠকী গান

আসরে বসিয়া তাল লয় সহযোগে যে গান গাওয়া হয়, তাহাই সাধারণত বৈঠকী গান বলিয়া পরিচিত। ইহা লোক-সঙ্গীতের সুর হইতে রাগ সঙ্গীতের স্তরে পৌছিয়া যায়। কদাচিৎ বৈঠকী গান লোক-সঙ্গীত হইয়া থাকে।

১

মা গো, যে দুঃখে কাটি দিন গো, তারা, যে দুঃখে কাটি দিন,
মা গো, মনে করি দিব ঝাড় গেলাসের বাতি।
হ'তে চায় না, মা, গো প্রদীপের শকতি॥
কেরসিন তেল দিয়ে আলো জ্বেলে,
লাল ধোঁয়ায় মায়ের বদন মলিন।
মনে করি দিব নাটশালাতে তালা
চন্দ্রকান্ত মণি সম চণ্ডী মেলা—
হ'তে চায় না, মা, গো শাল প্যালার চেলা।
বিষম জ্বালার জ্বালা জুটল কঠিন।
দিন যায়, মা দুর্গে, নানা উপসর্গে, পরিবার বর্গে পরিশোধে ঋণ॥

—বাঁশপাহাড়ী

বৈরাগ্যমূলক গান

ভাবের দিক দিয়া যে সকল গানে বৈরাগ্য প্রচার করা হয়, তাহাই বৈরাগ্যমূলক গান। কিন্তু বৈরাগ্যের ভাব বিভিন্ন প্রকৃতির গানের মধ্য দিয়াও প্রকাশ পাইতে পারে। তবে ভক্তিমূলক গান এবং বৈরাগ্যমূলক গানে পার্থক্য আছে। ভক্তির মধ্যে আসক্তির কথাও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বৈরাগ্যমূলক গানের মধ্যে নিরাসক্তি, ত্যাগ ও উদাসীনতার ভাব প্রকাশ পায়।

১

মিছা ধান্ধা বাজী এ সংসার, মন্‌রে, ভরসা কর কার?
ভেইবে দেখ মনে মনে তুমি বা কার? কেবা তোমার?
(মন্‌রে, ভরসা কর কার?)
এই যে তোমার সাধের বাড়ী ঘর,—
পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় নফর,
সব পড়ে রবে, দিন দুপরে চক্ষে দেখ্‌বে অন্ধকার॥

প্রাণান্ত কাল যখন হইবে,—
হরি হরি বলে সবে বাহিরে নিবে,-
দেহ চিতায় তুলে, আগুন জ্বাইলে
পুড়িয়া করবে আঙ্গার।
মন্‌রে ভরসা কর কার? —মৈমনসিং

বোলান গান

বোলান গান আমাদের বাংলা দেশের নিজস্ব গান। কিন্তু বাংলা দেশের সর্বত্র এই গানের প্রচলন নাই। এই গান যে কতদিন পুর্ব হইতে প্রচলিত তাহা সঠিক বলা যায় না, এই গান গাওয়া হয় চৈত্র সংক্রান্তির শিব পুজার সময়। তিন চারি দিন ধরিয়া এই শিব পূজা হয়। এই পূজা গাজন পুজা নামেও খ্যাত। বার হইতে বিশ পঁচিশ জন মিলিয়া একটা বোলান গানের দল গঠন করিয়া থাকে। পাঁচালী গাওয়ার সুবিধা ও লোকের চিত্তাকর্ষণের জন্য দলের দুই তিনজন পুরুষকে স্ত্রীলোক সাজান হয়। দলে সাধারণত একটি ঢোলক ও দুই এক জোড়া জুড়ি থাকে। বর্তমানে কোন কোন দলে হারমোনিয়ম, বাঁশী, বেহালা প্রভৃতিও দেখা যায়। শিব পুজার সময় দলগুলি এক এক স্থানে গিয়া দুই ঘণ্টা হইতে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত গান করিয়া থাকে। সীতার বনবাস, লবকুশ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস, সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গান ও পাঁচালী করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও এই সঙ্গে টপ্পা, ছড়া, রং পাঁচালী প্রভৃতিও গীত হয়। নীচে উদাহরণ স্বরূপ প্রথমেই পাঁচালী এবং ছড়া দিলাম।

১

বলি ও কলির ব্যবহার বলব কি আর,
কলির শেষে হবে দেশে ব্রাহ্মণ চেনা ভার।
যে জাতির যা অশৌচ আছে, জমিয়ে সমাজ কমিয়ে নিছে,
বলতে গেলে দোষে পড়েছে, করছে কে বিচার॥
দেশের বিচার সিন্ধু পারে, বিন্দুমাত্র নাই এ ধারে,
হাম বুঝে গা সব আধারে, ধারে না কেউ ধার॥

হিন্দু হোয়ে নাপিত না পান, কাল যদি হয় সে মুসলমান,
সোজা হয়ে দিবে কামান পেতে দিয়ে ঘাড় ॥
সমাজপতি যত হিন্দু, বিচার তাদের নাই এক বিন্দু,
সেই দোষে শুকালো সিন্ধু, নদী তো কোন ছার ॥
চাষার বুকে মেরে ছুরি, বড় লোকের বাবু গিরি,
তবু গেলে বাবুর বাড়ী, করেন না 'কেয়ার' ॥
নিরপেক্ষ বুদ্ধি কারক, নাই গো দেশে সুবিচারক,
আছে কেবল আমারই হোক, হোক না হোক তোমার ॥
সুবিচার যতদিন দেশে, না আসবে সব যাবে ঘুঁষে,
থাকবে যারা ভুগ্‌বে শেষে অনুতাপ ইহার ॥
রামনাথপুরের সতীশ ভণে, সুখ পেলাম না এ জীবনে,
কাকে বলছি কেবা শুনে, বাসনা আমার ॥
দশের চরণ শিরে ধরি, দিলাম সঙ্গীত সাঙ্গ করি,
বলুন সবে হরি হরি, নামই মূলাধার ॥

২

নিশির শোভা শশী, আর শশীর শোভা কলা।
শরতের শোভা নীলাকাশে সাদা মেঘের খেলা ॥
বসন্তের শোভা কোকিল, আর কোকিলের শোভা গীত।
আকাশের শোভা তারকামালা মেঘের শোভা তড়িৎ ॥
পর্বতের শোভা তুষার, নদীর শোভা বালি।
সরোবরের পদ্ম শোভা, পদ্মের শোভা অলি ॥
বনের শোভা তরু, আর তরুর শোভা ফুল।
ফুলের শোভা সুগন্ধ, নাইক কোন ভুল ॥
পল্লীর শোভা শস্যক্ষেত্র, নগরের শোভা বাড়ী।
বৈরাগ্যের তিলক শোভা, মোল্লার শোভা দাড়ি ॥
ব্রাহ্মণের পৈতা শোভা, যোগীর শোভা জটা।
পুরুষের বিদ্যা শোভা, নারীর সিঁদুর ফোঁটা ॥
হাতের শোভা অঙ্গুলি, দেহের শোভা স্থূল।
মুখের শোভা দন্ত আর, মাথার শোভা চুল ॥

সবাকার শোভা হেরি এ নয়নে।
শোভাহীন মদনমোহন ভাবে নিশি দিনে॥ —মুর্শিদাবাদ

হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত বোলন গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল, প্রথমে বন্দনা, তারপর কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র পালা

১

মনে জানিয়াছ তুমি, জগতে ভ্রমি আমি
মনের আঁধার গেল না গো দেখা নাহি পাই।
রহিয়াছ লুকায়ে কে দেবে দেখাইয়ে
এ জনম অকারণ বহিয়া যায়॥
আমোদে মাতিয়া ভবে লইতে তোমারি নাম
শান্তি পেতে ভ্রান্তি এসে জড়িত হতেছে কাম।
মরুময় হৃদয়েতে আপনার মহিমাতে
আসিয়া হবে বসিতে মিনতি গো তাই॥

জীবন ফুরায়ে গেল, আয়ু-সূর্য অস্ত যায়।
ঘোর অন্ধকার এলো, কি করি এখন উপায়॥
কোথা পাব ধন, বিভিন্ন রতন, কোথা পাব কামিনী।
দিবস-রজনী, গেল এই গণি, আর কিছু না জানি॥
যাদের লাগি ভেবে মরি তারা কিগো আমার হবে।
যাবার দিনে কেও কারো নয় একা চলে যেতে হবে॥
ওগো মরণে স্মরণে, বড় ভয় স্বপনে,
সেই দিনে আর তো কেহ নাই।
অসময়ে তাই ডাকি, হে হরি, চরণে
আমার পারে যাবার সময় হলো হে, নিয়ে যেতে ভুলো না।

১

সূর্যকুলে রাজ্য করে হরিশ্চন্দ্র নররায়।
দানে দুঃখী নাহি ছিল, সুখী সবে অযোধ্যায়॥

সতী শিরোমণি, তার শৈব্যারাণী বিদিত এ ভুবনে।
সুখে রাজ্য করে, অযোধ্যা নগরে, রোহিতাশ্ব সনে॥
হেন কালে তার কপালে বিধি-বিড়ম্বনা হলো।
বিশ্বামিত্র মহামুনি, সেই রাজ-সভাতে এলো॥
ওহে কেমন দাতা হও, তুমি হে রাজন,
জানা যাবে আজ তোমারে।
মুনি বলে, রাজা গো সত্য বল আজ আমারে॥
শুনি তুমি বড় দাতা কিছু দাও গো আমারে।
করজোড়ে নরপতি, মুনিরে প্রণাম করে।
বসিতে আসন দিয়ে, কুশল শুধায় তারে॥
ওগো মহামুনি, বড় ভাগ্য গণি, আজ বড় শুভদিন।
মনে এই সাধ, কর আশীর্বাদ, আমি অতি মতিহীন॥
মুনি বলে মহারাজা, কিছু মোরে দিতে হবে।
প্রতিজ্ঞা করহ আগে, কি চাহিব বলি তবে॥
ওগো প্রতিজ্ঞা বিহনে, তোমার সদনে
আমি তো কিছুই নেব না।
হৃষ্ট মনেতে দিও, গো রাজন, নইলে দানের ফল হবে না॥
সত্য কর আমার আগে গো, তবে গো যাবে জানা।

৫

রাজা বলে ওগো মুনি, দিব চাহ যত ধন।
সত্য করি বলি আমি, করতে নারি লঙ্ঘন॥
যাহা চাও তুমি, দিব তাই আমি,
সত্য করি বলি তাই।
মুনি বলে, আছে যত রাজ্য ধন, মাগি আমি তব ঠাঁই॥
শুনি রাজা হরিশ্চন্দ্র শিরে করাঘাত হানে।
হায় কি হইল বলে, ধারা বহে দুনয়নে॥
ওগো হায়, কি করিলাম, আগে না বুঝিলাম
সত্যকোরে দায়ে ঠেকেছি।
আজি প্রভাতে আমি গো, বল, কুক্ষণে কার মুখ দেখেছি॥

লহ গো মুনি, যত রাজ্য ধন, আমি সত্য করেছি ॥
মুনি বলে, ওগো রাজা, সব যদি আমায় দিলে,
রাজ্য-ধন ছাড়িয়ে, এখান হতে যাও চলে ॥
কিছু নাহি লবে, শুদ্ধ নাহি হবে, দানের দক্ষিণা দাও ॥
দক্ষিণা না দিলে তোমার, এ দান শুদ্ধ নাহি হবে।
সাতকোটি সোনা দিবে, তবে তুমি যেতে পাবে ॥
ওগো, যা ছিল দিয়েছি, কিছু না রেখেছি,
বলিল মহারাজ বিনয়ে।
না দিলে দক্ষিণা হবে না হবে না,
তোমায় যাইতে দিব না পলায়ে ॥
আপন দেহ বিক্রয় করে গো, বারাণসীতে গিয়ে।

অন্দরেতে গিয়ে রাজা, ডাকিছে রাণী বলে।
সর্বনাশ হইল আজি, যেতে হবে গো চলে ॥
মুনির ছলেতে, না পারি বুঝিতে, দিয়ে যাব রাজ্যধন।
সব ত্যায়াগিব, বারাণসী যাব, রহিব তিন জন ॥
এ দেহ বিক্রয় করি, দানের দক্ষিণা দিব।
ক্রীতদাস হইয়ে এখন, এ জীবন কাটাইব ॥
ওগো নিশিকালে, চল যাই হে চলিয়ে
অযোধ্যায় আর রব না।
অযোধ্যাবাসীদের প্রভাতে আর আমি,
এ মুখ আর দেখব না ॥
একই বস্ত্রে চলে যাবো গো, কিছু সঙ্গে নেব না ॥
কেঁদে বলে শৈব্যারাণী, রাজ্যধন তারে দিলে।
যেথা যাবে, মহারাজা, তোমার সঙ্গে যাবো চলে ॥
তোমার চরণ, মোর রাজ্যধন, তোমার সঙ্গে স্বর্গবাস।
তোমার বিহনে কি কাজ জীবনে, কিছু নাহি করি আশ ॥
তোমার সনে গহন বনে অযোধ্যার সুখ সবই পাবো।
চরণ ছাড়া হলে পরে এ জীবন ত্যায়াগিব ॥

ওগো স্বামীর বিহনে, নারীর জীবনে, কি আছে জগতে বল, ভাই।
তোমার চরণে থাকি হে যেন, এ দেহ ছাড়িয়া চলে যাই॥
তব সনে রোহিতে লয়ে গো চল বারাণসী যাই॥

তিন জনে মিলে রাজা বারাণসী ধামে যায়।
দাস লহ বলি রাজন্ ডাকিতেছেন উভরায়॥
কাল ডোম আসি বলিল প্রকাশি, দাস একজন আমার চাই।
ঘাটে কড়ি নেবে শূকর চরাবে অন্য কাজ তো কিছুই নাই॥
আধা দেনা শোধ হইল, আধা রইল বাকী!
দ্বিজ এক আসিয়ে বলে দাসীরে দেহ একাকী॥
ওগো দুজনে বিকালো, রোহিত রহিল, কেহ চাহে না তাহারে।
ধরিল শৈব্যার আঁচলে, মাগো, কোথা ফেলে যাও আমারে॥
ওগো, মোদের দুজনারে লহ গো, রাণী বলে ঠাকুরে॥

ফুল তুলিবারে রোহি গেল পুষ্প-কাননে।
নানাবিধ ফুল তোলে সে দেব-পুজার কারণে॥
করি পাতি পাতি ফুল নানা জাতি তুলি লয় সাজিতে।
বিধি বিড়ম্বন, ঘটিল তখন, বেল গাছের তলাতে॥
বেলের গাছে ফণী রোহিকে দংশন করিল।
বিষের জ্বালাতে তারি, সেইখানে ঢলে পড়িল॥
ওগো বেলা যে হইল, রোহি না আসিল, রাণী বলে একি ঘটিল।
বাগানেতে গিয়ে রাণী গো, তারে বেল গাছের তলেতে দেখিল॥
আমার একি হল, বলে গো রাণী কাঁদিতে লাগিল॥
বুকের ধনে বুকে লয়ে, যায় মণিকর্ণিকার ঘাটে।
নয়ন জলে বয়ান ভাসে, পুত্র লেগে বুক ফাটে॥
হায় কি হইল, রোহিত কোথায় গেল এই ছিল কপালে!
গেল রাজ্যধন এ পুত্র রতন, কোথায় রাজা রহিলে॥
একবার এসে দেখ তোমার প্রাণের রোহি যায় যে চলে।
কোথা রাজা হরিশ্চন্দ্র একবার কোলে লও হে তুলে॥

আহা ঘোর আঁধারে কে ডাকে আমারে, কাহারো পুত্র বা মরিল।
আমার কেন এমন হল গো, রাজা মনে মনে তাই ভাবিলো॥
দেখে রাজা প্রাণের রোহিতে লয়ে রাণী আসিলো॥
চিনিলো রাজারে রাণী তখন জাহ্নবীর কূলে।
প্রাণের রোহিতে রাজা তখন কোলে নেয় তুলে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা ও রাণীতে পাগলের পারা হয়।
রোহিতের সনে আমরা দুজনে পুড়িয়া হইব ছাই॥
হেন কালে সেইখানেতে স্বয়ং ধর্মরাজ এলো।
বিশ্বামিত্র ঋষি বলে চল রাজা রাজ্যে চল॥
ওগো আশীষ করিল রোহিত বাঁচিল আনন্দ হইল মনেতে।
সকলে মিলিয়া চলে গো তারা সেই অযোধ্যাপুরীতে॥
হরি হরি বলুন সকলে বোলান সাঙ্গ হইল॥ —মুর্শিদাবাদ

হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীবিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত বোলান গানটি রচনার দিক দিয়া বিস্তৃততর। ইহা একটি লোক-নাট্যে (folk-drama)র রূপ লাভ করিয়াছে।

সখী— কোথায় রাজা, হরিশ্চন্দ্র, বনে কাঁদে রমণী।
লতার বাঁধন মুক্ত কর, তুমি হে বড় দানী॥

রাজা— কে গো তোমরা, পঞ্চকন্যে কাঁদছো বল কিসের জন্যে।
লতার বন্ধন এ অরণ্যে কে দিলে বল শুনি॥

সখী— পুষ্প তুলতে বনে এলাম, বিশ্বামিত্রের কোপে পোলাম।
ফুলের গাছে বন্দি হলাম, মুক্ত করুন আপনি॥

রাজা— (বক্তৃতা) যাও পঞ্চকন্যা, মুক্ত হোয়ে তোমাদের যথা ইচ্ছা গমন কর।

সখী—গান:

জয় ২ মহারাজা, জয় তোমার হোক গো,
যাবত চন্দ্র-সূর্য রবে তাবত কীর্তি রোক গো।

বিশ্বামিত্র—গান:

কন্যাগণে মুক্ত করে, এমন শত্রু আমার কে রে।
দেখব আমি দেখব তারে, কে করে আমার মান হানী॥

(বিশ্বামিত্র—মাতান ত্রিপদী)

আমি ছারখার করিব, আমার সাধন নষ্ট করলে যে তার।

(ত্রিপদী)

ত্রিবিদ্যা সাধনের তরে, কন্যাগণে বন্ধন কোরে,
রাখলাম তারে, ছাড়াইলে কোন জনা।
আমার প্রাণে দিলে কষ্ট, করবো তারে রাজ্যভ্রষ্ট
শ্রীভ্রষ্ট হইবে গো সেই জনা ॥
আমারে অল্প জ্ঞান কোরে, কন্যাগণে দিলে ছেড়ে,
এ অপমান সহ্য না করিব।
আমার হৃদে জ্বলছে যেমন, এমন তার জালাব আগুন
তার সুখের ঘরে আগুন আজ ধরাব ॥
আমি দেখাব দেখাব, আমি কেমন মহাঋষি ॥

কলি—দেখতে আমি পাই গো ধ্যানে, হরিশ্চন্দ্র এলো বনে।
বাঁচাইব, রাখব প্রাণে, ছাড়াইব রাজধানী ॥

হরিশ্চন্দ্র, তোমার এত বড় অহংকার! আমার অপমান কর। কেন তুমি কন্যাগণে মুক্তি দিলে?

(রাজার কলি)

মুনি হে ধরি চরণে, রাখ রাখ, দীন জনে।
কেন, প্রভু, অকারণে, কও আমায় কটু বাণী ॥
শুন তার পরিচয় যে ভাবে সেই কার্য হয় গো,
মৃগয়া করিতে আমি বনে গিয়েছিলাম,
দূর হতে বামা কণ্ঠের ধ্বনি শুন্‌তে পেলাম।
ধীরে ধীরে সেই দিকেতে করিলাম গমন।
গিয়ে দেখি কন্যাগণ সব করিছে রোদন ॥
আমাকে দেখিবা মাত্র বলে কন্যাগণে।
আজ বন্ধন জ্বালা নিবারণ কর আজি মুক্তি দানে ॥
কাতরতা দেখে তাদের আমি কাতর হলাম।
সেই জন্যেতে আমি তাদের মুক্তিদান করিলাম ॥
আমি দান যে করেছি, আমি দোষী কিসে হয়েছি ॥
এমন কত দান করেছি, দান কোরে সুখী হয়েছি।
ঐ চরণে কি দোষ করেছি, বল গো মহামুনি ॥

বিশ্বামিত্র। হরিশ্চন্দ্র, তুমি দানের অহঙ্কার কর ? দাও, আমায় কিছু ভিক্ষা দান।

(গান)

তোমার কাছে এলাম আমি ভিক্ষা করিতে, হায় গো,
আমি তো ভিক্ষারী ব্রাহ্মণ, থাকি বনেতে।
পঞ্চ কন্যে বাঁধা ছিল, মুক্ত কেন করলে বল।
আমার সাধন ভঙ্গ হলো, মরি দুঃখেতে ॥

রাজা—কি ভিক্ষা করিবেন মুনি, তাই দেব তোমায় এখনি।

(বিশ্বামিত্র—কলি)

দেখি তুমি কেমন দানী পারবে কি দিতে।
তিন সত্য করলে পরে, তবে বলি প্রকাশ কোরে।

রাজা—সত্য করি বারে বারে, তোমার সাক্ষাতে ॥

বিশ্বামিত্র—রাজা গো, কি করলে কার্য, থাকতে পারবে ধরে ধৈর্য,
ধনরত্ন সমেত রাজ্য হবে গো দিতে ॥

রাজা—হায় ! আমি কি করিলাম, আমার বিধাতা হইল বাম,
না বুঝে আপনার মনে, সত্য আমি করলাম কেনে,
এখন আমার উপায় কিবা হবে ॥
না দিই যদি ধর্ম যাবে, জগতে অখ্যাতি রবে,
দিলে পরে জীবন কি রহিবে ॥

বিশ্বামিত্র—ভাবছো কি হে মহারাজন, তোমায় দানী কয় সর্বজন,
ধর্ম উপার্জন করিতে গেলে।
ধর্মেতে যদি থাকে মন, ছাড়তে হবে রাজ্যধন
সত্য রাখলে যাবে স্বর্গে চলে ॥
তুমি না দাও যদি ফিরে যাই, শুন হরিশ্চন্দ্র রায়।

রাজা—যা করেন এখন ভগবান, রাজ্যধন সহ করিলাম দান,
যাতে আমার থাকে গো মান, হবে করিতে ॥

বিশ্বমিত্র—দাও গো দানের দক্ষিণা, চায় সপ্ত কোটি সোনা,
না দিলে শুদ্ধ হবে না, পারবো না নিতে ॥

রাজা—ভাণ্ডারেতে স্বর্ণ আছে এনে দিই গো তোমার কাছে।

বিশ্বমিত্র—ভাণ্ডারটা কি বাদ পড়েছে দানের সময়েতে।

যত রত্ন ভাণ্ডারেতে অধিকার কী তোমার তাতে।
চলে যাও হে রাজ্য হতে পাবে না থাকতে ॥

রাজা—ঋষিরাজ, আজ একটু অনুমতি করুন, আমি রাণীকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি—কি করা উচিত—

বিশ্বমিত্র—আচ্ছা, এস।

রাজা—শুন শুন মহারাণী, এল বিশ্বামিত্র মুনি।
রাজ্যধন সব দিয়েছেন তিনি দিলাম দানেতে ॥

রাণী—হায় হে, রাজা, কি করিলে রাজ্যধন সর্বস্ব দিলে,
এ কর্ম কেন করিলে, ভাবলে না চিত্তে।

(রাজার মাতান)

উপায় নাই, উপায় নাই—দানের দক্ষিণা চাই হে—(ঐ)
সপ্তকোটি সোনা চাই হে দানের দক্ষিণা—
না দিই যদি বিশ্বামিত্র দান গ্রহণ করবে না,
কি করিব, কোথায় যাব ভেবে নাই পাই—
বল বল, ওহে রাণী, কি হবে উপায়।

রাণী—চল, রাজা, দুজনাতে মুনির কাছে যাই।
আমাদিগকে নিয়ে যদি মুনি খালাস দেয়,

রুহিদাস—ওগো, বাবা, ভাবছো কেনে ধরিগে মুনির চরণে,
বলে কয়ে মুনির ঋণে খালাস পাই যাতে।
ওগো মুনি, আমায় নিয়ে চলগো তোমার আলয়ে,
পিতা-মাতা মুক্তি দিয়ে হবে যাইতে।
তোমার তপোবনে থাকিব কোষাকুষি মাজিব
চিরজীবন আমি তোমার দাসত্ব করিব।
তোমার পুজার সময় হলে, ফুল তুলে আনিব,
এ নিবেদন করি মুনি, ধরি গো চরণ,
একবার চেয়ে দেখ, আমার পিতার বদন পানে,
আমার পিতামাতায় খালাস দাও—ওগো মুনি মহাশয়।

বিশ্বামিত্র—দাও গো দানের দক্ষিণা, চাই সপ্তকোটী সোনা
না করিয়া বিবেচনা—কেন চাও নিতে।

রাজা—একটু সময় দিতে হবে, সাত দিন পরে সোনা পাবে।

বিশ্বামিত্র—রাজ্য ছেড়ে যাইতে হবে আজ তিন জনাতে।

রাজা—কোন দেশেতে করব গমন, কোথায় থাকব এখন
মুনিরাজ হে ধরি চরণ, হবে রাখিতে ॥

বিশ্বামিত্র—যাওহে, রাজা, শিবের কাশী যেখানেতে বারাণসী,
আমি তো রাজকার্য করি এই অযোধ্যাতে ॥

(রাণীর গান)

ওগো চল চল রাজন, তেজি রাজ্যধন বিজন কাননে যাব,
বনফল এনে খাইব তিন জনে ধরম তো না ছাড়িব।

রোহিতাশ্ব—ওগো, ভাবছ কেন নিতে, গাছের ও তলাতে সুখেতে করিবো শয়ন।

রাণী—বাছা, দেখে রে তোর মুখ, ফেটে যায়রে বুক
রবে না, যাবে না মোর জীবন !

(রাণীর বক্তৃতা)

মহারাজ, এইতো আমারা কাশীধামে এসেছি। দেখা যায় বাবা বিশ্বনাথের মন্দির। —ঐ

রাজা—বল বল ওহে, রাণী, কি হবে উপায়।
কোথায় গিয়ে স্বর্ণ পাব বল গো আমায়।
দানের দক্ষিণা আমি দিব কি প্রকারে।
মুনি যখন আসবে দ্বারে, কি বলিব তারে ॥

রাণী—ভেবনা, ভেবনা, রাজা, বলি হে তোমারে
ঋণ-পরিশোধ আজি দেব আমি করে।
কোথায় দীনবন্ধু হরি, একবার এস তুমি,
বিপদে পড়েছি তরাও আমার প্রাণের স্বামী।
দেখা দাও, দেখা দাও, কোথায় দীনবন্ধু হরি, দেখা দাও দাও।

বিশ্বামিত্র—কোথা হরিশ্চন্দ্র, দানের দক্ষিণা সপ্তকোটী সোনা দাও।

রাণী—শুন শুন ওহে রাজন, বিলম্ব আর কিসের কারণ
মুনি যখন এলেন এখানে।
ওহো আমি মরি মরি, তোমার বদন দেখিতে নারি
আর বুঝি বাঁচিনা গো পরাণে ॥

তোমারে বলি ঋষিরাজ হে বিক্রয় কর মোরে।
দানের দক্ষিণা পাবে ঋষিরাজ আজ সন্তোষ পাবে
চলে যাবে অযোধ্যা নগরে॥

রাজা—কোন পরাণে পরাণ ধরে, রাণী তোমায় বিক্রয় করে
মুনির ঋণে আমি খালাস হবো।
তুমি যাবে চলে রুহিদাসে লয়ে কোলে
হায়, তখন আমি কি করিব॥
কে আছো বারাণসীতে এসো গো দাসী কিনিতে
বাজারে বেচিব এ রমণী।
এ দাসী যে কিনিবে চার কোটি সোনা দিবে।
বেচবো তবে, এইতো মোর বাণী॥
রাণী বেচিব, ঋষি ঋণে খালাস হবো॥

ব্রাহ্মণ—কে দাসী বিক্রয় করিবে? আমার একটি দাসীর দরকার।
একটি দাসীর দরকার আছে, বলে জানাই তোমার কাছে।
সত্য বলছি নয়কো মিছে। এলাম কিনতে…
তুমি দাসী বিক্রয় করবে? দাসীর মূল্য কি নিবে?

রাজা—দাম নেব চার কোটী সোনা, নাহি জানি প্রবঞ্চনা,
করেছি আমি কল্পনা, রাণী বেচিতে।

ব্রাহ্মণ—দাসী এই নাও, দাও তোমার দাম, এখন চলো।

(রাণীর ভাটিয়ালী)

এই নাও রত্নধন, তবে আমি যাইহে, রাজন, জনমের মতন।
কপালেতে আর কি আছে কে বলে এখন॥
বিদায় মাগি তব কাছে, আমার মত আর কে আছে,
পরাণ কাঁদিছে।
বলতে আমার বুক ফাটছে গো কি করি এখন॥

(রাজার পয়ার)

আগেতে না বুঝেছিলাম, দান করিয়ে ঋণী হলাম,
হায়, কি করিলাম।
শৈব্যারাণী হারাইলাম গো, বুঝি যাবে জীবন॥

রোহিতাশ্বের বক্তৃতা

মা, মা আমি কোথায় আমাকে ফেলে কোথায় যাবি, মা ?
আমি তোর সঙ্গে যাব।

(একাকী গান)

কোথায় যাবে গো জননী, আমায় পথের মাঝারে ফেলে।
কেন নির্দয় হয়ে, কঠিন হৃদয়ে, আমায় ভাসায়ে দিলে জলে॥
যখন আমার ক্ষুধা পাবে, মুখ চেয়ে কে খেতে দেবে।
ব্যথার ব্যথী আর কে হবে, কেন আমায় কাঁদালে।

(রাণীর কলি)

প্রাণের বাছায় ছেড়ে যাব গো হারাব জীবন॥

(মাতান—ত্রিপদী)

কেমন করে যাব হায় ছেড়ে আমার প্রাণের বাছায়,
ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, প্রাণের বাছায় সঙ্গে করি,
তোমার বাড়ী যাইব এখন।
অনুমতি পেলে পরে বলি আমি বিনয় করে
দুজনাতে করে আজ গমন॥

(ব্রাহ্মণের ত্রিপদী)

তোমার কথায় মরি ভেবে, দুজনাকে কে খেতে দেবে
ছেলের আশা ছাড় গো, দাসী।
সোনা দিয়ে নিলাম কিনে আমি তো এতো জানিনে
গলগ্রহ হবে ছেলে আসি॥
রাণী—পুজার যোগাড় করে দিবে ঠাকুর তোমার ফুল তুলিবে
আমার যাদুমণি।
পায়ে ধরি কথা রাখ, নারীহত্যা করো নাকো
ছেলের শোকে হারাব পরাণে॥
ব্রাহ্মণ—চল, দাসী, চল তবে যদি থাকতে না পারিবে
স্থান পাবে গো আমার বাড়ীতে।
তোমার খাবার পুত্রে দিবে না খেয়ে কেমনে রবে
না পারিবে গৃহকাজ করিতে॥

তোমার পুত্র ফুল তুলিবে তার বদলে খাবার পাবে
চল তবে দেরী আর করো না।
পূজার সময় বহে গেল চল চল, দাসী, চল
আর বিলম্ব এখানে সহে না॥

রাণী—তবে এখন চল যাই, যাতে থাকে ধর্ম বজায়
ওগো মাতা, বসুমতি, কাতরে কাঁদিছে সতী রেখো মোর পতি।
আমার যেন থাকে ধর্মে মতি হে, থাকি আজীবন॥

রোহিতাশ্ব—মা, বাবা কি আমাদের সঙ্গে যাবে না?
আমরা যাব দুজনাতে, পিতা রবে কার কাছেতে যাবে না সাথে।
পিতার কথা নাই মুখেতে গো ঝরে দু'নয়ন॥

বিশ্বামিত্র—আরে দুর্মতি হরিশ্চন্দ্র, তুই স্ত্রীপুত্রের মায়ায় ধর্ম বিসর্জন দিবি।
কই, তোর সাত কোটি সোনা?

রাজা—ক্ষমা করো, ঋষিরাজ, দানের দক্ষিণা তো দিব আজ,
কে আছ নগরবাসী, দেখ গো আসিয়ে।
নফর কিনে নাও আজ তিন কোটি সোনা দিয়ে॥
তিন কোটি সোনা দিয়ে কিনে নাও গো দাস।
যখনই যে করবে আজ্ঞা করবো বার মাস॥

কালী হাড়ী—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার একটি নফরের দরকার আছে।
আমার কাজ করতে পারবে তো?

(রাজার ত্রিপদী)

চরণে হাত না দিব, উচ্ছিষ্ট আমি না খাব,
তিন কোটি সোনা নেব আমি।
যখন যে কার্য বলিবে, এ দাস তখন তাই করিবে
মনিব যখন হলে আমার তুমি॥

কালু—আমার নাম কালু হাড়ী। তুই শূকর চরাতে পারবি তো।
এই বারাণসীর ঘাট আমার ইজারা। মড়া প্রতি ১৬ কাহন কড়ি
আদায় করতে হবে। পারবি তো?—চল।

রাজা—এত কি ছিল কপালে, আমার শেষ কালে।
হাড়ির ঘরে থাকতে হবে গো, শূকরের পালে॥

থাক্‌তে হবে শ্মশানেতে, আসবে যে মড়া ফেলিতে মড়া ঘাটেতে।
শ্মশান চণ্ডালের বেশে গো, গঙ্গার কুলে ॥
যা বলিবে তাই শুনিবো, চল তোমার বাড়ী যাব শূকর চরাব।
আমি ঋণের দায়ে খালাস হবো গো দেখুক সকলে ॥

কালু—এই নাও তোমার সোনা।

রাজা—মুনিরাজ, আমাকে মুক্তি দিন।

বিশ্বামিত্র—হরিশ্চন্দ্র, তুমি ঋণের দায়ে খালাস হও ॥

(রাণীর গান)

আজ শুনরে, বাছাধন, নিশিভোরে দেখছি স্বপন। (ওঠ বাছাধন)
আজ তুমি যেও না, বাছারে, সেই ফুলের বন ॥
দেখছি আমি স্বপনে, কে যেন কয় কানে কানে, বিজন বনে।
রোহিদাস সর্পের দংশনে গো, হারাবে জীবন ॥

(রোহিতাশ্বের গান)

কেন মাতা ভাবছো মনে, আমি যদি না যাই বনে, ফুল আহরণে।
আমায় খেতে দেবে কেন গো ভাব তাই এখন ॥

রাণী—আমি যা খাই তাই খাওয়াব, তবু আনন্দেতে রব, যেতে না দিব।
ছেড়ে দিলে হারাইয়িব গো হৃদয়-রতন ॥
তুই রে আমার কাঁচা সোনা, না দেখলে প্রাণে বাঁচবো না
হরগৌরী উপাসনা রে করে পাই এ ধন ॥
তুইরে আমার দুঃখ পাসরা, হিয়ার মাণিক নয়নতারা মায়ের কোলভরা।
হয়ে হারাবে, কাঁদে আমার মন ॥

বিশ্বামিত্র—একি, কে ফুল তুলছে, আর ডাল ভেঙ্গেছে।
আজি বনে আসিবে যে জন, নিশ্চয় করিবে তারে সর্পেতে দংশন ॥

(রোহিতাশ্বের গান)

এই তো কাননে, নানা ফুল ফুটিয়া রয়েছে গাছে।
মলয় হাওয়া পেয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে গরবেতে ফুলিতেছে ॥
যখন হইবে গো বাসি, যাইবে গো ঝরিয়া পড়িয়া যাবে।
মানবের জীবন এরূপ, যৌবন, সবই হয় তো গো মিছে ॥

(মাতান)

কোন দিন ঝরে পড়ে যাবে, ভবের খেলা ফুরাইবে॥

(ঐ পাঠ)

ওঃ, কি সাপে দংশিল, জ্বলে মোলাম, জ্বলে মোলাম।

(কলি)

আমার হায় কি হইল, বুঝি প্রাণ গেল, দেখা দাও গো, মা জননী।
আমার মরণ কালেতে, কোথা রইলে পিতে,
দেখা দাও গো, মা দুঃখিনী॥

(পাঠ)

বালক—ওগো দাসী, বনে ফুল তুলতে গিয়ে তোমার ছেলের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছে।

(রাণীর গান)

হৃদয়ের নিধি আমার কেন তুই নিলি রে।
কেন তুই নিলি বিধি, কেন তুই নিলি রে॥
রাজ্যধন সব নিলি কেড়ে, পাঠাইলি দাসী কোরে,
তবু প্রাণে শান্তি দিলি না॥
শোকেতে দারুণ বিধি আমার, হৃদয়ের ধন নিলি রে॥
ছিলাম রাজার রাজরাণী, হলাম পথের কাঙ্গালিনী,
তবু প্রাণে শান্তি দিলি না।
রাজ্যহারা, পতিহারা—আজ পুত্রহারা করিলি রে॥
উঠরে যাদুমণি, শৈব্যার হৃদয়মণি, কাঁদিছে তোর মা দুঃখিনীরে।
থেকোনা ঘুমায়ে ডাক মা বলিয়ে রে॥
মনে যে আশা ছিল, সে আশা ফুরাইল,
জন্মের মত বিদায় নিলি রে।
হৃদয়ের মাঝে ওকে শক্তিশেল হানিলি রে॥

ব্রাহ্মণ—চুপ্‌, চুপ্‌, অমন কোরে কাঁদিস্ না। গৃহস্থের বাড়ীর অমঙ্গল হবে।

(রাণীর গান)

বড় দুঃখে সে পড়ে, পরের ঘরে বাস করে মলে পরে কাঁদিতে নাই পাই।
অভাগিনীর বুকে দুঃখে আগুন কে জ্বালিলি রে॥

ব্রাহ্মণ—এখন চুপ কোরে থাক, রাত্রি হলে বারাণসীর জলে ফেলে দিয়ে আসবি।

(রাণীর গান)

বনে যার পুত্র মরে, অন্যে কে তায় জান্‌তে পারে,
পুত্রশোকে পাঁজর ভেঙ্গে যায়।
জনমের মত বিধি, দুঃখিনী করিলি রে॥

ব্রাহ্মণ—যা, এইবার রাত্রি হয়েছে, ছেলেটাকে বেশ কোরে কাপড়ে জড়িয়ে, আঘাটে ফেলে দিয়ে আয় গে, যেন ঘাটোয়াল দেখে না। তাহলে বিপদ হবে।

(রাণীর গান)

আর জ্বালা সয় না প্রাণে, বাঁচি কেমনে।
মরা ছেলে কোলে নিয়ে গো এলাম শ্মশানে॥
ঘরের বাহির নাহি হতাম, দাসীদের সঙ্গে রহিতাম, আনন্দ পেতাম।
কত রকম সুখী হতাম গো, যখন যা মনে॥

রাজা—নীরব নির্জন রজনী, কে কাঁদিছে কার রমণী, দুঃখের কাহিনী।
বামা কণ্ঠের মতন ধ্বনি রে কে শ্মশানে॥

(ঐ মাতান)

কেন শ্মশানেতে কাঁদিছে, আমার বুকে বাজিছে॥
কত গেল কত এলো এই যে শ্মশানে।
হৃদয় আমার কাঁদেনি গো কারও কান্না শুনে॥
যাই যাই আমি দেখে আসি কাহার রমণী।
কে হারা হয়েছে আজ হৃদয়-রমণী॥
কে গো তুমি এখানেতে কাঁদ কি কারণে।
একাকিনী দেখছি তোমার কিছু ভয় নাই মনে॥
একা কেন এসেছো, শ্মশানেতে কাঁদিছো।

রাণী—মরেছে গো আমার ছেলে, এই দেখ রয়েছে কোলে, ভাসাব জলে,
একাকিনী এলাম চলে গো আমি এখানে॥

(ঐ মাতান)

আমার কেহ নাই একাকিনী এলাম হেথায়।

রাজা—মড়া নিয়ে বারাণসী ঘাটে যে আসিবে।
যোল কাহন কড়ি তারে গুণে দিতে হবে ॥
রাণী—দীন দুঃখিনী কাঙ্গালিনী কড়ি কোথায় পাবো।
চণ্ডালের হাতেতে বুঝি, জীবন হারাব।
সর্বস্ব গিয়েছে আমার, আর তো কিছু নাই,
ধর্ম তুমি সতী-ধর্ম রেখ হে বজায় ॥

(ঐ মাতান)

আমার কেহ নাই, কেহ নাই, একাকিনী এলাম হেথায় ॥

(ঐ কলি)

আজ আমায় রাখ গোবিন্দ, কোথায় রাজা হরিশ্চন্দ্র
কপাল হয় মন্দ।
দেখ, তোমার রুহি নন্দন গো এলো শ্মশানে ॥

রাজা—অ্যাঁ, অ্যাঁ, কে তুমি? শৈব্যা! শৈব্যা! এই দেখ আমি সেই হরিশ্চন্দ্র। চিনতে পারছো?

রাণী—কোলে আছে মরা ছেলে, এত কি ছিল কপালে, ঘাটোয়াল বলে।
কটু কথায় জীবন জ্বলে গো, যাব কোনখানে ॥
রাজা—ভুলে কি গিয়েছো, বাজারে বেচেছি তোমায়।

(রাজার পয়ার)

চিন্তে পার নাই, ধনি, আমি হরিশ্চন্দ্র।
শ্মশান চণ্ডালের বেশে গো কপাল আমার মন্দ ॥
বিশ্বামিত্রে দান দিয়ে রাজ্যহারা হলাম।
কপাল দোষে আজি আমি শ্মশানেতে এলাম ॥
ভুলে কি গিয়েছো, বাজারে বেচেছি তোমায়।

রাণী—রাজন, রাজন, দেখ দেখ তোমার রহিদাসের কি হয়েছে।
রাজা—এত কি ছিল কপালে, ওরে বিধি কি করিলে, মোদের শেষকালে।
এস, আমরা আগুন জ্বেলে মরি তিন জনে ॥
বাঁচায় বল কি ফল আছে, যে দেশে রহিদাস গেছে,
যাব তার কাছে—
বক্ষ আমার ফেটে যেছে গো সহি কেমনে ॥

বিশ্বামিত্র—মরো না মরো না, রাজা, এসেছি হে আমি।
প্রাণের রহিদাসে এখন বাঁচাইয়ে নাও তুমি॥
ওই দেখ দেবতাগণ সকলে এসেছে।
তোমার ধর্মের তরে তারা বন্দী যে রহিছে॥
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রাহ্মণ হোয়ে এলো বারাণসী।
চারি কোটী সোনা দিয়ে যে কিনেছিল দাসী।
যার ঘরেতে তুমি, রাজন, শূকর চরালে।
কুবের এসে হরি হয়ে পরীক্ষা করিলে॥
বিশ্বামিত্র—রাজ্যধন সব নিয়েছিলাম ফেরৎ দিলাম আমি।
রহিদাসে বাঁচায়ে নিয়ে যাও অযোধ্যা ভূমি॥
দেরী আর করো না, তোমার সিংহাসন শূন্য আছে।
(রাজার কলি)
ধরি, ঋষি, তোমার চরণ, সন্তোষ যদি হয়েছে মন,
বাঁচাও গো নন্দনে।
এখন আমি প্রণাম করি গো, যত দেবগণে॥
বিশ্বামিত্র—নিজ রাজ্যে যাও, হে রাজন, ভোগ কর সর্বস্ব ধন লইয়ে নন্দন।
হরি হরি বলুন সর্বজন, ধর্মের কারণে॥
হরিচরণ বিরচিল, হরিশ্চন্দ্র দেশে গেল, আনন্দ হল। —মুর্শিদাবাদ

সীতার বনবাস

পুজিব যতনে, মাগো, এস হৃদয় মাঝারে।
বীণাপাণি বাজাও বীণে, বসিয়ে মধুর স্বরে॥
সাজায়ে সাজি রেখেছি, যতনে কুসুমে পুজিব।
তোমারি নামে, তোমারি গানে, নেচে নেচে গাহিব॥
আমি রচনা করিব, কবিতা মালা।
নিজগুণে দয়া করে, আমার হৃদয় অন্ধকারে জ্বালাও, মা, আলা
মনেরই বাসনা আমার, পুর্ণ করে দাও গো জননী।
বড় আশায় বসে আছি, মা, পাবো বলে চরণ দু'খানি॥

চরণে মায়ের, নূপুর বাজে।
ঘরণী তুমি, দেখিতে বাঞ্ছা
ডাকিতে জানি না বলে, দয়া কি হবে না।
সারা জীবন বসে আছি, চরণ কি পাব না॥

পালা

অযোধ্যাতে রাম রাজা হয়, প্রজাগণ সকলে করে জয় জয়।
সীতা-সঙ্গে নানারঙ্গে, সুখেতে রাম দিন কাটায়॥
জানকী কহিছে, শ্রীরামের কাছে, যখন ছিলাম লঙ্কাতে।
লঙ্কার রাবণ, আমারে তখন রাখে অশোক বনেতে॥
আমি কাঁদিতাম, আর বলিতাম, যদি দেশে যাই।
যদি, প্রভু, দয়া করে, আমারে উদ্ধার করে, গিয়ে অযোধ্যায়॥
এমনি মতন, অশোক কানন, প্রাণনাথে বলিয়ে করা চায়।
সীতার কথায়, প্রভু তাই, অশোক কানন অযোধ্যায় বানায়॥
রামসীতা দুই জনেতে অশোক কাননেতে যাই।
আনন্দেতে সীতার সঙ্গে, নিরানন্দ তাহাদের নাই॥
বিধির ঘটনা কে খণ্ডাইতে পারে।
স্নান করিতে গেল শ্রীরাম সরযূর নীরে॥

রাত্রিকালে পিত্রালয়ে রজকিনী যায় চলে।
ফিরে দিতে এসে রজক তাহার শ্বশুরে বলে॥
রাবণের ঘরে, সীতাদেবী ছিল, রামচন্দ্র আনিল তায়।
মনে কি ভেবেছো, তাই দিতে এসেছো, আমি তো নেব না হায়॥
ওগো, সেই কথা শুনে শ্রীরাম ভবনেতে যায়।
অযোধ্যাতে প্রজাগণে ও কথা জনে জনে বলিছে সবায়॥
এখানেতে সখীর সাথে, সীতাদেবী কত কথা কয়।
বল সীতা লঙ্কার রাবণ, বটে কেমন, কি মুরতি হয়॥
নয়নে দেখি নাই তারে, অনেক দিন লঙ্কাতে ছিলাম।
রাবণের রথ হইতে, জলেতে ছায়া দেখিলাম॥

দশাননের দশটি বদন দেখিব নয়নে।
অঙ্কিত করিয়া ধনি, দেখাও গো এক্ষণে॥

ধরাতে আঁকিল ছবি, দেখিয়া সবে ঘরে যায়।
পাতিয়া নেত্রের বসন শয়ন করিল ধরায়॥
রাবণের ছবি, মূছা নাই হোল, ঘুমে হল অচেতন।
এমন সময়ে, স্নান করিয়ে, শ্রীরামের আগমন॥
এসে, দেখে রাম সীতাদেবী, শয়নে আছে।
শ্রীরাম ভাবিছে॥
সীতা কুলকলঙ্কিনী, অযোধ্যাতে সকলেতে গায়।
রাখবো না সীতারে আজি, দিব বলে বিদায় করা চায়॥
ফিরে এসে লক্ষ্মণেরে বলে শ্রীরাম ধীরে ধীরে।
ভাইরে লক্ষ্মণ, শুন এখন, রাখবো না আর সীতা ঘরে॥
যতন করে ভুজঙ্গিনী ঘরেতে রাখিলাম।
বনবাসে দিব সীতায়, চরিত্র বুঝিলাম॥

উহু, আমি মরি মরি, বাঁচি না আর পরাণে।
মনের কথা প্রাণের ব্যথা, তুই বিনে আর কে জানে॥
যারে যারে ভাই বিলম্বে কার্য নাই রাখিয়া সীতারে।
সীতা কলঙ্কিনী, কাল ভুজঙ্গিনী দংশিল আমারে॥
আমি, চিরদিন তোমার আজ্ঞা, করেছি পালন।
তোমার আজ্ঞা শিরে ধরি, লয়ে যাব তোমার স্ত্রী নিবিড় কানন॥
এই খানেতে বোলান থামি, আমরা আজ সাঙ্গ করে যাই।
সাটুই গ্রামেতে বাড়ী, বসত করি, আমরা গো সবাই॥
রাম কানু দলপতি, হাবলচন্দ্র সহকারী।
ক্ষুদিরাম সে বাজাছে ঢোল, ভোলানাথ দিচ্ছে জুড়ি॥
পঞ্চুরের বাতিক ভারী, দলে সে মিশে না।
পোড়াডাঙ্গার হরিচরণ, গান করে রচনা॥

লক্ষ্মণ, কি বলিলে, কি শুনালে, ওহে রাম গুণমণি।
বিনা মেঘে আমার মাথায় পড়িল হে অশনি॥
এত যদি ছিল মনে, সীতা উদ্ধার করলে কেনে।
কি দোষে, রাম, দেবে বনে, সেই কথা বল শুনি॥
যার লাগি লঙ্কাতে গেলাম, শক্তিশেল বুকে বিন্ধিলাম।
যার লাগি সাগর বাঁধিলাম, গলায় জড়াই কালফণী॥
বনে দেবে এমন সীতে, বল শ্রীরাম কি দোষেতে।
আমি নয়নের জলেতে, ভাসবো দিবা-যামিনী॥

(পয়ার)

দাদা, শুনগো দুঃখের কথা, বলিতে প্রাণে পাই ব্যথা।
আমার চোদ্দ-বৎসর ঘুম নাই; চৌদ্দ-বৎসর নাহি খাই।
লঙ্কাপুরে যুদ্ধ করে বধিলাম রাবণ।
করি সীতার তরে পাথরে সাগর বন্ধন॥
অকালে বোধন কোরে, দেবী পুজে ছিলে।
ওহ কমল আঁখি, তবে তুমি জানকীরে পেলে॥

(মাতান)

তোমার মনে নাই নাই, আমি বনে বনে কেঁদে বেড়াই।
রাম—শুন শুন ভাইরে, লক্ষ্মণ, সীতা বনে দাও রে এখন॥
করিব আমি বিসর্জন, জনকের ঐ নন্দিনী॥
লক্ষ্মণ—তুমি একথা আর বলো না, সহিতে আর পারি না।
রাম, তোমার পড়ে না মনে, সীতাহরণের দিনে,
বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াই॥
রাম, তুমি সীতার শোকে, তরুলতায় ডেকে ডেকে
বলেছিলে সীতাদেবী নাই॥
শুনরে রাম রঘুমণি, জটায়ুর মুখেতে শুনি, সীতা নিল লঙ্কার রাবণ॥
সেই সীতা উদ্ধার তরে মিতা বলিলে বানরে,
লঙ্কা পারে হনুর গমন॥

(মাতান)

কত কষ্ট পেয়েছো, সেই সীতায় বনে দিচ্ছো॥

রাম—শুনবো না আর ঐ সব কথা, আর দিও না প্রাণে ব্যথা।
আমার সব রয়েছে হৃদে গাঁথা, ওরে, ভাই, রতনমণি ॥

(ত্রিপদী)

আমি রাখবো না সীতা ঘরে, বলেছি তোরে বারে বারে।
কাননেতে গিয়াছিলাম, মুনির তপোবনে রইলাম,
সীতাদেবী মুনি কন্যা সনে ॥
ক্ষুধা যখন পেতো ধনি, লইয়ে মুনিদের কামিনী
ফল কুড়াইয়া খাইতো বিপিনে ॥
মুনিরা যজ্ঞ করিতো, আতপ তণ্ডুল ফেলে দিতো,
হংসগণে খেতো আবার তাই।
হংস তাড়াইয়া দিতো, মুনিকন্যা সঙ্গে যেতো
বলতো যদি যাই গো অযোধ্যায় ॥
তোদের ডাল অন্ন খাওয়াইব অযোধ্যাতে যখন যাব।
মুনিকন্যা দেখিবার ছলে।
দিয়ে এস বনস্থলে, তোরে সন্ধি দিলাম বোলে।
যাও রে এখন, ভাই রে লক্ষ্মণ, চলে ॥
আমার কথা শুন, ভাই, সীতারে রেখে কার্য নাই ॥

লক্ষ্মণ—হায়, আমি কি করিব, আমি সোনার সীতায় বনে দিব ॥
বলে গেলে কমল আঁখি, এখন আমি করিব কি,
সীতার কাছে যেতে হায়।
রাম অনুমতি দিল আমাকে তাই পাঠাইল,
বলি গিয়ে, যেখানে সীতায় ॥
শুন, ওগো সীতা সতী, কহিলেন রাম রঘুপতি
আসিলাম গো তাঁহারি আজ্ঞায়।
বনশোভা দেখিবারে, লইয়ে যাব সঙ্গে করে,
কোথায় সীতা এস এই সময় ॥

(সীতা—কলি)

আজ কেন এখানে এলে দেবর লক্ষ্মণ।
এতকালে সীতা বলে পড়েছে কি মন ॥

সীতা—দেবর, অনেক দিন আস নাই। আজ কি মনে করে এলে?

(কলি)

এলে অনেক দিনের পরে, দেখিতে তুমি আমারে,
সর্বদায় থাক অন্দরে, কোন দিন তো আসনি ॥

লক্ষ্মণ—মুনিকন্যা দেখাবার তরে, রাম আমারে আজ্ঞা করে।
এস তুমি রথ পরে, ওহে জনক নন্দিনী ॥

সীতা—আজ কেন ওহে, দেবর, অমঙ্গল হেরি।
আমার বাম চক্ষু নৃত্য করে, আতঙ্কে আমি মরি বুঝিতে নারি ॥
শিবা ডাকে দক্ষিণ মুখে, আবার বুঝি পড়িব পাকে,
মনে হয় হারাব রামকে, চক্ষেতে ঝরে বারি ॥

লক্ষ্মণ—দুঃখ করো কেন, সীতে, এই আমরা এলাম বনেতে।
নাম এইবার রথ হইতে, ওগো রামের সুন্দরী, আজ ত্বরা করি ॥

সীতা—বুঝেছি দেবর লক্ষ্মণ বনবাসে দিলে হে।
অযোধ্যাপুরে কথা বলে ছিলে ছলে হে ॥
মুনিকন্যার সাথে, এলাম দেখা করিতে, দেবর তোমার
রথে চড়ে হায়।
আমারে বনে দিতে রাম তোমায় পাঠালে হে ॥

লক্ষ্মণ—হায়রে, আমি কি করিলাম, মা জানকী বনে দিলাম ॥

বাল্মীকি—এস গো, জনক-নন্দিনী, সাঙ্গ হবে রামায়ণ।
কেঁদ না কেঁদ না, সীতা, করি তোমায় নিবারণ ॥
আমার জনম সার্থক হবে, আবার তুমি রামকে পাবে,
আবার অযোধ্যাতে যাবে, রামচন্দ্র আসবে যখন ॥

রাম—ওরে হায়, আমি কি করিলাম যাইব কোথায়।
জীবনের জীবন রে আমার বনে দিলাম প্রাণের সীতায়
পরের কথায় ॥
হায়রে, আমি কোথা যাব, কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াব,
প্রাণ-প্রতিমা কোথায় পাবো, কার কাছেতে ব্যথা জানাই।
করি কি উপায় ॥

বশিষ্ঠ—বাছা, রাম, তুমি কাঁদছো! অশ্বমেধ যজ্ঞ কর, প্রাণে শান্তি পাবে।

রাম—শুন রে, ভাই, প্রাণের লক্ষ্মণ, কর রে যজ্ঞের আয়োজন
পৃথিবী কর নিমন্ত্রণ।
সুলক্ষণ ঘোড়া সে চায়, বলি তোমার ঠাঁই ॥

(পয়ার)

সুলক্ষণ আন হয়, যাতে যজ্ঞ পুর্ণ হয়,
দেশে দেশে সেই ঘোড়া ভ্রমিয়া বেড়াইবে।
ভরত শত্রুঘ্ন ঘোড়া রাখিবারে যাবে ॥
আপন ইচ্ছায় ঘোড়া পৃথিবী ভ্রমিবে।
যখন আবার সেই ঘোড়া অযোধ্যায় আসিবে।
যজ্ঞপুর্ণ হইবে, পুর্ণ আহুতি দিতে হবে ॥

লক্ষ্মণ—তোমার আজ্ঞা শিরে ধরি, যজ্ঞের ঘোড়া দিলাম ছাড়ি।
ঘোড়ার সঙ্গেতে ফিরি, আমরা তিনটি ভাই, যাইবে যেথায় ॥

(লবকুশ—গীত)

ও ভাই কুশি, দেখরে আসি, কার ঘোড়া তপোবনে।
ঘোড়ার ভালে লিখা আছে, দেখিতে পাই নয়নে ॥
বীরের বেটা যে বীর হবে, যজ্ঞের অশ্ব সেই ধরিবে,
এস, ঘোড়া ধরি তবে, আমরা যে বীর দুজনে ॥
ঘোড়ার ভালে লেখা আছে, রামচন্দ্র যজ্ঞ করিছে !
যজ্ঞেরই ঘোড়া ছেড়েছে, ভ্রমিছে আপন মনে ॥
ধরিলাম এই যজ্ঞের ঘোড়া, কিছুতেই হবে না ছাড়া,
যদি কার পাই গো বাধা, বধিব আজ জীবনে ॥

লক্ষ্মণ—কই অশ্ব কোথা গেল ? এই বালক দুটী আবার কে ?

(ঐ গীত)

কে তোরা দুজনে, বাছা, মুনির তপোবনেতে।
তোদিকে দেখে নয়নে, রামকে পড়ে মনেতে ॥
অমন শ্যামল বরণ, মরি কি অপূর্ব গড়ন,
ঠিক যেনরে চাঁদের কিরণ, যুগল চাঁদ ধরণীতে ॥
(কলি) তোরাই কি ঘোড়া ধরেছিস, সাহসে ঘোড়া বেঁধেছিস,
এখানেতে তোরা আছিস, কে তোদের হয় পিতে ॥

(লবকুশ)

আমরা তো ঘোড়া ধরেছি, তপোবনে আমরা আছি।

(লক্ষ্মণ—কলি)

যজ্ঞের ঘোড়া দাওরে ছেড়ে, অকারণ রেখেছো ধরে।

ঘোড়ার জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াই বনেতে॥

(লবকুশ—মাতান)

বিনা যুদ্ধ দিয় না, নইলে ঘোড়া পাবে না।

বীরের ব্যাটা বীর আমরা লবকুশ নাম ধরি॥

সেই জন্যে যজ্ঞের ঘোড়া রেখেছি হে ধরি॥

ঘোড়ার কপালে দেখ জয়পত্র আছে।

সেই জন্যেতে যজ্ঞের ঘোড়া ধরা যে হয়েছে।

বিনা যুদ্ধে দিব না।

(লক্ষ্মণ—কলি)

জয় করিলাম ইন্দ্রজিতে, লক্ষ্মণ আমি ত্রিজগতে,

কত বীর মোল মোর হাতেতে রাষ্ট্র আছে জগতে॥

(লবকুশ)

বীরপনা আজি ছাড় ছাড় ধর ধর ধনুক ধর।

যুদ্ধেতে পরাস্ত কর আজি তুমি রণেতে॥

(লক্ষ্মণ—কলি)

দেখে আমার প্রাণ বিদরে, মারবো তোদের কেমন করে।

হাতের ধনুক খসে পড়ে, যুদ্ধ করি কি মতে॥

লবকুশ—তা হলে, তোর ভয় হোয়েছে, ওরে, কুশি, ধর ধনুক।

লক্ষ্মণ—তবে আয়, তোদের মিটাই যুদ্ধের সাধ।

(লবকুশ—কলি)

যেমন এলো তেমনি মলো, দর্প করে এসেছিলো।

আমাদের কে পারবে বল, জয় করি।

(রাম—পয়ার)

কে মুনির তপোবনে, রয়েছো তোমরা দুইজনে।

তোমরা কেন এ বনে, বল বল আমার স্থানে॥

শুনিতে বাসনা আমার হোলো।

তোমরা কি ঘোড়া ধরেছো, আমার ভাই লক্ষ্মণে মেরেছো,

বল বল তাই আমারে বল ॥

অমন শ্যামল বরণ, আ মরি কি রূপের গড়ন

দেখে আমার পরাণ বিদরে।

দেখে তোদের মুখছবি, হৃদ্ আকাশে শশীরবি,

সীতা দেবীর বদন যে মনে পড়ে।

কি দেখিলাম বনেতে, সীতা পড়ে মনেতে ॥

(রাম—কলি)

আমি কি হেরিলাম এসে বিজন বনে।

বল বল বাছা তোমরা কে গো, বনে দুজনে, এ তপোবনে ॥

তোমাদের নয়নে হেরে, প্রাণ আমার কেমন করে।

আমার সেই প্রাণের সীতারে পড়িছে মনে,

তোদের দেখে নয়নে ॥

তোদের রূপে ভুবন ভুলে, কেন থাকিস্ বনস্থলে,

বাসনা হতেছে কোলে করিবে আজ দুজনে, শান্তি হক প্রাণে ॥

লবকুশ—ওগো, আমরা দুই ভাই—লব কুশ।

রাম—তোরা কার ছেলে ?

(লবকুশ—কলি)

আমরা হইগো সতীর নন্দন, সবাই করে মাকে বন্দন,

যজ্ঞের ঘোড়া করি বন্ধন, রেখেছি আজ এখানে, ভাই দুইজনে ॥

রাম—দেখে তোদের চাঁদ বদন, প্রাণ যে করে কেমন কেমন।

দুঃখের কথা বলবো কি আর, ঐ যে সুরেশ্বরী হার,

তোমাদের গলাতে আজ দেখি।

এ হার ছিল সীতার গলে, তারে দিলাম বনস্থলে,

তাইতে ঝরে আমার দুইটি আঁখি ॥

যজ্ঞসূত্র তোদের গলে, সত্য কোরে দাও রে বলে,

শিশু হইয়ে এ হার পেলি কোথা।

অশ্ব হেতু হলি শত্রু, বলরে, বাবা, তোরা কাহার পুত্র,

দিও না যেন প্রাণে আজ ব্যথা।
কেঁদে কেঁদে যায় জীবন, হারালাম ধনুক ভাঙ্গা ধন।

(লবকুশ—কলি)

প্রাণের ভয়ে ছেলে পাতায়, কাজ কি আছে বেশী কথায়।
ধনুকে বাণ পুর রে, ভাই, এখনি বধিব প্রাণে, আমরা দুজনে॥

(রাম—কলি)

তোদের পিতা কি নাম ধরে, কোন দেশেতে বসত করে।
বল বল তাই আমারে, শুনিব তাই এখানে, আমি শ্রবণে॥

লব—মোদের পিতে, তোমারে হল কহিতে।
পলায়ে যাও এখান হোতে, নতুবা বধিব প্রাণে, মায়ের গুণে॥
এখন বল কে তোমার পিতে।

(রাম—মাতান)

আমার পিতা দশরথ, অযোধ্যায় করিত বসত!

(লবকুশ—পয়ার, একহারা)

এক দশরথ অজ-পুত্র আমরা জানি খবর।
ব্রহ্মহত্যা করেছিল, মরদ ভারী জবর॥
এক দশরথ নারীর কথায় পুত্র বনে দেয়।
এক দশরথ পরশুরামের ধনুক মাথায় বয়॥
তুমি কোন দশরথের ছেলে।
আমার কাছে দাওগো বলে॥

লবকুশ—ওরে কুশী, আর কথায় কাজ নাই, ধর ধনুক।
রাম—আয় তবে, তোর রণসাধ মিটাই।   (যুদ্ধ করতে করতে প্রস্থান)

(হনুমান)

ওরে কি গৌরব, ও কুশীলব দেখাস আমারে।
বাধা না দিলে আমাকে, বল কে বাঁধিতে পারে, ভব-সংসারে॥
তোরা মা জানকীর নন্দন, তাই মোরে করেছিস বন্ধন,
আমি যাঁরে করি বন্দন, সর্বক্ষণ করজোড়ে হৃদয় মাঝারে॥

সীতা—ওরে কুশীলব, একি হেরি আ মরি মরি।
কাহারে এনেছিস তোরা রে বন্ধন করি॥

কে জানে মরম-কাহিনী, মন জানে আর আমি জানি, শুন এখনি।
কুশীলব হৃদয়ের মণিরে কই প্রকাশ করি ॥

(লহর ঐ—ত্রিপদী)

আমি ছিলামরে যখন লঙ্কায়, রাবণ রাজা লয়ে যায়।
সাগর পারে হনু গেল, আমার উদ্দেশ করেছিল।
সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে করেন ছাই।
বাণ কটক জুটিয়ে ছিল, শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পড়লো।
ঔষধ আন্‌তে গন্ধমাদন যায় ॥
আমার বড় সাধের হনুমান।

(লবকুশ)

শুন মাতা কই তোমারে, অযোধ্যায় রাম যজ্ঞ করে অশ্ব দেয় ছেড়ে।
ধরেছিলাম বন-মাঝারে, আমরা বল করি।
ঘোড়া নিয়ে চারজন এলো, সকলে প্রাণে মরিল, এই হনু রহিল।
যদি ছেড়ে দিতে বল গো, তবে দিই ছাড়ি ॥

সীতা—ওরে দারুণ বিধি, ভাগ্যেতে এই ছিল রে।
জনমদুঃখিনী সীতার কপাল যে ভাঙ্গিল রে ॥
দিলে রাম বনবাসে, ছিলাম রে তাহার আশে।
বসে বসে কাঁদি সর্বদাই।
কাঁদাই মোর সার হইল, সকল আশা গেলরে।
জনম-দুঃখিনী সীতে, বুক জলে দুঃখের চিতে।
বাঁচিতে আর তো ইচ্ছা নাই ॥
হৃদয় নাথে, ও দেখিতে, চল লবকুশ চল রে।
কাজ কি মোর প্রাণে বেঁচে, যে দেশেতে প্রভু গেছে,
জীবনে বেঁচে আর কাজ নাই।
জলেতে আজ ঝাঁপ দিব, বাছা, খাইব গরলরে ॥

(বাল্মীকি—পয়ার)

কেঁদোনা মা জানকী, চাহ চাহ মেলে আঁখি।
কেঁদোনা কেঁদোনা মা জনক-নন্দিনী, বাঁচায়ে দিয়েছি
তোমার রাম রঘুমণি।

বাঁচায়ে দিয়েছি তোমার দেবর লক্ষ্মণ।
ঐ দেখ আসিতেছে শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম—এস হে এস প্রিয়ে, জনক-নন্দিনী॥
তাপিত প্রাণ করি শীতল, দেখে ও বদনখানি॥
পরের কথায় বনবাসে দিলাম, হে ধনি।
কত কষ্ট পেলে বলে, ও চাঁদবদনী॥
বিনা দোষে বনবাসে দিলাম হে আমি।
তুমি কাঁদ বনে বনে দিবা-রজনী॥
মণিহারা ফণী যেমন, থাকে তেমনি।
তোমার চিন্তায় ধনী, কাঁদি দিবারজনী॥

(মাতান)

চল চল দেশেতে যাই, বনবাসে কার্য নাই।

(রাম—পয়ার)

তেমনি ভাবে অশোক বনে, রহিব দুজন।
দুঃখের রজনী প্রভাত হইল এখন।
চল চল বীর হনুমান চল চল মহামুনি।
যজ্ঞ সাঙ্গ হবে আমার, দেখিবে এখনি॥
সকলেতে চল যাই, আমার সাধের অযোধ্যায়।
বাল্মীকি—সীতা লয়ে যাও, হে রাম, আমি যাব পাছে।
লবকুশে ল'য়ে আমি যাবো তোমার কাছে॥
তোমার জনম না হইতে আমি রচি রামায়ণ।
অযোধ্যাপুরেতে তোমায় করাব শ্রবণ॥
সীতা—ওরে বাছা, বীর হনুমান, দুঃখ কর না।
অভাগিনীর অধম লবকুশ, তাদের দোষ দিও না॥
দুঃখের দিন গত হোল সুখেরই দিন এল।
সকলেতে চাঁদ মুখেতে রাম জয় জয় বল॥
দাও গো সবে রামের জয়, নামে শমন পরাজয়।
(কলি) পোড়াডাঙ্গার হরিচরণ, এ বোলান করেছে রচন।
রামসীতা অযোধ্যায় গমন করে এখনি॥

সীতা—তোমার কোন দোষ নাই, হে রাম রঘুমণি।
সকলি কপালে করে, আমি জনম-দুঃখিনী॥ —মুর্শিদাবাদ

সীতাহরণ

কোথায় আছ, মা বিশ্বরাণি, দয়া করে এস হৃদি-আসনে।
আমি অতি মূঢ়মতি, কৃপা কর, মাগো, নিজ গুণে॥
আসার আশে আছি বসে কোলে তুলে নাও।
আঁচলে মুছায়ে মুখ, ধূলা ঝেড়ে দাও॥
দিনে দিনে দিন ফুরালো আর কবে দিবে দেখা।
মহামায়া তোর মায়াতে কুপথেতে ভ্রমি একা॥
এ ভব-ঘোরে কত দিন রাখিবি মোরে।
মায়ার বাঁধন দে না গো খুলে, বলি মাগো, করজোড়ে॥
মা বিনে সন্তানের বেদন অন্য কে জানে।
কাতরে বলে মৃত্যুঞ্জয়, দিনে দিনে দিন বয়ে যায়,
কি হবে আমার উপায়, নিদানের দিনে, আমি ভজন জানিনে

অযোধ্যাতে রাম হইবে রাজা আনন্দে মগ্ন পুরবাসিগণ।
রাম জয় রব করে প্রজা সব হুলুধ্বনি দেয় যত বামাগণে॥
কৈকেয়ী বসিয়া আছে রত্ন মন্দিরে,
মন্থরা রাণীর কাছে যায় ধীরে ধীরে॥
শুন শুন, ও গো রাণি, সব আশাতে ছাই পড়িবে।
শুনে এলাম লোকের মুখে, কাল সকালে রাম রাজা হবে॥
কৈকেয়ী রত্নহার ও দিল ওগো উপহার।
মন্থরা বলে, রাগে অঙ্গ জ্বলে, ছি ছি একি ব্যবহার॥
ওগো রামের বিমাতা তুমি জানে সকলে।
রামচন্দ্র হইলে রাজা, উচিত মত পাবে সাজা,
দুদিন পরে, দেখবি মজা, যাই আমি বলে,
ভাসাবি চোখের জলে॥

মন্থরা কয় শুন গো, রাণী, এখন তুমি আমার কথা।
ছুটি বর তুমি চেয়েছিলে, মনে কি পড়ে নাকো তা॥
সেই বর ছুটি আজি তুমি চাও রাজার কাছে।
নইলে পরে গো তুমি, পড়িবে গো পেঁচে॥

কৈকেয়ী মনের ছুঃখে বসিলেন ও ধরাসনে।
রত্নহার ও দূরে ফেলে, কাঁদিছে অঝোর নয়নে॥
কৈকেয়ীর অভিমান শুনিয়া দশরথ রাজন্।
সর্বকার্য ছাড়ি, চলে তাড়াতাড়ি, রাণীরে দিল দরশন॥
সুখের দিনেতে, রাণি, কেন কর মান।
কালকে রাম রাজা হবে, আনন্দিত প্রজা সবে,
তুমি কেন এমন ভাবে, হলে হতজ্ঞান, রাণি, ত্যজ অভিমান॥
কৈকেয়ী কয়, শুন গো রাজন্, তোমার নিকট মোর নিবেদন।
দয়া করে, আজি আমারে সেই বর ছুই দাও গো এখন॥
এক বরেতে রাজা হবে ভরত অযোধ্যায়।
শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর যেন বনে যায়॥

বিনা মেঘে বাজ পড়িল কৈকেয়ীর কথা শুনে।
অন্ধমুনির অভিসম্পাত ফলিল বুঝি এতদিনে॥
বল কোন পরাণে, শ্রীরামে বনে পাঠাইব॥
কৌশল্যা রাণীরে, আমি কেমন করে, বল দেখি বুঝাইব॥
হায় রে, দারুণ বিধি, এই ছিল তোর মনে,
কি করিব কোথায় যাব, কোথায় গিয়ে শান্তি পাব,
কেমনে রামে বলিব, তুমি যাও বনে, ও বুক বেঁধে পাষাণে॥

শ্রীরাম ও বলে, আঁখি জলে, কেন গো পিতা ভাসিছ তুমি।
দাও পদধূলি, বনে যাই চলি, তোমারই সত্য পালিব আমি॥
পিতার পদধূলি লয়ে মায়ের কাছে যায়।
বনে গমন করিব মাতা, দাও গো বিদায়॥

প্রণাম করি মায়ের পদে সীতারও নিকটে গেল।
বিদায় দাও গো, বিধুমুখী, অধোমুখ কেন বল,
পতি বিনে সীতার গতি আছে বল কোথায়।
জীবনে মরণে, ও রাঙ্গা চরণে, লয়েছি গো আমি আশ্রয় ॥

লক্ষ্মণ বলিছে তখন, শুন রঘুবর।
আমায় তুমি একা ফেলে, কোথায় বল যাচ্ছ চলে,
কেমনে যাইলে ভুলে, ওহে রঘুবর, আমি তোমারি কিঙ্কর ॥
শ্রীরাম তখন সঙ্গে লইয়ে সীতা দেবী আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
পিতৃসত্য পালিবারে বনে তখন করিল গমন।
হাহাকার করে সবে বহে অশ্রুধার।
পুত্রশোকে মৃত্যু হলো দশরথ রাজার ॥

প্রথমে রাম উপনীত, বাল্মীকির ও তপোবনে।
তিনজনে অতিথি হয়েছিল মুনির সন্নিধানে ॥
তৃতীয় দিনেতে গুহক আলয়ে গেল,
চণ্ডালের ভক্তি, দেখে জগতের পতি, মিতা বলে কোলে নিল ॥
ও রাম অবশেষে পঞ্চবটী উপনীত হয়।
করে কত পরিপাটী, বনের লতাপাতা কাটি,
বাঁধিল কুটীর দুটি, লক্ষ্মণ সেথায়, রহে তখন তিন জনায় ॥

দৈবযোগে রামের সনে, শূর্পণখার দেখা হইল।
দেখিয়ে মুরতি, অঙ্গের জ্যোতি দেখে রামে ভজিতে গেল ॥
লক্ষ্মণের নিকটে যেতে বলে ইসারায়।
ঘটা করে নয়ন ঠেরে ঘুরে ঘুরে চায় ॥
গজেন্দ্র গমনে ধনি, লক্ষ্মণেরও নিকটে যায়।
লক্ষ্মণ বলে, ও রাক্ষুসি, মায়াতে ভুলাবি আমায় ॥
এত বলি লক্ষ্মণ, ধনুক লইল হাতে।
নাক ও কান দুটি, ফেলিলেন ও কাটি, বিমুখ হয়ে এক বাণেতে ॥

মন দুঃখে শূর্পনখা ফিরে চলিল

রাবণ রাজার কাছে গিয়ে, শূর্পণখা কয় কাঁদিয়ে,
দাদা, তোমার ভগ্নি হোয়ে, হায় কি হইল,
আমার কুলমান গেল ॥
ভগ্নির কথা শুনিয়ে রাবণ, রাগে তখন হল হুতাশন।
হরিয়া সীতা লব প্রতিশোধ, প্রতিজ্ঞা আমি করিলাম এখন ॥

ক্রোধেতে মারীচের কাছে চলিল রাবণ।
মারীচ বসিয়া ছিল, করি যোগাসন ॥
শুন শুন, ওগো মারীচ, স্বর্ণমৃগ রূপ ধর।
সীতা হরণ করিব আমি, একটুকু সাহায্য কর।
উভয় সঙ্কটে মারীচ পড়িল তখন।
এইবার বুঝি, রামের হাতে হারাইতে হবে জীবন ॥
হরিণের বেশে মারিচ পঞ্চবটী যায়।
স্বর্ণমৃগ রূপ দেখিয়ে, সীতাদেবী যায় ভুলিয়ে।
রামের কাছে কহে, বিনয় করিয়ে, হরিণ দাও গো আমায় ॥
সীতা—কেন কুমতি হলো, বল্‌রে দেবর লক্ষ্মণ।
দক্ষিণ অঙ্গ নাচে, আমার মন কেন হয় উচাটন ॥
এসে সেই সোনার হরিণ, ঘটাইল আমার কুদিন,
কুমতি মোর হইল তখন।
কোথায়, হে রাম রঘুমণি, একবার দাও হে দরশন ॥
লক্ষ্মণ—ধৈর্য ধর, ওগো সতি, করি গো তোমায় মিনতি।
মিছে রোদন কর কেন সামান্য নয় সীতাপতি ॥
ভেব না ভেব না মাতা, বৈদেহি, জনক-সুতা।
কেন তুমি পাচ্ছ ব্যথা, কেন হলো কুমতি ॥
মিছে কেন চিন্তা দেবি, মৃগ লইয়া রঘুমণি
আসিবে ফিরিয়া। আর যদি মায়াবলে ধরে থাকে
ঐ মৃগরূপ, তা হোলে সুনিশ্চয় শাস্তি পাইবে তার।

মারীচ—কোথায় আছ ভাইরে লক্ষ্মণ, রক্ষা কর আমারে।
রাক্ষস কবলে বুঝি প্রাণ যায় বনমাঝারে ॥
কোথায় আছ, সীতা সতী. দেখে যাও মোর দুর্গতি,
কেন দিলে আমায় কুমতি স্বর্ণমৃগ ধরিবারে ॥

সীতা—শুনিলে, শুনিলে লক্ষ্মণ ! বিপাকে পড়িয়া রাম ডাকে ঘন ঘন,
যাও ত্বরা, রক্ষা কর প্রাণেশ্বরে আমার।

(ঐ গান)

বিলম্ব আর কর কেন, ধর ধর ধনুকবাণ, রাখ রাখ এ দুঃখীর মান।
ডাক্‌ছে তোমায় উচ্চৈঃস্বরে. লক্ষণ, শীঘ্র কর গো গমন ॥

লক্ষ্মণ—নাহি ভয়, দেবি ! তাড়কা বিনাশকারী রাম রঘুমণি ছিন্ন করি
রাক্ষসের হীন মায়াজাল, আসিবে ফিরিয়া।

গান

ভেবোনাকো. ও জননি, হবে বুঝি কোন্ মায়াবিনী।
ডাকিছে রামের স্বরে, বুঝি বা কোন মূঢ়মতি ॥

সীতা—যাইবে না কুটীর ছাড়িয়া ?

(ঐ পয়ার)

এতক্ষণে বুঝিলাম, লক্ষণরে, তোর মন।
অন্তরে গরল রাশি, মুখে মধুর বচন ॥
পরের চিত্ত অন্ধকার, বুঝা বড় দায়।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, সাধুজন কয় ॥
ভরত নিলে রাজ্যধন, তুমি নিবে সীতে।
তাইতে তুমি রামের সাথে, এসেছ বনেতে ॥
সে আশা তোমার কভু হবে না পুরণ।
গলাতে কলসী বেঁধে ত্যজিব জীবন ॥

লক্ষণ—মাতা হয়ে পুত্রে তুমি, কি কথা শুনালে।
যাবার সময় একটি কথা তোমারে যাই বলে ॥
ধনুর গণ্ডী দিলাম আমি কুটীরের দ্বারে।
কভু যেন যাইবে না, দাগের ও বাহিরে ॥
বিদায় গো জননী, চলিলাম এখনি ॥

সীতা—চলে গেল অভিমানী। বিনা দোষে বলিয়াছি কটু কথা তারে।
বড় ব্যথা পেয়েছে হৃদয়ে।

(ঐ গান)

ছিলাম যে রাজার নন্দিনী, আজি গো বড় দুঃখিনী
কুটীরেতে নাহি কোন জন।
কোথায় আছ, রঘুমণি, একবার দাও হে দরশন॥
ডাক্‌ছি তোমায় কাতর স্বরে, দেখা দাও, নাথ, এ দাসীরে,
ঘুচাও আমার মনেরই বেদন।
গভীর বনে মন কেন হয় উচাটন॥

(রাবণ—গান)

ভিক্ষা দাও গো এসেছি কুটির দ্বারে।
আমি জটাধারী, তিন দিন অনাহারী, বনে বনে বেড়াই ঘুরে॥
ভিক্ষা দাও গো দয়া করে, জঠর-জ্বালা সইতে নারি,
ক্ষুধিত ত্রাসিত আমি, ভিক্ষা দাও গো আমারে॥

(ঐ পাঠ)

ওগো সুলোচনি! ভিক্ষা দিয়ে রক্ষা কর আমায়।

( )

শুন শুন, ও সন্ন্যাসি, আমরা যে গো বনবাসী,
কিছু সম্বল নাহি কো এখন।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর আসুক গো ঠাকুর লক্ষ্মণ॥

রাবণ—ততক্ষণ ধৈর্য ধরে না পারি থাকিতে।

(ঐ গান)

আমি যে সন্নাসী, কুটীরে প্রবেশি, ভিক্ষা না লব আমি।
কুটীর ও বাহিরে, এস শীঘ্র করে॥
ভিক্ষা দেহ আজি তুমি॥
যা দেবে তাই দাও গো মোরে, এসে এই গণ্ডীর বাহিরে॥

(সীতা—গান)

যাব কি যাব না, বুঝিতে পারি না, উতলা কেন হলো মন।
উভয় সঙ্কটে আমি পড়িয়াছি আজি এখন॥

রাবণ—দিতে হয় দাও ত্বরা, নহে যাই গো ফিরিয়া।

(সীতার গান)

যেও নাকো, যোগীবর, এই নাও ভিক্ষা দিচ্ছি, ধর, কয়টি ফল করি সমর্পণ।

রাবণ—পেয়েছি রামের সীতারে, সব আশা হলো পুরণ ॥

সীতা—কি কর গো কি কর, কে গো তুমি যোগীবর,

আমি যে অবলা বালা সতী কুলনারী,

রাঘব-বনিতা আমি ছাড় তাড়াতাড়ি ॥

পরনারী স্পর্শ করা ধর্মে নাহি সয়,

বিনয় করি, জটাধারী, ছেড়ে দাও আমায় ॥

(রাবণ—পয়ার)

শুন শুন বিধুমুখি, শুন মোর বাণী।

লঙ্কাপুরে তোমায় আমি করিব পাটরাণী ॥

সিন্ধুপারে বসত করি রাবণ আমার নাম।

সদয় হও গো আমার প্রতি পুরাও মনস্কাম ॥

ছাড়বো বলে কি ধরেছি, আকাশের চাঁদ পেয়েছি।

(ঐ গান)

মৃত্যুঞ্জয় কয় ওগো সীতে, চোড়ে আমার মনোরথে,

উল্লাসিতে কর গো গমন।

নাশ কর গো সবশেষে কামাদি রিপু ছয় জন ॥

ভগবানবাটীতে বসত করি, আলু মোদের সহকারী

আনন্দ ভাই আনন্দে মগন।

মাষ্টার মোদের মুরারিমোহন, হরি বলুন সর্বজন ॥ —মুর্শিদাবাদ

ধ্রুবচরিত্র

এস গণপতি, করি হে মিনতি, প্রণতি তোমার ঐ চরণে

আমি অভাজন, না করি পুজন, রেখ হে জীবনে মরণে ॥

শ্বেত শতদল-বাসিনী, এসো মা হৃদে বাগ্‌বাদিনী।

দয়াকর ওগো জননী, পতিত-পাবনী নারায়ণী ॥

বীণাপাণি, বীণাখানি লয়ে করে।
ওগো শ্বেতাব্জবরণী, সেতার-ধারিণী, বাজাও আনন্দ ভরে॥
গ'লে যাবে নীরস কঠিন প্রাণ, শুনে তব মহিমার গান।
কাতরে ডাকিছে মা সন্তান, শান্তি করে দাও, মা, প্রাণ, কর কৃপাদান,
আমি করব পূজা চরণ কমলে॥

১

অতি পুরাকালে, এই মহীতলে, উত্তানপাদ নামে ছিল রাজন্।
শুন সভাজনে, আমরা বোলান গানে, সেই কথা এখন করি বর্ণন॥
রয়েছে পুরাণে লেখনি, স্বরুচি, সুনীতি দুই ও রাণী।
সুনীতি বড় অভাগিনী, পতির বিষনয়নে পড়ে ধনী॥
স্বরুচি হইল রাজার ভালোবাসা।
ছোট রাণীর শাসনে, সুনীতির কষ্ট প্রাণে ঘটিল কত দুর্দশা॥
ছোটরাণী বলে, হে মহারাজন, বড়রাণী দিয়ে এসো বন।
বড়রাণী রাখলে ঘরে, রাখবো না আমি জীবন, ত্যজিব এখন॥
শুনে রাজা তখন করিছে হায়॥
সুনীতির বসনে ধরে, ছোটারাণী কটু কথা বলে বারে বারে।
ধরে দুটি করে, বলে বারে বারে, রাজবাড়ী হতে বেরে॥
অঙ্গের ভূষণ-বসন কেড়ে নিয়ে, সুনীতিকে দেয় রাজ্যের বাহির করে।
কাঁদে বড়রাণী উচ্চৈঃস্বরে, জানিনা বনবাস কি দোষেরে
জীবন ত্যাজিব আমি জীবনেরে।
আমি জলে ঝাঁপ দেব, না হয় বিষ খাব, বাঁচব না প্রাণেরে॥
কি হইল ওহে প্রভু নারায়ণ, পতিহারা ক'রলে কি কারণ।
সতীনের কথাতে আমায়, মহারাজা দিলে বন, একি বিড়ম্বণ॥
তখন কাঁদিতে কাঁদিতে, সুনীতি চলে।

২

গৌতম নামেতে, ব্যাধের পাড়াতে, উপনীত হল মহারাণী।
যত ব্যাধগণ, করি দরশন, বলে, এসো এসো জননী॥
এইখানে থাক, মা গো, কোন চিন্তা নাই, পদ-সেবা করব আমরা সবাই।
আমরা চণ্ডাল জাতি আছি সবাই, মায়ের পূজা যতনে করব গো তাই॥

পাতার কুটীরে রাণী রহিল, হায়।
কপালেরই লেখন, কে করিবে খণ্ডন, বড় দুখে দিন যায়॥
রাণী সদাই পূজা করে নারায়ণ, ধর্মপ্রতি সদা তাহার মন,
হায়রে বিধির কি ঘটন ঘটিল আজ অঘটন, রাজা করে মৃগয়ায় গমন॥
তখন মৃগ অন্বেষণ করিতে, হায়।

৩

মৃগ অন্বেষণে, ফেরে বনে বনে, বেলা অবসান গগনে।
এলো আঁধার রাতি, রাজা যাবে কতি, ভাবে রাজা কত মনে মন॥
পশ্চিম গগনে মেঘ লেগেছে, জল পড়ে, তার উপরে ঝড় উঠেছে।
পথে পথে রাজা ছুটিছে, চণ্ডাল পাড়ায় গিয়ে ডাকিছে॥
পাতার কুটীরে দেখে আলো জ্বলে।
রাজা বারে বারে, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে, কে কোথায় আছে গো বলে॥
সেই কুটীরে আলো জ্বেলে সুনীতি, নারায়ণের পূজায় রয় মতি।
ডাক শুনে বাজিল প্রাণে, এলো আমার নৃপতি, প্রাণের ও পতি॥
বলে, আসুন আসুন, ঘরেতে আসুন।

৪

সেই রজনীতে, রাজা আর রাণীতে, হইল তাদের মহামিলন।
রাণী মহামতী, হলো গর্ভবতী, দেখেনে রে জগৎপতির ঘটন॥
রাজা বলে, রাণী, চিন্তা নাই, মাঝে মাঝে আমি আসিব হেথাই।
পরিত্যাগ করিব না আমি তোমায়, আজিকার মত হই বিদায়॥
পুত্র প্রসব করে রাণী পেয়ে সময়।
দিনে দিনে বাড়ে, নামকরণ করে ; ধ্রুব নাম সন্তানের হয়॥
পঞ্চম বৎসরের যখন হইল, মায়ের মুখে সকল শুনিল।
পিতা লাগিয়া, ধ্রুব তখন চলিল ; পিতার কাছে উপনীত হলো॥
তখন পুত্র দেখে ধরিল বুকে।

৫

সুরুচি বলে, রাজা, এ কাহার ছেলে, কেন নিলে কোলে দাও গো ফেলে।
রাজা বলে বচন, আমারই হয় নন্দন, ভেসে যায় তখন নয়ন জলে।
রাণী বলে একি কুমতি, সুনীতির বুঝি এই সন্ততি।
সুনীতির বনে, বসাত গোপনে ; তুমি কর গো গতি।

ধিক ধিক, রাজা, তোমায় শত ধিক।
ভালবাসি বলে, আমায় ভুলালে, তারে ভালবাস অধিক॥
দূর হয়ে যা রে, অভাগিনীর ছেলে, দূর হয়ে যা অভাগিনীর ছেলে।
যদি আমার গর্ভে জন্ম নিতিস, রাজার কোলে উঠতিস;
দূর হোয়ে যা, অভাগিনীর ছেলে॥
তখন কাঁদিতে কাঁদিতে ধ্রুব যায়।

৬

কি করিব, মাগো, বল কোথা যাব; বিমাতা কত যে মেরেছে।
আমাদের রাখিতে, এই জগতে, বল বল, মাগো, কেবা আছে॥
সুনীতি বলে, ওরে বাছা-ধন, রাখিবে তোরে নারায়ণ।
রাখিবে সেই বিপদ বারণ; নাম পদ্ম-পলাশলোচন॥
মাতা পুত্রে কহে দুঃখের কাহিনী।
পত্রের ও কুটীরে, পুত্রে কোলে কোরে, ঘুমাইল সুনীতি রাণী॥
অর্ধ রজনীতে ধ্রুব উঠিল, মায়ের পদে প্রণাম করিল।
হরি সাধন করতে যাব, যাতে হইবে ভাল; মনে মনে ধ্রুব কহিল॥
তখন প্রণাম করি, ধ্রুব চলিল।

৭

ঘোর বনেতে গিয়ে আসন করিয়ে, নয়ন মুদিয়ে করে সাধন।
হিংস্র-জন্তু এলে ধ্রুব ডেকে বলে, তুমি কি হে পদ্ম-পলাশলোচন॥
গোলোকের ও আসন টলিল, গোলোকবিহারী হরি চলিল।
নারদ মুনির কাছে কহিল, চল চল, মুনি, বনে চল॥
ইষ্টমন্ত্র দাও, মুনি ধ্রুবের কানে।
ইষ্টমন্ত্র নাহি হয়, কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদা কয়; দেখা দিও অকিঞ্চনে॥
নারদ মুনি ধ্রুবের কাছে কহিছে, এস বাবা, আমার ও কাছে।
তোমার হরি পাবার সময় হোল, হরি ঠাকুর এসেছে;
ইষ্টমন্ত্র নাও আমার কাছে॥
তখন ইষ্টমন্ত্র ধ্রুবের কাণে দেয়॥

৮

মধুর মুরতি সুন্দর অতি, রূপের জ্যোতি খেলে বনমাঝে।
নূপুর চরণে পীতবাস পরণে, আসিয়া দাঁড়ালো মধুর সাজে॥

রুমু ঝুমু নূপুর বাজিছে, কর্ণ কুহরে ধ্রুব শুনিছে।
নয়ন মেলে ধ্রুব দেখিছে পদ্ম-পলাশলোচন এসেছে॥
আনন্দেতে ধরে ধ্রুব চরণে।
ওহে ত্রিভঙ্গ-মুরারি, দয়া কর হরি, শরণ নিলাম জীবন মরণে॥
হরি বলে, শুনরে, ধ্রুব, বচন, তুমি আমার জীবনের জীবন।
আমার ও সাথেতে চল দেব তোরে সিংহাসন,
তুমি আমার জীবনের জীবন॥
তখন হরির সাথে পিতার কাছে যায়।

৯

উত্তানপাদ রাজা দেখে হরিপদ, আনন্দেতে সকল ভুলে গেল।
রাণী ছিল বনে, আনিল তৎক্ষণে, ধ্রুবে সিংহাসনে বসাইল॥
হরিচরণ বলে কিসের ভয়, যাঁরে দয়া করেন দয়াময়।
এতদূরে বোলান সাঙ্গ হয়; হরি হরি বলুন গো সবাই॥
সাটুইয়েতে সকলেতে বাস করি।
আমাদের এই দলে নিমাই বই বলে, বল বল সবে হরি॥
ধরণী নন্দী দলপতি, বোলানেতে বাতিক তার অতি।
ওগো পঞ্চা, সুধীর বাজায় ঢোলে, ধর্মে আছে মতি,
বাতিক তার অতি॥
দলে ক্ষুদিরাম আর নাচে আনন্দ। —মুর্শিদাবাদ

একটি পাঠান্তর

সুনীতি—(বনে প্রবেশ করিয়া রোদন)

কে আছ নিবিড় বনে, দেখা দাও।
বিধির বিধানে, এসেছি এখানে, বুকে তুলে নাও এ'দুর্দিনে।
সতীনের কথাতে, পতি দেয় বনেতে, সহে না অবলার প্রাণে॥

(ব্যাধের আগমন)

প্রথম ব্যাধ—অ্যারে ভাইয়্যা মিরিং মিরিং।

দ্বিতীয় ব্যাধ—তাইতো ভাইয়্যা, কোন্ মৈয়া মানুষ বিপদে পড়িয়ে কাঁদছে। আউর গীত গাহিছে। চল্ চল্ ধেইয়া চল্।

গান

ডুল ডুলা ডুল, ডুল ডুলা ডুল।

পাহাড় ঘেমে পড়্ছে পানি, ফুট্‌লো কদম ফুল॥

কালো কোকিল ডাকে আমের ডালে,

ফুটেছে ফুল কত শাল তমালে।

ফেরে অলিকুল, গাছে বুল্‌বুল॥

দ্বিতীয় ব্যাধ—সোনার পির্‌তিমা ভাইয়্যা।

১ম ব্যাধ—তু, কে বোলতো মায়ি, তু কাঁদছিস কেন? হামি তুর বেট্টা আছি। তুর যেত্তো দুখ্ আছে, হামি সব লিবে।

(সুনীতির গীত)

শোন, মোর দুঃখেরই গান গাইগো।

ছিলাম রে রাজরাণী, হলাম পথের ভিখারিণী

সতিনী করে অপমান, হায় গো॥

পতি সতিনীর বশে, আমায় দেয় বনবাসে,

কোন্‌দেশে কার বাসে জুড়াইব প্রাণ, হায় গো॥

১ম ব্যাধ—মায়ি, হামরা ছোট্ট জাত আছি। হামার কলিজার রক্ত দিয়ে তুর রাঙা পা-দুখানি ধুয়ায়ে দেবে। চল্ মায়ি, আমাদের ঘর চল্। আজ আমাদের দেওতার পুজা। পুজা দেখ্‌বি চল্ মায়ি। দেওতার দয়াতে তুর সর্ব দুঃখ দূরে যাবে, মায়ি॥

(সুনীতির গীত)

হায় রে, দারুণ বিধি, এই ছিল তোর কপালে।

জানি না কি পাপেতে আমায় এত দুখ্ দিলে॥

১ম ব্যাধ—তুর দুখ্ দূর হোবে মায়ি।

(সুনীতির গীত)

তোরা তো বাপ চণ্ডালের জাতি, তোদের জীবন সরল অতি রে।

আজ হোতে তোরা সন্ততি, ডেকো সদাই মা বলে॥

১ম ব্যাধ—মায়ি, হামরা তুর চরণ পুজা করবে। পাতার কুটীতে থাক্‌বি, আর কৃষ্ণজীকে ডাক্‌বি।

সুনীতি—চল, বাবা, তোমার সঙ্গে যাই। [সকলের প্রস্থান।]

(উত্তানপাদ রাজার সৈন্য সামন্ত সহ মৃগয়ার্থে বন গমন)

একসঙ্গে গান—

আয়রে সবে, যাইরে বনে, ভাল করে ধর ধনুর্বাণ।
ধর ডাণ্ডা, মার গণ্ডা, ধর ধর খড়্গ খরশান॥

(কিছু পরে ঐ গান)

ঘুরে ঘুরে হরিণ ঢুরে ঢুরে, হলাম রে বড় হয়রান।
সূয্যি মামা বসলো পাটে, পাই না শিকারের সন্ধান॥
সকালে এসেছি চলে, গেল সারা দিনমান।
ঐ আসিছে আঁধার রাতি, দিনের বাতি অবসান॥

রাজা—চুপ্ চুপ্, ঐ দেখ এক সুন্দর রঙের হরিণ,
আমাদের সাড়া পেয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

শুন সৈন্যগণ, আমি ঐ মৃগের পাছে চল্লুম। যে প্রকারে পারি ঐ মৃগকে নিজেই আয়ত্ত করতেই হবে।

(বেগে সকলের প্রস্থান)

(একা পুনঃ রাজার আগমন)

রাজা—ঘোরতর অন্ধকার রাত্রি, নিবিড় জঙ্গল। আমি একা, সৈন্যগণ কে কোথায় রয়েছে। এই যে মহাবেগে ঝড় উঠ্ছে, ঘর্ঘর মেঘ ডাক্ছে, এখন আমি যাই কোথায়!

ওগো, কে কোথায় আছ, পথভ্রান্ত পথিককে একটু আশ্রয় দাও।

(রাজার বেগে প্রস্থান)

(সুনীতির বাতি জ্বালিয়া প্রবেশ ও ধ্যান নিমগ্ন রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা—ঐ যে, অদূরে মিটি মিটি আলো জ্বলছে। বোধ হয় কোন মুনি-ঋষির আশ্রম!

(রাজার গীত)

কে আছ গো, আশ্রয় দাওগো, অতিথি এসেছে দ্বারে।

সুনীতি—নারায়ণ, ব্রহ্ম সনাতন ভক্ত মনোরঞ্জনকারী
মম আশা পূরণ কর, শ্যাম নটবর মুকুন্দ মুরারি॥

রাজার গীত—

কে আছ গো, আশ্রয় দাওগো, অতিথি এসেছে দ্বারে।

সুনীতি—কে গাইছে গান? আমার প্রাণ কেন আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠল! আমার মনোবীণার তারে তারে কে মধুর সুরে বাজাইল।

(রাজার গীত)

অন্ধকার রাতি, নাই সাথের সাথী

বনে বনে বেড়াই ঘুরি।

সুনীতি—নারায়ণ, নারায়ণ, দাসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন।

বড় ভাগ্য আমার, রাজা আগমন করেছেন॥

ঐ গীত

এসেছো দাসীর কুটীরে ওগো।

মরম বেদনা, আর কেহ জানে না।

সে দুখ আমার অন্তরে ওগো॥

সুনীতির গীত

দিয়ে নেতের অঞ্চল, মুছাবো চরণ কমল,

মুছাতে দু আঁখির জল, কে আছে সংসারে॥

রাজা—কে, কে, সুনীতি! ভগবান, ভগবান, তোমার মহিমা অপার। আমাদের মহামিলনের কারণেই বুঝি তুমি আছ! ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত রজনী এনেছো। ধন্য ধন্য তোমার মহিমা!

সুনীতি—দয়া করে ভগবান যখন এনে দিয়েছেন, কুটীরের ভিতরে আসুন; আমাদের মহামিলন হবে।

(ঐ গীত)

ফুটেছে আজ ফুল।

নাথ, তুমি রাখ কুল গো॥

ভগবানের কি মহিমা।

হয় না কিছুই ভুল গো॥

আনন্দে আমি ভুলিব, পদে পুষ্পাঞ্জলি দেব।

দুজনে আমরা বাঁধিবো, ভবনদী পুন গো॥ (উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে) ওহে স্বর্গমর্ত্য পাতালবাসিগণ, আজ মর্ত্যলোকে মহামানব জন্মগ্রহণ করবেন। যাবৎ চন্দ্র সূর্য রবে, তাঁর চরিত্র কীর্তন তাবৎ রবে। তোমরা সকলে আনন্দে হরিধ্বনি দাও।

(ধ্রুব ও সুনীতির প্রবেশ)

ধ্রুব—হাঁ আ, মা, চাঁদ উঠেছে, সূর্য উঠেনি কেন ?

সুনীতি—খ্যাপা ছেলে, চাঁদ, সূর্য কি এক সঙ্গে উঠেরে। চাঁদ উঠে রাত্রে, সূর্য দিনে।

ধ্রুব—হ্যাঁ মা, তুমি একা একা থাক, আমার বাবা কোথা ?

(সুনীতির গীত)

রাজ্যেশ্বর তোমার পিতা, মাতা তোমার দুঃখিনী।

ধ্রুব—কোন্ রাজা আমার পিতা ?

(সুনীতির গীত)

উত্তানপাদ তোমার পিতা, আমি তাহার হই রাণী ॥

ধ্রুব—মা, পিতা রাজা, তুমি রাজরাণী, তবে বনবাসে কেন ?

(সুনীতির গীত)

সতীনের কথায় ভুলে, বনবাসে আমায় দিলে রে।
তুমি তো সেই রাজার ছেলে, শুন দুঃখের কাহিনী ॥

ধ্রুব—মা, এইতো রজনী প্রভাত হয়েছে।
তুমি কেঁদ না, মা, আমি পিতা দরশনে চল্লাম। (উভয়ের প্রস্থান)

রাজা—একি দেখ দেখ, এই তো, এখনি চন্দ্রদেব অস্ত গেল।
দিনমণির উদয় হয়েছে, তবে আবার চাঁদের উদয় কেন !
একি ধ্রুব, ধ্রুব।

সুরুচি—নাম, নাম হতভাগিনীর ছেলে। এই তোমার গোপন বিহারে সুনীতির পুত্র ধ্রুব। নাম, নাম, হতভাগিনীর ছেলে।

(ধ্রুব—গীত)

মের না, মের না, মাগো, ধরি তোমার দুটি পায়।
আর উঠব না পিতার কোলে,
ছাড়ো মাগো, যায়, যায় ॥
এবার আমায় দাও, মা, ছেড়ে, চলে যাব অনেক দূরে।
আবার আমি আসব ফিরে, যদি, মাগো, সময় পায় ॥ [প্রস্থান]

(সুনীতি ও ধ্রুবের প্রবেশ)

সুনীতি—বাবা ধ্রুব, কাঁদছিস, কে কাঁদাইল তোরে ?

গীত—

বল, বাছা, এমন করে, কে তোরে কাঁদাইলে।
কেন বাবা, পিতার দরশন করিতে গেলে॥
আর কেঁদ না বারণ করি, যে দুখ দিয়েছেন হরি রে।
বল মুখে হরি হরি, সব দুঃখ যাবে চলে॥

ধ্রুব—মা, হরি আমাদের কে?

সুনীতি—হরি তো সর্বস্ব, বাবা।

ধ্রুব—হরি যদি আমাদের আপন, তবে আমাদের দেখে না কেন?

সুনীতি—আরো আপন করে নিতে হয়, বাবা।
সাধনা করলে হরি আপন হন।

ধ্রুব—আমি তবে সাধনা করব, মা।

সুনীতি—খ্যাপা ছেলে, কথায় কথায় কি হরি মিলে।
সে যে গোলোকবিহারী, ভববন্ধন-মোচনকারী।
নারায়ণ, পদ্ম-পলাশলোচন; সে যে যোগীর যোগের ধন,
যোগাসন করেও পাই না।

ধ্রুব—মা, আমি সেই পদ্ম-পলাশলোচন হরিকে এনে তোমার দুঃখ মোচন করব। আশীর্বাদ কর, মা, আমি যেন পদ্ম-পলাশলোচনের দেখা পাই।

(প্রণাম করিয়া ধ্রুবের প্রস্থান)

সুনীতি—যাস্‌নে, যাস্‌নে ধ্রুব; মাকে কাঁদিয়ে যাস্‌নে।

(সুনীতির প্রস্থান ও ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব—হরি বোল হরি বোল; কোথায় পদ্ম পলাশলোচন হরি!
হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু, প্রভু দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেশ্বর গোপীকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে॥

(ব্যাঘ্র ভল্লুকের প্রবেশ)

ধ্রুব—ওগো, তোমরা কি পদ্মপলাশলোচন হরি?

(নারদের প্রবেশ ও গীত)

হরি হরি বল, ভবের বেলা গেল, ঐ যে আসিছে অন্ধকার।
বারে বারে ডাকে পারের কাণ্ডারী, আয় পাপী তাপী কে যাবি পার॥
চিনিল না ভবে কেবা আপন পর, ভেঙ্গে ফেল, ভাই, খেলা-ধূলার ঘর।

যখন তোর গোলা করবে ঘর্ঘর, এ ঘর তখন তোর থাকবে না আর,

ধ্রুব—তুমি আমার সেই পদ্ম-পলাশলোচন হরি।

নারদ—না, বৎস। আমি তোমার পদ্ম-পলাশলোচন হরি নই।

তোমার হরিকে পাবার রাস্তা দেখিয়ে দিতে এসেছি।

ধ্রুব—ওগো, দাও গো ; ওগো পদ্মপলাশ-লোচন হরি আমায় দাও।

নারদ—(কাণে মন্ত্রদান)

ধ্রুব হরি বল, হরি বল। একি আনন্দে আমার হৃদয়খানা ভরে উঠলো।

ঐ কে অদূরে মোহন বাঁশীতে গাইছে গান—হরি বল, হরি বল।

(কৃষ্ণের প্রবেশ ও গীত)

আমি এসেছি এইবারে, ধ্রুব তোমার তরে, সাধেরই গোলোক ছেড়ে।

ওরে, তব ডাক শুনে, বাজলো মোর প্রাণে, চেয়ে দেখ নয়ন ভরে॥

(ধ্রুব—গীত)

এসেছ হে হরি, কি রূপের মাধুরী ; জনম সফল করি হেরে।

(কৃষ্ণ—গীত)

ওগো ভক্তজনানন্দ, নাম আমার গোবিন্দ ;

থাকতে নারি ঘরে, ডাকলে পরে।

আমার প্রাণ কাঁদাইলে হরি বলে, আয় রে ভক্ত আয় রে কোলে॥

(ধ্রুব—গীত)

মা আমার রাজরাণী, জনম-দুঃখিনী রয়েছে ঘরে।

দয়াময় হরি, তুমি দয়া করি, দাও তুমি উদ্ধার করে॥

কৃষ্ণ—চল, চল, ধ্রুব আমার সঙ্গে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

(সুনীতির প্রবেশ ; পশ্চাতে কৃষ্ণের হাত ধরিয়া ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব—মা, মা, চেয়ে দেখ, সেই পদ্ম-পলাশলোচন হরি ;

আমাদের দুঃখ মোচন করতে এসেছেন।

(উত্তানপাদ রাজার প্রবেশ)

রাজা—হরি বল, হরি বল, আজ আমি ধন্য হলাম ; রাণী তুমি ধন্য।

তোমার পুত্র ধন্য, আমার এই বন ধন্য, রাজ্য ধন্য। চল চল, ধ্রুব,

তোমাকে রাজসিংহাসন প্রদান করিতেছি।

(সুরুচির প্রবেশ—উভয়ের গীত)

জয় জয় বিনোদবিহারী হরি, বাঁকা শ্যাম ; হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।
জগদীশ পরমেশ, হৃষীকেশ শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥ —ঐ

৫

কুঞ্জভঙ্গ

ভজরে মানসে, প্রথমে গণেশে, অনায়াসে তুই হবি পার।
হরসুত বিঘ্নহর, ওহে হর, দুর্গতি আমার ॥
একবার এসো, মাগো বীণাপাণি, আমার আসরে।
এসো, মাগো, দয়া করে বলাও বাণী আজ আমারে ॥
ভজন সাধন নাহি জানি, দিও রাঙ্গা পা দুখানি,
কণ্ঠাসনে বসি বাণী বলাও আমারে ॥
আজি এ বিপদ-সাগরে আমারে তরাইবে তুমি,
না করিলে দয়া আমার কিবা হবে গতি !
অধম অকৃতি আমি নাই গেয়ান ভেবে মরি,
কেমনে পার হবো আমি বিনা তব চরণ-তরী,
তোমার রাঙ্গা পা দুখানি ভরসা আমার,
তুমি দয়া কর যদি ভয় কি আছে আর।
জনম যে ফুরালো, সময় বৃথা গেল হরি বলা আর হলো না।
মিছে আশায় রইলাম ভুলে, ওগো সে ভুল আমার গেল না ॥
দারাসুত বন্ধু যত বল কেবা কার।
বিষয় মদে মত্ত হয়ে গেলাম আসল পথ হারায়ে,
এখন যে ভেবে মরি কি হবে আমার।
করজোড়ে ডাকি, হরি, একবার দয়া কর মোরে।
রাঙ্গা পায়ে নিলাম শরণ রাখ হে এ পামরে।
তুমি না রাখিলে হরি, কে রাখিবে আমারে,
আর যে আমার নাইকো কেহ, ডাকি তাই তোমারে।
রাধাকৃষ্ণের যুগল পদে মজাইল মন,
কুঞ্জভঙ্গ লীলা কথা কর গো শ্রবণ ॥

নাগর নাগরী, জাগি বিভাবরী প্রেমেতে মাতিয়া কুঞ্জেতে।
অপনীত হলো অতি, কাতর হলো ঘুমেতে ॥
তখন এলাইয়ে পড়লো দেহশয্যা উপরে,
ঘুমেতে হারাল চেতন, খসে পড়ে বসন ভূষণ,
দুই জনেতে রইলো তখন কুঞ্জ মাঝেতে ॥
মধুর যামিনী গত হল প্রেম আলাপনে,
প্রভাত হইল নিশা গায় কোকিল পঞ্চতালে।
উষার বাতাসে দোঁহে রহিল যে অচেতন,
কেমনে রাই যাবে ঘরে হয়ে গেল বিস্মরণ।।
যামিনী হইল গত জাগিল গোকুল।
গাছে গাছে প্রস্ফুটিত হ'ল কত ফুল।।
কুঞ্জের দ্বারেতে তমাল তলাতে শুকশারী বসে রহিয়াছে।
সারী বলে, শুন নাথো, যামিনী পোহায়েছে।।
নিশিতে মিলন আশে এসেছিল রাই,
সে যে কুলের কুলবালা, হয়ে গেল সকাল বেলা,
ঘরে ফিরে যাবার বেলা আর ত তাহার নাই।
একান্তে নিশিতে রাধে এসেছিল অভিসারে।
রজনী পোহাল এখন ফিরে যাবে কেমন করে।।
এখন না জাগাইলে প্যারি, কেমনেতে ঘরে যায়,
কেমনেতে বল, নাথো, একুল ওকুল দুকুল রয়।
মিনতি করি হে রাখো বচন আমার,
জাগো, রাধে, জাগো বলি ডাক একবার।।

২

শুনি শুক বলিলো, হৃদয় যে দহিল এমন কথা আর বলিল।
সুখের মিলন ভাঙ্গ্‌তে আমি আর পারবো না।
যত যোগী হবে উদ্যোগী সব এই মিলন চায়,
তুমি যে নিঠুর অতি, তোমার শত পাপে মতি,
নইলে কেন তোমার, সতি, এ শকতি যায়।

দেখ চেয়ে, চেয়ে দেখ রাধাকৃষ্ণের মিলনে,
জনম সফল কর আজি চেয়ে দেখ দুনয়নে।
ভুজের বালিশে রাধে আলিসে করি শয়ন,
হৃদয়ে হৃদয় রাখি নিদ্রাতে হল মগন ॥
রাধাকৃষ্ণ উভয়েতে সুখে নিদ্রা যায়,
বলোনা বলোনা এ সুখ ভাঙ্গাতে আমায় ॥
শারী তাই ভাবিল, সময় বয়ে গেল জাগাতে হইল আমারে,
এখন না জাগিল প্যারে ঘরে যাবে কি করে।
(তখন) 'রা রা' রবে ডাকে শারী 'ধা' মুখেতে নাই।
রাধারে জাগাবে আগে যেন কৃষ্ণ নাহি জাগে,
ডাকে শারী অনুরাগে যেন ডাকে রাই ॥
জাগো জাগো ওগো ধনি, ঘরে ফিরে যেতে হবে।
সময় বয়ে গেল—তোমার কলঙ্ক রটিবে।
শুন, ধনি, ওই দিনমণি উদয় হল পূরবে।
গেল গেল সময় গেল বল উপায় কি হবে ॥
উঠগো, রাই বিনোদিনী, জাগগো একবার।
না জাগিলে কলঙ্কে নাম রটিবে তোমার ॥

৩

'রা' 'রা' রব শুনিয়া, উঠেন জাগিয়া, বসন প'ড়িয়া খসিল।
কুঞ্জের বাহিরে তখন নয়ন :মেলে দেখিল ॥
পদতলে বসি পদ ধরে বলে রাই,
উঠ, ওহে প্রাণসখা, দায় হল যে মান রাখা,
দিনমণি দিল দেখা কিসে ঘরে যাই।
ঘরে আছে ননদিনী তার জ্বালায় জ্বলে মরি,
কথায় কথায় বলে আমায় কলঙ্কিনী তুমি প্যারি।
একবার উঠ উঠ, রসরাজ হে, আমায় বিদায় দাও হে ঘরে যাই,
তোমায় ছেড়ে যাব ঘরে এমন মনত আমার নাই ॥
দেহ যাবে তোমায় ছেড়ে, গৃহমাঝেতে পড়ে রবে,
মন যে আমার ঐ চরণেতে ॥

৪

যামিনী নিদয়, ভানুর উদয়, শশী গেল ঢলে অস্তাচলে,
কুমুদিনী মলিন হলো জলে ফুটিল কমল।
ডালে ডালে ফুটলো কুসুম জুটলো অলিকুল
ফুটিয়াছে কত যে ফুল, সুগন্ধে মন করে আকুল,
কেমনেতে যাব গোকুল হয়েছি ব্যাকুল।
একবার উঠ, প্রাণসখা, হেরি তোমার ও চাঁদবদন,
হয়ে সদয় দাওহে বিদায় যাই হে সারা দিনের মতন।
তোমায় ছেড়ে কেমন করে বলহে, নাথ, গৃহে যাই,
ঘরে কে কে, কার মুখ দেখে কেমনে প্রাণ জুড়াই।
তোমা বিনে আর কে আছে আমার গোকুলে,
কুলবালা তাইতো আমি যেতে চাই কুলে ॥
গত হলো কাল সুখের নিশিকাল, প্রভাত কালে রই কেমনে।
তোমারে ছাড়িয়ে ঘরে যাব যে শূন্য প্রাণে।
আমি যখন থাকি গৃহমাঝে গৃহ কাজেতে,
সদা তোমায় মনে পড়ে, ঝরে আঁখি শতধারে,
ও রূপ দিয়ে ধরে ভাবি ধ্যানেতে।

৫

রাখ হে মিনতি রাখ ওঠ আমার রাই,
ও চরণ হৃদয়ে ধরে চললাম আজি গৃহমাঝ।
জনমে জনমে যেন আমি দাসী হই ঐ চরণে,
প্রণাম করি, রাসবিহারী, চাওহে করুণ নয়নে ॥
গা তোল গা তোল নাথো, ডাকি হে তোমারে।
হাসি মুখে কওহে কথা বিদায় দাও আমারে ॥
(তখন) চেতনা পাইল, নয়ন মেলিল উঠিয়া বসিল শয্যাতে।

৬

গা তোল গা তোল বেলা বয়ে গেল, নয়ন মেলে একবার বস না।
কে জানতে যাব গোকুল ওহে গেল অসময় ॥
সদাই তোমার কাছে থাকি এইত বাঞ্ছা হয়,

নয়নে নয়নে রাখি, রূপরাশি সদাই দেখি, এই আমার বাঞ্ছা।
কিন্তু বিধির বাঞ্ছা নয়।
তোমায় রেখে ঘরে যেতে মন আমার নাহি সরে,
দারুণ ননদিনী আছে তার ভয়ে মরি,
কৃষ্ণপ্রেমের বিবাদিনী ননদিনী করে কেলেঙ্কারী॥
হৃদয়েরি ধন যে তুমি হৃদয় মাঝে রাখি।
হৃদয় আমার যাবে ফেটে সারাদিন নাই দেখি॥
চঞ্চল হয়েছি আমি হৃদয় ব্যাকুল,
হাসিমুখে দাও হে বিদায় চলিব গোকুল॥

৭

চেতনা পাইল, নয়ন মেলিল, বসিল শয্যাতে।
কেমন করে দিব বিদায়, ওহে, তোমারে ঘরে যেতে॥
এস, এস, প্রেমময়ী, এস হৃদয়ে,
শ্রীমতী বসিল বামে কি অনুপমে কি শোভা হইল দেখ
নয়ন মেলিয়ে।
সকলে আসি সে শোভা দেখিল।
কুঞ্জ মাঝে যে গেল দেখ কি শোভা হইল॥
মনে প্রাণে চাঁদ বদনে হরি হরি বল ভাই।
কলিযুগে হরি বিনে আরতো জীবের গতি নাই॥
নিজ নিজ ঘরে গেল নাগর নাগরী।
কুঞ্জভঙ্গ কথা সাঙ্গ মুখে বল হরি॥

৮

ভোলানাথ দলপতি, সাটুয়ে বসতি, করিগো মিনতি সকলে।
সুরেন্দ্রনাথ গান বেঁধেছে ওগো গুরুর চরণ বলে॥
ক্ষুদিরাম বাজাছে ঢোল আর হরি নাই।
ভক্তি জোগাড় করলে ভারি, গাইত দলের সহকারী—
শঙ্কর দেখ নাচছে কেমন তুলনা তার নাই॥
উমাপদ ফড়িং দত্ত সুর দিলে যত্ন করে।
রতিকান্ত সানাই বাজায় অতি মধুর স্বরে॥

রামদাস, আশু, পেছুদলে কেমন দেখ ধর্তা করে
সত্য, মদন নেচে গানে সকলের মন হরে ॥
আনন্দময় যে আমরা সবাই দোহার ক জনা।
দয়া করে ক্ষমাকর তোমরা দশজনা ॥

মুর্শিদাবাদ—

ব্যঙ্গ গান

হাস্যরসাত্মকসঙ্গীতও বাংলার পল্লীসমাজে বহুল প্রচলিত। সাধারণ ভাবে তাহাদিগকে ব্যঙ্গগীত বলা যায়—

১

কি খিটকাল করলাম রে, পাকিস্থানের মেয়ে বিয়ে করে ॥
আমি যে কুলীনের ছেলে একথা বলবো কাহারে।
বৌ আমাকে বলে এসে তোমায় ঢাক কই ঘরে ॥
বৌ বলে, ওগো পতি, কি ক্ষতি তোমায় হলো বিয়ে করে।
এমন বিয়ে আছে এবং হচ্ছে দেখ অনেক ঘরে ॥
আমার শ্বশুর মশায় ঢাক বাজায়, বৌ বলে আমারে।
সম্বন্ধি বাজায় কাঁসি কাঁই কাঁই করে ॥
বৌ বলে আমরা সকল দেবতার আগে যাই,
জাত খারাপ কেমন করে।
আমাদের না হলে পুজা, সিদ্ধ হয় না সংসারে ॥
কেমন করে থাকব আমি, ওগো সমাজ ছেড়ে।
মা-বাবা যে পর হবে, আমা দু'আঁখি ঝরে ॥
বৌ বলে—সমাজ আবার কাদের আছে, নাথ, বল আমারে।
ফাটে ফাটে জল মুলুক ময়, হয়েছে সংসারে ॥
হোঁজা খেতে দেবে না, ভাই, কেহ আমারে।
ভোজ খেতে গেলে, আসন দেবে আলাদা করে ॥
বৌ বলে—ভয় কি আছে, আমরা থাকব হয়ে একঘরে।
তুমি কেবল ঢাক বাজাবে, আমি ঘসি বিচব বাজারে ॥
ঢাক বাজানো কপালে ছিল, সাধের বিয়ে করে।
আমার মরা গরুর চামড়া, ছাড়াতে হবে ভাগাড়ে ॥

বলি বর্তমানে দোষ নাই, এসব করা চলবে।
এসব না করলে পরে সমাজ এক হবে কি ভাবে॥ —মুর্শিদাবাদ

এই সব গান ধর্মরাজ পূজায় গাওয়া হয়।

২

ভবে তাঁতি হয়েছে বড় বুদ্ধিমান্।
তালগাছে চড়াইএর বাসা, সেই কলরব শুনতে পান।
কেউ বলে হাট বসেছে, কেউ বলে বাজার বসেছে,
কেউ বলে না রে, ভাই, র‍্যাডিঅতে হচ্ছে গান।
ভবে তাঁতি হয়েছে বড় বুদ্ধিমান। —বীরভূম

৩

গোদা পায়ের কি যে যন্ত্রণা
যার নাই সে জানে না…
আমি সব গুণের গুণী।
পেটটি মোটা, পাটি ফোলা কানে কম শুনি।
আবার রেতের বেলা দেখতে পাইনা
লোকে বলে রাত কানা।
আমার পা দুটি ভারী, আমি চলি ধিরি ধিরি,
তার উপর বেরিয়েছে গোটা দুই ফুলুরি।
হেই, দাদা, তোর পায়ে পড়ি, বেশী জোরে চলিস্ না॥ —ঐ

শুনরে গোঁড়া তাঁতি, তোর বেজায় বুকের ছাতি,
সভার মাঝে করিস তাইরে গোদার অখ্যাতি॥ —ঐ
গোদা পায়ের শুনরে গুণের কথা,
তোর মাথার উপর চাপালে পা
হেঁট হবে তোর মাথা—
ধূলায় গড়াগড়ি যাবি, গাত্রে হবে ব্যথা।
ভগবানের দেওয়া শরীর গোদায় কি ক্ষতি।
তোর বাপ দাদারা এই পায়েতে জানাইছে নতি।

৫

জাত তুলে গাল দিও না গো ও ময়রা খুড়ো,
স্বীকার করে নিচ্ছি, চাচা, তুমি মাথার চুড়ো।
রামেশ্বরের গাজনেতে, গাইলাম মোরা গান,
তোমার ছোট হলাম খুড়ো বাড়ুক সম্মান।
আজকের মত এই খানেতে পালা হল শেষ,
সবাই মিলে বল এবার আহা বেশ বেশ বেশ। —ঐ

পূর্ব পৃষ্ঠায় বর্ণিত ছড়াগুলি গ্রামে ধর্মরাজ পুজা উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার তাঁতিপাড়া ও ময়রা পাড়ার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সংএর মাধ্যমে গাওয়া হইত। ময়রাদের মুল গায়েন গোবিন্দ দে এবং তাঁতিদের মুল গায়েন রাধাশ্যাম রক্ষিত কর্তৃক ছড়াগুলি গীত হয়। গোবিন্দ দের পা গোদা। উক্ত একটি ছড়ায় তার গোদা পায়ের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে সাজিয়া গুজিয়া ছড়ার পাল্টা ছড়া রচনা করিয়া তাহারা গ্রামবাসীদের হৃদয়ে যথেষ্ট কৌতুক ও হাস্যরস পরিবেশন করে। বৈশাখ মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

৬

ওকি হলোরে বালাই,
ময়না টিয়ে দেশ ছেড়েছে
ক্যাচকেঁচের জ্বালায়,—ওকি হলোরে বালাই।
ভূলোকের গোলোক ধাঁধাতে পেলাম এতক্ষণে—
আকাশে উড়ে শকুন, মন থাকে তার ভাগাড় পানে। —নদীয়া

ব্যবসায়ীর গান

বিশেষ কোন কোন ব্যবসায়ী তাহাদের ব্যবসায় সূত্রে যে গান গাহিয়া থাকে, তাহাকে ব্যবসায়ীর গান বা ব্যবসায়ের গান (professional song) বলা যায়। ইহাদের মধ্যে বেদের গানই (পূর্বে দ্রষ্টব্য) প্রধান। বেদেরা সাপ দেখাইয়া ব্যবসায় করিবার সূত্রে এই গান গাহিয়া থাকে। ভালুক ও বাঁদর নাচাইবার সময় কিংবা কোন ঐন্দ্রজালিক খেলা দেখাইবা সময়ও এই শ্রেণীর গান শুনিতে পাওয়া যায়। ব্যবসায়ের দিকেই ইহাদের একান্ত লক্ষ্য

থাকে বলিয়া ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন সাহিত্যিক গুণ প্রকাশ পাইতে পারে না। তবে কোন কোন সময় বেদে বিশেষত বেদেনীরা যে লখীন্দর বেহুলার করুণ কাহিনী সুর করিয়া গায়, তাহাদের করুণ রসের আবেদন অনেক সময় সার্থক হয়।

১

আমি একে যে মরি গো বিষের জ্বালায়—
আরও যে অপমান রে,
আমি বিয়ার রাইতে যে হইলাম গো রাঢ়ী—
বেহুলা সুন্দরী রে। —ঢাকা

বৌ-ঘরার গীত

বর যখন নববধূ লইয়া নিজের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আনুষ্ঠানিক ভাবে বধূকে বরণ করিয়া লওয়া হয়। সেই সময়ের মেয়েলী গীতকে বৌ-ঘরার গীত বলে।

১

আয় লো আয়, ও আয়তি কুলবতী, বর-বধূকে বরণ কর,
দেখে হেমাঙ্গিনী বধূরাণী মুখখানি তার তুলে ধর।
শুভ দিনের শুভ মিলন, এই সুযোগ কি যায় গো হেলন,
এতদিন ছিল যেমন মেঘে ঢাকা শশধর।
আহা, কি রূপের আভা কনকে মুকতা শোভা,
সর্বজন মনোলোভা, মরি মরি, কি সুন্দর! —মৈমনসিং

২

কালী তারা ধূমাবতী, চরণে চরণে চতুর অতি,
সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী মিথিলাতে আগমন।
বরণ করে বধূগণ, বরণ করে দাইয়োগণ॥ —ঢাকা

৩

কি কর, রামের মাগো, গৃহেতে বসিয়া।
তোমার রামচন্দ্র আসে জানকী লইয়া।

আরবার বল আমি শুনিব শ্রবণে।
বাইর আইল কৌশল্যা গো ধান্য দূর্বা লইয়া।
ধান্য দূর্বা চিনি সন্দেশ লইল হাতে হাতে।
বর বধূরে ঘরে লইল দূর্বা লয়ে সাথে। —মৈমনসিং

৪

চল রঙ্গ দেখি গিয়া ;
রামচন্দ্র দেশে আইলাইন জানকীরে লইয়া।
দূত গিয়া বার্তা কইলো, কৌশল্যা গো রাণী,
তোমার রামচন্দ্র আইছে লইয়া জানকী।
দুয়ারে ফালাইয়া পিড়ি চাউল দিল মুঠি
কড়ি দিল ষোল গণ্ডা ফল দিল পঞ্চটি।
বাইর আইলো রাজরাণী কুলা মাথায় দিয়া
ঘরে নিলো রামচন্দ্র সীতারে আভ্রিয়া।
রামের মুখে ধান দূর্বা সীতার মুখে চিনি,
দুয়ারে ফেলাইয়া পীঁড়ি বস্‌লাইন রাজরাণী।
বাৎসল্যের ভরে রাণীর গদ গদ তনু,
কোলেতে বস্যাছে রাম মেঘের বরণ ভানু।
রাণীগণে রঙ্গ ভরে দিলাইন উলুধ্বনি,
এই মত বধূঘরা সাঙ্গ করলেন রাণী। —ঐ

বৌ-নাচের গান

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকৃতির যে সকল লোক-নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাংলার পুর্ব ও পশ্চিম এই দুই প্রান্তবর্তী অঞ্চলের বউ নাচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুর্ব বাংলার শ্রীহট্ট জিলায় প্রায় সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই এক শ্রেণীর নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহা বউ নাচ বলিয়া পরিচিত। শ্রীহট্ট জিলার পুর্ব সীমান্ত অঞ্চল আসাম প্রদেশের কাছাড় জিলার বাংলা ভাবাভাবী অঞ্চলেও ইহার প্রচলন দেখা যায়। বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের

সঙ্গে সঙ্গে ইহা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলেও পল্লী অঞ্চলে ইহার প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও সক্রিয় আছে।

বউ নাচ নানাভাবে পুর্ব বাংলা বিশেষত শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহ জিলার নারী সমাজে দীর্ঘকাল যাবৎই প্রচলিত ছিল। ইহার যে সকল লক্ষণ এখনও বর্তমান আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, নববধূ বিবাহকালীন যখন বরকে বরণ করিত, নৃত্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই তাহাকে বিবাহ-সভায় বরণ করিয়া লইত। ক্রমে সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইবার ফলে বালিকা বধূকে যখন পাটে তুলিয়া বরের চারিদিকে সাত পাক ঘুরান হইত, তখন স্বভাবতই পদক্ষেপ দ্বারা তাহার নৃত্যভঙ্গি প্রকাশ করা অসম্ভব হইত; সেইজন্য তখন হইতে কেবলমাত্র হাতের মুদ্রা দ্বারা বরকে বরণ করিয়া লইয়া নৃত্যের সংস্কারটি তাহাতে রক্ষা করা হইত। কিছুদিন পুর্ব পর্যন্তও উক্ত অঞ্চলের বিবাহানুষ্ঠান যাঁহারা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বিবাহ-সভায় বধূ সাত পাক ঘুরিবার সময় এক একবার যখন বরের ঠিক মুখামুখী হইত, তখন বিচিত্র মুদ্রাভঙ্গি সহকারে বরকে এক একবার বরণ করিত। অঙ্গুলির এই মুদ্রাভঙ্গি পুর্ণাঙ্গ নৃত্যভঙ্গির অঙ্গ ছিল, বর্তমানে পদক্ষেপের (Foot-step) মধ্য হইতে নৃত্যরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র অঙ্গুলির মুদ্রাভঙ্গির মধ্যেই তাহা রক্ষা পাইয়াছে।

শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার বাঙ্গালী সমাজে ইহার পূর্ণতর রূপটি এখনও রক্ষা পাইয়াছে। তবে তাহাও বিলুপ্ত হইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের কোন পরিবারের মধ্যে বিবাহ হইলে কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামের মাহিলারা নূতন বধূর নাচ দেখিবার জন্য সেই গৃহে সমবেত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ লাভ করিতেন। বধূ মুখে ঘোমটা টানিয়া দুইখানি হাতে মুদ্রাভঙ্গি করিয়া এবং ধীর লয়ে পদক্ষেপ সহকারে সমবেত নিমন্ত্রিত নারীদিগের সম্মুখে তাহার নৃত্যকৌশল দেখাইত। কিছুদিন পুর্বে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ শিলচরের এক অনুষ্ঠানে যে একটি বউ নাচ দেখিয়াছিলেন, তাহার তিনি এই বর্ণনা দিয়াছেন,—'গ্রাম্য ঢাকের ছন্দে ও তালে প্রথমে ঢিমা লয়ে গানের সঙ্গে নাচটি সুরু হলো। বধূসাজে মেয়েটিও পা দুটি কাছাকাছি সমানভাবে রেখে, অল্প একটু হাঁটু মুড়ে, সামনে ঝুঁকে কেবল দুই হাতের পাতা নানা ভঙ্গীতে দোলাতে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করলাম যে, মেয়েটি হাঁটু মুড়ে থাক্‌লেও গানের ছন্দে ছন্দে ঈষৎ ওঠা-নামার

একটা দোলা সর্বদাই রেখে চল্‌ছে তাহার দেহে। মেয়েটির পা দুটি কখনোও মাটি ছেড়ে উঠ্‌ছে না। আগাগোড়াই মাটিতে পা ঘসে ঘসে, তার ডান দিক লক্ষ্য রেখেই চক্রাকারে ছন্দে ছন্দে সরে সরে যাচ্চে। এই নাচে পদ-চালনার বৈচিত্র্য অল্প। মাত্র তিনটি ভঙ্গী। হাতের ভঙ্গীর বৈচিত্র্য পায়ের চেয়ে কিছু বেশী; কিন্তু খুব সহজ। এত সহজ হয়েও গানের রসে, বাজনার ছন্দে ও বালিকার বধূজনোচিত ভয় ও সলজ্জভাবের মিশ্রণে নাচটি অত্যন্ত মধুর লেগেছিল।' (গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য' ১৩৬৬, পৃ. ৬৫)

অনভ্যাসের ফলে হাত ও পায়ের ভঙ্গি এখানে বৈচিত্র্যহীন হইয়া আসিলেও একদিন যখন ইহার যথার্থ চর্চা ছিল, তখন যে ইহা নিতান্ত সহজ এবং বৈচিত্র্যহীন ছিল না, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। এমন কি, এই সকল অঞ্চলে বিবাহ-সভায় কন্যা বরণ-নৃত্যের সময় যে মুদ্রাভঙ্গি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা এখনও অত্যন্ত জটিল এবং দুঃসাধ্য। বিবাহের পুর্বে পরিবারের বয়স্কা মহিলারা এই বিষয়ে বধূদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সকল মুদ্রাভঙ্গি যে পুর্বে পুর্ণাঙ্গ নৃত্যের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত ছিল, তাহা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চলের হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বউ নাচ আর একটি স্বতন্ত্র রীতিতে প্রচলিত আছে। ইহাদের উভয়ের মধ্যে যে কোন সম্পর্ক আছে, আপাত দৃষ্টিতে তাহা এখন আর মনে হইতে পারে না। বর্ধমান জিলার বন-নব-গ্রাম নিবাসী শ্রীনকুলচন্দ্র দত্ত এই বিষয়ে যে একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আনুপুবিক এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য।

'স্থান কাল ভেদে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচিত্র রকমের এক একটি আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়। বীরভুম জেলায় সুবর্ণ বণিক সমাজের মধ্যে প্রচলিত বৌ-নাচ এইরূপ একটি অনুষ্ঠান। বৌ-নাচ একটি বিচিত্র নৃত্য। লোক-নৃত্যের মধ্যে ইহা পড়ে কিনা জানি না, হয়ত ইহা লোক-নৃত্য। আজিকার সুবর্ণ বণিক সমাজে যে রূপে এই আচার অনুষ্ঠানটি আসিয়া পালিত হইতেছে, তাহা হইতে ইহার পুর্বরূপ কি রকমের ছিল, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পুর্বে ইহা যে ভাবে পালিত হইত, তাহার বর্ণনা এখানে দেওয়া হইতেছে।

'বরবধূ বিবাহান্তে বরের বাড়ীতে আসিলে বৌভাতের দিন হইতে অষ্টমঙ্গলা দিনের মধ্যে, বিশেষ বৌভাতের পরের দিনে বরের আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্বগণ নববধূকে এক একবার কোলে লইয়া সোহাগভরে নৃত্য করেন। অবশ্য ইহাকে ঠিক নৃত্য বলা চলে না, ইহাতে নৃত্যের ভঙ্গিমায় অঙ্গসঞ্চালন ও পদক্ষেপ রীতি প্রকাশ পায়, ইহাকে নৃত্যের ভঙ্গিমা মাত্র বলা চলে। এই সময়ে হোলির দিনে রং খেলার মত আত্মীয় স্বজনরা বধূকে রং দেন এবং নিজেদের মধ্যে রং লইয়া মাতামাতি করেন। পশ্চিমাদের মত ও আধুনিক কালের সহুরে অর্বাচীনদের মত কাদা গোলা জল, নর্দমার জল, ভাতের ফেন লইয়াও এই খেলার মাতন চলে। কখনও কখনও উত্তেজনা হইতে অধিকতর উত্তেজনার মধ্যে ইহা কদর্যতায় পরিণত হয়; এমন কি, বিপদ ঘটিবারও সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমি একবার রং-এর বিকল্প হিসাবে ভাতের ফেন ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা যে উত্তপ্ত ছিল, আনন্দের আতিশয্যে তাহা লক্ষ্য না করায় ব্যবহারকারী অপরকে পুড়াইয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছিল।'

'এই বৌ-নাচটি সম্ভবত অতীতে যখন শিশু-বধূরা ঘরে আসিত, তখনকার এক স্মৃতি বহন করিতেছে! তখন সেই শিশুবধূকে লইয়া শ্বশুর শাশুড়ী ও আত্মীয়-স্বজনেরা কোলে করিতেন, শিশুদের মত সোহাগ করিতেন এবং পিতামাতা যেমন পুত্রকন্যাকে কোলে লইয়া নৃত্যভঙ্গিমায় আদর করেন, সেইরূপ শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্ব জনেরা সেই শিশু-বধূকে কোলে লইয়া নৃত্যভঙ্গিমায় আদর করিতেন। শিশুবধূ যেন নূতন পরিবেশে আনন্দ পায়, যেন শ্বশুর বাড়ীকে আপন করিয়া লইতে পারে, পিতামাতার বিচ্ছেদ যেন সে অনুভব করিতে না পারে, বৌ-নাচের মধ্যে তাহার প্রচেষ্টাই ছিল। সম্ভবতঃ "বৌ নাচের" পশ্চাতে এই জন্ম-ইতিহাসটুকু লুক্কায়িত আছে।'
(শারদীয় বর্ধমান, ১৩৭২)

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হইবার পর হইতে শিশুবধূকে কোলে লইয়া বয়স্কা মহিলাগণ নৃত্য করিয়া একটি প্রাচীন প্রথার মুখ রক্ষা করিলেও, ইহাতে পূর্বে যে পূর্ণ যৌবন-প্রাপ্তা বধূগণ নিজেরাই স্বাধীনভাবে তাহাদের নৃত্য-কৌশল দেখাইতেন, শ্রীহট্ট কাছাড়ে প্রচলিত রীতিটি তাহার আজিও প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়। পূর্বে ঐ দেশের সমাজে, নৃত্যগুণ বাঙ্গালী বধূর একদিন সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া গণ্য হইত; বিবাহের সময় বধূর আর

কোন গুণেরই বিচার হইত না, কেবল মাত্র নৃত্যগুণেরই বিচার হইত। চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ নির্বাচন প্রসঙ্গে সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তুর্কী আক্রমণের পর হইতে বিপর্যস্ত বাংলার সমাজ হইতে ইহার সংস্কার দূর হইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেও বাংলার সমাজের কোন কোন দূরবর্তী অঞ্চলে তাহা বিচ্ছিন্নভাবে কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করিয়া আছে। বাংলার উভয় প্রান্তের বউ নাচ তাহার নিদর্শন।

শ্রীহট্ট, কাছাড় ও ত্রিপুরা জিলার এক শ্রেণীর মেয়েলী নৃত্যের নাম ধামাইল বা ধামালী। এই নৃত্যের সঙ্গে যে গান গাওয়া হয়, তাহা ধামাইল বা ধামালী গান বলিয়া পরিচিত। তাহার কিছু নিদর্শন পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিবাহিতা এবং বয়স্ক মহিলারাই প্রধানত এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীহট্ট এবং কাছারের বৌ-নাচে ধামাইল গানই শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্বে ইহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৌদ্ধ গান

আজ হইতে প্রায় এক হাজার বছর আগে অপভ্রংশের গর্ভ হইতে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। কিন্তু সে'দিন ইহার যে রূপ ছিল, তাহা দেখিলে ইহাকে বাংলা ভাষা বলিয়া মনে করাই কঠিন হইবে। ইহাকে প্রাচীন যুগের বাংলা বা প্রাচীন বাংলা বলা হইয়া থাকে। বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধগান নামক কতকগুলি গীতি-রচনা সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। এ'দেশে তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় নামক এক ধর্মসম্প্রদায় ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের শেষ অবস্থায় ইহার নানা শাখা-প্রশাখা এ'দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাহাদের অন্যতম। এই সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের কথা সে'কালের বাংলা ভাষায় গানের আকারে লিখিত হইয়াছিল। এই গানগুলিকেই বৌদ্ধগান বা চর্যাপদ বলা হয়। বৌদ্ধ সাধকগণ চর্যাপদগুলি রচনা করিয়াছিলেন; ধর্মের তত্ত্ব এবং সাধন-ভজনের কথা ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া বাহির হইতে অনেক সময় ইহাদের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না; তবে ইহাদের ভাষা যে প্রাচীন বাংলা ভাষা এবং ইহাদেরই ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়া যে আধুনিক বাংলা ভাষার

বিকাশ হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ভুসুকুপাদ নামক একজন বাঙ্গালী সাধকের রচিত একটি 'চর্যাপদ' এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, প্রাচীন বাংলা ভাষার কি রূপ ছিল, তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

কাহেরে ঘিনি মেলি আছহুঁ কীস।
বেঢ়িল হাঁক পড়ই চৌদীস ॥
অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী ॥
তিণ ন ছুবই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জানী ॥
হরিণী বোলই হরিণা সুণ তো।
এ বন ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥
তরঙ্গতেঁ হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুক ভণই মূঢ়-হিঅহি ণ পইসই ॥

আধুনিক বাংলায় যদি ইহাকে অবিকল অনুবাদ করা যায়, তবে ইহা এই রকম দাঁড়াইবে—

কাহাকে লইয়া ছাড়িয়া আছি কেমনে।
বেড়া হাঁক পড়ে চৌদিকে ॥
আপন মাংসে হরিণ বৈরী।
ক্ষণও না ছাড়ে ভুসুকু শিকারী ॥
তৃণ না ছোঁয় হরিণ, খায় না পানী।
হরিণ-হরিণীর নিলয় না জানি ॥
হরিণী বলে, হরিণ, শোন তুই।
এ' বন ছাড়িয়া হও ভ্রান্ত ॥
উল্লম্ফনে হরিণের খুর না দেখা যায়।
ভুসুকু ভণে মূঢ়ের হিয়ায় না পাশে ॥

আগেই বলিয়াছি, ইহা সাহিত্য নহে, ইহা ধর্ম—তত্ত্বকথাই ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে; অতএব যাঁহারা এই পথের সাধক, তাঁহারা ব্যতীত ইহাদের সুগভীর তত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারিবার কথা নহে, পারেও না।

বিভিন্ন সাধকের রচিত এই প্রকার ৪৭টি মাত্র গান চর্যাপদ নামে পরিচিত—বাংলা ভাষার সর্বাপেক্ষা পুরাতন নিদর্শন রূপে ইহাদের বিশেষ মূল্য আছে।

ব্যবহারিক গান

ইংরেজিতে যাহাকে functional song বলা হয়, বাংলায় তাহাই ব্যবহারিক গান। বিবাহের গান ইহাদের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পূর্বে তাহা বিস্তৃত উদ্ধৃত হইয়াছে।

পদ্মের পুষ্পের জল করে টলমল।
তার ভিতরে স্নান করে সুন্দর বিদ্যাধর॥
স্নানটি কইর‍্যা রামগো হইল পূর্বমুখী।
তার শ্বশুরে পাঠাইয়া ছিল সুন্দর একখানা ধুতি॥
ধুতিখান পইর‍্যা আবার হইল পূর্বমুখী।
রাম বসে পূর্বমুখী সীতা বসে বামে॥
সীতার চোখের জলে রামের বাম অঙ্গ ভাসে।
আকাশে নক্ষত্র যেমন চন্দ্রে দিল দেখা॥ —মুর্শিদাবাদ

সংযোজন

(নিম্নোদ্ধৃত গানগুলি ১৯৬৭ সনের মে মাসে সংগৃহীত হইয়াছে। এই খণ্ডের মুদ্রণ কার্য তখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া যথাস্থানে ইহারা সন্নিবিষ্ট হইতে পারে নাই।)

বাদীগান

মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতের নাম বাদীগান। ইহারা সাধারণত সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে প্রশ্নোত্তর বাচক এই শ্রেণীর গানে একটু অভিনবত্ব আছে। ইহাতে স্ত্রী যদি পুরুষের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হয়, তবে প্রশ্নকারী পুরুষ তাহাকে অধিকার করিয়া যতদিন ইচ্ছা তাহাকে নিজের প্রয়োজনে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। অনেক সময় স্ত্রীর পরাজয় ইচ্ছাকৃতও হয়।

১

পুঃ—উনুনমুখী কোটরচোখী তুই আমার খেঁদি সুন্দরী।
স্ত্রী—উনুনমুখা কোটরচোখা আমি তোর রূপ দেখে মরি।
পুঃ—খাঁদি, তুই আস্তাকুড়ের পাত,
স্ত্রী—তাতে তুই কুকুর হয়ে চাট্।
পুঃ—তুই লঙ্কা মাখা গামলা ভরা পচা পান্তাভাত,
স্ত্রী—তাতে তুই মাছির মতো করিস ভ্যানভ্যান।
কি জ্বালাতন, কি জ্বালাতন, জ্বালাতন সইতে কি পারি।
পুঃ—খাঁদি, তুই শেওড়া গাছের ভূত,
তোর পীরিতির কসম খেয়ে আমার প্রাণের বড় দুখ।
স্ত্রী—তুই যা যা যা সর্ সর্ সর্
আমি তোর রূপ দেখে মরি ॥ —ডোমজুড়ি (সিংভূম)

২

প্রঃ—ঘর ছাইগলি পটে নাগেশ্বর ফুল ফুটুছি গুটে
পাতুলি গাণ্ডুয়া ঘাটে,
উঃ—নই মাছ চুনি চুনি
উপর শাইরে কাঁদুছি কোনে
জুতা পাঙ্কত চিনি চিনি।

প্রঃ—তাল বহঙ্গড়া নাশি
দরিয়া ভিতরে ডাকে বিদেশী
মো সঙ্গে যাউছি ভাসি।

উঃ—পড়িয়া বনড় ঘোষি (শুখনা গোবর)
কৃষ্ট ধরিয়াছে ফুলর বাঁশী
রাধিকা গেলাসি হাসি।

প্রঃ—আমি বেগুনা ভাজিলি ডালে
হাতু রূপামুদি পডিলা তোড়ে
মুই পড়িলা তোড়ে, মুড়িয়া নাগুড়ি বেড়ে।

উঃ—সোনামুদি দাউ দাউ
রূপামুদি ফোঁড়ে দাডু গাগুব
পাকাঘর ছাড়ি দেউ।

প্রঃ—গহির বিলর হাড়
তোতে কি দিলা এ রঙ্গমাড়।
হারাইল জাতিকুল।

উঃ—ধানকাটালি হেরে
দেই যা সঙ্গত কোড়ে
মাগুছি অতিভি কোরে।
চৌদ্দ বছর বারোমাস ও রাম দেখিব তোরে,
সোনার লঙ্কা রাখবি কেমন ক'রে। —ঐ

৩

প্রঃ—নই বালি সুরু কাই সুরু সুতা মুগা মঝুর জালি,
দেখিনি তুমারি চালি।

উঃ—গুয়া গছ ধাড়ি ধাড়ি, গুয়া গছ মুড়ে গোল বাহারি,
উচ মুগা ছাড়ি ছাড়ি বাহারি গলা।

প্রঃ—রসুন খাইলা পুকো, দড়ে হসি দেলা কি দিব ডুখ,
যেতে হুন পর মুক।

উঃ—ফাটা মাদলের ঝাঁই, সুরু মুহা পিলা
সাইগো বাদীরে নাই।

প্রঃ—মাগুর মাছের কাঁটা পরপতি সঙ্গে ন হব কথা,
গালর খাইব যথা,

উঃ—কাঁড়া গলা ঘর ঘর গুটিয়ে কইমু দু'টি বর
টাঁড়া ঝিকা হই মর।

প্রঃ—সড় ফুল সঁই সঁই, সুকুলা মুহাকু চাই বা নেই
আগুর তাক ভড়ক নাই।

উঃ—পঁড়স পতর কঁড়া, ভাত রাঁধি দেবে গুটিক পহড়া,
বাবু জিবে সাঁই কুড়া। —দহমুণ্ডা (মেদিনীপুর)

৪

প্রঃ—নই বালি ধ্বস ধ্বস মনবায়া হীনে করিবা কি স
যথা হেরি কেতে বম।

উঃ—কটাকিরা গেল আড়ু, আশা দেই নিরাশা কলু
কাহা সঙ্গে ভুলি গেলু।

প্রঃ—বসাইলি বসা দহি আশা করি থেলা পাতরা ভাই,
দিন না পারিলি খাই।

উঃ—তাটি আরে শলা সাগ তাতে নাই যোধ উপর ভাগ
সেইটা ভাঙ্গিবু রাগ।

প্রঃ—চাউরি পুরা কলসী, মোর শরীর কথা কিয় জানন্তি
মিলহ হাসি বউউচি।

উঃ—গুয়া ভাঙা থিলি কাতি, না হেলি পাতরা পনা ছাতি,
জঙ্গরে পান খুয়ন্তি।

প্রঃ—পাটারে টেকা রসি আগুচারি দেল মনহরাসি
পচুরে ভাবিব বসি।

উঃ—ছেড়ি নেড়ি নভু গুটি, গুটি আসিথিল পাতরি নিদলু উঠি
কুগা গেল ফিটি।

প্রঃ—নই ঘাটে পড়া দাপে নানা পরকারে নেই ষামুতে
ভাত রান্ধিবি তাতে।

উঃ—কদুরী পাতের দোনা, কি কলা তাতে দুয়ার মানা,
শরীর বড় ভাবনা।

প্রঃ—বিড়ি ভাজি ধীরি ধীরি, আজি, মা, যাউচি ঘর কাহারি
সাইরে মকর ছুড়ি।

উঃ—আম গাছ আবু ডাবু সতেকি পাতরা মোতে গোতেবু
গুয়া ভাঙ্গি দেবু।

প্রঃ—ক্ষীরি বাড়ী থারি থারি আজ রাতে মোর পলা থেঁকরি
বিছানা গেলা কাঁকরি।

উঃ—নইরা মাধরী কেতে দিলা কড়া মুঙ্গি সারি কে তোতে
ফুটাই গহনা খোতে।

প্রঃ—সরপে মারে শিমরি, আড় পাতরিয়া দাঁতের মিশি,
মোউ থরা বেলা দিলা হাসি।

উঃ—মউহা করা অন্ধার শাশুড়ী গালি দেব ননদ মোর
চল ফিরি যেবা ঘর।

প্রঃ—বাটরে বুড়িলু ফুটি, বারিপদা রাজা যাউচি উঠি
ছমাস ছদিন ছুটি।

উঃ—মোরচি বুয়েলি তলা, চম্পাপড়ি দিহ কাটই থরা
কি দেব ছাই তরা। —বনগড়া (মেদিনীপুর)

বালিকা পূজার গান

মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যার সীমান্তে সুবর্ণরেখা নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলে কার্তিক মাসে কুমারী বালিকারা নদীতীরে গিয়া এক লৌকিক ব্রত বা পুজার অনুষ্ঠান করে। তাহা বালিকা-পুজা বলিয়া পরিচিত। এই উপলক্ষে ওড়িয়া এবং বাংলা ভাষায় মিশ্রিত যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই বালিকা পুজার গান নামে পরিচিত। নিম্নোদ্ধৃত গানগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রকে দামোদর বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

১

হে দামোদর, নোড়া পদরী গাছের ভড়া,
ওগো বামুনী, ওগো বামুনী, তোগর ঘিঅ কে নিলা।
ক্ষীর সমুদর উদিয়া নারী গো বালিকা পুজিতে নেলা,
ওগো বামুনী, ওগো বামুনী, তোগরে কদরী কে নেলা।

ক্ষীর সমুদর উদিয়া, নারী গো, বালিকা পুজিতে নেলা,
ওগো বামুনী, ওগো বামুনী, তোগর গুড়কে নিলা।
ক্ষীর সমুদর উদিয়া নারী গো বালিকা পুজিতে নিলা
ওগো বামুনী, ওগো বামুনী তোগর শঙ্খ কে নেলা,
ক্ষীর সমুদর উদিয়া, নারী গো, বালিকা পুজিতে নিলা,
ওগো বামুনী, ওগো বামুনী, তোগর দুধ কে নেলা,
ক্ষীর সমুদর উদিয়া নারী গো বালিকা পুজিতে নেলা।

—বনগড়া (মেদিনীপুর) ১৯৬৭

রাম ও সীতার পাশা খেলার বিষয় নিম্নোক্ত গানটিতে শুনিতে পাওয়া যাইবে—

২

শত সুবর্ণের মুড়িপ চন্দন কাঠের কুঠি,
সীতারাম জো খেলস্তি হস্তে কৌড়িমুঠি।
এক মুঠি জৌ খেলস্তি রাম হইল দন্ধা,
হাসি বনমালী দিয়া গো তার পৈতা বান্ধা।
শত সুবর্ণের মুড়িপ চন্দন কাঠের কুঠি,
সীতারাম জৌ খেলস্তি হস্তে কৌড়ি মুঠি।
দুই মুঠি জৌ খেলস্তি রাম হইল দন্ধা,
হাসি বনমালী দিয়া গো তার বাড়ীটা বান্ধা।
শত সুবর্ণের মুড়িপ চন্দন কাঠের কুঠি,
সীতারাম জৌ খেলস্তি হস্তে কৌড়ি মুঠি।
তিন মুঠি জৌ খেলস্তি রাম হইল দন্ধা,
হাসি বনমালী দিয়া গো তার ছাতাটি বান্ধা।
শতা সুবর্ণের মুড়িপ চন্দন কাঠের কুঠি,
সীতারাম জৌ খেলস্তি হস্তে কৌড়ি মুঠি।
চার মুঠি জৌ খেলস্তি রাম হইল দন্ধা,
হাসি বনমালী দিয়া গো তার জুতাটি বান্ধা।
শত সুবর্ণের মুড়িপ চন্দন কাঠের কুঠি,
সীতারাম জৌ খেলস্তি হস্তে কৌড়ি মুঠি।

পাঁচি মুঠি জৌ খেলন্তি রাম হইল দন্ধা,
হাসি বনমালী দিয়া গো তার নেপুর বান্ধা।
শত স্থবর্ণের মুড়িপ চন্দন কাঠের কুঠি,
সীতারাম জৌ খেলন্তি হস্তে কৌড়ি মুঠি।
ছয় মুঠি জৌ খেলন্তি রাম হইল দন্ধা,
হাসি বনবালী দিয়া গো তার মুকুট বান্ধা।
শত স্থবর্ণের মুড়িপ চন্দন কাঠের কুঠি,
সীতারাম জৌ খেলন্তি হস্তে কৌড়িমুঠি।
সাত মুঠি জৌ খেলন্তি রাম হইল দন্ধা,
হাসি বনমালী দিয়া গো তার ঢুলটি বান্ধা।
শত স্থবর্ণের মুড়িপ চন্দন কাঠের কুঠি,
সীতারাম জৌ খেলন্তি হস্তে কৌড়ি মুঠি।
আট মুঠি জৌ খেলন্তি রাম হইল দন্ধা,
হাসি বনমালী দিয়াগো তার ফুলটি বান্ধা।
শত স্থবর্ণের মুড়িপ চন্দন কাঠের কুঠি,
সীতারাম জৌ খেলন্তি হস্তে কৌড়ি মুঠি।
নয় মুঠি জৌ খেলন্তি রাম হইল দন্ধা,
হাসি বনমালী দিয়া গো তার তকতি বান্ধা।
শত স্থবর্ণের মুড়িপ চন্দন কাঠের কুঠি,
সীতারাম জৌ খেলন্তি হস্তে কৌড়ি মুঠি।
দশ মুঠি জৌ খেলন্তি রাম হইল দন্ধা,
হাসি বনমালী দিয়া গো তার জীবন বান্ধা।· দহমুণ্ড (মেদিনীপুর)

৩

সোনার নাগল রূপার ফাল
হে সরস্বতী রকত মাল।
উঠহে গৌরী চলহে সখী
যুগী ভাই সঙ্গে বড় পিরতী।
হৈঠে আইলা কাশীয়া দেশ
কাশী বীরাসরে কবাট পেশ।

কবাট পেশিলা উঠে মালিকা
হস্তে চাঁপা ফুল পুজে বালিকা।
উজাগর হই জাগর জালি
নিচন্তি কমল থালি বাজাই,
স্বর্গ পড়ি এলেন রুণ্ড
সবু ঢালি দেশে অমৃত কুণ্ড।
কাতিক মাসেরে সে মুগ গজা
আনন্দে করগো বালিকা পুজা।
বালিকা পুজালি যোল কাহন
বালিকা আনরে বাউ বাহন।
বন্ধাইল বন্ধাইল চৌষট্টি তারা
ছয়টি কাহারি পরভু তোমারি যে সেবা।
আমগাছ ধাড়ি ধাড়ি পক্ষীকুলে বাস।
প্রভু আসিব বলিয়ে গো করিয়েছি বাসা।
আস, প্রভু, আস, প্রভু, বহানে
তোক্ষা নাগি আনি রাখছি ফুল চন্দনে।
আঠ তারা লেখি লিখি
পক্ষীতারা কেশরী
বোউনারী বান্ধিবিনে যাব কেস্থ দেখি,
কালিয়া কদম মুলে কাগজেরি লেখা,
যমুনার জলে, পরভু, বেগে দিও দেখা।
খিলি পান মুড়িথিলিকি,
প্রভু অত ছন্দ মায়া কলকে
প্রভু তেন দিনে সুখী গেল কি। —ঐ

৪

বালিকা নবেন্দ্র বালিকা নবেন্দ্র,
বালিকা বন্ধ-এ নারী
স্বর্গপুর পুষ্পাতি পড়িলে
মঞ্চে পরে হুলাহুলি।

নদী নবেন্দ্র নদী নবেন্দ্র
নদীকে বান্ধ এ নারী,
স্বর্গপুর যে পুষ্পতি পড়িলে
মঞ্চে পরে হুলাহুলি।
দামোদর নবেন্দ্র দামোদর নবেন্দ্র
দামোদর বান্ধ এ নারী,
স্বর্গপুর পুষ্পতি পড়িলে
মঞ্চে পরে হুলাহুলি। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে বকের বিষয় বলা হইয়াছে—

৫

বগ মুহে চাই বগলি বসে
আরে বগলি মুহরি আসে
মুই যে ঘুরিমু ভেরি কার্তিক মাসে
কার্তিক মাসরে সে মুখগঙ্গা
সন্তোষে করগো বালিকা পূজা।
বালিকা পুজিলি ষোল কাহন,
বালিকা আনরে মৌ বাহন।